আমার জীবনের লক্ষ্য।

শ্রীরামলাল সরকার।

১৯১১

ভূমিকা।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনের একটা লক্ষ্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। লক্ষ্য-হীন জীবন আর কর্ণধার-বিহীন তরী, এই উভয়েরই একদশা হইয়া থাকে। নদীর স্রোতে কর্ণধারবিহীন ভাসমান একখানি তরণী যেমন স্রোতের বেগে চালিত হইয়া বা বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কোন স্থানে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে, সেইরূপ, লক্ষ্যহীন জীবনও কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোন একটা বিষয়ে গিয়া আবদ্ধ হইয়া তাহার উন্নতির মূলে বাধা প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস এই যে, আমাদিগের দেশের অধিকাংশ জীবনই লক্ষ্যহীন এবং এই কারণে এ দেশে অনেক বিষয়ে আদর্শ জীবনের সংখ্যা অতি অল্প। বাল্যকাল হইতে জীবন-তরণী-খানি সংসার-স্রোতে সাহস, উদ্যম, তেজ ও দৃঢ়তার সহিত চালাইতে পারিলে, যদি তাহাতে কোন দৈব দুর্ব্বিপাক না ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা আপন লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইবে। এই বিষয়টী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইবার জন্য, এই গ্রন্থখানি ১৯০৬।১৯০৭ খ্রীঃ লিখিত হইয়াছিল এবং ১৯১১ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ইহার মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হইল। অনেক ইতস্তত করিয়া ইহা প্রকাশিত হইল। কারণ ইহাতে বহুসংখ্যক গুরুতর মুদ্রণ-ভ্রম ঘটিয়া ইহাকে স্থানে ২ অপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। তন্মধ্যে ২০১, ২০৭, ২০৮, ২১৫ পৃষ্ঠাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে অপ্রকাশিত রাখা ক্ষতির কারণ মনে করিয়া, এক সুদীর্ঘ ভ্রম-সংশোধনের তালিকা মস্তকে ধারণ করিয়া, ইহা সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত হইল। সমালোচকগণের তীক্ষ্ণবাণ ইহার দুর্ব্বল স্থান সকলে আঘাত করিয়া মনোবেদনা জন্মাইবে, এই আশঙ্কা। তবে নিরুপায়। পাঠকগণ দয়া করিয়া ইহার যে স্থানে অসংলগ্ন বা দুর্ব্বোধ বোধ হইবে, সেই সেই স্থান সংশোধন-তালিকা দেখিয়া ঠিক করিয়া লইবেন।

এই গ্রন্থে মুদ্রণ-ভ্রম ঘটিবার আর একটী বিশেষ কারণ এই যে, গ্রন্থকার বিদেশ হইতে ইহার প্রুফ সংশোধন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন এবং কাপির হস্তলিপিও খুব স্পষ্ট লেখা ছিল না। ব্রহ্মদেশের স্থানের ও ব্যক্তির নাম সকল মুদ্রণে অধিক ভ্রম লক্ষ্য হইবে। সেটা এইদেশের ভাষা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে বুঝা দুরূহ, তাহার আর সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানি আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে, আশঙ্কা অনেকের ইহা পাঠ করিতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে।

পুস্তকে আর একটী কথা উল্লেখ না করিলে কোন কোন ব্যক্তির নিকটে নিন্দনীয় হইতে হইবে, তাহা এই—ইহার স্থানে স্থানে ইংরেজী ও হিন্দী কথার প্রয়োগ। ইংরেজের মুখে ইংরেজি কথা এবং হিন্দুস্থানীর মুখে হিন্দী কথায় যেমন সেই সেই কথার ভাবরস সুচারুরূপে উপভোগ করা যায়, তাহা বাঙ্গালা করিয়া বলিলে তাদৃশ শ্রুতিমধুর হয় না বিধায়, বাঙ্গালা গ্রন্থে ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়াছি। এই সকল স্থান ঐ সকল ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন উপভোগ করিবেন, উক্ত সকল ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আবার তাদৃশ বিরক্ত হইবেন। আমার জীবনের লক্ষ্য বাঙ্গালাভাষায় স্থান পাইবে কিনা, সুধী পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

টেজিয়ে,
১৯শে আগষ্ট, ১৯১১। } শ্রীরামলাল সরকার।
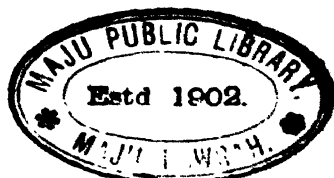
আমার জীবনের লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়।

আত্ম-পরিচয়।

আমার নাম কুড়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পূর্ব্ববঙ্গের কোন গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি। ঠিক কোন্ জেলায় আমার বাস, তাহা বলিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বরিশাল, ময়মনসিং এবং ফরিদপুর, এই তিন ঠেঙ্গারে জেলার কোন এক জেলায় আমার বাড়ী হইবে।

বাপ পিতামহের বিষয় সম্পত্তি সামান্য। অল্প পরিমাণে জোতজমা এবং কিছু ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর মাত্র সম্বল ছিল। পরিবারের লোক সংখ্যা অধিক থাকায় বৎসর যে ধান্যাদি পাওয়া যাইত, তাহাতে চলিত না। উপরি কিছু আয় না থাকিলে, সেই বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া কিছুতেই চলিত না। সুতরাং সংসারে এক প্রকার অনাটন ছিল।

পিতামহ নীলকুঠীর গোমস্তাগিরি করিয়া সামান্য কিছু বেতন পাইতেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ আনুকূল্য হইত। তিনি শিষ্ট শান্ত ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কিন্তু আমার খুল্লপিতামহ মহাশয় একটী "গোঁয়ার-গোবিন্দ" ধরণের লোক ছিলেন। গামছা পরিয়া নামিয়া তালাশ করিলেও তাঁহার পেটে "ক" অক্ষর খুঁজিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার কার্য্যের মধ্যে ছিল মাছধরা আর ভাত খাওয়া। বড়শী, জাল ও পোলতে তিনি একপ্রকার সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মাছ ধরিতে গেলে সকলে কিছু পাউক আর না পাউক, তাঁহার কোন দিন প্রায় ফাঁক যাইত না। কই, মাগুর প্রভৃতি মাছ সর্ব্বদাই জালা ভরা ঘরে জিয়ান থাকিত। শীতকালে জালদারা পাখী ধরিতেন, তাহাও পোলর মধ্যে সর্ব্বদা মজুদ থাকিত। বাটীতে গাই ছিল, দুধের ভাবনা ছিল না। সুতরাং অন্নবস্ত্রের অনাটন হইলেও মাছ মাংস ও দুধের বড় অভাব ছিল না।

নিজে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। সাহস ও গোঁয়ারতামির জন্য গ্রামের সকলই তাঁহাকে ভয় করিত। তৎকালে এই যে দুর্দ্দান্ত নীলকরের প্রতাপ, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। খাজনার জন্য কুঠী হইতে পেয়াদা আসিলে বাটীর মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, দেখা দিতেন না। যদি পেয়াদারা ভেউ ভেউ করিয়া বড় বিরক্ত আরম্ভ করিত, তাহা হইলে রাগিয়া বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া তাড়াইয়া দিতেন। এই মত এক-বার পাঁচ ছয় বৎসরের খাজানা বাকী পড়িলে, কুঠীর পেয়াদাগণ সতত তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিতে লাগিল, কুঠিয়ালগণ তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইবার আয়োজন করিলেন।

একদিন গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে এক বিলের মধ্যে পোলদ্বারা মাছ ধরিতে গিয়াছিলেন, এমন সময়ে, ঢাল সড়কীধারী প্রায় পঁচিশ জন লাঠি-য়াল আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। তখন আর পলায়নের উপায় নাই, নিরুপায় হইয়া, আপন পোলযন্ত্রের সাহায্যে কতক্ষণ লড়িয়া, কাহাকেও নিকটে যাইতে দিলেন না। কিন্তু পঁচিশ জন অস্ত্রধারী লাঠিয়ালের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ পোলযন্ত্রের সাহায্যে কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারে? অভিমন্যু সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়া হত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার খুল্লতাত মহাশয় পঞ্চবিংশ রথী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ধৃত হইয়া নীলকুঠিতে নীত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা এবং মাছ ধরার কোমর বাঁধা বেশ দেখিয়া, কুঠির-নায়েব মহাশয়, তাঁহার বস্ত্র পরিবর্ত্তনের আদেশ দিলেন এবং তাঁহার স্নানা-হারের কার্য্য তথায় সম্পন্ন করাইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি পাঁচ ছয় বৎসর যাবত কেন খাজনা দেন না। তাহাতে তিনি সগর্ব্বে উত্তর করিলেন যে "তোমরা যদি পেয়াদা পাঠাও, তবে আমি খাজনা দিব না, আমাকে ধ'রে এনেছ বেশ, খাবার দেও, এখানে বসে থাকি। পেয়াদা যদি না পাঠাও, তবে বৎসরে চারি কিস্তিতে আমি খাজনা নিজে পাঠাইয়া দিব।" বলা বাহুল্য, নায়েব তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন এরূপ খাজনার আইন ছিল না এবং নালিশ করিয়া সহসা কাহারও সম্পত্তি ক্রোক করিবারও সুবিধা ছিল না। তখন প্রায় 'জোর যার মলুক তার' ভাবেই কার্য্য হইত। তখন গ্রামে এত লোক ও লাঠিয়াল ছিল যে, দুই শত লোক আসিয়াও সহসা তাঁহাকে বাটীর উপর হইতে কেহ ধরিয়া লইতে সাহস পাইত না। গ্রামের দুষ্ট লোকগণ তাঁহার হাতের থাপড় খায় নাই, এমন লোক প্রায় ছিল না। তাঁহার বা হাত বড় চলিত, বাম

হাতে এত জোর ছিল যে, যাহাকে মারিতে হইবে,তাহাকে মারিতে বাম হাতই ব্যবহার করিতেন। একবার মাঠে ধানের ক্ষেতে, কোন ভদ্র লোকের সঙ্গে বচসা হওয়ায়, তাঁহাকে বাম হাত দ্বারা এমন থাপড় মারিয়াছিলেন যে, ঐ ভদ্র লোকটার মাথা ফাটিয়া রক্তপাত হইতেছিল। জেলায় নালিশ হইলে এজন্ত তাঁহার ২০৲ টাকা অর্থ দণ্ড হয়।

আর একবার গ্রামের কর্ম্মকারদিগের বাটীতে ডাকাইত পড়িল। ডাকাইতগণ মশাল জ্বালিয়া ঢাল, সড়কী, তলোয়ার, ও লাঠি প্রভৃতি দ্বারা বাহির বাটীতে অতি বিক্রমের সহিত খেলা করিয়া লোকের মনে আতঙ্ক জন্মাইতে লাগিল এবং কয়েক জন বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কর্ম্মকারদিগের মধ্যে একজন বেশ লাঠি খেলা জানিত। ঐ ব্যক্তি তাহার বাটীর চৌকিদার সহ সদর দরজার ভিতর অনেকক্ষণ যাবত ডাকাইতদিগের গতি রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ডাকাইত পড়ার সংবাদ পাইয়া আমার খুল্ল পিতামহ মহাশয় এক ডাক ছাড়িলেন যে "পাড়ায় কে কোথায় আছিসরে, শীগ্‌গীর আয়, কামার বাড়া ডাকাইত পড়িয়াছে" এই বলিয়া নিজে লাঠিসহ ও পাড়ার লোক সহ বেগে কর্ম্মকার বাটীর অভিমুখে ছুটিলেন। তিনি ক্রোধে এমন আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, 'ধর, ধর, মার, মার' করিতে করিতে দলবল সহ অস্ত্রধারী ডাকাইতগণের সম্মুখে গিয়া পড়িলেন। তাঁহার পৌছার পূর্ব্বে বহু লোক তথায় জমা হইয়া আড়ালে লুকাইয়া তামাসা দেখিতেছিল, কিন্তু কাহারও ডাকাইত তাড়াইতে সাহস হয় নাই। যখন তিনি দলবলে 'মার মার'করিতে করিতে ডাকাইতদিগের সম্মুখে পড়িলেন, তখন অপর সকলে তাঁহাকে টানিয়া পিছনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং বলিতে লাগিল, "আপনি যান কোথা, অস্ত্রধারী ডাকাইতগণ এখনই আপনাকে হত্যা করিবে"। কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার সাহস ও তেজের জন্য বহু লোক জমা হইয়া ডাকাইতগণকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলে, ডাকাইতগণ অনন্যোপায় হইয়া কর্ম্মকার বাটীর পশ্চাতস্থ জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া পলায়ন করিল। তাহারা কোন মূল্যবান সম্পত্তিই লুট করিতে পারিয়াছিল না।

আমার বাপ খুড়াগণও খুল্ল পিতামহের ধারা পাইয়াছিলেন। পিতা খুব বলিষ্ঠ ছিলেন, তিনি ৬ ফুটের উপর উচ্চ ছিলেন। তাঁহার প্রসস্ত বক্ষ ও বিশাল বাহুদ্বয় প্রকৃত সাহসী বীরপুরুষের পরিচয় দিত। যেমন শারীরিক শক্তি,তেমনই সাহস ছিল।

একদা মাঠের মধ্যে জঙ্গলের ধারে, আমাদিগের দুই তিনটী গাই চরিতেছিল। তাহার মধ্যে একটী গাইয়ের অল্প দিন হইল একটী বাছুর হইয়াছিল। ঐ বাছুরটীও গাইয়ের সঙ্গে চরিতেছিল। গ্রামে তখন কেঁদ বা চিতা বাঘের বড় উপদ্রব ছিল। জঙ্গল হইতে একটী বাঘ বাহির হইয়া আসিয়া ঐ ক্ষুদ্র বাছুরটীকে গ্রাস করিবার জন্য ছোঁ মারিবার চেষ্টা করিতেছিল, আর গাই তিনটী বাছুরটীকে মধ্যে রাখিয়া শিং পাতিয়া বাঘটীকে তাড়া করিয়া যাইতেছিল। গাভিত্রয়ের বিক্রমে ব্যাঘ্রটী হটিয়া কিছু দূর গিয়া বসিতে লাগিল। এমন সময়ে বোধ করি কাহারও চীৎকারে পিতাঠাকুর দৌড়িয়া গিয়া গরু ও বাঘের মধ্যস্থলে পড়িয়া বাছুরটীকে কোল সাপ্‌ঠা দিয়া ধরিয়া, মাত্র একখানা বাঁশের কঁঞ্চি দ্বারা মাটিতে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং চীৎকার করিয়া অপর লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই চীৎকারে অপরাপর লোক সকল তাঁহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলে, ব্যাঘ্রনন্দন ভগ্নমনোরথ হইয়া জঙ্গলে মাথা দিলেন।

আর একবার রাত্রিকালে একটী বাঘ আমাদিগের বাটীর গোশালা হইতে বড় একটী বাছুরকে বেড়া ভাঙ্গিয়া টানিয়া বাহির করিয়াছিল। বাঘটী বোধ করি খুব বড় হইবেনা, তাই বাছুরটীর গলার নলি কামড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, আর বাছুরটীও সজোরে টানিয়া পিছনে হটিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। রাত্রিকালে সকলেই নিদ্রিত ছিলেন। বাছুরটীর গোঁ গোঁ শব্দে আমার খুড়ামহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া, তাঁহার সেই প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া, অন্ধকার রাত্রিকালে বাঘের সম্মুখে গিয়া পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিলেন এবং লাঠিদ্বারা মাটিতে আঘাত করিয়া বাঘটাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। বাটীর মধ্য আঙ্গিনায় এ ঘটনা। পিতাঠাকুর সেদিন বাটীতে ছিলেন না। অপর এক ঘরে আমার খুড়া সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি আমার খুড়াকে সাহায্য করিবেন, দূরের কথা, উঠিয়া তাঁহার ঘরের দরজার খিলটী আরো আঁটিয়া দিলেন। খুড়া মহাশয় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা যাবৎ একাকী অন্ধকারের মধ্যে বাঘের সম্মুখে পড়িয়া চেঁচাইতেছিলেন। যখন গ্রামের পাড়ান্তর হইতে লোক সকল কলরব করিয়া সাড়া দিল এবং লোক আসিয়া জমিল, তখন বাঘটী বাছুরকে ছাড়িয়া দিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বাছুরটীকে যেই ছাড়িয়া দিল, অমনি পড়িয়া সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

আমাদিগের এই "ঠেঙ্গাঠ্যাঙ্গাতে" গোষ্টির হাতে যে অনেক হিন্দু মুসলমান মার

খাইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। উত্তরাধিকারী সূত্রে বাপ পিতামহের অন্ত কোন গুণের অধিকারী না হইলেও, এই "ঠেঙ্গাহাতে' স্বভাবটা আমাতে আসিয়া বর্ত্তিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য আমি তাদৃশ পাই নাই, তাহার কারণ, ছোট বেলা হইতেই ম্যালেরিয়াতে আমার শরীর এমন ভাবে নষ্ট করিয়াছিল যে, পেটের মধ্যে পাঁচ সের ওজনের একটা প্লীহা দেখা দিয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিষ ভক্ষণ।

আমার এক পিস্‌তুত ভগ্নী ছিল। তাহাকে সকলে পাগলী বলিয়া ডাকিত, কারণ তাহার স্বভাবটা পাগলা পাগলা ছিল। তাহার বয়স আমা অপেক্ষা তিন বৎসরের অধিক ছিল। আমার যখন চারি বৎসর বয়স, তখন সে এক দিন অপরাহ্ণে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের বাহিরে, ময়দানের মধ্যে বেড়াইতে লইয়া যায়। আমা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক বয়সী আরো দুই তিনটী ছেলে মেয়ে আমাদিগের সঙ্গে ছিল। দিদী বেড়াইতে বেড়াইতে একটী ধুতরার গাছ হইতে পাকা ধুতরা দুই তিনটী তুলিয়া, তাহার বীজ বাহির করিয়া বলিল যে, "তোরা পাগল হবিত আয়, আমরা ধুতবার বিচি খাইয়া পাগল হই।" এই কথায় আমি বলিলাম,'দিদী আম্রি পাগল হব, আমি পাগল হব' এই বলিয়া আমি আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইলে আমার হাতে কতকগুলি ধুতরার বিচি দিয়া দিদী বলিল যে,"সমস্ত খেয়ে ফেল, এই দেখ্‌না আমিও খাই" এই বলিয়া নিজেও দুই একটা মুখে দিল। অপর ছেলেদিগের একজনে কিছুতেই এই বিষ হাতে লইল না, আর দুই জন কয়েকটা বীজ হাতে লইয়া মুখে দিবা মাত্র থু থু করিয়া ফেলিয়া দিল। আমি কিন্তু সমস্তই মুখে দিয়া একেবারে গিলিয়া ফেলিলাম। পরে বেড়াইতে বেড়াইতে বাটীতে ফিরিলাম। বাটী আসিলেই সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়,এমন সময়ে মা আমাকে ভাত খাওয়াইয়া দিলেন এবং সন্ধ্যার পর বিছানায় আমাকে শোয়াইয়া রাখিলেন। আমি অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহরের সময় আমি হঠাৎ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলাম, মা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "একি ছেলে কেন হঠাৎ ঘুম হইতে লাফাইয়া উঠিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল ?" আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে "মা, ঐ পাকা কুলগুলি গাছ হইতে পেড়ে দেও ত, দেখ, কেমন রাঙ্গা টুক্ টুকে কুল সকল গাছে ধরে রয়েছে।" মা বলিলেন, "কই কুল কোথায় ? তুই বুঝি স্বপন দেখেছিস্, শুয়ে পড়।" আমি বলিলাম, "না না, দেখ্‌তে পাচ্ছনা, তোমার চক্ষু কি একেবারে গে'ছে, আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। আর ঐ দেখ আর এক গাছে কেমন পাকা আম সকল ঝুল-তেছে, ওঠ, ওঠ, দেও, শিগ্‌গীর আমাকে ঐ আম ও কুল পেড়ে দাও।" মার তখন স্বপ্নের ধোকা গেল, তিনি ভীত হইয়া পিতা ঠাকুরকে ডাকিলেন, এবং প্রদীপ জ্বালিলেন। তিনি পিতা ঠাকুরকে বলিলেন যে "ছেলে যেন পাগলের মত কথা বল্‌তেছে, না কোন অপদেবতার দৃষ্টি হল" ! বাবাও কিছু বুঝিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। মা এক এক বার আমাকে টানিয়া শোয়াইয়া স্তনের দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আর আমি ধাক্কা দিয়া মাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া বলিলাম, "ঐ যে কুল ! আমাকে দাও। তোমরা কথা শোন না কেন ?" আমি এই বলিয়া উঠিয়া দৌড়িয়া কুল ও আম ধরিতে যাইতে লাগিলাম এবং পিতা ও মাতা আমাকে টানিয়া কোলে করিয়া কত প্রবোধ দিতে লাগিলেন। আমি যেন দেখিতে লাগিলাম যেন, ঘরের খুঁটি গুলিতে অসংখ্য পাকা রাঙ্গা কুল সকল ও আম সকল ধরিয়া রহিয়াছে। আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম, পিতা মাতা কিছু বিশ্বাস না করিলে তাহা মানিব কেন ? এক এক বার খিল্ খিল্ করিয়া হাসি, চীৎকার করি, লাফাইয়া উঠি, এই ভাবে সমস্ত রাত্রি চলিল। বাটীর অপর লোক সকল আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বাটীর নিকটস্থ অপর বাড়ী হইতেও দুই এক জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আমাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কেহ বলিলেন যে 'ছেলে স্বপন দেখে এই প্রকার কর্‌ছে" কেহ বলিলেন যে 'তা নয়, এ ভূতের কাণ্ড, বিকাল বেলা মাঠের মধ্যে, শনিবারের দিন বেড়াইতে গিয়াছিল, ঐ চণ্ডের বট গাছটায় ভূত থাকে, নিশ্চয়ই ছেলেকে ভূতে ধরেছে। . তোমরা ভূতের ঝাড়া ও জল পড়া জানে, এমন একজন লোককে ডাক।' বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎই ওঝা ডাকিবার জন্য লোক ছুটিল।

কিছুকাল পরে সোণাই মণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আমাকে ঘর

হইতে বাহিরে আনিবার জন্ত আদেশ করিল। এই সময় আমার শরীর ঘূর্ণন আরম্ভ হইয়াছে, বাক্যের জড়তা বোধ হইতেছে, চক্ষুর সম্মুখে নানা রংএর আবির্ভাব দেখিতেছি।

সোণাই মণ্ডল আমাকে আগা গোড়া নিরীক্ষণ করিয়া, চক্ষের ভাব দেখিল এবং অন্যান্য কথা সকল শুনিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া মনে মনে বিড়্ বিড় করিয়া কি কি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিল যে "এত জে'র ভূত্"! জে'র ভূতের কথা শুনিয়া সকলের মনে কৌতূহল উপস্থিত হইল যে, এ জে'র ভূত্ কাহার এবং কোথা হইতে আসিল? সোণাই মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে 'না তাহা আমি বলিব না।' সকলে যখন পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন সোণাই মণ্ডল বলিল যে "এ ব্রাহ্মণ বিধবার জারজ সন্তান, আট মাসের সময় ইহাকে নষ্ট করা হয়। ইহার মা আপনাদের বাটীর নিকটই থাকেন।" আর অধিক বলিব না। এই কথায় সকলে কাণাকাণি ও পরস্পর ইষারা করিতে লাগিলে, লোক চেনার আর বাকী রহিল না, সোণাই মণ্ডলের ও ঘটনাটী জানা ছিল, তাই সুযোগ পাইয়া বলিয়া ফেলিল।

সোণাই মণ্ডল পিতলের ঘটি একটী পূর্ণ করিয়া, এক ঘটি জল আনিতে বলিল।

জল আনা হইলে সে প্রথম মনে মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আমার চক্ষু ও মুখে জোরে ফুঁ দিতে লাগিল। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র প্রকাশ্যে পাঠ করিতে লাগিল :—

ভূত প্রেত পিশাচ দান।
শঙ্কর মহাদেবের হুকুম মান॥
ভূতনাথ মহাদেবের আদেশ।
চলে যা ছাড়ি এ দেশ॥
যদি না মানিস্ আমার কথা।
খা'স্ তবে শিবের মাথা॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সে তিনবার আমার মুখে ও চক্ষে ফুঁ দিল। পরে জল পড়া মন্ত্র পড়িয়া জলের ঘটির উপর তিনবার ফুঁ দিয়া বাবাকে বলিল যে, "ভয় নাই, আপনি এই জল একটু ছেলেকে খাওয়াইয়া দিন এবং আর কিছু জল উহার মুখের উপর ছিটাইয়া দিন, এখনই ভূত ছেড়ে যাবে।" তাহাই করা হইল। ওঝা চলিয়া গেল, কিন্তু আমার ভূত ছাড়িল না, আমার যে ভাব সেই

ভাবই রহিল। শেষ রাত্রিতে ক্লান্ত হইয়া, আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। পরদিন বেলা দশটার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমার কিন্তু রাত্রের কোন কথা বিশেষ স্মরণ ছিল না।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার পাগলা দিদী মনে মনে ভীত হইয়া চুপ করিয়াছিল। পরদিন অন্যান্য ছেলেরা যখন গল্প করিতে লাগিল যে, কুড়নকে তাহার দিদী কা'ল্ ধুতরার বিচি খাওয়াইয়াছিল, তখন সকলের মনের ভূতের ধোকা দূর হইল, ধুতরার বিষদ্বারা ছেলের এই প্রকার ঘটনা রাত্রিকালে হইয়াছে, তাহা জানা আর কাহারো বাকী রহিল না। দিদীকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে নিরুত্তর; আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি সমস্ত কথা বলিলাম যে, "দিদী আমাকে পাগল করার জন্য ধুতরার বিচি খাওয়াইয়াছিল।" তখন বলা বাহুল্য যে, দিদীর পিঠে তাহার পাগলামির ফল বিলক্ষণ ফলিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

আমার বিদ্যারম্ভ।

পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি দিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। তথায় গিয়া তালপাতায়, খাঁড়ার উপর কালি দিতে অভ্যাস করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক, খ, লেখা অভ্যাস হইল।

গুরুমহাশয় জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, সরকার উপাধি। তাঁহার মুখখানি বড়ই খারাপ ছিল। শিক্ষকের মুখের মত ভাবেই ছিল না, তাঁহার হুকুম ছিল যে, প্রত্যেক প'ড়ো পালামত প্রত্যহ একগুলি মাথাতামাক তাঁহার জন্য লইয়া পাঠশালায় যাইতে হইবে। কিন্তু বাটীর অভিভাবকগণ টের না পান, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতেন। ধানের ফশলের সময় প্রত্যেক প'ড়োর অবস্থানুসারে কেহ আউষ আমনে এক কাঠা (বিশ সের) কেহ বা দুই কাঠা করিয়া ধান তাঁহাকে দিবার আদেশ ছিল। ইহা ভিন্ন আম কাঁঠালের কালে প্রতি ছাত্র একটি করিয়া কাঁঠাল ও দুচার হালি আম আমরা তাঁহাকে দিতাম।

গুরুমহাশয়ের মনস্তুষ্টির জন্য বাবার তামাকের ডিবা হইতে প্রায়ই এক-গুলি করিয়া মাথাতমোক চুরি করিয়া লইয়া যাইতাম। কয়েক দিন মধ্যেই বাবা টের পাইলেন। তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে "আমার তামাক চুরি করে কে রে?" আমি বলিলাম "তা কি জানি, আমি আপনার তামাক ছুঁইও না.বলিতেও পারি না।" প্রায় প্রত্যহই তামাক চুরি যায় বলিয়া তিনি এক দিন তামাক কোন গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। সেদিন আর আমি,মাথা তামাক্ দিয়া, গুরুপূজা করিতে পারিলাম না। গুরুমহাশয় কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম যে "আজ বাবা তামাক যেন কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাই আজ চুরি করিবার অবকাশ পাই নাই।" গুরু মহাশয় আমার কৈফিয়ত শুনিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন যে, "আরে ভেড়ের ভেড়ে, তোর বাবা কোথায় তামাক লুকাইয়া রাখল, তাহা গোপনে দেখলি না কেন?" এই বলিয়া বেতদ্বারা সপাৎ করিয়া একটা বাড়ি আমার পিঠের উপর ঝাড়িলেন, তারের মত পিঠ ফুলিয়া উঠিল। দুঃখ ও যন্ত্রণায় কাঁদিয়া ফেলিলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আমের সময়, প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাগিচায় আমতলা গিয়া আম কুড়াইতাম এবং ভাল ভাল মিঠে পাকা আম সকল বাছিয়া গুরু মহাশয়ের জন্য লইয়া যাইতাম। নিজের প্রাণে ছাই দিয়া এত মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিলেও সামান্য একটু অপরাধ পাইলে বেত মারিয়া পিঠ ফুলাইয়া দিত।

কোন পালি পার্ব্বণে বাটীতে দুই চারিজন ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হইলেই গুরু মহাশয়ের নিমন্ত্রণ ফাঁক যাইত না। যে দিন বলিতাম "গুরু মশায়, মা বলেছেন, যে আজ আমাদের বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ", সে দিন তিনি মহা খুসী হইয়া আমার পিঠ থাবড়াইয়া বলিতেন "বাস্তবিকই কুড়নের মত সৎস্বভাবাপন্ন ছাত্র বড় দেখা যায় না। যেমন লেখা পড়ায়, তেমনি আদব কায়দায় ও আপ্যায়নে। আচ্ছা যাও আজ তোমার ছুটি।" এইরূপে ছুটি পাইয়া মহানন্দে দৌড়িয়া বাড়ীতে যাইতাম এবং মনে মনে বলিতাম যে "এ বেটাকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলে ত বেশ ছুটি পাওয়া যায়।"

পাঠশালায় আমাদিগের প্রত্যেকেরই আসন বাটী হইতে লইয়া যাইতে হইত। কেহ সামান্য একখানি মাদুর, কেহ ক্ষুদ্র একটী পাটি, কেহ বা ক্ষুদ্র একখানি নলের চাটাই লইয়া যাইত। তালপাতা ছাড়িয়া কলারপাতা ধরিলাম। পাঠশালায় যাইবার কালীন আমার একটী পাতের তাড়া, তিন চক্ষু-

বিশিষ্ট, রশির সাহায্যে ঝুলন একটী মেটে দোয়াৎ, বাঁশের কঞ্চির কলম দুই একটা এবং বগলে মাদুর বিছানা লইয়া, গলায় একখানা চাদর ঝুলাইয়া, মহাগর্ব্বে পাঠশালায় প্রত্যহ যাইতাম। যাইয়া দেখি, গুরু মহাশয় পাঠশালা গৃহে চাটাইয়ে বসিয়া উরু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া এক ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতেছেন।

গুরু মহাশয়ের বেতের ভয়ে সকল ছাত্রই ভয়েতে কাঁপিত। আমার এক স্বভাব ছিল যে, পাঠশালায় মা'র খাইলে কখনও বাটী গিয়া বলিতাম না। কিন্তু অন্যান্য ছাত্রের মধ্যে অনেকেই কাঁদিয়া বাটীতে গিয়া বলিয়া দিত। একদিন গুরু মহাশয় নবীন চেৌধুরী নামক একটী ছেলেকে অত্যন্ত প্রহার করিয়াছেন, সে অমনি দৌড়িয়া গিয়া বাটীতে তাহার বাপের নিকট কাঁদিয়া পিঠের দাগ দেখাইল। তাহার বাপও গুরুমহাশয়ের মত দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিল। সে বাটী হইতে কোমর বাঁধিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁরে শালা, তুই আমার ছেলেকে এমন করে মেরে পিঠ ফুলাইয়া দিয়াছিস্" এই বলিয়াই গুরু মহাশয়কে ঘাড়েমুড়ে ঠাসিয়া ধরিল, দুই জনে জড়াজড়ি করিতে করিতে এক-খানার ভিতর পড়িয়া গেলেন। অপর লোকে আসিয়া ছাড়াইয়া দিল, তাহা না হইলে তাঁহার কপালে আরও কিছু বেশী রকম ঘটিত। সেইদিন হইতেই চৌধুরী পুত্র আমাদের পাঠশালা ছাড়িল এবং গুরু মহাশয়ের যথেষ্ট আক্কেল হইল। সেই অবধি তাঁহার মা'রের হাতও কিছু খাট হইল। বলা বাহুল্য যে, আমরা সেই কীচকবধ কাণ্ড দেখিয়া, মহা খুসি হইয়াছিলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, যেমনি গুরু তেমনি অভিভাবক। যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

কিছুদিন পরে একজন মুসলমান ছাত্র ও একজন নমশূদ্র ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইল। তাহাদের সঙ্গে একত্র পড়িতে হইবে বলিয়া দুই জন ভট্টাচার্য্য পুত্র পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন শরীর কিছু খারাপ ছিল, তাই সেদিন পাঠশালায় যাই নাই। অমনি গুরুমহাশয় দশজন ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা প'ড়োকে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তাহারা আসিয়া আমাকে ধরিবার উপক্রম করিলে আমি দৌড়িয়া গিয়া ঘরের মধ্যে মাচার নীচে পালাইলাম। তাহারা আমাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাকে ধরিতে আসিলে, আমি অনন্যোপায় হইয়া নিকটে একখানা কুড়াল ছিল, তাহা লইয়া আমার শত্রু পক্ষকে আক্রমণে

করিলাম। বলা বাহুল্য যে আমার আক্রমণ নিষ্ফল হইল, কেননা আমি ছোট, তাহাতে একক, আর আমার বিপক্ষ ষণ্ডা ও ঢ্যাঙ্গা রকমের দশজন ছাত্র। সুতরাং অচিরে তাহাদের হাতে বন্দী হইয়া শৃঙ্খভাবে পাঠশালায় নীত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইলে, গুরুমহাশয়, প্রথমতঃ বেতদ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাকে "চৌদ্দপোয়া" করাইলেন এবং ঘাড়ের উপর একখানা চাড়া রাখিয়া দিলেন। একটু নড়িলেই যেমন চাড়া খানি পড়িয়া যাইতে লাগিল, অমনি একটা বেতের বাড়ি পিঠের উপর পড়িতে লাগিল। মনে মনে বলি "হায়, বিধাতা! এমন বেটা গুরুমশায়কেও যমে চক্ষে দেখে না।" আমার মত আর সকলেই জ্বালাতন হইয়া প্রত্যহ এই প্রকার মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

একদিন একটা ছাত্র যোড় হাতে গুরু মহাশয়কে বলিল যে "গুরু মশায়! আমি প্রস্রাব করতে যাব।" তখন আমিও দাঁড়াইয়া যোড় হাত করিয়া কহিলাম যে "গুরু মহাশয়, আমি বাহ্যিও করব এবং প্রস্রাবও করব।" তখন গুরু মহাশয় সুমিষ্ট স্বরে কহিলেন যে. "আরে হারামজাদা, এক কর্ম্ম করতে গেলেই দুই কর্ম্ম সম্পন্ন হবে, (অর্থাৎ বাহ্যে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবও আপনা আপনি হইবে। সে জন্য, আর ডবল ছুটির দরকার করে না।" তখন আমি বলিলাম যে "কি জানি যদি বাহ্যে গিয়া হঠাৎ প্রস্রাব করে ফেলি, আর কোন ছাত্র এসে আপনার নিকট আমার নামে নালিশ করে, তাহা হইলে হয়ত আপনি বেত মারিবেন এবং বলবেন যে "বাহ্যের ছুটি লয়েছিলি তা প্রস্রাব কেন করলি?" সেই জন্য কথাটা পরিষ্কার করিয়া লওয়াই ভাল। কেন না সেদিন একটা ছেলে প্রস্রাবের ছুটী লইয়া গিয়া বাহ্যে গিয়াছিল, তাহাকে আপনি মেরেছিলেন। আমার কথায় তিনি আর রাগ করিতে বা মারিতে পারিলেন না, ঈষৎ একটু হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা যা"।

এই প্রকার উঁচুদরের শিক্ষকের নিকট বিদ্যা শিক্ষা অধিক দিন ঘটিল না। ঈশ্বরের মর্জ্জি,সংবাদ আসিল যে গুরু মহাশয়ের মা মরিয়াছেন, তাঁহাকে বাটীতে যাইতে হইবে। তিনি বাড়ীতে গেলেন, আমরা সকলে মহাখুসী। আমাদিগের আহ্লাদ আর গায়ে ধরেনা। আমরা সকলে হরিলুট ও গাজির ছিন্নী মানস করিলাম যে "এ শালা যেন আর ফিরে না আসে।" বলা বাহুল্য যে, আমাদিগের এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা উভয় গাজি সাহেব ও হরিঠাকুর শুনিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার আর আসা হইল না, কারণ শুনিতে পাইলাম, তাঁহার স্ত্রীরও মৃত্যু হইয়াছে।

পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে বেকার অবস্থায় বসিয়া রহিলাম। অন্যান্য ছেলের আনন্দের বিষয় হইলেও আমার মনে অশান্তি হইল। অনর্থক খেলা করিয়া সময় নষ্ট করা যেন আমার অসহ্য বোধ হইল। মনে মনে বলি যে,যে সেই বেটা দুর্ম্মুখো গুরুর পাঠশালায় গালাগালি শুনিতাম এবং বেতের বাড়ী খাইতাম, সেও ভাল ছিল, এখন যেন দিন আর কাটেনা। কিছুদিন পরে গ্রাম্য লোকের যত্নে একটী স্কুল স্থাপিত হইল। একজন মাষ্টার আসিলেন. তিনিও জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, চেহারাটী দেখিতে সুন্দর ছিল,কিন্তু মুখখানি সেই গুরুমহাশয়ের মুখের মত ছিল। ক্লাসে বসিয়াই নানা অশ্রাব্য অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিতেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি ফেল,ছিলেন। তাঁহার নিকটই সর্ব্ব প্রথম মদন মোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়িতে আরম্ভ করি। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করিয়া শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। স্কুলের সকল ছাত্রদিগের মধ্যে আমি ও গুরুদাস নামক আমাদিগের এক জ্ঞাতি ভাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলাম। লম্বা লম্বা, ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা ছাত্রগণ যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত না, আমরা দুইজনে চট্‌ পট্‌ সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতাম। দুঃখের বিষয় যে, মাষ্টার মহাশয় আমাদিগের দ্বারা সেই সকল বড় বড় ছাত্রদের কাণ মলাইতেন। কোন কোন ছাত্র এত লম্বা ছিল যে, তাহাদের কাণ আমরা লাগাল পাইতাম না। কান মলিবার সময় তাহাদিগকে অবনত হইয়া তবে কান ধরা দিতে হইত। ইহাতে অনেকে আমোদ অনুভব করিত, কিন্তু আমার ইহাতে মনে বড় দুঃখ ও লজ্জা বোধ হইত। মনে মনে বলি হায়! এরূপ বর্ব্বর রীতি স্কুলে কেন চল হইল? পাঠশালায় গুরুগুলি যেন অসভ্য, তাহাদের পক্ষে এই প্রথা সম্ভবে। কিন্তু এ শিক্ষাও অধিক দিন রহিল না। শিক্ষক মহাশয় মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্কুলটী ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা আবার বেকারে পড়িলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

জীবনের সঙ্কট ব্যাধি।

বেকার বসিয়া থাকিতে থাকিতে আবার ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। সকল ছেলে পড়াশুনার দায় হইতে রক্ষা পাইয়া হর্ষ মনে খেলা করিয়া বেড়ায়, কিন্তু আমার তাহাতে শান্তি জন্মে না। বসিয়া মনে মনে, নানা চিন্তা করি। আমার চিন্তার স্বভাবটা এই সময় হইতে জন্মিল। কি যে চিন্তা করি, তাহা নিজেই বুঝি না, অথচ একাকী বসিয়া ভাবি। আমার ভাবনার বিষয়টা কি? অন্ন বস্ত্রের চিন্তা, বিষয় সম্পত্তির ভাবনা, না পরিবার প্রতিপালনের ভাবনা? এ সকল কিছুই না। কোন একটা নূতন বিষয়ের আলোচনা হইলে হয়ত তাহাই বসিয়া ভাবি, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে কখনও তাহাই ভাবি, ভাবিতে ভাবিতে তাহার একটা কূল কিনারা না হইলে মনে শান্তি জন্মিত না। কি উপায়ে লেখা পড়া শিক্ষা হইবে, ভবিষ্যতে কি হইবে, এ সকলও চিন্তার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, নিজেদের কি উপায় হইবে, পাড়া প্রতিবেশী গরিব লোকদের কি উপায় হইবে তাহাও বসিয়া ভাবি। আমার এই মত স্বভাব, দেখিয়া পিতা মাতা সময় সময় আমাকে তিরস্কার করিতেন।

এই সময়ে হঠাৎ জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইলাম। বাইশ দিন ক্রমাগত একজ্বর, তাহার পরই হঠাৎ জ্বর ছাড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া গেল, নাড়ি বসিয়া গেল, কেবল রহিল শ্বাস টুকু। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান। একটি বৈদ্য কবিরাজ আগা গোড়া আমার চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমার নাড়ি সজীব করিবার জন্য বহু ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া তাঁহার থলি ঝাড়িয়া একটী বড়ি বাহির করিলেন। সেই বড়িটী লেবুর রস দ্বারা মাড়িয়া ঝিনুকের সাহায্যে আমার গলার মধ্যে ঢালিয়া দিয়া বহু যত্নে উদরস্থ করাইয়া দিলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে "মারি আমি তীক্ষ্ণ বাণ হয়ে যায় ভোথা"। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে "এই আমার ঔষধেরও শেষ রোগীরও শেষ। বাঁচে ইহা দ্বারা, মরে ইহা দ্বারা।" বলা বাহুল্য যে, বাটীস্থ সকলে বিশেষতঃ পিতামাতাগণ অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়াছেন। কবিরাজের কথায় আরও হতাশ হইয়া সকলে

কাঁদিতে লাগিলেন এবং আমার মৃত্যুর জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কবিরাজ কহিলেন যে "অদ্য রাত্রি আড়াই প্রহর অতিক্রম করিবে কি না সন্দেহ"। আমার বাটীর নিকট, ভাই সম্পর্কে এক প্রাচীন ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনিও বেশ নাড়ি-জ্ঞানী ছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়েও খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। গ্রামের যে কোন বাড়িতে লোকের পীড়া হইলে তাঁহার দ্বারা এক বার হাত না দেখাইলে কাহারো মন শুদ্ধ হইত না। আমার সেই বিজ্ঞ দাদা মহাশয় আমার অবস্থা আগা গোড়া পরীক্ষা করিয়া আমার নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া, গোপনে তুলসীর গাছ, কুশাসন ও একখানি কোদালি আনিয়া রাখিলেন, কেন না ব্রাহ্মণের ছেলের মৃত্যুকালে,অন্তিম ক্রিয়া না করিলে অপমৃত্যুর ফল হইবে। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল, কবিরাজ ও দাদা মহাশয় ঘন ঘন আমার নাড়ি টিপিতে লাগিলেন। অবশেষে কবিরাজ মহাশয় কহিলেন যে "নাড়ির এখনও খোঁজ নাই, কিন্তু নাড়ির স্থানে যেন একটু গরম গরম বোধ হইতেছে"। ইহার পর কিছুকাল পরই কবিরাজ মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, "আর ভয় নাই, সুতা সঞ্চার রূপে নাড়ি হাতে পাইতেছি"। ইহার পর ক্রমশই নাড়ি সজীব হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ গরম হইল। কবিরাজ উল্লাসে মত্ত হইয়া কহিলেন যে "এবার কুড়ন রক্ষা পাইল"। বলা বাহুল্য, এই সংবাদ গ্রাম মধ্যে প্রচারিত হইল, কারণ পাড়াপড়শী সকল উৎকর্ণ হইয়াছিল, যেই আমাকে বাহির করিবে, অমনি আমার বাড়ীতে হাহাকার ক্রন্দন ধ্বনি উঠিবে। এ সংবাদে সকলেই মহা খুসি হইলেন, আমার দাদা মহাশয় যেমন গোপনে তুলসী-গাছ, কুশাসনাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আবার সেই মত গোপনে ঐ সকল সরাইয়া ফেলিলেন।

ক্রমে আমার সংজ্ঞা লাভ হইল। আমি আরাম হইলাম বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারিলাম না। এক বৎসর যাবত পঙ্গুবৎ হইয়া রহিলাম। নিজের শক্তিতে দণ্ডায়মান হওয়ার বা চলাচলের শক্তি রহিল না। গায়ের এক পরতা চামড়া উঠিয়া যাইতে লাগিল, ঠিক যেমন সাপে খোসা এড়ে আমার শরীরের দশা তাদৃশ হইল। সকলে কহিতে লাগিলেন যে কবিরাজ, যত বড়ি খাওয়াইছেন, তাহার সমস্ত বড়িতেই হলাহল বিষ ছিল, তাই বিষের রাগে গায়ের চামড়া উঠিয়া যাইতেছে। বাস্তবিক সে কথা মিথ্যা নয়। কবিরাজ যে সাপের বিষ যুক্ত ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা তিনিও বলিয়াছিলেন।

এই সাংঘাতিক পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া কিছুদিন ভাল ছিলাম

কিন্তু তাহার পর ম্যালেরিয়াতে আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ প্রত্যহ হাড় ভাঙ্গিয়া কাঁপাইয়া জ্বর আসিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা ও যকৃত-দ্বয় স্ব স্ব আয়তন বিস্তার করিয়া উদর জুড়িয়া বসিল। তখন পল্লী গ্রামে কুইনাইনের বিশেষ চল হয় নাই। জ্বর হইলে কইওকড়া, সেফালিকা ফুলের পাতা, এবং বেলের পাতা থেৎলাইয়া, তাহার রস তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগ করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন। তাহাতে নাকি রস পরিপাক হইয়া জ্বর সারিয়া যায়।

শেষে প্রাত্যাহিক জ্বর ছাড়িয়া ত্র্যাহিক জ্বর হইল। এই জ্বর ছাড়াইতে কত জনের কত ঔষধ আমার হাতে ও গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হইল। কিছুতেই জ্বর সারিল না। গ্রামের এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণঠাকুরাণী এক ঔষধ জানিতেন। শনি মঙ্গল বারে জ্বরের পালা হইলে সেই দিন প্রত্যুষে তাঁহার ঔষধ কোমরে ধারণ করিয়া বাটী পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে কোথাও গিয়া সেদিন থাকিতে হয়। শনিবারের দিন জ্বরের পালা পড়িলে তাঁহার ঔষধি দুইখানা শিকড়, কোমরে ধারণ করিয়া বাটী পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলাম, কিন্তু যাই কোথা? ঘটনাক্রমে গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে সেদিন বড় এক নিমন্ত্রণের আয়োজন ছিল। আমার জ্বরের চিকিৎসা ও নিমন্ত্রণ খাওয়া উভয়েরই এক মহা সুযোগ ঘটিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, মহানন্দে নিমন্ত্রণ খাইলাম, সেদিন আর জ্বর আসিল না। বাটী ফিরিলে সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। ঠাকুরাণীর ঔষধের খুব নাম পড়িয়া গেল। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, সেই দুইখানি শিকড়, চারা বেলগাছের শিকড়। তবে স্থান পরিবর্ত্তন যে পীড়ায় একটা চিকিৎসা, তাহা এখন সকলেই জানেন, কিন্তু তখন সে ধারণা অনেকের ছিল না।

ত্র্যাহিক জ্বর আরাম হইল বটে কিন্তু ক্রমে শরীর শুকাইয়া গেল, পেটটী মাত্র সার হইল, প্লীহা সমস্ত পেট জুড়িয়া পড়িল। এই প্লীহা চিকিৎসার জন্য কত জনে কত প্রকার ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে একটু লবণ প্রথম মুখে দিয়া এক ঢোক্ জল পান করিয়া শেষে খাদ্যদ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে প্লীহা আরাম হইয়া যাইবে। এ ব্যবস্থা যিনি দিলেন তাঁহার যুক্তি এই যে প্রত্যহ আহারের সময় রোগী যেমন হা করিয়া খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ করিতে আয়োজন করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে উদরস্থ প্লীহাটিও হা করিয়া আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়। সেই সময় যদি সর্ব্বপ্রথমে নুণজল খাওয়া যায়, তাহা হইলে নুণজল প্লীহার

মুখে পড়িয়া, প্লীহা অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়ে। এই মতে ক্রমে প্লীহা নিস্তেজ হইয়া রোগ আরোগ্য হয়।

এই অদ্ভুত এনাটমী ও ফিজিয়লজীর তত্বজ্ঞান সর্ব্বপ্রথম আমার লাভ হইল। যিনি এই তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন,তাঁহাকে ও তাঁহার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ। তবে এই প্রকার খালিপেটে একটু করিয়া লবণ খাইলে যে প্লীহার পক্ষে ফলদায়ক হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কেন না সাধারণ লবণ একটী ঔষধ বিশেষ। তাহাতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড (লবণ দ্রাবক) এবং সোডা নামক ক্ষারীয় পদার্থ আছে।

আর একজন ব্যবস্থা দিলেন যে, সকালে স্নান করিয়া বাসি পেটে একটী কাঁটাল বিচিসুদ্ধ খাইয়া ফেলিতে পারিলে প্লীহা আরাম হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, অতি আনন্দের সহিত এই ব্যবস্থানুযায়ী একটী ক্ষুদ্র কাঁঠালকে বীজ-সহ উদরস্থ করিলাম, তাহাতে পেটের অসুখ হইয়া দাস্ত হইতে হইতে পেট অনেকটা কমিয়া গেল। সকলে মনে করিলেন, প্লীহা অনেক আরাম হইয়াছে কিন্তু পেটের অসুখ সারিয়া গেলে যেমন পেট তেমনই রহিল।

সপ্তাহ কাল প্রত্যহ এক বাটি করিয়া গোচনা আমাকে খাওয়াইলেন,তাহা-তেও কোন ফল হইল না।

ছলিমদ্দি দাই প্লীহার বাণ মারা জানে, তাহাকে আনা হইল। শনি মঙ্গল বারে ত্যহার বাণ মারার নিয়ম। সে আসিয়া আমাকে মধ্য উঠানে পশ্চিম-মুখো করিয়া বসাইল। কলা বাহির হয় নাই, এমন একটী মোচা আনিতে হুকুম দিল এবং সওয়া পাঁচ গণ্ডা খেজুরের কাঁটার ফরমাইস হইল। সমস্তই আনিয়া হাজির করা হইল। সে আমার সম্মুখে কয়েক হস্ত দূরে বসিয়া প্রথমতঃ মুসলমানি ধরণে বিচমোল্লাপ্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিল। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র জোরে পাঠ করিয়া উক্ত খেজুরের কাঁটা দ্বারা মোচাটী সক্রোধে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

রামের হাতের তীর ধনুক, লক্ষ্মণের হাতের বাণ।
কুড়নচন্দ্রের অঙ্গের পিলে কাটি করি খান্ খান্॥

এই প্রকার একুশ বার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া একুশটী খেজুরের কাঁটা মোচা-টার গাত্রে বিদ্ধ করিয়া রাগিয়া বলিল যে "এক গাছা সুতা দ্বারা, কুড়নী যে ঘরে শয়ন করে সেই ঘরের দরজার উপরে ইহা ঝুলাইয়া রাখুন"। ছলিমদ্দি মন্ত্রের দক্ষিণা স্বরূপ সওয়া পাঁচ আনার পয়সা লইয়া প্রস্থান করিল। মোচা আমার

শয়ন ঘরের দরজার শীর্ষদেশে ঝুলিতে লাগিল। ইহার পর সকলেই অনুমান করিতে লাগিলেন যে, পেট যেন কিছু কম্ কম্ বোধ হইতেছে, কেহবা হাত দ্বারা আমার পেটটা টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "প্লীহা" পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নরম হইয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু আমার পেটের অবস্থা যেমন তেমনি রহিল।

ইহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া অভিভাবকগণ চিন্তিত হইলেন। পশ্চিম পাড়ার রায় ঠাকুরাণীর "ব্যাঙ পড়া" প্লীহার অমোঘ ঔষধি বলিয়া কোন ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল। সুতরাং রায় ঠাকুরাণীর স্মরণ লওয়া হইল।

তাঁহার একটু পাগলাটে ভাব ছিল। তিনি আসিয়া বলিলেন যে "আমার ব্যাঙ্ পড়া" এমন ধন্বন্তরি যে কত লোকের পিলে ভাল হয়ে গেল। তা তোরা এত দিন আমার কাছে আসিস্ নাই কেন?" তিনি আরো দম্ভ করিয়া বলিলেন, যে, "ভেড়ির পাঁড়ায় যদি ধান পড়ে, তাহা হইলে কি লোকে আর গরু কেনে? এ সকল কি ছলিমদ্দি কলিমদ্দির কাজ? যা অবিয়েত মেয়ের (কুমারী কন্যার) কাটা এক গাছা সুতার যোগাড় কর, তাহা যদি না পাও, তবে এক গাছা কাঁথার সুতা হইলেই চলিবে। আর একটা ব্যাঙ তালাশ কর। ব্যাঙ্টার কপালে একটা হলুদে তিলক থাকা চাই, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ মেটে রং হওয়া চাই। ব্যাঙটা যখন গর্ত্ত মধ্যে থাকে, তখন ধরিতে হইবে"। অবিয়েত মেয়ের কাটা সূতা সহজেই পাওয়া গেল, কেন না তখন চরকা বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করে নাই। নিম্ন শ্রেণীর লোকের প্রায় বাড়ীতেই তখন চরকা ছিল। কিন্তু তাঁহার এই লক্ষণ যুক্ত ব্যাঙ্ তালাশ করিতে কয়েক জন লোক একবারে হদ্দ হইয়া গেল। রায় ঠাকুরাণী স্নান করিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে বাসি মুখে, জঙ্গল হইতে কি একটা গাছের শিকড় তুলিয়া আনিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন এবং সেই সুতা গাছটা শিকড়ের সঙ্গে জড়াইতে লাগিলেন। পরে ঐ সুতাযুক্ত শিকড় খানা ব্যাঙটার গলার মধ্যে সজোরে ঠেলিয়া তাহার পেটের মধ্যে পৌছাইয়া দিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

ব্যাঙ্ ব্যাঙ্, মহা ব্যাঙ্, থাকিস্ জলে স্থলে।
এই ঔষধ গিলে জল করে ফেল্ কুড়নের পেটের পিলে॥

এই মন্ত্র তিন বার উচ্চারণ করিয়া সুতার অবশিষ্ট অংশ হতভাগা ব্যাঙ্টার গলায় জড়াইয়া বাঁধিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ঔষধের ঠেলায় ব্যাঙটার যে

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি সেই মন্ত্রপূত ঔষধযুক্ত ব্যাঙ্‌টা আমার শয়ন ঘরের দরজার উপরে ছলিমদ্দির মোচার পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন যে, "দেখ্‌বি, সাত দিনের মধ্যে ছেলের পেটের পিলে একবারে জল হইয়া যাইবে।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার কয়েক দিন মধ্যে পেট্‌টা যেন একটু নরম নরম বোধ হইতে লাগিল এবং পিলের বেদনাও যেন বড় একটা টের পাইতে লাগিলাম না। এই সুফলের সংবাদ রায় ঠাকুরাণীর নিকট পৌছিল। তিনি সংবাদ শুনিয়া হাঁসিয়া বলিলেন, "কেমন রায় ঠাকুরাণীর কথা তোরা মানিস্ না, এখন ত হাতে হাতে ফল পালি।" এ সংবাদ তিনি এ পাড়া, ও পাড়া, সে পাড়ার যাহাকে দেখিলেন, তাহার নিকটই আপন গৌরব ও হাত যশের ব্যাখ্যা স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সুসংবাদ রাষ্ট্র হইলে তাঁহার প্রাক্‌টীশ আরো বৃদ্ধি হইল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ব্যাঙেরও প্রাণ নাশ হইতে লাগিল। সাত দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আমার পেটের দশা যেমন তেমনই রহিল। কেবল যে আমার, তাহা নহে, আমার দেখা দেখি আর যাহারা ব্যাঙো চিকিৎসা তাঁহার দ্বারা করাইয়াছিল, সকলেরই সেই দশা হইল। পাগলা রায় ঠাকুরাণীর দন্তটা অনেক ক্ষান্ত হইল। তবে তিনি দোষ্‌টা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে ক্রটী করিলেন না। তিনি বলিলেন "তোরা নিশ্চয় কোন অনাচার ও অপচার করিয়াছিস, তাই আমার ঔষধে কোন ফল হইল না।"

ছোট বেলায় মন্ত্রে আমার খুব বিশ্বাস ছিল, মনে করিতাম যে, মন্ত্রগুলি বুঝি দেবদত্ত কোন তত্ত্ব বিশিষ্ট কথা হইবে। কিন্তু ছলিমদ্দি ও রায় ঠাকুরাণী প্রভৃতির মন্ত্রের বাঁধুনি দেখিয়া মন্ত্রের প্রতি আমার ভক্তি একেবারে চটিয়া গেল।

আমার অবস্থা ক্রমে আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। আত্মীয়গণ আমার ভবিষ্যৎ গনিয়া চিন্তিত হইলেন। পিতা ঠাকুর আমার প্লীহাতে অস্ত্র করাইবার জন্য বিশ্বম্বর কৈবর্ত্তকে ডাকিলেন। তাহাকে লোকে সচরাচর "বিশে ডাক্তার" বলিয়া ডাকিত। ছোট লোকের মধ্যে তাহার মান ও পশার খুব ভারি ছিল। তখন পল্লীগ্রামে এখনকার মত ইংরেজি মতের ডাক্তার ছিল না। তাই দায় পড়িলে ভদ্র মহালেও সময় সময় অস্ত্র চিকিৎসার জন্য বিশে ডাক্তারকে ডাকা হইত। লোকটা খুব বলিষ্ট, প্রকাণ্ড শরীর বিশিষ্ট, কাল অসুরের মত চেহারা বিশিষ্ট ছিল। তাহার গলার আওয়াজটাও চেহারানুযায়ী কর্কশ ও গম্ভীর ছিল।

কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসায় তাহার অসীম সাহস ছিল। নিজের বুদ্ধির ও ক্ষমতার উপর তাহার অকাট্য বিশ্বাস ছিল। সে অন্য কাহারো কথা গ্রাহ্য করিত না। ফোড়াটা, বাঘাটা, নালিঘাটা সে অনায়াসেই অস্ত্র করিয়া সারাইত। কিন্তু কোন গুরুতর বিষয়ে সে যখন হস্তক্ষেপ করিত, তখনই বিপদ হইত।

গ্রামের নিকট এক গ্রামের এক ব্রাহ্মণের পায়ে "সাম্কো" নামক ক্ষত রোগ জন্মে। ঐ রোগকে ডাক্তারি মতে টিবিয়া অস্থির ক্ষত (Necrosis of Tibia bone) বলা যাইতে পারে। বিশ্বম্বরকে সেই ব্রাহ্মণের পদ চিকিৎসার জন্য ডাকা হইল। ডাক্তার গিয়া রোগীর পায়ের সম্মুখের হাড় ও মাংস একেবারে ছুরি দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বাটী ফিরিল। এদিকে রোগীর ভয়ানক রক্তস্রাব হইতে লাগিল। ডাক্তার বাটীতে ফিরিতে না ফিরিতেই গরিব ব্রাহ্মণের স্বর্গ লাভ হইল।

বিশ্বম্বর শুনিয়াছিল যে, জেলাতে ডাক্তারগণ কোন ঔষধ শোঁকাইয়া রোগীকে অজ্ঞান করিয়া, তবে অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারও সেই মত অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিবার খেয়াল জন্মিল। একটী রোগীকে অস্ত্র চিকিৎসার কালে তাহাকে কি একটা ঔষধি খাওয়াইয়া দিল, রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ডাক্তার হৃষ্ট চিত্তে রোগীর উরুদেশের ক্ষতের গলিত মাংস সকল কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া পটি বাঁধিয়া দিল। কিন্তু রোগী যে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, আর জাগিল না। কত চেষ্টা করিয়াও সে রোগীর চৈতন্য লাভ করাইতে পারিল না। তাহার যেমন আসুরিক চেহারা ও বুদ্ধি ছিল, চিকিৎসাও তেমনি আসুরিক ধরণের ছিল এবং তাহার ফলও সময় সময় তাদৃশ ভয়ঙ্কর হইত। আবার কোন কোন স্থলে সুফলও যে না ফলিত, এমন নহে। একজন মুসলমানের পায়ে গ্যাংগ্রেণ (Gangrene) নামক ক্ষত হইয়া তথা হইতে মাংস পচিয়া পড়িয়া পায়ের নলার হাড় মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিশ্বম্বরকে তাহার চিকিৎসার জন্য ডাকা হইল। ডাক্তার রোগী দেখিয়া খেজুর গাছ কাটা একখানি ছ্যান দাও আনিতে বলিল। পরে রোগীর পা খানি একটা মুগুরের উপর রাখিয়া পাঁঠা কাটা কোপের মত এক কোপ মারিয়া রোগীর পা খানি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিল। ইহাকেই ডাক্তারি মতে এমপুটেশন অব লেগ (amputation of leg) বলে। যে অপারেশন করিতে দুই তিন জন বিচক্ষণ ডাক্তারের প্রয়োজন হয়, ক্লোরোফরমের দরকার হয় এবং নানা বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের আব-

শুক হয়; তাহাই বিশ্বম্বর একাকী মাত্র এক ছ্যান্ দাও ও মুগুরের সাহায্যে সাধন করিল। এ বিষয় তাহার সাহস ও বাহাদুরির প্রশংসা করিতে হয়। সেই মুসলমান লোকটী ইহার পরে অনেক বৎসর যাবত জীবিত ছিল এবং এক খানা লাঠির সাহায্যে চলিয়া বেড়াইত।

এবম্বিধ কালান্তক যম স্বরূপ বিশ্বম্বরকে আমার পেটে অস্ত্র করিবার জন্য আনা হইল। সে আসিয়াই বলিল যে "ঠাকুর মশায়, উজান ভাট্যান এক লোটা জল আন।" অর্থাৎ ঘটিটী পুকুরের জলে ডুবাইয়া, ডান ও বামদিকে আলোড়িত করিলে, সেই সীমাবদ্ধ জলে ক্ষণকালের জন্য যে একটু কৃত্রিম স্রোত উৎপন্ন হয়, সেই জলকে "উজান ভাট্যান" জল বলে। জল আনা হইলে কি মন্ত্র পড়িয়া জলে ফুঁ দিয়া সেই জল মাটীতে কতকটা ঢালিয়া একটু কাদা করিয়া লইল। পরে আমাকে উঠানের মধ্যে বসাইল এবং আমার পেট ভালমত নিরীক্ষণ করিয়া উক্ত কাদা তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিতে লইয়া আমার পেটের উপর সাতটী ফোঁটা দিল, তিনটী প্লীহার উপর, একটী পাকস্থলীর উপর, আর তিনটী যকৃতের উপর। পরে লম্বা একটী পিতলের কৌটা বাহির করিল, তাহা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে সেজারুর কাঁটার ন্যায় লম্বা লম্বা সাতটি লোহার শলা এবং একখানি ছুরি বাহির করিল। অতঃপর কোমরের কাপড় কসিয়া বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীরস্বরে আমার কাকাকে কহিল "ঠাকুর ভাল করে ধরিও।" তখন তাহার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। পাঁঠা বলি দিবার সময় যেমন খাঁড়াইত কোমর বাঁধিয়া খাঁড়া হাতে করিয়া দাঁড়ায়, আমার নিকট যেন বিশ্বম্ভরকে সেই মত বোধ হইল। প্রথমতঃ সে ছুরিখানি হাতে লইয়া যে যে স্থানে কাদার ফোঁটা দিয়াছিল, তথা হইতে সপ্ সপ্ করিয়া ফোঁটার আয়তন অনুসারে গোলাকার চামড়া কাটিয়া ফেলিল। পরে এক একটী করিয়া শলাকা সেই সকল কর্ত্তিত স্থানে সজোরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। শলাকাগুলি প্রায় ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা হইবে। সমস্ত গুলি শলাকা আমার পেটের উপর সেজারুর গায়ের কাঁটার মত খাড়া রহিল। ডাক্তার বলিল যে যেমন "শালা বজ্জাত পিলে এই কাঁটাই তার উপযুক্ত ঔষধ।" যন্ত্রণায় আমার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল কিন্তু চীৎকার করিবার সাধ্য নাই। কাকা আমার মুখ এমন করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছেন যে মুখ খুলিবার সাধ্য নাই। অতঃপর ডাক্তার এক এক করিয়া সমস্ত গুলি শলা টানিয়া বাহির করিল। পরে কি এক প্রকার কটাশে গুড় ঔষধ প্রত্যেকটী

ক্ষতের মুখে দিল এবং আক্‌নাদির পাতা একটা করিয়া একখানি ঘায়ের মুখে লাগাইয়া রাখিল। এই আকনাদির পাতার এমন গুণ যে,তাহার এক পিট ঘায়ে লাগাইলে ঘা বৃদ্ধি হয়, অপর পিঠে ঘা আরাম হয়। অপারেশন সমাপ্ত হইলে, তাহার দক্ষিণা একটা টাকা লইয়া যাইবার সময় বলিল যে "কুড়নকে পাকা কাঁঠাল, তেঁতুল প্রভৃতি খুব রশাল দ্রব্য খাইতে দিও, অর্থাৎ যাহাতে ঘা পাকিয়া উঠে, তাহা খাইতে দিবা।" আর আমাকে শোয়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল।

ডাক্তারের ব্যবস্থানুযায়ী পথ্যাদি গ্রহণ করিলাম। পরদিন আমার পেট ফুলিয়া ঢাক হইল। নিশ্বাস ফেলিতে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে অতি কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্বরও হইল। মূলকথা ডাক্তারি মতে যাহাকে পেরিটোনাইটিশ বলে, উদরস্থ পেরিটোনিয়াম ঝিল্লি বিদ্ধ হওয়ায় তাহার প্রদাহ হওয়ার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আমার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারের বিশেষ এক গুণ এই ছিল যে, যে রোগীকে তিনি অস্ত্র করিতেন,তাহার যদি লক্ষণ ভাল দেখিতেন, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যহ দেখিতে যাইতেন। আর বেগতিক দেখিলে তাহার বাড়ীর চতুঃসীমায়ও পদার্পণ করিতেন না। সুতরাং আমার সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। আমার অবস্থা খারাপ হইলে "বিশে ডাক্তারের" আর খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। অথচ শুনিতে পাই যে, গ্রামের এপাশ ওপাশ দিয়া প্রত্যহই যাতায়াত করে। নিতান্ত মরণ নাই, তাই এমন যমের হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। স্বভাবই যেন আমার চিকিৎসক রূপে নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থা হইতে আমাকে অনুকূল অবস্থায় আনিয়া দাঁড়া করাইলেন। যখন আমার জ্বর ও প্রদাহের চিহ্ন সকল ক্রমে কমিতে লাগিল, তখন একদিন বিনা ডাকেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইয়া নানা মিথ্যা কথা দ্বারা আমাদিগকে প্রবোধ দিল যে, দূরে কয়েকটা রোগী লইয়া সে বড় ব্যস্ত ছিল,তাই কয়েকদিন আসিতে পারেন নাই। তবে আমার অবস্থার উন্নতি দেখিয়া দম্ভ করিয়া বলিল যে, "ঠাকুর তোমরা অনর্থক ভীত হইয়াছিলে, আমি যে ঔষধ লাগাইয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে আর রোগীর অনিষ্ট হইতে পারে কি?" অথচ এই অস্ত্র চিকিৎসায় গ্রামের কয়েকটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা জানি। পেরিটোনিয়াম ঝিল্লির প্রদাহ আরাম হইল বটে, কিন্তু পেটের উপরস্থ ক্ষতগুলি পচিয়া উঠিল এবং তাহা আরাম হইতে প্রায় আর দুই তিন মাস সময় লাগিল।

এই সাংঘাতিক অস্ত্র-চিকিৎসায় যে বিশেষ কোন ফল হইল, এমন কিছু বোঝা গেল না। প্লীহার অবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় রহিল, কিন্তু বোধ হইল যেন যকৃতের আয়তন অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে। ইহার পর নানা স্থানে নানা ব্যক্তির টোট্‌কা ঔষধ অনেক সেবন করিতে করিতে শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা কতকটা ভাল হইল। প্লীহাটি এত বড় হইয়াছিল যে, শূন্যোদরে চিত হইয়া শয়ন করিলে পেটের উপর একটি বাছুরের মাথার মত উচু হইয়া উঠিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

গ্রামান্তরে বিদ্যাশিক্ষা।

এগার বৎসর বয়সের সময় উপনয়ন হইল। উপনয়ন হওয়ার পর কিছুদিন আমি ধর্ম্মের বড় গোঁড়া হইলাম। ত্রিসন্ধ্যা ও একাদশী নিয়মমত পালন করিতাম। শূদ্রের জল গ্রহণ করিতাম না।

স্কুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর হইতেই লেখাপড়া এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল। অনর্থক বিনা কার্য্যে সময় নষ্ট হইতে লাগিল। অভিভাবকগণ আমার লেখা পড়ার কোন একটা চেষ্টাই করিলেন না। বড়শী দ্বারা মাছধরা এবং বন্দুক দ্বারা পাখীমারা অভ্যাস করিলাম এবং গ্রাম্য তাশখেলার আড্ডায় যোগ দিলাম। কিন্তু কিছুদিন মধ্যেই ইহাতে বিরক্তি জন্মিল, মনে অশান্তি উপস্থিত হইল। লেখা পড়া করি না বলিয়া অভিভাবকগণ সময় সময় কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, অথচ শিক্ষার কোন একটা বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়া দিলেন না। ইহা আরো দুঃখের কারণ হইল। তখন ভাবিতে লাগিলাম যে হায়! আমার জীবন কি এই ভাবেই যাইবে? মনের চিন্তা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার খুড়া মহাশয়ের মত হইল যে বাটী বসিয়াই হাতের বাঙ্গলা লেখাটী পোক্ত করি, কেন না বয়স হইয়াছে, এ বয়সে ইংরেজী পড়া বৃথা, এত বয়সে ইংরেজী পড়িলে বিদ্যা হয় না। তাহাতে ইংরেজী কেতাবের দাম বড়বেশী, এত খরচ চলিবে না। আমার এক পিসীমা ছিলেন, তিনি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি আমাকে ইংরেজী পড়িতে দিতে একেবারেই নারাজ। তিনি বলিতেন যে, "অয় ইংরেজী পড়িয়া ছেলে না হবে হিন্দু, না হবে মুসলমান।" বাস্তবিকই

তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সত্যই হইল, কেন না শেষে আমার অবস্থা যে ভাবে দাঁড়াইল, তাহাতে আমি না হইলাম হিন্দু, না হইলাম মুসলমান।

এই সকল নিরাশার বাণীতে মনে আরো অশান্তি উপস্থিত হইল। কয়েক দিন একাকী বসিয়া এই অদৃষ্ট-চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি করিব, কোথায় যাইব, কি করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিব, এই ভাবনার বিষয় হইল। শেষে চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলাম যে, কত লোকে শুনি বাটী হইতে বাহির হইয়া বিদেশে গিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করে এবং চাকরি করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করে। আমি কেন তাহা পারিব না। বাটী হইতে বাহির হইবার চেষ্টায় রহিলাম, কিন্তু কোথায় যাইব, কাহার নিকট যাইব, কে সাহায্য করিবে, এই সকল ভাবনায় মন দমিয়া যাইতে লাগিল। পরম্পর শুনিতে পাইলাম, আমাদিগের গ্রাম হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটী গ্রামে একটী ভাল মাইনর স্কুল আছে। তথায় ভিন্নস্থানীয় ছাত্রগণ আসিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া থাকে।

একদিন গোপনে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলাম, পথ চিনি না, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গিয়া সেই গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তথায় আমার এক আত্মীয় বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আহারান্তে তথায় থাকিয়া স্কুলে পড়াশুনা করিব, এমত প্রস্তাব করিলাম। আত্মীয় মহাশয় স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তদীয় পত্নী আমাকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে দিতে নারাজ হইলেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে, "ও আমার বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না, আমি কাহারো ভাত রাঁধিতে পারিব না। আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাউক।" এই কথায় মনে যে দুঃখ হইল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেই আত্মীয় মহাশয়ের মহদ্‌গুণে ও দৃঢ়তায় তাঁহার পত্নীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি আমাকে থাকিতে অনুমতি করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হর্ষমনে বাটীতে ফিরিলাম। বাটী আসিয়া পিতাকে বলিলে, তিনিও খুসী হইলেন এবং মাসিক দুই আনা স্কুলের বেতন দিতে স্বীকৃত হইলেন।

বাটী হইতে বস্ত্রাদি ও বিছানাদি লইয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলাম। আত্মীয়-গৃহিণী আমাকে দেখিয়া মুখখানি কালী করিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া মনে আবার দুঃখ বোধ হইতে লাগিল। প্রতি দিন আহারের সময় কত চুপে চুপে কত নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিলাম, তাহা লিখিয়া শেষ করা কঠিন। মূল কথা, যে যাহাকে দেখিতে না পারে, তাহার হাঁটাতেও দোষ ধরিয়া নিন্দা

করিতে থাকে। আত্মীয় মহাশয়ের সেই মহৎ অন্তঃকরণের সঙ্গে তদীয় পত্নীর এই নীচ প্রকৃতির সংঘর্ষ মাঝে মাঝে আমাকে লইয়া হইতে লাগিল। আমি প্রত্যহ নানা কটু কথা সহ্য করিয়াও চোরের মত রহিলাম,এবং যাহাতে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইতে পারে, তদ্বিষয় সযত্ন হইলাম। আত্মীয় পত্নীর নানা কটু বাক্যে সময় সময় গোপনে অশ্রুপাত করিতাম। কিন্তু তবুও দাঁত মুখ চিপিয়া রহিলাম। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমার অন্য বিষয়ে কোন দোষ পাইলেন না, কিন্তু অবশেষে একটী দোষের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন। তাহা আমার খোরাক। অন্যান্য ছেলে অপেক্ষা আমার খোরাকটি কিছু বেশী ছিল। প্রত্যহ দুই বেলা আহারের সময় এজন্য আমাকে তাঁহার গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত। আমার পাতে ভাত দিবার সময় প্রকারান্তরে কত প্রকার বিদ্রুপ ও নিগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সময় সময় মনে হইত, এ ভাত খাইতেছি না, বিষ খাইতেছি? কখন কখন ভয়েতে আর ভাত চাহিতাম না। ক্ষুধা লইয়াই উঠিয়া যাইতাম। এই ভাবে যে কষ্টে আমি এই আত্মীয় পত্নীর নিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকিতে লাগিলাম। অন্য ছেলে হইলে এক দিনেই সেই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া নিজ বাটীতে গিয়া বসিত। নিজের খোরাক বেশী হওয়ার জন্য নিজকে নিজে ধিক্কার দিতাম, কিন্তু আবার চিন্তা করিয়া দেখিতাম যে, আমার ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত শরীর কেবলমাত্র এক খোরাকীর জন্যই জীবিত আছি। সেই জন্য উদরস্থ প্লীহা মহাশয় আমাকে বড় কাবু করিতে পারিতেছেন না, কারণ তাঁহার বিশাল দেহকে পুষ্ট রাখিতে, যাহা খাই তাহার অধিকাংশই দরকার হইত। বাস্তবিক গ্রাম্য লোকের অনেকের বিশ্বাস যে এই প্রকার পিলেতে খুব পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পারিলে ভাতের চাপে পিলে খুব নরম থাকে, সুতরাং সে রোগীকে বড় কাতর করিয়া তুলিতে পারে না। গণ্ডগ্রামের অজ্ঞ সমাজ ভিন্ন এরূপ অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যুক্তির আবিষ্কার অন্যত্র সম্ভবে না।

স্কুলের ভর্ত্তি হইলাম, এবং এ, বি,সি, ডি, পড়িতে আরম্ভ করিলাম। মাসিক দুই আনা হারে স্কুলের বেতন দিতে লাগিলাম।

ছোট বেলা হইতেই মনে একটা স্বাধীন ভাব জন্মিয়াছিল। আমি নিজে দুর্ব্বল ও অর্থ শূন্য হইলেও অকারণে কাহাকেও তোষামোদ করিতে পারিতাম না। ফলতঃ বর্ত্তমানে এক আত্মীয় গৃহিণীর নিগ্রহ ভিন্ন, অন্য কাহারো একটী উচ্চ কথা গায়ে সহিত না। এই গ্রামের জমিদার বাড়ীতেই স্কুল। জমিদার

পুত্রগণের সঙ্গে একত্র অধ্যয়ন করিতাম। তাঁহাদের কেহ কেহ আমাদিগের উপর আধিপত্য করিতে ইচ্ছা করিতেন। কেননা, তাঁহাদের নিজেদের প্রজা-বর্গের ছেলের উপর যেমন জমীদারী-প্রভুত্ব দেখাইতেন, সেই মত আমরা যে কয়েক জন বিদেশী ছেলে তথায় থাকিয়া পড়িতাম, তাহাদের উপরও তাদৃশ প্রভুত্ব দেখাইতে চাহিতেন। সকলে "বাবু বাবু, কর্ত্তা কর্ত্তা" করিত। আমার এই প্রকার অন্যায় প্রভুত্ব আদবেই সহ্য হইত না। জমীদার পুত্রগণ বিদেশী ভদ্রলোকের ছেলেদের, নিজেদের প্রজাগণের ছেলের মত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। আমি যে গ্রামের লোক, তথায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহারও আধিপত্য সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিল না। জমীদার পুত্রগণের এই প্রকার অন্যায় আবদার ও আধিপত্যে সময় সময় আমাদিগের মধ্যে কলহ হইতে লাগিল।

আমাদিগের খেলিবার ক্রিকেট পার্টি ছিল। এক দিন নদীর ধারে ক্রিকেট খেলিতেছি, এমন সময় এক সহপাঠী জমীদার পুত্র আমার হাত হইতে হঠাৎ ব্যাট্‌খানি কাড়িয়া লইয়া আমাকে খেলিতে দিবেন না বলিলেন। আমি ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে বেশ ঠ্যাঙ্গাইয়া দিলাম। ঘটনাটী জমীদার বাটীতে বড় বাবুর কাণে দিয়া পৌছিল, কিন্তু তিনি আমাকে কি করিবেন,? আমিত তাঁহার প্রজা নয় যে, আমাকে জরিমানা করিবেন। তাঁহাদের ছেলেরই অন্যায়।

একত্র পার্টিতে খেলিতে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সঙ্গে কলহ করিতে হয় বলিয়া, আমি তাঁহাদের প্রজাবর্গের ছেলের কতকগুলিকে ভাঙ্গাইয়া নিজের দিকে লইয়া আসিয়া স্বতন্ত্র এক দল গঠন করিলাম। এবং প্রত্যহ স্বাধীন ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া খেলা করিতে লাগিলাম। জমীদার তনয়দিগের জুলুমে অসন্তুষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহাদের দল ছাড়িয়া আসিয়া আমার দলে যোগ দিল। ক্রমে আমার দল বিলক্ষণ চায়ান হইয়া উঠিল। কি খেলোয়াড়ে, কি সবজ্ঞামে, কি অন্যান্য-বিষয়ে আমার দলের নিকট তাঁহাদের দল পরাস্ত হইতে লাগিল। ইহা আমার সহপাঠী জমীদার-নন্দনের অসহ্য হইল এবং তিনি কোন প্রকার একটা বিবাদ বাধাইয়া আমার দলকে ভাঙ্গিবার চেষ্টায় রহিলেন।

একদিন, আমরা প্রত্যহ যথায় খেলা করি, তথায় প্রথমে গিয়া খেলা আরম্ভ করিলে পরে, তাঁহার দল আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদার-নন্দন অন্যায়

পূর্ব্বক আমাদিগকে তথা হইতে উঠাইয়া দিতে সংকল্প করিয়া আমাদিগের উইকেট তুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন আমার অসহ্য হইল, আমাদিগের মধ্যে পরাপর বাকবিতণ্ডা আরম্ভ হইল, অবশেষে দুই পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জমীদার-নন্দন সহ কয়েকজনকে এমন প্রহার করিলাম যে, কেহ কেহকে কয়েকদিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। আমার মাথায় এক লাঠীর বাড়ি পড়িয়া মস্তকের চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া গিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। এইরূপ অল্পাধিক অনেকেই আহত হইয়া গেল। ঘটনাটী স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের কর্ণে পৌছিল। পরদিন দাঙ্গাকারী সকল ছাত্রদের কাহাকেও বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল, কাহাকেও নীলডাউন হইয়া সমস্ত দিন কাটাইতে হইল, ইহার উপর প্রত্যেকের পীঠে দশটী বেতের বাড়ি সজোরে পড়িল।

এই সকল ঘটনায়,জমীদার-নন্দনদিগের ধৃষ্টতায়, অবিচারে এবং অত্যাচারে আমার অভিমানে আঘাত লাগিল। সর্ব্বদাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে কেন ইহারা আমার উপর এত প্রভুত্ব দেখাইতে চাহে এবং আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে? মনে মনে আরো দুঃখ হইল যে, ইহাদের অভিভাবকগণ এই সকল দুর্ব্বৃত্ত ছেলেদিগকে শাসন করেন না,তাঁহারা আরও তামাসা দেখেন! ইহাদের অভিভাবকগণের নীচপ্রকৃতির একটী দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব।

আমাদিগের স্কুলের প্রথম শ্রেণীর একটী ভাল ছাত্র আমার দলে ছিল। একদিন নদীর ধারে সকলে বেড়াইতে গেলে, ঐ ছেলেটীর সঙ্গে আমার সহপাঠী জমীদার-তনয়ের কোন কথা লইয়া বচসা হয়। জমীদারপুত্র ক্রোধে অধীর হইয়া গিয়া বাটীতে ঐ ছেলেটীর নামে অভিযোগ করিল। জমীদারবাড়ী হইতে পেয়াদা গিয়া ঐ ছেলেটীকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ছোটবাবুর সম্মুখে তাহাকে হাজির করা হইল এবং সহপাঠী জমীদারপুত্র, তাঁহার পিতৃব্য সেই ছোটবাবুর সাক্ষাতে, নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া লইয়া ঐ ছেলেটীর মুখে প্রহার করিতে লাগিল। এই ছেলেটি তাহাদের প্রজার মধ্যে। ইহাতে প্রবীণ ছোটবাবু একটি কথাও বলিলেন না এবং আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকেও নিবারণ করিলেন না। তবে অপরে গিয়া জমীদারপুত্রের হস্ত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল। এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া ক্রোধে শরীর জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু উপায় নাই। আমি ক্ষুদ্র নাবালক একটী ছাত্র বইত না।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তবে আমার প্রতিও উহারা ঐ প্রকার

ব্যবহার করিতে চায়। আমার জমীদারী নাই বা অর্থবল নাই, তাই এত অবজ্ঞা? ক্রমে মনে মনে ঘৃণা ও জেদ হইল, অভিমান আরো উচ্চ হইল, আত্মসম্মান বোধ দ্বিগুণ বাড়িল। মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে একদিন নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, "আমি ইহাদের অপেক্ষা যাহাতে ক্ষমতাশালী হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব, অত্যাচারী প্রবলের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা দাঁড়াইব, প্রবল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত দুর্ব্বলের পক্ষ সর্ব্বদা অবলম্বন করিব, এবং অর্থ ও সম্পদশালী, অভিমানীর বৃথা গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব। সর্ব্বদা ন্যায়পথে থাকিব। স্বদেশের কল্যাণের চেষ্টা করিব, একতা, দৃঢ়তা, সাহস ও তেজ স্বজাতির মধ্যে যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করিব।"

আমার উদ্দেশ্য হইল যে, জমীদারী ও অর্থবল না থাকিলেও, লোকে যে ক্ষমতাশালী হইতে পারে, তাহা একবার দেশের লোককে দেখাইব। আমার মত এই বালকের প্রতিজ্ঞা, পঞ্চবর্ষ বয়সের ধ্রুবের প্রতিজ্ঞার মত হইল।

কোন্ দলের নায়কত্ব করিবার লালসা আমার বৃদ্ধি হইল। আমার এই ক্ষুদ্র ক্রিকেট-পার্টির নায়ক হওয়াই আমার জীবনের সর্ব্বপ্রথম ঘটনা। জমীদারপুত্রগণের দলের সঙ্গে সর্ব্বদা বিবাদ ও ঠেঙ্গাঠেঙ্গী করিতে করিতে সাহস বাড়িয়া গেল, কি করিয়া স্বদেশের লোককে সাহসী ও একতাপ্রিয় করিতে হয় এবং কি করিয়া গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে হয়, তাহার অভ্যাস এই সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ। লোকে অত্যাচারিত না হইলে তাহার মনে ঘৃণার উদয় হয় না, অপর কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত না হইলে তাহার জেদ ও তেজ হয় না।

মনে মনে জীবনের লক্ষ্য স্থির হইল বটে, কিন্তু নিজে অর্থশূন্য ও সহায়শূন্য, এই ভাবনায় মন দমিয়া যাইতে লাগিল। কি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা আদবেই জ্ঞান নাই। সম্প্রতি এই প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে একদিন মনে উদয় হইল যে লোকে বলে সর্ষপ "কুড়াইতে কুড়াইতে বেল হয়, তিল কুড়াইতে কুড়াইতে তাল হয়।" আমার সে সর্ষপ বা তিল কিছুই নাই। ইতিমধ্যে মনে এক খেয়াল উপস্থিত হইল। কায়স্থ ও নবশাকদিগের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ভোজন দক্ষিণায় যে কয়েকটী পয়সা পাই, তাহা আর ব্যয় করিব না। তাহাকে তিল মনে করিয়া তালে পরিণত করিব। এযাবত মনে এ খেয়াল জন্মে নাই, সুতরাং যখন যাহা পাইয়াছি, তখন তাহা গ্রামে সন্দেস রসগোল্লা-বিক্রেতাগণ আসিলে তাহাদের তহবিলে গিয়া অবিলম্বে পড়িত। এবার এই সংকল্প হইবার পর

কুণ্ডুবাড়ীর এক বৃদ্ধের মৃত্যু হইল। মনে করিলাম, এইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া যে কয়েকটী পয়সা পাইব, তাহা জমা করিব। ঠিক একমাস পরে মহাসমারোহে বৃদ্ধের শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধে কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হইল বটে, কিন্তু আমার ভাগ্যে চারি গণ্ডা পয়সার অধিক দক্ষিণা মিলিল না। কপর্দ্দক শূন্য-হস্তে একদমে চারি আনা আসিয়া পৌঁছিল, মনে ভরসা হইল। তাহার কয়েক দিন পরে শুনিলাম যে, পালেদের বাড়ীর বুড়ী মর মর হইয়াছে। তখন ভাবিলাম যে এই বুড়ীটা যদি মরে, তাহা হইলে তাহার শ্রাদ্ধে অন্ততঃ আর চারি আনার পয়সাত পাইব। আমার মত শুভানুধ্যায়ীর আকাঙ্ক্ষা পরমেশ্বর পূর্ণ করিলেন। সত্য সত্যই বুড়ী এবার আর রক্ষা পাইল না। সে পূর্ব্বে কতবার এইরূপ মর মর হইয়াছিল, কিন্তু যমকে ফাঁকি দিয়া সে দিব্যি সারিয়া উঠিল, তাই মনে একটু সন্দেহ ছিল, পাছে পূর্ব্বের মত বা এবারও সারিয়া উঠে!

এই বুড়ীর শ্রাদ্ধে আশাতিরিক্ত ফল হইল। পালেদের বংশানুগত নিয়মানু-সারে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সময়ে ব্রহ্মাবরণ পাইতেন, তিনি ঘটনাক্রমে এই শ্রাদ্ধের দিন অনুপস্থিত ছিলেন। এখন প্রশ্ন হইল যে তাঁহার অনুপস্থিতে ব্রহ্মা-বরণ কে গ্রহণ করিবে? সভামধ্যে নানা তর্কবিতর্ক করিয়া, সকলে নিরুপায় হইয়া আমাকে ঠেলিয়া দিয়া সেই শূন্যগদিতে বসাইলেন। সেই ব্রহ্মাবরণে একখানি মার্কিনের ধুতি ও আট গণ্ডা পয়সা বরণ ও দক্ষিণা পাইলাম। তাহার পর ফলারের দক্ষিণাটী ত হাতের পাঁচ আছেই। মনে অনেক জোর হইল। ফলারের দক্ষিণা চারি আনা, ব্রহ্মাবরণের দক্ষিণা আট আনা এবং কাপড়খানি বিক্রয় করিয়া বার আনা পাইলাম। থোকে একদিনে দেড় টাকা লাভ হইল এবং পূর্ব্বের চারি আনা লইয়া ১৸৹ এক টাকা বার আনা তহবিলে জমিল।

এবার আর সন্দেস রসগোল্লা বিক্রেতাগণ আমার নিকট বড় ঘেঁসেন না। প্রাণে ছাই দিয়া প্রাণটাকে এমন করিয়া বাঁধিয়াছি যে, আর নড়াচড়ার সাধ্য নাই। সন্দেস রসগোল্লা ওয়ালা আসিলে আর সকলে মহানন্দে রসগোল্লা কিনিয়া, আমার সাক্ষাতে টপ টপ করিয়া খাইতে থাকে, তাহা দেখিয়া আমার জিহ্বার জল টস্ টস্ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। প্রবৃত্তি জাগিয়া মনে একবার বলে যে দূর হউক পয়সা জমানের সংকল্পে, মনের সুখে একবার রসগোল্লা খাই। কিন্তু আবার নিবৃত্তি আসিয়া তাহা নিবারণ করে যে, যখন রসগোল্লা সন্দেসাদি না খাইয়াই লোকে বাঁচে, তখন বৃথা পয়সা নষ্ট করিয়া তাহা খাইবা

কেন? কারণ মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার সময় ক্ষণিক রসনা তৃপ্তিমাত্র, উদরস্থ হইলে তাহাতে আর কি মজা থাকে?

এই প্রকার আত্মসংযম অভ্যাস করিতে লাগিলাম। প্রবৃত্তি বেচারা প্রথম প্রথম বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিত, কিন্তু নিবৃত্তির চাপে পড়িয়া আর শেষে মাথা নাড়িবার সাধ্য রহিল না। আমি যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসর ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা দেবীর কৃপায় নিমন্ত্রণের সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যদিও চারিদিকে হরিধ্বনি ও মড়াকান্নায় প্রাণ আকুল করিয়া তুলিত, কিন্তু ফলারে দক্ষিণার পয়সাটা পাওয়ার কথা মনে পড়িলে মনে কতক শান্তি হইত। এই মরশুমে নিমন্ত্রণের দক্ষিণার পয়সায় আমার তহবিলে দশ টাকা জমিল। এই দশ টাকা হাতে থাকায় মনে খুব জোর হইল!

একদিন এক গরিব দায়গ্রস্ত ব্যক্তি, আমার নিকট যে কয়েকটা টাকা আছে, তাহার সন্ধান পাইয়া টাকা কয়েকটা কর্জ্জ চাহিল। সে প্রতি টাকায় মাসে তিন পয়সা হিসাবে সুদ দিতে স্বীকৃত হইল। আমিও সুদের লোভে তাহাকে টাকা কয়েকটা ধার দিলাম। লোকটা গরিব হইলেও সাধু ধরণের ছিল। পাঁচ ছয় মাস পরে সুদসহ টাকা কয়েকটা আনিয়া ফেরত দিল। মনে বড় আনন্দ হইল। ইহার পর হইতেই এ ও সে মাঝে মাঝে সুদ দিয়া দুই চারি টাকা করিয়া ধার লইতে লাগিল। আমি এক ক্ষুদ্র মহাজন হইয়া দাঁড়াইলাম। এই মত সুদে পল্লী কারবারে ও নিমন্ত্রণের আয়ে এক বৎসরে আমার তহবিলে ২৫৲ টাকা জমিল। চারি আনা হইতে সুরু করিয়া ২৫৲ টাকা মূলধনে পরিণত হওয়া একেবারে নিতান্ত মন্দ বলা যায় না।

যেখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম, তথায় আমার সিন্দুক বাকস্ কিছুই ছিল না। বিশ্বাস করিয়া টাকাটা অন্যের নিকটও গচ্ছিত রাখিতাম না। একটা গেঁজে-থলের মধ্যে টাকা কয়েকটা পুরিয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখিতাম।

একদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দেখি, কোমর যেন হাল্কা বোধ হয়। হাত দিয়া দেখি, টাকার থলেটা নাই। প্রাণটা যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে মনে হায়! হায়! করিতে লাগিলাম। আহা! আমার এত কষ্টের টাকা কয়েকটা আমার মাথায় বাড়ী দিয়া কে লইয়া গেল? একথা সহসা বাটীর আত্মীয় মহাশয়কেও সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কেন না পাছে তিনি রাগ করেন যে, তাঁহাকে বিশ্বাস না করিয়া কোমরে টাকা রাখিয়া এই ফল হইল। গোপনে কাঁদিতে লাগিলাম, সে দিন টাকার শোকে

আর আহার করিতে পরিলাম না। পরস্পরের কাণাকাণিতে বাটীর কর্ত্তা মহাশয়ের কাণেও সংবাদটী পৌঁছিল। কর্ত্তা বড় দুঃখিত হইলেন কিন্তু কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেন খুসি হইলেন এবং বলিলেন যে, "যেমন ছোট অন্তঃকরণ তাহার এই উপযুক্ত শাস্তি।"

সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে যে, কাহার উপর আমার সন্দেহ হয়? তাহাতে আমি বলিলাম যে "বাটীর চাকর বনমালার প্রতি আমার সন্দেহ হয়। কারণ সে আর আমি এক ঘরে শুইয়া থাকি এবং এক দিন আমার বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় সে আমার কোমরে টাকার গেঁজে দেখিয়াছিল।" সকলে এবং কর্ত্তা নিজে তাহাকে প্রকারান্তরে বুঝাইয়া বলিলেন যে, সে যদি টাকা পাইয়া থাকে তবে ফেরত দিউক। তাহার প্রতি কেহই অসন্তুষ্ট হইবে না। প্রথমতঃ তাহাকে তোষামোদ করা হইল, পরে তাহাকে ধমকান হইল, কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করিল না। সে আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য ব্রাহ্মণের পা ছুঁইল, ঠাকুর ঘর ছুঁইয়া দিব্যি করিল যে, "যে টাকা লইয়াছে সে মুচির সন্তান, বেজাতক" এবং সকলে তাহাকে অনর্থক চোর বলিয়া সন্দেহ করিতেছে বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, সে ভিন্ন আমার টাকা আর কেহ লয় নাই।

ইতিমধ্যে একজন বলিলেন যে "নারাণ দাস চা'লপড়া জানে, তাহার চা'লপড়া খুব ভাল।" নারাণ দাসকে ডাকা হইল। সে আসিলে ঘটনার সমস্ত হাল অবগত হইয়া বলিল যে "আমার চা'লপড়ার গুণ এই যে, যে ব্যক্তি দোষী, সে এই চাউল মুখে দিবামাত্র তাহার মুখ জ্বালা করিবে, মুখ হইতে লালা নিঃসরণ হইবে এবং ক্রমে মুখ ফুলিয়া উঠিবে। আর নির্দ্দোষী ব্যক্তি ইহা মুখে দিলে তাহার কোন যন্ত্রণাই হইবে না।" আমার সন্দেহ যাহার উপর হইয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারিয়া "বনমালীকে বলিল যে, "তুমি এই পড়াচাউল মুখে দিয়া চিবাইতে আরম্ভ কর।" বনমালী কিছুতেই ঐ চাউল পড়া মুখে দিতে স্বীকৃত হইল না। সে বলিল যে, "আমি টাকা লই নাই। অনর্থক কেন পড়াচাউল মুখে দিব? আগুনে হাত দিলে ইচ্ছায়ও পোড়ে, অনিচ্ছায়ও পোড়ে।" তাহার আপত্তিতে সকলে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল এবং জোর করিয়া তাহাকে পড়াচাউল খাইতে বাধ্য করিল। নারাণ দাস বাটী হইতেই পড়াচাউল প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল। চাউল যেন হরিদ্রা ও চুণের সাহায্যে রক্তবর্ণে পরিণত করা হইয়াছে। সকলে জোর করিয়া বনমালীর

মুখের মধ্যে চাউল খুসিয়া দিল। চাউল মুখে দিবামাত্র সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, মুখ হইতে লালাস্রোত বহিল। মুখগহ্বর, ওষ্ঠ ও জিহ্বা লাল হইয়া উঠিল। আর কি প্রমাণের বাকী রহিল যে, সে চোর নয়? সকলে তাহাকে ধরিয়া উত্তম মধ্যম দিতে আরম্ভ করিল। দুর্ভাগার একেত মুখের যন্ত্রণায় কথা বলা দায় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর এরূপ "ধনঞ্জয়ের" চোটে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে জড়িতস্বরে কহিল যে, আরে তোমরা আর আমাকে মেরনা, আমি টাকার কথা বলে দিচ্ছি, ছাড় ছাড় বলিয়া অস্পষ্টভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন প্রহারের একটু বিরাম হইল। সে আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া বাড়ীর বাহিরে একটা ছাইয়ের স্তূপের মধ্য হইতে গেঁজে-থলিটাকে বাহির করিয়া দিল। তখন নারাণ দাসের চাউল পড়ার ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। নারাণের যেমন খাটমন্ত্র এমন আর কাহারো নাই। এই সকল প্রশংসায় গর্ব্বে নারাণের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহাকে আমি একটা টাকা পুরস্কার দিলাম, সে তাহা লইল না, বলিল যে, "অর্থ গ্রহণ করিলে কি মন্ত্রের গুণ থাকে?" তাহার মন্ত্রের গুণ আর কি, চাউলের সঙ্গে কলিচুণের ভাগটা খুব বেশী ছিল বলিয়া ফলটা সত্বর ফলিল। উক্ত পড়াচাউল যে কোন ব্যক্তির মুখে দিলেই বনমালীর মুখের দশা যে তাহার হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইবার আমার এই স্কুলের শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষার পূর্ব্বে রাত্রি জাগিয়া পড়াশুনার দরকার। আমার ঘুম অত্যন্ত বেশী ছিল, সুতরাং আহারান্তে কেতাব লইয়া পড়িতে বসিলেই দুই চক্ষু বুজিয়া আসিত। ঝুমিয়া ঝুমিয়া কিছুকাল চেষ্টা করিয়া বিরক্ত হইয়া শুইয়া পড়িতাম। সে রাত্রির মতন আর পড়া হইত না। এইমত পড়া ভাল করিতে না পারিয়া কতকটা পাছে পড়িয়া গেলাম। একজন সহপাঠী ছাত্র বলিলেন যে, "ঘুম পাইলে চক্ষের কোণে একটু সর্ষপের তৈল দিলে তৎক্ষণাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।" আমি তাঁহার উপদেশমত কয়েক দিন চক্ষে তেল দিয়া ঘুম ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলাম। প্রথম দিন বেশ ফল পাইলাম, তারপর চক্ষে তেল দেওয়া মাত্রই চক্ষের জল পড়িতে থাকিত। জলপড়া ক্ষান্ত হইলেই, কিছুকাল পরেই আবার ঘুম পাইতে লাগিল।

আর একজন ছাত্র বলিলেন যে "তুমি, আহারান্তে যখনই ঘুমে ধরিবে, তখনই শুইয়া পড়িবে। কিন্তু শোয়ার কালে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। যেই ঘুমের ঘোরে মোড়ামোড়ি ছাড়িবে, অমনি আঙ্গুলে আঙ্গুলে টান লাগিয়া বেদনার চোটে জাগিয়া উঠিবে।" বাস্তবিক এ কার-

দায় ঘুম শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু উঠিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ঘুমে দুইটী চক্ষু বুজিয়া আইসে। ঘুম নিবারণ এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

আমরা চারি পাঁচটী ছাত্র একত্র বাসায় পড়িতাম। আমি ভিন্ন সকলেই তামাক-খোর ছিলেন। আমি ছোটবেলা হইতে কখনও তামাক খাইতাম না। তামাকের ধুঁয়ার গন্ধে আমার অসুখ বোধ হইত। সহপাঠী ছাত্রগণ আমাকে তামাক খাইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, ঘুমপাওয়া মাত্র তামাকে টান দিলে ঘুম তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়। আমি তামাককে ঘৃণা করিলেও অগত্যা পরীক্ষার সময়ে পাঠাভ্যাসের জন্য তামাক খাওয়া শিক্ষা করিতে রাজি হইলাম। প্রথম দিন রাত্রি কালে আহারান্তে সকলে তামাক খাইয়া হুঁকাটী আমার হাতে দিয়া আমাকে তামাক টানিতে অনুরোধ করিলেন। আমিও হুঁকাটী লইয়া জোরে কয়েকটী টান দিয়া ধুম্ পান করার কিছুকাল পরে মাথা ঘুরিয়া ন্যাকার করিয়া শুইয়া পড়িয়া গেলেম। নেশার চোটে সে রাত্রি আর মাথা খাড়া করিতে পারিলাম না। সুতরাং সে রাত্রির মনে আর পড়াশুনা হইল না। মনে মনে ভাবিলাম,আর এমন মাটি খাবনা। কিন্তু সহপাঠীগণ নানা উপদেশ দিয়া সযত্নে আমাকে আস্তে আস্তে তামাক খাওয়া শিখাইতে লাগিলেন। গুরুগম্য না হইলে কোন বিদ্যাই হাঁসিল হয় না। আমারও গুড়ুক খোর উপদেষ্টাগণের যত্নে বিষবৎ তামাকের নেশায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়া শেষে যেন তামাকের প্রতি ঝোঁকটা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। শেষে এমন হইল যে, যাঁহাদিগকে সম্মান করি, তাঁহাদের সম্মুখেও তামাক খাওয়াটা বাদ দিলে ভয়ানক অসুখ বোধ হইত। নেশার ঝোঁক ক্রমে এমন চড়িয়া গেল যে,সম্মানিত লোকের সম্মুখ হইতে হুঁকাটাও আড়ালে লইয়া গিয়া হুঁকায় দম না দিলে প্রাণটা ঠাণ্ডা হইত না। মনে মনে বলি, এওত এক উপদ্রব মন্দ হইল না। রাত্রিকালে যখনই জাগি, তখনই হুঁকায় একটা টান না দিলে মনটা অস্থির হইতে লাগিল; পরীক্ষা দিবার জন্য জেলায় যাইলাম। হুঁকা ও কলিকা যন্ত্রটী সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মাষ্টার মহাশয়ও তামক খাইতেন। সময় সময় আমাদের তামাকের ধুঁয়া ষ্টিমারের চিমনির ধুঁয়ার ন্যায় স্তম্ভে স্তম্ভে, স্তরে স্তরে গিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিত। মনে মনে লজ্জা বোধ হইল। ছি! এমন কু অভ্যাসও লোকে করে, পয়সা খরচ করিয়া নিজের শরীরে একটী কৃত্রিম ব্যাধির সৃষ্টিকরা কেন? যে দিন পরীক্ষা শেষ হইল, সেই দিনই ক্রোধ পরবশ হইয়া ধূমপানের যন্ত্র

দুইটী সরোশে আছ্ড়াইয়া প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিলাম। এবং সেই হইতে আর হুঁকা যন্ত্র কখনও মুখের কাছে আনিতে দিই নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবাহের পত্র।

পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিয়া বসিলাম। কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল যে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম বটে, কিন্তু মনে আবার নানা চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। কোথায় যাব, কি করিব, ইত্যাদি ভাবনার বিষয় হইল।

পল্লীগ্রামে আবার সেই তাশ্ পাশার আড্ডায় যোগ দিতে বাধ্য হইলাম। তাহা না করিলে সমবয়সী, নিষ্কর্ম্মা, বকাটে ছেলেরা ছাড়ে কই? তাহারা জোর করিয়া টানিয়া লইতে লাগিল। মাঝে মাঝে বন্দুক দ্বারা পাখী শীকার এবং দড়ি বা জাল দ্বারা শূকর শীকার করিয়া আনন্দ লাভ করিতাম, কিন্তু তাশ্ পাশায় আমার মনে শান্তি দিতে পারিত না। গ্রামের আস্ পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল গুলিতে অনেক বন্য শূকর থাকিত। যে জঙ্গলে শূকর আছে তাহার অনুসন্ধান পাইলে, সকলে জুটিয়া শূকর মারা দড়ি বা জাল পাতিয়া, কুকুর সহ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া তাড়াইয়া দড়ির দিকে শূকর গুলি লইয়া যাইতাম। যদি দড়িতে শূকর পড়িয়া জড়াইয়া আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে দুই দিকে বর্শা হস্তে অবস্থিত শীকারিদ্বয় গিয়া অমনি শূকরটাকে বর্শাদ্বারা কোপ দিয়া, ঠাসিয়া ধরিত, আর আমরা লাঠীর আঘাতে শূকরটীর দফারফা করিয়া ফেলিতাম। এ সকল নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইলেও ইহা পুরুষোচিত ক্রীড়া। ইহাতে সাহস বৃদ্ধি হয়, শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হয়, এবং শস্যাদি ধ্বংসকারী শূকর রূপ শত্রু নিপাত হয়।

পল্লীগ্রামে তাশ, পাশা, দাবার, কে কয়টা বাজী জিতিল, তাহার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ফলারে বা ভোজের নিমন্ত্রণে কে কতটা কাঁচা গোল্লা বা রসগোল্লা খাইল, তাহারও বিশেষ আলোচনা হইত। নিমন্ত্রণে যে যত বেশী খাইতে পারে, তাহার তত বাহাদুরী। তৎকালে আমাদের গ্রামে যত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার মধ্যে আমার খুড়া মহাশয় প্রথম নম্বরের খানেওয়ালা ছিলেন। তাঁহার কোন নিমন্ত্রণে আহারের এমন নিয়ম ছিল যে, প্রথম হইতে শেষ

পর্য্যন্ত যত দ্রব্য পরিবেশন করা হইত, তাহার সমস্ত তিনি আহার করিয়া, শেষে সন্দেশ বা রসগোল্লায় টান ধরিতেন। অন্যান্য অনেকে, শেষে সন্দেশের বা রশগোল্লার সংখ্যা বেশী দেখাইয়া, নাম করিবার জন্য প্রথমে প্রায় কিছুই খাইতেন না। সমস্ত দ্রব্য পাতে মজুত রাখিতেন, কিন্তু আমার খুড়া মহাশয়ের পাতা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিত।

গ্রামান্তরে কোন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে বড় এক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা দল বলে কোমর বাঁধিয়া ফলাহারে চলিলাম। এই নিমন্ত্রণে প্রায় ছয় সাত শত ব্রাহ্মণ তিন চারিটী খলাট জুড়িয়া আহারে বসিয়াছেন। ফল মূলাদি, লুচি, ডাল তরকারী, দই ছানা, ক্ষীর সন্দেশ প্রভৃতি আহার সমাপ্ত হইলে, আর কেহ কিছু চান কিনা, তাহার যাচাই হইল। তখন সন্দেশের পালা পড়িল। সকলে দু'চারিটী বা দশ বিশটী অতিরিক্ত আহার করিয়া নিরস্ত হইলেন, কিন্তু আমার খুড়া মহাশয়ের সন্দেশের টান আর কমিল না। একটী ভদ্র লোক বড় এক হাঁড়ি কাঁচা গোল্লা লইয়া আসিয়া কাকার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"মহাশয়! কয়টী দিব?" কাকা বলিলেন যে, "আপনি আট্‌টী করিয়া গোল্লা দিতে থাকুন, আমি ধীরে ধীরে আহার করিতে থাকি।" এই প্রকার কয়েক বার আটটী করিয়া লইয়া পরে বলিলেন"ছয়টী করিয়া দিন।" শেষে চারিটী, পরে দুইটী করিয়া অবশেষে একটী করিয়া কয়েক বার লইয়া ক্ষান্ত দিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে বিরক্ত হইলেন। গণনায় ধার্য্য হইল যে, সর্ব্ব সমেত তিনি ১০৫টী কাঁচা গোল্লা উদরস্থ করিয়াছেন। কুড়িটায় একসের হইল, পাকী সওয়া পাঁচ সের কাঁচা গোল্লা তিনি সে দিন খাইয়াছিলেন। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের সমষ্টি ধরিলে আট নয় সের খাদ্যের পরিমাণ হইবে। আমাদের গ্রামের মধ্যে সেদিনকার ফলারে কাকার নীচেই আমি হইলাম। আমি সেদিন পঁয়ত্রিশটী কাঁচা গোল্লা খাই। কাকা সন্দেশাদি খাইবার জন্য পাতে একটু টক্ দই, বা কোমলা লেবুর কাদে, কোমলা প্রভৃতি রাখিতেন। টক্ দ্বারা মুখের মিঠা মারিয়া লইতেন। তিনি বলিতেন যে, সন্দেশাদি খাইতে হইলে টপ্ টপ্ করিয়া গিলিয়া না খাইলে বেশী খাওয়া যায় না। যিনি কামড় দিয়া ভাঙ্গিয়া কাঁচা গোল্লা বা সন্দেশ খাইবেন, তিনি কোন মতেই বেশী খাইতে পারিবেন না।

[illegible] জেলায় একটী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল "আধমণি কৈলাস।" তিনি ঠিক্ আধ মণ দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারিতেন। তাঁহার নাকি সমস্ত অন-

ধ্যাপী এক মাত্র পেট্ সার ছিল। তিনি বঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণ মহলে আহারের বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম ছিলেন, তাহা নিশ্চয়। তবে আমার কাকার নম্বর যে সে সময়ে কত ছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তিনি হয়ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানীয় হইবেন। অনেকে একদিন অতিরিক্ত আহার করিয়া হয়ত দুই দিন অন্য কোন খাদ্য স্পর্শ করিতেন না, কিন্তু আমার কাকার এক নিয়ম ছিল যে তিনি মধ্যাহ্নে যে এত গুরুতর আহার করিতেন, তাহাতে রাত্রিকালে বাটীতে তাঁহার যথারীতি আহার না করিলেই হইত না। তাঁহার যেমন শারীরিক শক্তি ও সাহস ছিল, আহারও তাদৃশ ছিল।

যদিও আমার ফলারে আনন্দ ও তাশ পাশায় মত্ততা, কি শীকারে উৎসাহ ছিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। বাটী আসিলেই নির্জ্জনে বসিয়া নানা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতাম। জীবনের সংকল্পের কথা মনে পড়িলে তাহা যে সিদ্ধ হইবে, এমন আশা জন্মিত না। আমাকে চিন্তাকুল দেখিয়া পিতা মাতা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোন "বুদ্ধিমান" হয়তঃ তাঁহাদিগকে সোম্‌জাইয়াছিলেন যে "ছেলের বিয়ের চেষ্টা কর, কারণ সমবয়সী আর সকলের বিয়ে করিতে দেখিয়া বুঝিবা সে দুঃখিত হইয়া বিয়ের জন্য চিন্তা করে।" বাস্তবিকই পিতা মাতা আমাকে বিবাহ দিয়া সংসারের সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন।

এ সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইল। পিতা মাতাকে অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলাম যে, তাঁহারা যেন আমার বিবাহের-কোন সম্বন্ধ ঠিক না করেন, কারণ আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। তাহাতে তাঁহারা মনে করিলেন, প্রায় সকল ছেলেই প্রথম প্রথম এই প্রকার বলিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহ দিলে আনন্দিত হয়। আমাকেও তাদৃশ মনে করিলেন। তখন মনে মনে আরো দুঃখ হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, হায়! নিজের বিদ্যাবুদ্ধি বা ক্ষমতা নাই। সংসারে এমনিই অনাটন, তাহার উপর ইঁহারা আমাকে বিবাহ দিয়া ব্যয় বৃদ্ধির সংকল্প করিলেন। এ অবস্থায় নিজে বিবাহ করিয়া আর একজনকে কষ্টের ভাগী করিব না। আর বউ আসিয়া ভাল খাইতে.পরিতে না পারিয়া, গহনাদি না পাইয়া নানা যন্ত্রণা দিবে, সেই নির্য্যাতন ভোগ করিব? তাহা কখনই হইবে না। আমি কিছুতেই এখন বিবাহ করিব না। এখন বিবাহ করিলে লেখা পড়া শিক্ষা হইবে না এবং জীবনের সংকল্পও সিদ্ধ হইবে না, তাহা নিশ্চয়।

বিবাহের ঘটক ঘন ঘন আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। কন্যাপক্ষের লোক আমাকে দেখিবার জন্ত আসিল। আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলাম। একজন ঘটক এবং দুইজন অপর ভদ্র লোক আসিয়াছিলেন। তাহার একজন প্রায় আমার বয়সী।

প্রাচীন ভদ্র লোকটী আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার অভিপ্রায় বোধ করি আমি বোবা কি কালা তাহা পবীক্ষা করা। নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম "আমার নাম কুড়ণ"। তখন অল্পবয়স্ক ব্যক্তি বলিলেন যে, "আরে মশায়, নামটা ভাল করিয়াই বলেন, একি চাঁড়ালে ধরণের নাম বলা।" ইনি বোধ করি কন্যার ভাই হইবেন, তাই ভাবী ভগ্নিপতির সঙ্গে একটু তামাশা করিলেন। আমি বলিলাম "তবে কি প্রকাব নাম বলিব, তবে কি বলিব যে, "আমার নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত কুড়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুব"? আমার এ কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন। আমার ইচ্ছা ইহাদিগকে চটান্, তাহা হইলে বোকা বা গোঁয়ার মনে কবিয়া চলিয়া গেলেই মঙ্গল। তাঁহারা আমার হাতের লেখা দেখিতে চাহিলেন। আমি হাতেব লেখা দেখাইতে সম্পূর্ণ নারাজ। আমি বলিলাম যে "আমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে বসিয়াছি?" কিন্তু খুড়া মহাশয়েব তাড়নায় আমাকে কিছু লিখিতে হইল। বাঙ্গালা ও ইংরেজী দুই প্রকার লেখার নমুনা লইয়া যাইতে চাহিলেন।

বাঙ্গালায় লিখিলাম যে—

"বাল্য বিবাহের অনেক দোষ। বাল্য বিবাহের জন্য হিন্দু জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে।"

ইংরেজীতে লিখিলাম—

"He is a big fool who marries his child daughter to a boy who has neither money nor education:"

পাঠক মাইনর পাশ করা বিদ্যায় ইহা অপেক্ষা ভাল ইংরাজী লেখা সম্ভব নয়।

ভাবী শ্যালকের ইংরেজী বিদ্যা আমার মতই ছিল, তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া মুখটা একটু কুঞ্চিৎ করিলেন। কিন্তু অপর সকলে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। পরে তাঁহারা আমার লেখা লইয়া বাড়ী যাইবার সময় আমার পিতাকে গোপনে কহিলেন যে, ছেলেটার চক্ষু ও মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হয় যেন বেশ বুদ্ধি আছে, কিন্তু তাহার কার্য্যে যেন বোকামি ও অভদ্রতা প্রকাশ

পাইল। তাহাতে কর্ত্তা তাঁহাদিগকে কহিলেন যে "সে বিবাহ করিতে একেবারেই নারাজ, তাই এই মত ব্যবহার করিয়া আপনাদিগকে চটাইতে চেষ্টা পাইয়াছে। বাস্তবিক ছেলে বুদ্ধিমান ও চালাক।"

তাঁহারা প্রস্থান করিলে মনে মনে ভাবিলাম যে আপদ গেল, বেটারা আমার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আর আসিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুই দিন পরেই সেই বেটা ভগ্নদূত ঘটক আসিয়া আবার উপস্থিত হইল এবং পিতাকে বলিল যে "কন্যা কর্ত্তা এই পাত্রেই কন্যা বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন। তিনি আরো বলিলেন যে, ছেলেটী যদিও প্রকারান্তরে আমাকে ফুল বা আহম্মক বলিয়াছে, তাহাতে তাহার মনের মহৎ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং ভবিষ্যতে সে যে একটা বড় লোক হইবে, তাহার আভাস পাইতেছি। অন্যত্র আরো দুই তিনটী সম্বন্ধ উপস্থিত থাকিলেও আমি এই ছেলের সঙ্গেই আমার মেয়ের বিবাহ দিব।" কন্যাকর্ত্তার কথা শুনিয়া পিতাঠাকুর খুসী হইয়া শুভ দিন ও লগ্ন ঠিক করিয়া বিবাহের "পত্র" হইয়া গেল। আমিও এদিকে পলায়নের সুযোগ চেষ্টা করিতে থাকিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

বিবাহের বরযাত্র।

ইতিমধ্যে এক সুযোগ ঘটিল। গ্রামের মজুমদারদিগের এক ছেলের বিবাহ, বরযাত্রী যাইতে হইবে। এ সংবাদে আমি নাচিয়া উঠিলাম। বিবাহে যাইতে প্রায় ৩ প্রহরের পথ। এক বৃহৎ নদী পার হইয়া যাইতে হইবে। মহা সমারোহে বিবাহের বরযাত্রী হইয়া চলিলাম। বাদ্যকর, মশালচী, বেহারা, লাঠিয়াল ও ভদ্রলোক সমস্ত লইয়া প্রায় দুই শত লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মিছিলের মত বাহির হইলাম। সকালে আহার করিয়া সকলে চলিল। পথ চলিতে চলিতে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। বেলা দুই প্রহরের সময় সকলের জলযোগের ব্যবস্থা হইল। কয়েক ধামা চিড়ামুড়ী এবং চিনি সন্দেশ বাহা লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে কাহারো ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না। সকলে সন্ধ্যার প্রাকালে নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। নদী পার হইবার জন্য পাটনী যে বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহা এতগুলি লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইল না। সুতরাং পার হইতে বহু বিলম্ব হইল। সকলে যখন আমরা পার হইলাম, তখন রাত্রি প্রায়

ছয় দণ্ড। নদীর ঘাট হইতে কন্যাকর্ত্তার বাটী প্রায় তিন মাইল দূরে। বিবাহের গ্রামে পৌঁছিতে প্রায় দেড় প্রহর রাত্রি হইল।

কন্যাকর্ত্তার বাড়ী হইতে যে লোক আমাদের পথদর্শকরূপে আসিয়াছিল, তাহারা আমাদিগকে আসল পথ দিয়া না লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, নানা বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া লইয়া চলিল। কাদা ও জল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আছাড় পড়িয়া অনেকের বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল, কাঁটাতে গা আঁচড়াইয়া গেল, রাত্রি অন্ধকার। একেত ক্ষুধার কষ্ট, তাহাতে পথশ্রান্তি, তদুপরি গ্রাম্য লোকের অত্যাচার আরম্ভ হইল। গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে চারিদিক হইতে ঢিল, গোহাড় প্রভৃতি অজস্র আমাদিগের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। গ্রাম্য লোকের অভ্যর্থনার চোটে জর্জ্জরিত হইয়া বরযাত্রীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কোথায় বা লাঠিয়ালগণ, কোথায় বা বরপাত্রের পাল্কী, কোথায় মশালচী—প্রাণের আশঙ্কায় যাহার যেদিকে ইচ্ছা দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। কাহারো মাথা ফাটিয়াছে, কাহারো গাত্র জখম হইয়াছে, কাহারো বস্ত্রাদি কাঁটায় ছিড়িয়া গিয়াছে, এক হাহাকার রব উঠিল। যেন এক ভূতানন্দী কারখানা উপস্থিত হইল। বিবাহের বরযাত্রী হওয়ার সাধ মিটিল, প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও বিবাহের বরযাত্রী হইব না।

সঙ্গে চারিখানা পাল্কী ছিল, তাহার একখানারও খোঁজ নাই। পথদর্শক-গণ গা ঢাকা দিয়াছে। আমরা সকলে ডাকাডাকি করিয়া গ্রাম হইতে কিছু দূরে মাঠের মধ্যে সমবেত হইলাম। যে যেখানে ছিল, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। পাল্কী চারিখানার মধ্যে তিনখানা দেখা গেল। বরপাত্রের পিতা যে পাল্কীতে ছিলেন, সেই পাল্কীর উপর গ্রাম্যলোকে লাঠির প্রহার করিলে তিনি ভয়ে "দুর্গা, দুর্গা, ত্রাহি মধুসূদন" করিতে লাগিলেন। গুরুদেব যে পাল্কীতে ছিলেন, তাহারও কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। সকলে চিন্তিত হইলাম। আতশবাজী সঙ্গে কতকগুলি ছিল, তাহা গ্রাম্যলোকে জুটিয়া কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা কন্যাকর্ত্তার নাম ধরিয়া কত ডাকিলাম; কিন্তু তাঁহাদের কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। পথদর্শক সঙ্গে নাই বাড়ী চিনি না। তাহাতে অনাহার পথশ্রান্তি ও গ্রাম্যলোকের ধনঞ্জয়ে সকল অবসন্ন হইয়া পড়িল।

আমাদিগের যে এত বিড়ম্বনা, সে কিন্তু কার্য্যকর্ত্তার বাড়ীর নিকটেই, অথচ লোকগুলি এমনই পাজী যে, আড়ালে থাকিয়া আমাদের দুর্দ্দশা রূপ তামাশা

দেখিতেছে। অবশেষে ভদ্র নামধারী এক ব্যক্তি কন্যাকর্ত্তার পক্ষ হইতে আসিয়া নানা সৌজন্যতা জানাইলেন এবং বলিলেন যে "মহাশয়দের বড়ই কষ্ট হইয়াছে, গ্রামের দুষ্টছেলে গুলি জুটিয়া আপনাদের এমন যে দুরবস্থা করিয়াছে, তাহাতে আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। ক্ষমা করুন এবং আমার সঙ্গে চলুন, এই যে বিয়ে বাড়ী।" আমাদের অন্য উপায় থাকিলে আর বিয়ে বাড়ী যাইতাম না, শূন্য মাঠে অনাহারে পড়িয়া থাকা অবিধেয়—অগত্যা এই কপট ভদ্র লোকের সঙ্গে চলিলাম। বিয়ে বাড়ী উপস্থিত হইলাম।

কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখি যে মড়া কান্না উপস্থিত হইয়াছে। কন্যার মা, মাসী, পিসী, সকলে মিলিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অনুসন্ধানে কারণ জানিতে বিলম্ব হইল না। আমাদের গুরু ঠাকুরের পাল্কীর বেহারাগণ প্রহারের চোট এড়াইবার জন্য চালাকী করিয়া বলিয়াছিল যে "আমাদিগকে মারিও না, এ পাল্কীতে বরপাত্র আছেন।" সুতরাং বরপাত্রের পাল্কী মনে করিয়া সর্ব্ব প্রথমে পদদর্শক ঐ পাল্কী খানা কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে উপস্থিত করিয়া রাষ্ট্র করিল যে "বরপাত্রের পাল্কী আসিয়াছে।" এবং এই কারণ বশতঃ কন্যাকর্ত্তার পক্ষ হইতে আমাদিগর রক্ষার তত গরজ ছিল না।

গুরু ঠাকুরের পাল্কী খানা বিয়ে বাড়ী উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকগণ কৌতুহল পরবশ হইয়া জামাই দেখিবার জন্য আসিয়া একে একে পাল্কীর দরজা খুলিয়া জামাই দেখিয়া যান, কিন্তু কেহ কিছু বলেন না। অপরে জিজ্ঞাসা করিল বলেন যে "বেশ জামাই, কার্ত্তিকের মত পুরুষ।" এই মত কয়েক জণে জামাই দেখার পর পরস্পর কানা কানি হইতে লাগিল। জামাইয়ের সংবাদ কন্যার মার কাণে পৌছিল। তাঁহারা পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক পক্ককেশ, লোলচর্ম্ম, মুণ্ডিত-মস্তক বিশিষ্ট, আর্ক-ফলাযুক্ত গলায় রুদ্রাক্ষের মালা-পরিহিত জামায়ের কথা শুনিয়া রোল-কান্না সুরু করিয়া দিয়াছেন। একথা শুনিয়া কন্যার পিতাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। শুনা গেল, কন্যা স্বয়ংও নাকি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। এদিকে গুরু ঠাকুর কিন্তু পাল্কীর ভিতর হইতে বলিতেছেন, "আরে তোমরা বৃথা কাঁদ কেন, আমি জামাই নই, আমি গুরু ঠাকুর।" কিন্তু তাঁহার কথা কেহ কি বিশ্বাস করে?

এ বিধাতার শাস্তি বিধান! গ্রামবাসীগণ যেমন চালাক, তাহার

প্রতিফল একটু হইল। আমরা সকলে উপস্থিত হইলে জামাইয়ের পাল্কী লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইল। প্রকৃত জামাই আবিষ্কৃত হইলে কন্যাকর্ত্তার অন্দর মহলে শান্তি স্থাপিত হইল।

আমরা বাসা বাড়ীতে পৌছিলাম, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলাম, কেহবা স্নান করিতে বাধ্য হইলেন, কেহ কেহ হাতে মাথায় বা পায়ে পটি বাঁধিলেন। গ্রামের লোকের বদমাইসীর জন্য প্রথম রাত্রির বিবাহের লগ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। আর এক লগ্ন রাত্রি এক প্রহর থাকিতে। বাজে লোকে সিধা লইয়া পাক করিয়া খাইল, ভদ্র লোকেরা সামান্য রকমের একটু জল খাইবার পাইল। তাহাই খাইয়া সকলে শুইয়া পড়িয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ঢিলের যন্ত্রণা অনেক লাঘব করিলেন।

রাত্রি এক প্রহর থাকিতে বিবাহের মজলিষে যাইবার জন্য হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শারীরিক গ্লানিবশতঃ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও মজলিষে যাইতে বাধ্য হইলাম। ফরাসের সম্মুখে লাইন বাঁধিয়া আমাদিগকে বসাইবার আয়োজন হইল। বরযাত্রীর পশ্চাতে গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ বসিলেন। আমাদের ঠিক পশ্চাতেই গ্রামের এক দল বালক সারি বাঁধিয়া বসিয়া গেল। এদিকে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল, অপর দিকে আমাদের পাছাতে যেন কুটুর কুটুর করিয়া চিমটি কাটার মত যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। পশ্চাতে ফিরিয়াও ধরিতে পারি না কে চিমটি কাটে, বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাহারা চটিয়া লাল হয়। আমরা এই চিমটী কাটার যন্ত্রণায় টিকিতে না পারিয়া সকলে গোলমাল করিয়া দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম যে "আর এ বেটার অভদ্র গ্রামে এক মুহূর্ত্ত থাকা নয়। উঠ, বরপাত্রকে পিঁড়ির উপর হইতে তোল। চল স্থানান্তরে গিয়া রাত্রি টুকু থাকা যাউক, প্রাতকালে বাড়ী চলিয়া যাইব।" আমরা এই প্রকার চটিয়া উঠিলে, এক বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। আমাদের সমস্ত লোক জন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল! লাঠিয়ালগণ কোমর বাঁধিয়া সড়কী, লাঠী, ঢাল ইত্যাদি লইয়া আস্ফালন আরম্ভ করিল। আমাদিগের পিছনের বদমাইস ছেলে, বুড়গুল ভয়েতে পালাইল। আমরা ছেলে বিয়ে দিব না বলিয়া জোর করিয়া বরপাত্রকে তুলিয়া বাসা বাড়ী লইয়া চলিলাম। গ্রামের লোকগুলি আপাতত আমাদিগের তেজ দেখিয়া ভয়ে জড় সড় হইল। কিন্তু অবিলম্বে গ্রামের চতুঃপার্শ্ব হইতে মুসলমান, নমশূদ্র প্রভৃতি বহু লোক আসিয়া জমিতে লাগিল। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে জোর করিয়া ছেলে লইয়া গিয়া বিবাহ দিবে।

আমাদিগের লাঠিয়ালগণ বরপাত্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল যে, "যে নিকটে আসিবে, তাহাকে খুন করিব।" দুই পক্ষে এক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন হইল। উভয়পক্ষে দাঙ্গা আরম্ভ হয়, এমন সময়ে, গ্রামের একজন প্রবীণ বৃদ্ধ আসিয়া মাঝখানে পড়িলেন। তিনি নিজ গ্রামের লোক সকল হটাইয়া দিয়া যোড়হাতে মাপ চাহিলেন, এবং বলিলেন যে, "আমাদের গ্রামের ছেলে পিলেরা আপনাদের সঙ্গে বড়ই অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, ক্ষমা করুন।" তিনি এই বলিয়া বরপাত্রের পিতার হাত চাপিয়া ধরিলেন। এই বৃদ্ধের অনুরোধে সকলের ক্রোধের কতকটা শান্তি হইল। বরপাত্রকে পুনরায় পিড়ীর উপর লইয়া যাওয়া হইল। বরপাত্র পিড়ীর উপর দাঁড়াইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আবার কোলাহল উপস্থিত হইল। "আন্ জল, আন্ তেল, আন্ পাখা" বলিয়া সোর পড়িল। কেহ তাঁহার মাথায় ফুঁ, কেহ কাণে ফুঁদিতে লাগিলেন, কেহ তেল জল মাথায় ঠাসিতে লাগিলেন। অবশেষে বরপাত্রের চৈতন্য হইল।

বরপাত্র একেত ছেলেমানুষ, তাহাতে সমস্ত দিন রাত উপবাসী, ইহার উপর গ্রাম্য লোকের ও বরযাত্রীগণের এই "কুরুক্ষেত্র কাণ্ড" দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সুস্থ হইলে তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পিড়ীর উপর বসাইয়া বিবাহের মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কন্যাদান করা হইল এবং নানাবিধ স্ত্রী-আচার দ্বারা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে তাঁহার জন্য কিছু দুগ্ধ ও সরবতের ব্যবস্থা হইল।

বর ও কন্যা বাসরঘরে নীত হইলেন। এখানে আসিয়া সস্ত্রীক বর মহাশয় যুবতীগণ রচিত-ব্যূহমধ্যে আবদ্ধ হইলেন। এত কষ্টের পর যে তাঁহার বিবাহ হইল, এখনও তাঁহাব নিস্তার নাই। শ্যালী ও শ্যালকপত্নীগণের বিদ্রূপ-বাণ তাঁহার উপর অনবরত বর্ষিত হইতে লাগিল। নূতন জামাই তেজিয়ান ও বয়স্থ হইলেও, এ ব্যূহমধ্যে তাঁহার নিস্তার নাই। আত্মরক্ষার্থ সহিষ্ণুতারূপ বর্ম্ম ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এ ব্যূহের কাপ্তানের হাতে তিনি বন্দীস্বরূপ, কাপ্তান তাঁহাকে যাহা বলিবেন, তাঁহাকে তাহাই পালন করিতে হইবে।

একজন কন্যার পা জোকা দুইখানা কলার খোলা তাঁহার দুই গালে স্পর্শ করাইলেন, অমনি হাসির রোল পড়িয়া গেল। ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে কন্যার পায়ের জুতাদ্বারা তাঁহার মুখে প্রহার করা হইল। পরে "ঢাকন

ঢোকন ও জুয়া" খেলা আরম্ভ হইল। কলিকাতা অঞ্চলে এ রীতি আছে কিনা, জানি না। কিন্তু আমার বাড়ী যে জেলায়, তথায় ও তন্নিকটবর্ত্তী কোন কোন জায়গায়, ইহাকে এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। পাঠক পাঠিকাগণ যদি বিবাহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিবাহের সময় যতগুলি স্ত্রীআচার ও নানা খুঁটী নাটী দেশাচাব পালন করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিবেন। আর তাঁহারা যদি অবিবাহিত হন, তাহা হইলে কোন ভুক্তভোগীর নিকট শুনিয়া লইবেন। কারণ একটী বিবাহের সমস্ত কার্য্যের বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। একারণ সংক্ষেপ মাত্র বাসরঘরের দুই চারিটী কথার পরিচয় দিব।

বাসরঘরের শীতল পাটীর উপর বরকন্যা আসন গ্রহণ করিলে বরের মাথার মুকুট হইতে একখণ্ড এবং কন্যার কপালি হইতে একখণ্ড সোলা লইয়া সোহাগ-জলের হাঁড়ির মধ্যে ভাসাইয়া দিয়া কন্যার হাত দ্বারা উক্ত জলের হাঁড়িটী একখানি ঢাকন দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। বর উক্ত ঢাকনখানা তুলিয়া নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় কন্যার হাত দ্বারা ঐ ঢাকন বা সরাখানি হাঁড়ির উপর রাখিয়া দেওয়া লইল। বব আবার উহা নামাইয়া রাখিলেন। এই মত ঢাকা ঢাকির সাত বারের পর একটী যুবতী কন্যার হাত দ্বারা জামা-ইয়ের হাত খাঁ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন যে "বল কুমুদিনীর যখনকার যে অপরাধ, তাহা মাপ করিব।" বর এ অন্যায় অসীম অঙ্গীকার করিতে নারজ হইয়া হাত ছাড়াইবার জন্য মৃদু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এস্থলে জোর প্রকাশ করা অবৈধ বিধায় তিনি অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন যে "আচ্ছা মাপ করিব।" তখন তাঁহার হাতের "হ্যাণ্ডকাপ" মুক্ত হইল।

পরে নয়কড়া কড়ি দ্বারা বরকন্যার জুয়া খেলা আরম্ভ হইল। এই প্রকার খেলিতে খেলিতে একজন যুবতী কন্যার হাত দ্বারা বরের হাত খানা আবার ধরিয়া ফেলিলেন। কাপ্তানের আদেশে নূতন জামাইকে নবপত্নীর ভবিষ্যৎ অপরাধের ক্ষমার জন্য পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিতে হইল।

অতঃপর দুইটী পান দুই হাতে লইয়া যুবতী বরকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন যে "এ কি?" বরের যদি পূর্ব্বে জানা থাকে, তবে তিনি বলিবেন "তাম্বুল"। কিন্তু আমাদিগের বরের সে জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল না, সুতরাং তিনি সোজাসোজী বলিয়া বসিলেন যে, "পান", তখন উক্ত যুবতী বলিলেন যে,

"কুমুদিনী তোমার প্রাণ।" তাহার পর একটী কৃত্রিম আম দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল "এ কি?" বর সরল লোক কহিলেন যে, 'আম।' তখন কাপ্তান কহিলেন যে, "তুমি কুমুদিনীর গোলাম।" তাহার পর কিঞ্চিৎ পৃষ্ঠক আনিয়া বরকে দেখান হইল এবং পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করা হইল। বর কহিলেন 'পিঠে।' তখন কাপ্তান কহিলেন যে, "আজ হইতে তুমি কুমুদিনীর হাতের মুঠে।" আর সকলে জামাইকে সরল বেয়াকুব মনে করিয়া হাসিয়া বাসরঘর আমোদে পূর্ণ করিয়া তুলিল। এই মতে নব পরিণয়ে যে সকল সন্ধির প্রস্তাব হইল, একে একে তাহার সমস্ত সর্ত্তগুলি হাঁসিল করিয়া, তাহার পর কাপ্তেনের হুকুমে, প্রেমযুদ্ধের রমণী-ব্যূহ ভঙ্গ হইল। আমাদের বরপাত্র হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের পর বরযাত্রীগণের জলপানের আয়োজন হইল। গ্রামের লোক গুলি বদমাইস হইলেও আহারের আয়োজনটা ভালমতই করিয়াছিল। ফলার সাঙ্গ হইতে না হইতেই প্রভাতের কাক ডাকিয়া উঠিল, মুসলমান পাড়ায় কুক্কুটগণ কু-ক্কুঃ-কু উঃ রব করিয়া ডাকিয়া উঠিল; ফেঁচপাখী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিয়া উড়িয়া কুলা ছাড়িয়া বাহির হইল। পূর্ব্বাকাশ ফরসা হইল। প্রাচীনগণ "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু আমাদের মত পেটুক যাঁহারা, তাঁহারা উদর পূর্ণ না করিয়া কিছুতেই পাত্র ত্যাগ করিলেন না। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া সকলে বাসাবাড়ী গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

বেলা দেড় প্রহরের সময় প্রশ্ন উঠিল যে,ঘরে কে কে আহার করিবেন? আমরা সকলেই একজোট হইয়া বলিলাম যে "এ বেটার ভাত আর খাওয়া হইবে না, অন্ততঃ টাকা না পাইলে অথবা মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে আমরা কিছুতেই ইহার ভাত খাইব না।" সঙ্গের কুলীনগণের প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ টাকা এবং শ্রোত্রিয়-গণের তিন টাকা হিসাবে দিতে হইবে। এই রেট লইয়া নানা স্থানে নানা বৈ-ঠকে নানা প্রকার আলোচনা হইতে লাগিল। গত রাত্রির ঢিল ও গোহাড়ের কথা, পাছায় চিমটী কাটার কথাও উঠিল। এই সকল কথা লইয়া পক্ষ বিপক্ষ প্রায় ঘণ্টা দুই বাকবিতণ্ডা করিয়া কুলীনদিগকে তিন টাকা এবং শ্রোত্রিয়গণকে দুই টাকা করিয়া দিতে রাজী হইলেন। সকলের মত জিজ্ঞাসা করা হইল, কেহ রাজী হইলেন এবং কেহ বা গররাজী হইলেন। আমি বলিলাম "রাজী হওয়াই ভাল, মান থাকিতে স্বীকৃত হওয়া কর্ত্তব্য, কেন না লোকগুলি যেমন সয়তান, যদি রাগ করিয়া চা'ল ডা'ল আনিয়া দেয়, তাহা হইলে এই দুই প্রহর

বেলায় আবার আমাদিগের হাঁড়ি ঠেলিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা তৈয়ার ভাত খাওয়া এবং কিছু টাকা পাওয়া কি ভাল নয়?" আমার কথায় সকলেই বলিলেন, "যে কথাটা মিথ্যা নয়।" সকলে সম্মত হইলেন। বেলা প্রায় চারিদণ্ড থাকিতে ভোজনের ডাক পড়িল। আহার করিতে করিতে সন্ধ্যাবাতি জ্বলিয়া উঠিল। যাঁহারা সায়ং সন্ধ্যা করেন, তাঁহারা সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। আমরা, কতকগুলি ছেলে, সেই প্রাতঃকালের মত আহার সমাপ্ত না করিয়া আর উঠিলাম না।

এই নিমন্ত্রণের মজলিশে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। জানিলাম, তিনি দিনাজপুরে চাকুরি করেন। আগামী কল্য তিনি বাটী হইতে সপরিবারে যাত্রা করিবেন। তিনি মহা অসুবিধায় পড়িয়াছেন। একটী ব্রাহ্মণের ছেলের তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে পীড়িত হওয়ায় তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিল না। তিনিও আর অপেক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহার মনিবের একটী বড় মোকর্দ্দমার নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে সহরে হাজির হইতে হইবে।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশি।"

আমার সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবনা ছিল যে, কি উপায়ে পালাইব। এই এক মহা সুযোগ ঘটিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, "মহাশয়! যদি দয়া করিয়া আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি যাইতে সম্মত আছি।"

বাবু। তুমি দিনাজপুর গিয়া কি করিবে?

আমি। তথায় গিয়া কিছু লেখাপড়া শিক্ষার চেষ্টা করিব।

বাবু। কতদূর লেখা পড়া করিয়াছ?

আমি। মাইনর পরীক্ষা পাশ করিয়া বসিয়া আছি।

বাবু। আচ্ছা আমার সঙ্গে যাইতে পার।

আমি। আজ্ঞা হাঁ আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।

আমি গোপনে বলিলাম, আমি যে আপনার সঙ্গে যাইব, সে কথা অন্য কাহাকেও বলিবেন না, তাহা হইলে আমার গ্রামের লোকে আমাকে যাইতে দিবে না। আমি না গেলে তাঁহারও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় বিধায় তিনিও "আচ্ছা তাই হবে, কাহাকেও বলিব না" বলিয়া সম্মতি দিলেন। আর বলিলেন যে "তুমি বরং অদ্য রাত্রিতে আমার বাড়ীতে গিয়া শয়ন করিবে। আমরা অন্ধকার থাকিতে নৌকায় গিয়া উঠিব।" আমিও তাঁহার

বাড়ীটীর সন্ধান লইয়া তথাস্তু বলিয়া বাসাবাড়ীতে ফিরিলাম। রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে আস্তে আস্তে উঠিয়া অন্ধকারের মধ্যে সরিয়া পড়িলাম।

অষ্ঠম অধ্যায়।

পলায়ন ও দিনাজপুর যাত্রা।

অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে বাবু তদীয় পরিবার সহ নৌকায় আরোহণ করিলেন, আমরা সকলে ঠিকঠাক্ হইয়া বসিলাম। ছইয়ের মধ্যে একখানা পরদার দ্বারা বাবু-গৃহিণীর জন্য একটী অন্দরমহলের সৃষ্টি হইল। নৌকা আমাদিগকে লইয়া স্রোতের বেগে নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে তাল ঠুকিতে ঠুকিতে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইল।

বাবু। ওহে, ছোকরা, তোমার নাম কি ?

আমি। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাবু। তোমার আছে কে কে ?

আমি। আজ্ঞে আমার প্রায় সকলেই আছেন, মা, বাপ, ভাই, খুড়া, সকলেই বর্ত্তমান।

বাবু। তবে তুমি তাঁহাদিগের বিনা অনুমতিতে আমার সঙ্গে যাইতেছ কেন ?

আমি। আজ্ঞে, এক বিপদে পড়িয়া যাইতেছি।

বাবু। কি বিপদ ? কোন মোকদ্দমা মামলায় ত পড়নি ?

আমি। আজ্ঞে, সে ভাবনা নাই, আমার বিপদ অন্য রকম।

বাবু। কি সে বলনা ?

আমি। আজ্ঞা, মাপ করিবেন, আমি তাহা বলিতে পারিব না।

বাবু। তবে নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ঘটনা হইবে, তাই বোধ করি বলিতে সাহস পাচ্চ না।

আমি। আজ্ঞে, গুরুতর ঘটনা এমন কিছুই নয়, তবে কি না—

বাবু। 'তবে কি না" কথাটা বুঝিলাম না। তুমি কথাটা খুলিয়া না বলিলে আমি সুদ্ধ বিপদে পড়িব। তুমি তাহা না বলিলে আমি তোমাকে সঙ্গে

লইতে পারি না। যদি না বল তবে আমি বাধ্য হইয়া তোমাকে এই পাড়ে নামাইয়া দিয়া যাইব।

আমিও বিপদে পড়িলাম; কিন্তু ঠিক কথা না বলিলে এখনই এই পাড়ে আমাকে নামাইয়া দিবেন।

আমি। আজ্ঞে, আমার আর বিপদ কিছুই না, তবে পিতামাতা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের সম্বন্ধে স্থিব করিয়া পত্রাদি করিয়াছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। তাঁহারাও জোর করিয়া আমাকে বিবাহ দিবেন, সেই বিপদে পড়িয়া আমি পালাইতেছি।

বাবু। আমি বাঁচলাম, এই বিপদ! মনে করিয়াছিলাম বুঝিবা কোন চুরি টুরি মামলায় পড়িয়া ভয়ে পালাইতেছ। তা, এ আর বিপদ কি? তুমি ইহাকে বিপদ বল, আমিত ইহাকে সৌভাগ্য মনে করি। বিবাহের পত্রাপত্র যখন স্থির হইয়াছে, তখন তোমার এই প্রকার পালাইয়া যাওয়াটা অন্যায় হইল। তোমার পিতা মাতার মনে কষ্ট হইবে, তাহা বাদে যে কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহের পত্রাপত্র ঠিক হইল, সেই মেয়ে অন্য পাত্রে বিবাহ দেওয়াটা হিন্দুশাস্ত্রে অবৈধ। তোমার বিবাহটা করার আপত্তি কি?

আমি। আজ্ঞে, আপত্তি এই যে আমি লেখাপড়া শিখিলাম না। সংসারের অবস্থাও তত ভাল নহে। বয়সও অল্প। এ অবস্থায় বিয়ে করাটা আমি বিপদ মনে করি। কারণ এখন বিয়ে করিলে আমার পরকাল নষ্ট হইবে। লেখাপড়া আর শিক্ষা হইবে না, কেন না বিয়ের খরচে সংসারে আরো দেনা হইয়া পড়িবে, পড়ার খরচ চলিবে না। নিজের অসচ্ছল অবস্থার উপর আর একজনকে আনিয়া সেই দুঃখের ভাগী করাটা সঙ্গত মনে করি না, স্ত্রী বড় হইলে যখন ভাল খাওয়া, ভাল পরা এবং গহনার জন্য আবদার করিবে এবং তাহা না পাইলে যখন নানা গঞ্জনা দিবে, তখন দেখুন দেখি, কেমন বিপদ! বউ দুরান্ত ও দুর্ম্মুখ হইলে ত কষ্টের সীমা থাকিবে না। সর্ব্বদাই গৃহে অশান্তি বিরাজ করিবে। সে যখন বলিবে যে, "এমন পোড়া মুখোর হাতে পড়ে চিরকাল দুঃখেই গেল", বলুন দেখি তখন মনটায় কি বলিবে?" এই কথা বলিয়া আমি লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইয়া রহিলাম।

বাবু-জায়া আমার কথাটা শুনিয়া পরদার আড়াল হইতে মুখখানির কতক বাহির করিয়া হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বাবু। তোমার কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি দেখিতে ছেলে মানুষ, কিন্তু বুদ্ধিতে বুড়র দাদা। তোমার পেটে যে এত বুদ্ধি, তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই। তা বেশ করেছ, কিন্তু তোমার পিতা টের পাইলে আমাকে অনুযোগ দিবেন যে, তাঁহার ছেলে আমি ফোঁসলাইয়া লইয়া আসিয়াছি। তাহার কি?

আমি। সে জন্য আপনার কোন ভাবনা নাই। আমি নিজেই স্বীকার করিব, যে আপন ইচ্ছায় আসিয়াছি।

বাবু। তুমি ভাল বামুন ত? কোন অপর জাতিব ব্রাহ্মণ ত নয়?

আমি। আজ্ঞে, তাহ'লে কি আপনাদের সঙ্গে এক মজলিশে আহার করিতে পারি?

বাবু। ও! ঠিক কথা, আমিই আহম্মকের মত এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তুমি কিছু মনে করিও না। আমার জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, ভাল বংশের ব্রাহ্মণ কি না, অর্থাৎ কুলকার্য্যাদি আছে কি না।

আমি। আমরা ভাল বংশের লোক, আমাদের কুলকার্য্য পূর্ব্বে ছিল। আমাদের অবস্থা খারাপ হওয়ায় এখন আর কুলকার্য্য করিতে পারেন না। তবে আমাদিগের জ্ঞাতিদিগের এখনও কুলকার্য্য আছে।

বাবু। বেশ। রাঁন্ধে পার ত? যে জন্য সঙ্গে করিয়া আনিলাম, তাহা জিজ্ঞাসা করা দরকার।

আমি। আজ্ঞে, বামুনের ছেলে, তা রাঁন্ধে আর পারিনে, তবে আমরা রাঁধুনী বামনের জাত নহে, সে ব্যবসায়ে পরিপক্ক নহি। দেখাইয়া শুনাইয়া দিলে কোন মতে কাজ চালাইয়া লইতে পারিব, এমন ভরসা করি।

বাবু। আচ্ছা বল দেখি মটরের ডাইল কেমন করিয়া রাঁধে?

আমি। সে আর কঠিন কি? প্রথমতঃ ডাইল ধুইয়া জল দিয়া হাঁড়িতে চড়াইবে। তাহাতে একটু হলুদ ও নূন দিবে। ডাইলে উতল আসিলে ফেনা কাটিয়া ফেলিয়া, দুই একটা কাঁচা লঙ্কা ভাঙ্গিয়া তাহাতে দিবে। কোন মসলার গুঁড় থাকিলে তাহাও একটু দিতে পারা যায়। কিছুকাল পরে ডাইল ঘুঁটিয়া সন্তার দিলেই মটরের ডাইল পাক হইল।

বাবু। তবেই মাটী করেছ। আরে উতলবার কিছু পরেই কি ডালে কাঠি দিতে হয়? প্রথমতঃ একটা ডা'ল তুলিয়া দেখিবে, যে ভাল মত ডা'ল গুলি

গলিয়াছে কিনা। আফুট ডা'লে কাঠি দিলে যে সে ডাল আর গলিবে না, আর তাহা খাইতেও আস্বাদ পাওয়া যাইবে না। বুঝ্‌লে কিনা?

আমি। আজ্ঞে, এখন বুঝ্‌লাম। এখন জানিয়া লইলাম, আর ভুলিব না।

বাবু। আচ্ছা, বলত পায়েশ রাঁধে কি করিয়া? কেননা, আমার ছেলে পায়েশ বড় ভালবাসে।

আমি। আজ্ঞে, কড়াতে দুধ ঢালিয়া উনানের উপর চড়াইব এবং তাহাতে অল্প কিছু চাউল দিব। কিছুকাল জাল দিয়া তাহাতে চিনি বা গুড় দিয়া ঘুঁটিয়া নামাইলেই পায়েশ প্রস্তুত হইল।

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে পরদার আড়াল হইতে পর্য্যন্ত হাঁসির তরঙ্গ উঠিল। আমিও কিছু বেয়াকুব হইলাম। কোথায় ভুল করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

বাবু। (হাঁসিয়া) এও দেখি তোমার ডা'ল রাঁধার মত হইল। আরে দুধ চড়াইয়া, তাহাতে চা'ল দিবার কিছুকাল পরেই কি মিষ্টি দিতে হয়? তাহা হইলে যে চা'ল আর গলিবে না। দুধের সঙ্গে চা'ল জাল দিতে দিতে দেখিবে যে, চাউলগুলি বেশ গলেছে, তখন মিষ্টি দিতে হয়। তাহা না হইলে পায়েশ আর ভাল হয় না। পায়েশ রাঁধিতে আর একটু সাবধান হওয়া দরকার। চুলার আঁচ অধিক হইলে নীচে দুধ যদি ধরিয়া যায়,তাহা হইলে পায়েশে পোড়া পোড়া গন্ধ হইবে, তাহা একেবারে অখাদ্য হইবে। সেই জন্য কাঠি বা হাতা দ্বারা সর্ব্বদা ঘুঁটিতে হইবে যেন নীচে না ধরিতে পারে, বুঝলে কিনা?

আমি। আজ্ঞে, এখন বেশ বুঝলাম। আর ভুলিব না। মনে মনে বলি, হা পরমেশ্বর! এমন ভাবে চা'ল ডা'ল গলানের কার্য্য কি করিয়া সম্পন্ন করিব।

পাক্ শাস্ত্রের দুইটী প্রশ্ন, দুই প্রশ্নেই ডাহা ফেল হইলাম। মনে মনে ভয় হইল, বাবু বুঝি আমাকে অকর্ম্মণ্য মনে ক'রে তাড়াইয়া দেন।

দিনের বেলায় নৌকায় আমরা লুচি, চিড়ে, দই প্রভৃতি খাইয়া রহিলাম। সন্ধ্যার প্রাকালে এক বন্দরের নিকট আমাদিগের নৌকা লাগান হইল। তথায় নদীর ধারে বালীর চরে পাকের বন্দোবস্ত করিতে হইল। ভিজা মাটীতে চুলা, কাঁচা কাঠের সাহায্যে পাক করিতে প্রাণান্ত হইল, ধুঁয়ায় চক্ষু অন্ধবৎ হইল, এবং চুলায় ফুঁ দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। অতি কষ্টে ইলিশ মাছের ঝোল ও ভাত রান্না করিলাম। ভাতগুলি চেলে চেলে রহিল এবং মাছের

ব্যঞ্জনে অতিরিক্ত ঝাল ও নূন পড়ায় তাহা এক প্রকার অখাদ্য হইয়াছিল। কিন্তু বাবু ও বাবুপত্নী তজ্জন্য আমাকে মাপ করিলেন। কেবল বলিলেন যে, ঝাল আর নূনটা কিছু কম ব্যবহার করিও এবং ভাত যেন ভাল সিদ্ধ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিও। এই মিষ্ট ভর্ৎসনায় আমি লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। আমার সঙ্গে বিছানাদি কিছুই ছিল না। মাত্র একখানি অতিরিক্ত কাপড় এবং একখানি গামছা ছিল। বাবু দয়া করিয়া একখানি সতরঞ্চ, একখানি বিছানার চাদর, একটী বালিশ এবং একখানি লেপ আমাকে দিলেন। চক্ষুর জ্বালায় ও শিরঃপীড়ায় রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না।

বাবুর ও বাবুপত্নীর কথা।

বাবুর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর হইবে। দেখিতে মধ্যমাকার, গৌরবর্ণ এবং সুগঠিত অঙ্গ-বিশিষ্ট। প্রশস্ত ললাট, চক্ষুদ্বয় বৃহৎ, তাহাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রূ যুগল কৃষ্ণবর্ণ ও বক্র। পাতলা এক জোড়া গোঁপ মুখে ধারণ করিয়া থাকেন। মাথার কেশগুলি কোঁকড়ান ও যত্নে রক্ষিত, পরিধানে একখানি পাতলা শান্তিপুরে ধুতি। গায়ে একটী জামা। দেখিলেই বোধ হয় যে লোকটী বেশ সুখী ও সৌখীন। তাঁহার চক্ষুর জ্যোতিতে যেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন দুষ্ট দুষ্ট ভাবও প্রকাশ পায়। তাঁহার নামটী বলিব না। উপাধি রায়। ইনি দিনাজপুর সহরে বাস করেন। বর্দ্ধমানের কোন জমিদারের সদর নায়েবী এবং আমমোক্তারী কার্য্য করেন।

বাবু-জায়াও মধ্যকায় ও কৃশাঙ্গী। শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তাঁহার সৌন্দর্য্যের যথাযথ বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, কেননা আমি কবি নহি। কল্পনা আমাকে সাহায্য করিতে বিমুখ। তবে সৌন্দর্য্য-বর্ণনা কোন কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে যাহা যাহা পড়িয়াছি, তাহার আভাস মাত্র দিতে পারি—যথা "তিল ফুল নাসিকা, মৃগনয়নী, মরালবিনিন্দিত-গতি, পদ নখে কোটী কোটী চন্দ্রের উদয়" ইত্যাদি। তাঁহার চক্ষু দুইটী চেরা পটলের মত, বাস্তবিকই যেন হরিণীর চক্ষু দুইটীর ন্যায়। সেই চক্ষুদ্বয় হইতে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তাহা সাম্য ও ধীরতা ব্যঞ্জক, তাহাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিল ফুলের সঙ্গে তাঁহার নাকের তুলনা করিতে আমি নারাজ। কারণ কবির নাকের বর্ণনায় তিল ফুলের সঙ্গে নাসিকার তুলনা পড়িয়া অনেক বার অনেকের সর্ব্বজন প্রশংসিত নাকের সঙ্গে তিল ফুল লইয়া

মিলাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাই নাই। সেই জন্য তিল ফুলের সঙ্গে নাকের তুলনা কখনও করি না। তবে হ'তে পারে, কাহারও কাহারও মতে ঐ তুলনা খাটিতে পারে, কিন্তু নিজের যাহা মনঃপুত হয় না, তাহা কি অন্যের খাতিরে বলিব বা লিখিব? তবে বাবু-জায়ার নাকটী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাহা সুগঠিত, উন্নত এবং সুন্দর। তাঁহার ভ্রূ-যুগল ধনুকের ন্যায় বাঁকা, ও ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ দ্বারা রচিত। ললাট নাতি-প্রশস্ত, নাতি-সংকীর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় পাতলা ও গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত। কিন্তু ঠোঁট পাতলা বলিয়া কেহ মনে না করেন যে ইঁনি বড় ঝগড়াটে, সে লক্ষণ ইঁহাতে আদবেই দেখিতে পাইতেছি না। গণ্ডদ্বয় পরিপুষ্ট। একটু উত্তেজিত হইলে গণ্ডদেশ গোলাপী বর্ণ ধারণ করে। ভ্রূ যুগলের মধ্য স্থানে ক্ষুদ্র একটী রাখাল ফোটা থাকায় মুখের সৌন্দর্য্য যেন আরো বৃদ্ধি করিয়াছে। কোমর সরু, নিতম্বদেশ উন্নত ও সুগঠিত। ফলতঃ তাঁহার অঙ্গের গঠনের সঙ্গে ষ্টেজ পরা একটা সুন্দরী মেমের অঙ্গের গঠনের বেশ সুসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। "বেণিনীর সঙ্গে ফণিনীর" তুলনা করিতে পারিলাম না, কেন না, তাঁহার মাথার বেণী কখনও দেখি নাই। তবে মাথার কেশ দাম ছাড়িয়া দিলে তাহা যে হাঁটু পর্য্যন্ত পড়ে, তাহা দেখিয়াছি। সেই কেশ গুচ্ছ ঢেউ তোলা এবং অতি যত্নে রক্ষিত। "যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধরের" তুলনা করা ঘটিল না, কেননা তাঁহার বয়স এখন ছাব্বিস বৎসর, দশ বৎসরের একটী কন্যা এবং পাঁচ বৎসরের একটী ছেলে সঙ্গে। বাহুদ্বয় হালকা হইলেও সুগোল, পদদ্বয় ছোট ও সুন্দর কলিকাতা অঞ্চলের রমণীগণের ন্যায় সেই পদে আলতার প্রলেপ নাই। মোজা ও জুতা ব্যবহার না করায় শীতের কোপে পদদ্বয় যেন কাঁকুড় ফাঁটার মত হইয়াছে।

আমার সৌভাগ্যক্রমে উভয়েই আমাকে অতি কৃপার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বাবুজায়া প্রথম প্রথম আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া মুখখানি মেঘঢাকা চন্দ্রবদনের মত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু ক্রমে ঘোমটার আয়তন কমিতে লাগিল। ঘোমটা প্রথম প্রথম সমস্ত মুখ ঢাকিয়া পড়িত, শেষে নাক পর্য্যন্ত উঠিল, অবশেষে অর্দ্ধ কপোল ঢাকিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, কয়েক দিনের মধ্যেই এই সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। বোধ করি, আমার নম্র প্রকৃতি, সলজ্জভাব, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং বিবাহে অরুচি প্রভৃতির জন্য আমার প্রতি তাঁহার সংকোচটা কমিয়া আসিবার কারণ হইবে।

আমরা যে সময়ে দিনাজপুর যাইতেছিলাম, তখন রেল ছিল না। সুতরাং বরাবর নৌকাযোগে আমাদিগকে দিনাজপুর যাইতে হইবে। আমাদিগের নৌকা পদ্মা ও যমুনার সংযোগ স্থানে এক চড়ায় লাগিল। কিছু ইলিশমাছ লইয়া যাওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ তখন দিনাজপুর অঞ্চলের লোকে সদ্য ইলিশ মাছের স্বাদ কেমন, তাহা জানিত না। নদীর চড়ায় প্রায় শতাধিক জেলে প্রকাণ্ড একবেড় জাল টানিয়া আনিয়া, তাহাতে অসংখ্য ইলিশমাছ আটকাইয়াছিল। মৎস্য খরিদ করিবার জন্য বহু শত ব্যাপারী আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ইহা ভিন্ন গ্রামবাসী হিন্দুমুসলমানগণ জাল পোল ইত্যাদি লইয়া মাছ ধরিবার জন্য আসিয়াছে। পদ্মার চড়াটী একটী বাজারে পরিণত হইয়াছে। জেলেগণ অসংখ্য ইলিশমাছ জালে আটকাইয়া জলের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। ক্রমে জাল টানিতেছে এবং জলে নামিয়া মাছ ধরিয়া নৌকা বোঝাই করিতেছে। এবং ব্যাপারিগণের নিকট মাছ সকল বিক্রয় করিতেছে। এইস্থানে মহা এক হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। গ্রাম্যলোকে এই সুযোগে জলে নামিয়া মাঝে মাঝে ইলিশ মাছ ধরিয়া গোপনে লইয়া যাইতেছে এবং জেলেগণ দেখিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। আমি ও মাঝিগণের কেহ কেহ জলে নামিয়া এই প্রকার মৎস্য অপহরণের প্রলোভনে পতিত হইলাম। প্রায় পাঁচ ছয়টা ইলিশমাছ আমরা নৌকার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আত্মসাৎ করিলাম, কিন্তু জেলেরা যখন টের পাইল, তখন দুই একটী কাড়িয়া লইল। অবশেষে প্রায় পঁচিশটা ইলিশমাছ আমরা খরিদ করিয়া লইলাম। মাছ গুলি কাটিয়া নুনদ্বারা মাখিয়া নূতন হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া তাহার তলায় এমন ভাবে ছিদ্র করিয়া দিলাম যে,ভিতরের রস চোয়াইয়া পড়িতে পারে। এই মাছ ধরিতে এমন আমোদ বোধ হইল যে, অপরের দ্রব্য চুরি করিলাম, তাহাতেও মনে কোন সংকোচ বোধ হইল না। শেষে কিন্তু মনে পরিতাপ হইল।

পদ্মা-যমুনার মোহনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা হুড়াসাগর নদীতে পড়িয়া উজাইয়া চলিলাম। মাঝিগণ গুণ টানিয়া চলিল। দিনের বেলায় নৌকায় পাক করিয়া খাইতাম এবং সন্ধ্যাকালে কোন বন্দরে বা গ্রামের নিকট নৌকা লাগাইয়া তীরে নামিয়া পাক করিয়া খাওয়া হইত। আমার পাকের উন্নতি এবং কার্য্যাভ্যাস ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন আর বেশী কষ্টবোধ হইত না। ইলিশমাছ অপহরণ হইতে চলন বিলে পৌঁছা পর্য্যন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই।

চলন বিলে ডাকাইত।

চলন বিলের মধ্য দিয়া তখন অনেকগুলি নদী নালা প্রবাহিত হইত। বিলটী অতিক্রম করিয়া অপর পারে যাইতে প্রায় এক দিন লাগিত।

আমরা যেদিন চলন বিলে পড়িলাম, সেদিন আর বিল পাড়ি দিতে পারিলাম না। বিলের মধ্যেই সন্ধ্যা হইল। এক চড়ায় নৌকা লাগান হইল, তথায় আরো দুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল। তাহার একখানি মহাজনী নৌকা, আর একখান ছোট পান্‌সী নৌকা, তাহাতে চড়নদার ছিল। আমরা তীরে নামিয়া রন্ধনাদির আয়োজন করিতেছি, এমন সময় একখানি ডিঙ্গিনৌকা আসিয়া আমাদিগের নৌকার নিকট লাগিল এবং আমাদিগের মাঝিগণের নিকট আগুন চাহিল। ডিঙ্গিনৌকায় তিনজন মুসলমান ছিল। তাহারা আমাদিগের নৌকার ভিতর যেন অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মাঝিরা আগুন দিলে তাহারা চলিয়া গেল। কিন্তু আমাদের নৌকার বুড়ামাঝির দৃষ্টিও যেন সেই তিন জন লোকের উপর পড়িল। বুড় মাঝি বলিল যে "এই ডিঙ্গি নৌকাখানার উপর যেন আমার সন্দেহ হইল, ইহাদের তাকানের ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন ইহারা ডাকাইতের খোজাক।" আমি বলিলাম যে,কেন এখানে কি কোন ভয়ের কারণ আছে?" তাহাতে মাঝি বলিল যে "ঠাকুরমশায়, এ বিল বড় ভয়ঙ্কর স্থান, এখানে কত মহাজনী নৌকা ও চড়নদারের নৌকা লুট হইয়াছে, তাহার কি সীমা আছে। আমি কতবার চড়নদার লইয়া এই বিলের মধ্যে বিপদে পড়িয়াছি।" বাবুরও এ পথের হাল বেশ জানা ছিল, কিন্তু আমিই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। মহাজনী নৌকার মাঝিও বলিল যে, "কিছুদিন হইল এখানে দুইখান নৌকা ডাকাইতেরা লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে।" এই সকল কথা লইয়া তিন নৌকার মাঝিগণের মধ্যে বেশ আলোচনা হইতে লাগিল।

মহাজনী নৌকায় আটজন মাল্লা, সমস্তই মুসলমান, অপর চড়নদারী নৌকার দুইজন ভদ্রলোক এবং তিনজন নমঃশূদ্র মাল্লা এবং আমাদিগের নৌকার চারিজন জেলেমাঝি এবং আমরা চাকর লইয়া তিনজন পুরুষ। মোট তিন নৌকায় আমরা কুড়িজন পুরুষ লোক ছিলাম। পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা হইতে লাগিল যে কি জানি যদি বিপদ উপস্থিত হয় তখন কি করা? আমাদের নৌকায় স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে থাকায় অধিক আশঙ্কার কারণ হইল। তখন মহাজানী নৌকার মাঝি আমাদিগের মাঝিগণকে বলিল যে, মশায়রা তোমরা

কিছুমাত্তর ডরাইবা না, আমি যৎকালীন এ্যাহানে আছি, তৎকালীন আমাগো তির-সীমানার মদ্দি আসে এ্যামন সাদ্দি কার।" মাঝির কথা শেষ হইলে ঐ নৌকার অল্পবয়স্ক একটা মাল্লা বলিল যে "আপনারা মাজি মানুষ (অর্থাৎ জেলে মানুষ) তাই এ্যাত বয় কর্‌তেছেন। আপনাগো চড়নদারও বন্দর লোক। আমাগো মুছলমান ডরা[illegible]না। তা আমাগো খাঁ চাচা (মহাজনী নৌকার মাঝি) যদ্দপি এ্যারো আছে, তদ্দপি তোমাগো কোন বয় নাই। ঐযে হ্যাহো বুর আইল দ'রে ব'সে থাকে, ও বেটার প্যাটে কত গুণ? উওর মত গুনীন বাঙ্গালা হ্যাশে আর নাই। ও বেটার নজরবন্দী মড় চমৎকার। চোর অউক, ডাহাত অউক, উওর বন্দ করা সীমানার মদ্দি আহুলে এ্যাহেবারে আন্দা অয়ে যায়। ও বেটা ছোট ব্যালা অবধি লায় লায় ব্যাড়ায়, যত বিপদ অতে ও রক্ষা ক'রে তাহে।" ইত্যাদ। মাঝিগণের আলোচনায় বাবু গৃহিণী অত্যন্ত শঙ্কাযুক্তা হইলেন এবং বাবু স্বয়ংও কিছু ভীত হইলেন। "কিন্তু খাঁ চাচার" পেটে অসাধারণ গুণের কথা শুনিয়া ঠাকুরাণী আশ্বস্ত হইলেন। বাবুর মন্ত্রে বিশ্বাস ছিল কি না, জানি না। কিন্তু তাঁহারও মুখমণ্ডলে ভরসার চিহ্ন দেখা গেল। আমাদিগের মাঝিগণের মধ্যে একজন প্রাচীন এবং তিনজন যুবক ছিল। তাহারা খুব বলিষ্ঠ লোক ছিল। ইহারা আশ্বস্ত হইলেও আমার মনে কিন্তু শান্তি জন্মিল না। আমি বুড়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মাঝির বেটা কি বল? যদি ডাকাইত সত্য সত্যই আইসে, তাহা হইলে, 'খাঁ চাচার' মন্ত্রে কাটিবে কি?" তখন বুড়া মাঝি বলিল যে "ঠাকুর মহাশয় ও মিছে কথা, আমার জীবন গ্যাল এই কাম করিতে করিতে, কতগুণীন দ্যাখলাম, কিন্তু কাজের ব্যালায় সকলই ভুয়।" আমি বলিলাম যে, আমিও তাই বলি, ওসকল পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমি প্রস্তাব করিলাম যে, আমরা সমস্ত রাত্রি জাগিব, কেহই আজ ঘুমাইতে পারিবে না। তখন বুড়া মাঝি বলিল যে না, সকলে এক যোগে জাগিয়া থাকাটা সঙ্গত নয়। আপনারা সকলে ঘুমান আমি জাগি, আমার ঘুম পাইলে ছোঁড়াদিগের এক জনকে তুলিয়া দিব, সে-ই জাগিবে, তাহার ঘুম পাইলে, আর একজনকে জাগাইয়া দিবে। সকলে এক যোগে জাগিয়া এক যোগে ঘুমাইয়া পড়িলে, বিপদের সময় কেহই টের পাইবে না।" বুড়া মাঝির কথাটা সঙ্গত বোধ হইল। সেই অনুসারে কার্য্য করা হইল।

আমি বুড়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,যদি সত্য সত্যই ডাকাইত আসিয়া

পড়ে, তাহা হইলে আমরা কি করিয়া আত্মরক্ষা করিব? তাহাতে বৃদ্ধ বলিল যে, তখন আমাদের যে কাজ, তাহা আমরা করিব, কিন্তু আপনি বন্দুকটী ভাল করিয়া পূরিয়া রাখুন। আমি সেই কথা অনুসারে দোনালা কেপ দ্বারা বন্দুকটী *পূরিয়া রাখিলাম। বলা বাহুল্য যে, তুইটী নালেই বড় গুলি ভরিয়া রাখিলাম।*

আমরা সকলে শয়ন করিলাম, কিন্তু বুড়া মাঝি জাগিতে লাগিল। ইতি মধ্যে কয়েক খানা নৌকা আসিতেছে টের পাইয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের নৌকা কোথাকার?" তাহারা বলিল যে "আমরা হাটুরে নৌকা, হাট করিয়া বাটী যাইতেছি। তাহারা চলিয়া গেল। সমস্ত বিল নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। ঘুমে মাঝিদিগের নাক ডাকিতে লাগিল, কিন্তু উদ্বেগে আমার ঘুম মাত্রই হইল না। ঘণ্টা খানেক পরে দূরে যেন জল ভাঙ্গার মত শব্দ শুনা গেল, বোধ হইল যেন ক্ষুদ্র একখানি ডিঙ্গি নৌকা যাওয়া আসা করিতেছে। আমাদের বুড়া মাঝি জিজ্ঞাসা করিল যে "কে যায়?" কোন উত্তর পাওয় গেল না। নৌকা খানা চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর, আমার তন্দ্রার ভাব হইয়াছে। এমন সময় স্বরূপ মাঝি (বৃদ্ধের নাম) জিজ্ঞাসা করিল যে "তোমরা কে? কোথায় যাইতেছ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে "মাঝির বেটা কি?"সে বলিল"দূরে যেন জল ভাঙ্গার শব্দ শুনিলাম এবং বোধ হইতেছে যেন এথানে বড় একখানা নৌকা আসিতেছে। ঠাকুর মহাশয়, একবার উঠে দেখেন। আমার নজর ধরিয়া গিয়াছে, ভাল মত দেখিতে পাচ্ছি না।" আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া খুব ভাল মত নজর করিয়া দেখিলাম যে, দূরে একখানা লম্বা বাছের নৌকারমত নৌকায় দো সারি ব'ঠে হাতে লোক বসা। তাহারা আস্তে আস্তে টুক টুক করিয়া বাহিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং ধীরে ধীরে অতি সতর্কতার সহিত কথা বলিতেছে। আমি বৃদ্ধকে বলিলাম যে "গতিক যেন ভাল নয়!" স্বরূপ মাঝির কথায় তাহারা কোন উত্তর দিল না, কিন্তু ধীরে ধীরে নিকট আসিলে আমি মাঝিকে বলিলাম "মাঝি সতর্ক হও।" তখন স্বরূপ মাঝি তাহার মাল্লাদিগকে ডাকিল, "গদা, শুস্তু, নারাণে,উঠত। দেখত ঠাকুর মহাশয় বলছেন যে, একখানা বাঁছের নৌকায় অনেক লোক, তাহারা ধীরে ধীরে আসিতেছে।" তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিল, শম্ভু মাঝি বলিল যে "সত্যি ত টাকুর মহাশয় যা বল্লেছেন তা সত্যি।" নারাণে বলিল "তোমরা কে কোথায় যাচ্ছ?" কোন উত্তর পাওয়া গেল না, কিন্তু নৌকা খানি ক্রমে নিকটে যে আসিতেছে, তাহা স্পষ্ট বোধ হইল এবং

তাহারা যে শত্রু, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন আমি বাবুকে ডাকিলাম,তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন যে, কি? আমি বলিলাম যে "ডাকাতের নৌকা নিকটবর্ত্তী, ঠাকুরাণীকে তুলুন, ছেলেপিলে সহ ঠাকুরাণীকে নৌকার খোলের মধ্যে বসাইয়া উপরটা ঢাকিয়া রাখুন।" বাবু ঠাকুরাণীকে ডাকিলেন, তিনি ভয়ে হাউ মাউ করিয়া উঠিলেন, ছেলেপিলে কাঁদিয়া উঠিল। আমি চুপ্ চুপ্ করিয়া থাকিতে বলিলাম। বাবু আমার কথানুসারে ছেলেপিলে সহ ঠাকুরাণীকে নৌকার খোলের ভিতর বসাইলেন এবং উপরটা ঢাকিয়া ফেলিলেন।

বুড়মাঝি বলিল "আরে বেটারা তোরা কে কথা বলিস না যে? সেই নৌকা হইতে তখন একজন উত্তর দিল, "আমরা তোমার বাবারা, একটু থাক এখনই টের পাবে আমরা কে?" ইতিমধ্যে সেই নৌকাখানা হইতে "আলি! আলি! আলি! বলিয়া ডাক ছাড়িয়া উঠিল।

তখন আমাদের বুড়স্বরূপ মাঝি চীৎকার করিয়া "কালী করালবদনী, মহিষমর্দ্দিনী অসুরঘাতিনী রক্ষা কর মা!" এই বলিয়া"কালী! কালী! কালী!"বলিয়া ডাক ছাড়িল, আমরাও সেই ডাকের সঙ্গে যোগ দিয়া বিল কাঁপাইয়া তুলিলাম। আমাদের ডাকছাড়া শুনিয়া নৌকাখানা থামিল এবং আনাগোনা করিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল যেন এ নৌকায় শক্ত লোক আছে। আমাদের মাল্লারা তখন "খাঁ চাচা পীরখাঁ চাচা" বলিয়া বলিয়া মহাজনী নৌকার মাঝিকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, অথচ আস্তে আস্তে যেন পরস্পর কথা বলিতেছে, তাহা টের পাওয়া গেল। অপর চড়নদারী নৌকার মাঝি বিপিন মণ্ডলকে ডাকিল, বিপিন সাড়া দিল, কিন্তু চড়নদার ভদ্রলোকদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, "চুপ করে থাক, এখন কি পরের জন্য নিজেদের প্রাণটাও যাবে না কি, অনর্থক তোরা কথা বলিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিস না। এই কথায় সেই নৌকার মাল্লারা আর কোন কথা বলিল না। ইহাতে আরো আশঙ্কার কারণ হইল। কিন্তু বিপদ কালে অধৈর্য্য হইল ও ভয়ে বিহ্বল হইলে বিপদ আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। তাই সাহস অবলম্বন করা দরকার। বাবু ও ঠাকুরাণী "দুর্গা,দুর্গতিনাশিনী দুর্গা,রক্ষা কর মা," প্রভৃতি বলিতেছেন এবং ভয়ে কাঁপিতছেন। আমি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি স্বয়ং বন্দুকটী লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "কেন, তুমি বন্দুক ছুড়িতে জাননা।" আমি বলিলাম যে "আজ্ঞে আপনার

অনুমতি হইলে অবশ্যই বন্দুক চালাইতে পারিব, কেন না ছোট বেলা হইতেই বন্দুক চালান অভ্যাস আমার আছে।" এই কথায় বাবু মহা খুসী হইলেন এবং বলিলেন যে "যাহা করিতে হয় তা তুমিই কর, আমার হাত পা সরেনা, আমি কিছুই করিতে পারিব না।"

আমি তখন বন্দুকটী তুলিয়া লইয়া প্রস্তুত হইলাম এবং মাঝিদিগকে বলিলাম "তোমরা ভীত হইও না এবং আত্মরক্ষার জন্য যাহা যাহা করিতে হয়, তাহা কর,আমার যাহা কর্ত্তব্য আমিও তাহা করিব।"আমাদের সাহস ও আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ডাকাইতের সর্দ্দার বলিয়া উঠিল যে "শালারা গোলমাল করিবি ত ধনে প্রাণে মারা যাবি। আর যদি ভাল চাস্, তা'হলে যা যা আছে চুপ করে ব্যার করে দে। আমরা তোদের কোন অনিষ্ট করিব না।" ডাকাইতদিগের কথায় ঠাকুরাণী বাবুকে কহিলেন যে "বেশ কথা, আমাদের যা আছে তাহা বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে প্রাণটা ত বাঁচিবে।" বাবুও তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু আমি বলিলাম যে "আপনি আগেই এত ভীত হইয়া অনর্থক কেন যথা-সর্ব্বস্ব খোয়াইবেন, অপেক্ষা করুন, দেখা যাক। সহসা আমাদের নৌকার কাছে আইসে এমন সাধ্য কার। আর চোর ডাকাইতের কথায় কি বিশ্বাস করিতে আছে? এখন বলিতেছে যে আমাদের যাহা আছে, তাহা দিলে আমাদিগকে কিছু বলিবে না, কিন্তু সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া যে আমাদিগকে প্রাণে বধ করিবে না, তাহার বিশ্বাস কি? তাহার কারণ আমরা জীবিত থাকিলে তাহাদেরই বিপদ। মামলা মোকদ্দমা হইতে পারে।" আমার এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিলেন। শম্ভু মাঝি, (নূতন লোক) এবং বাবুর ভৃত্য নবীনচন্দ্র দে ভয়েতে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। নৌকা খানা ধীরে ধীরে কিন্তু অতি সতর্কতার সহিত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। স্বরূপ মাঝি বলিল, "আজ তোদের নিতান্ত দুর্দ্দিন, জানিশ না, বাতাশ আজ কোন দিক হ'তে বচ্ছে? হট্, না হলে সকলে প্রাণে মারা যাবি।" এই কথায় নৌকা হইতে নানা কুৎসিত ভাষায় অজস্র গালি আমাদিগের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ মাঝি তখন ধরাধর গুরল চালিতে লাগিল, এবং গদাই ও নারাণে তীর চালাইয়া নৌকার লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। নৌকায় গোলমাল উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। নৌকার লোক গুলি ঢাল বাহির করিয়া তাহার আড়ালে আত্মরক্ষা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। আগেই নৌকার গলইয়ের উপর প্রকাণ্ড অসুরাকৃতি

একব্যক্তি কোমর বাঁধিয়া ঢাল ও সড়কী লইয়া যেন সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে। লোকটার মাথায় লম্বা বাবরি চুল। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কালী কালী বলিয়া ভ্যাং করিয়া বন্দুক ছুড়িলাম। আর "আল্লারে! মরেছি!" বলিয়া লোকটা ঝপ করিয়া জলে পড়িয়া গেল। নৌকার মধ্যে মহা গোল উপস্থিত হইল, নৌকা কিছু ভাট্যাইয়া গিয়া লাশটা তুলিল, এমন বোধ হইল। আবার যেন তাহারা সাহসে ভর করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমি সুযোগ অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পৌছিলে আর একটা প্রকাণ্ড লাঠিয়ালকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ফায়ার করিলাম, সে লোকটা নৌকার খোলের মধ্যে ধড়াস করিয়া পড়িয়া গিয়া কাটা পাঁঠার মত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ডাকাইতগণের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমি এদিকে চেঁচাইয়া বলিলাম, "গদারে, দে, শিগ্‌গীর দোনালা বন্দুকটা দেত, শিগ্‌গীর আন। আর দু' বেটাকে যমের বাড়ী পাঠাই।" আমার এই কথায় ডাকাইতগণের মাঝি নৌকা ঘুরাইয়া ভাটি দিল। আপদ গেল, কিন্তু মনে শান্তি হইল না, কেন না রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভয়ের কারণ রহিল। পাছে ডাকাইতগণ বন্দুক লইয়া পুনরায় আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। বলা বাহুল্য যে, আমার শেষ ফায়ারের পর যদি ডাকাইতগণ আক্রমণ করিত, তাহা হইলে আর আত্মরক্ষা করিবার সাধ্য ছিল না। কেন না কেপদার বন্দুক, অন্ধকার রাত্রে ভরিতে বিলম্ব হইত। অবশ্য কার্ত্তুজের বন্দুক হইলে কোন ভয় ছিল না। ডাকাইতের নৌকার মাঝি যাইবার কালে বলিল যে "আজ তোগ ডাইনের ছিল, ঠাহুর বাড়ী চাল ডাল দিগে।"

ডাকাইতের নৌকা ভাটি দিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই অদৃশ্য হইল। তখন ছোট নৌকা হইতে ভদ্রলোক দুইটী লাফাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে, বিপিন মণ্ডল উঠত, দেখ দেখি, ঐ সোয়ারি নৌকা খানায় বুঝি ডাকাইতে ঘিরিয়াছে। তাঁহারা ধর ধর করিয়া নৌকা হইতে লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িলেন, এবং বলিলেন যে, মহাশয় আপনাদের কোন ভয় নাই, এই আমরা আসিতেছি। এদিকে খাঁ চাচা আমাদের মাঝিকে ডাকিয়া বলিল যে, "মাঝি মশায়, তোমরা মিছেমিছি গোলমাল হরছ ক্যান্, আমার কথা এ্যাহন হত্তি কি মিছ্যা। আমি যদ্যপি এ্যাহানে আছি, তদ্দপি চোর ডাহাইৎ এ্যার তীরসীমানায় আস্‌তে পারে? এ্যাহন স্থাহদেহি ডাহাইৎ কনে বাগেগে গেল।" তখন নারাণ মাঝি বলিল, "চাচা তোমার পায়ে শ্যালাম, আর তোমার মন্ত্রেও শ্যালাম করি। আমাদের

নিজেদের সাহস, বন্দুক, তীর ও গুরল বাঁশ না থাকিলে তোমার মন্ত্রে আমাদিগকে বেশ রক্ষা করিত! যখন বিপদে পড়ে তোমাদিগকে ডাক্‌লাম তখন তোমরা চুপ করে রলে, কোন কথা বল্লে না। এখন মন্ত্রের বাহাদুরি জানাচ্ছ। ব'স ঢের হয়েছে, তোমাদিগকে আমরা চিনেছি। আর না।"

ভদ্রলোক দুটীর বৃথা আস্ফালনে মাঝিরা আর কিছু বলিল না, কিন্তু আমি বলিলাম "মহাশয়রা আর এত কষ্ট করে বৃথা আস্ফালন করে, নিজের বল ক্ষয় করিবেন না। আপনাদিগের মহদ্‌গুণে মোহিত হইলাম, রাত্রি প্রভাত হইলে আপনাদের গুণের প্রতিশোধ দিব।" তাঁহারা আমার তীব্র ভৎর্সনায় চুপ করিলেন। আমরা আর তাঁহাদের সঙ্গে কোন আলাপ করিলাম না। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবার সংকল্প হইল। রাত্রিও বেশী ছিল না। দূরে কোন শব্দ শুনিবা মাত্রই বন্দুক ফায়ার করিতে লাগিলাম। এবং হৈ হৈ শব্দ করিয়া বিলটী ঝাঁকাইয়া তুলিলাম।

ক্রমে অন্ধকারের গাঢ়তা দূর হইতে লাগিল, পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইল। উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি যেন খাঁ চাচা ও ভদ্রলোক দুটীর ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া ম্লান হইতে লাগিল এবং অবশেষে ক্রমে নীলাকাশের মধ্যে লুকাইল। এত বড় বিলের মধ্যে প্রভাতের কাক আর ডাকিল না। তবে খাঁ চাচার নৌকা হইতে একটী কুক্কুট চীৎকার করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিল। ভোরবেলায় আমরা নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

বাবু নিদ্রা হইতে উঠিয়াই সর্ব্বাগ্রে আমাকে কোল সাপটা দিয়া ধরিয়া বলিলেন "বাবা কুড়ন, তুমি ধন্য ছেলে! ধন্য তোমার বুদ্ধি ও সাহস! তুমি যে কালে একটা বড়লোক হবে,তাহার নমুনা আজ পাইলাম। তোমার এ গুণের প্রত্যুপকার আমি করিব।" অবশেষে মাঝিদিগের সাহসের ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের প্রশংসা করিয়া তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং তাহা-দিগকে দশ টাকা পুরস্কার দিলেন। পরিচয়ে জানা গেল যে, ঐ দুইটী ভদ্রলোক বাবুর সম্পর্কে আত্মীয় এবং তাহারা পাবনা জেলার ক্ষেতুপাড়ার রায়-পরিবারের লোক। ভদ্রলোক দুইটী কত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং লজ্জিত হইলেন। বাবু আজ স্বয়ং প্রাতঃকালের আহারের বন্দোবস্ত করিতে গেলেন এবং বলি-লেন যে, "কুড়ন সারারাত্রি জাগিয়া ক্লান্ত হইয়াছে, সে বিশ্রাম করুক। আমি তাঁহাকে পাক করিতে দিতে দিলাম না। নিজেই গিয়া সমস্ত জোগাড় করিয়া লইলাম। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া নৌকা ছাড়িয়া ছিলাম।"

চলন বিল পরিত্যাগ করার পর দিনাজপুব পৌছা পর্য্যন্ত আর কোন উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। নদীর দুরাবস্থার জন্ত নৌকা চালান কষ্টকর হইল। অনেক স্থানে নামিয়া না চলিলে, নৌকাচলা কষ্টকর হইল, আবার স্থানে স্থানে নৌকাখানা আমরা টানিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। মোট ১৮ দিনে আমবা দিনাজপুব পৌছিলাম।

বাবুর বাসা মুন্সিপাড়া। আমবা সকলে বাসায় পৌছিলাম। পাড়াস্থ ও অপর স্থানের পরিচিত বন্ধুগণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই বাস্তাব মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা কবিলেন। তখন আমাদের বাবু পথের অমঙ্গলেব কথা বর্ণন কবিলেন। তাহা শুনিয়া সকলে ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমাদের বাবু কহিলেন যে "যদি এই ছোকবার সাহস ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব না থাকিত এবং মাঝিগণ ভয়ে ভীত হইত, তবে আর আমাদের ধন প্রাণ বক্ষা হইত না এবং কাহাবও সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হইত না। আমি নিজেই ভীত হইয়া বল বুদ্ধি হাবাইয়া বসিয়াছিলাম।" আমার সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে বিপদ কালে আত্মবক্ষাব কথা শুনিয়া সকলেব দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। একটী উকীল বাবু আমাকে টানিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন যে "সাবাস্ ছেলে! বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে এমন সাহসী ছেলে বড় দেখা যায় না।" আর একজন কহিলেন যে ছেলেটি যে কালে একটা বড় লোক হইবে। তাহা উহার মাথাটা দেখিযাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে।" বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনা প্রসঙ্গে সহবময় আমাব নাম রাষ্ট্র হইয়া গেল। পাড়ার উকীল ও আমলা-মহলে আমার আদর বৃদ্ধি হইল।

নবম অধ্যায়।

তৎকালীয় দিনাজপুর।

দিনাজপুব পৌছিযা কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম।

দিনাজপুব সহরের অধিকাংশ বাড়ীই মেটেকোঠার দ্বারা নির্ম্মিত ছিল।

পাকা বাড়ী অতি অল্পই ছিল। মেটে কোঠাগুলির উপরে পাতলা খড়ের ছাইনির চালা। বৃষ্টি হইলে মাটির ছাদ ও প্রাচীরকে রক্ষা করিবার জন্যই খড়ের ছাইনির প্রয়োজন হয়।

সহরে তখন অগ্নির আশঙ্কা অত্যন্ত ছিল, বিশেষতঃ মাঘ,ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে যেদিন প্রবল বেগে হাওয়া বহিত, সেদিন, এক প্রকার নিশ্চয় ছিল যে সহরের কোন না কোন স্থলে আগুন লাগিবেই লাগিবে। সেই জন্য বাসাড়েগণ বলিতেন যে "আজ সহরে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা, সকলে সকালে সকালে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সাবধান থাক"। সকলে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বাহিরের দ্রব্যাদি ঘরের ভিতর রাখিয়া মেটে ঘরের দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া, তাহার উপর এক একখানি ঝাঁপ আচ্ছাদন দিয়া রাখিতেন এবং হাড়ি পূর্ণ করিয়া কাদা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইত। আগুন কোথাও লাগিবামাত্রই গৃহস্থ উক্ত কাদা দ্বারা ঝাঁপখানি বেশ করিয়া পুরু করিয়া লেপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করিতেন। প্রবল বাতাসের বেগে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া, ব্রহ্মা লোল জিহ্বা করত মুহূর্ত্ত মধ্যে পাড়াটীকে ছারখার করিয়া যাইতেন। গৃহস্থের জন্য মাত্র ভস্মরাশি রাখিয়া দিতেন। সতর্ক ও চালাক গৃহস্থ তাঁহাকে বড় ভয় করিত না। সর্ব্বভস্ম হুতাশন চলিয়া গেলে গৃহস্থ ঝাঁটা হাতে করিয়া ভস্মরাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিতেন। এ আগুনে,মই আন, জল আন, জিনিষ বাহির কর, হুড়াহুড়ি, কাঁদা কাঠি, হৈ হৈ, রৈ রৈ বড় ছিল না। কিন্তু অসতর্ক লোকে অনেক সময়ে ধনে প্রাণে মারা যাইত। ঘর পুড়িয়া গেলে হয় ত দুই এক দিনের মধ্যেই কোঠার উপর চাল খাড়া হইত। কেননা পাতলা কাজ, দেড় পয়সা দুই পয়সা হাত চুক্তি চাল বাঁধার নিয়ম ছিল।

আগুনটা ঘাসি পাড়া হইতেই প্রায় আরম্ভ হইত, কেননা তথায় ঘর বাঁধা মজুরগণের আড্ডা ছিল। তাহাদের কাজ কর্ম্মের বিশেষ ভিঁড় না থাকিলে, বাতাসের কোপ দেখিলেই, তাহারাই দয়া করিয়া কোন এক ঘরে আগুন ধরাইয়া দিত। মুহূর্ত্ত মধ্যে পাড়াকে পাড়া ছাপ হইয়া গেলে সহরে তাহাদের আদরের সীমা ছিল না।

স্কুলের ঘণ্টার সময়ে আগুন লাগার সংবাদ পাওয়া মাত্র মাষ্টার মহাশয়দিগের বিনা অনুমতিতেই সমস্ত ছাত্র এক যোগে দৌড়িয়া বাহির হইয়া অগ্নি কাণ্ডের স্থলে উপস্থিত্ হইতাম এবং নিরাশ্রয় গৃহস্থের যথাসাধ্য আনুকূল্য করি-

তাম। যে পাড়ার কোন কোন স্থানে মেটে কোঠা ছিল না, তথায় অসতর্কতা বশতঃই হউক, অথবা ঘাসি পাড়ার মজুরদিগের অনুগ্রহেই হউক, আগুন লাগিলে সময় সময় বড় হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিত। মানুষ ও গবাদি পশু সকল সময় সময় পুড়িয়া মরিত।

আমরা এক দল ছাত্র "ফায়ার ব্রিগেট" রূপে ছিলাম। যখনই যেখানে আগুন লাগিত, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া বিপন্ন গৃহস্থের উপকার করিতাম। একবার বালু পাড়ায় আগুন লাগিলে, আমরা স্কুল হইতে দৌড়িয়া গিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। তথায় কতকগুলি বাড়ী মাত্র বাঁশ ও খড়ের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। একখানি বাড়ীতে আগুন হু হু শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীখানা আমাদিগের রক্ষা করা উদ্দেশ্য হইল। কিন্তু ঘরের চালের উপর যাইবার মই নাই। কেহই চালে উঠিতে সাহস করে না। অবশেষে চালের উপর একটী বাঁশ ফেলিয়া দিয়া আমাদের হেড মাষ্টার মহাশয় চালের উপর উঠিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কেহই রাজি হইল না। অবশেষে আমি অগ্রসর হইলাম। তিনি বাঁশটী শক্ত করিয়া ধরিলেন, তাঁহার হাতের উপর পা দিয়া আমি কষ্টে চালের মটকার উপর উপস্থিত হইলাম এবং জল লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ঘূর্ণী বায়ুতে দগ্ধ গৃহের অগ্নিশিখা লোলজিহ্বা করিয়া, আমি যে ঘরের উপর অপেক্ষা করিতেছি, তাহার পার্শ্বের ঘর খানিকে ধরিল। ঘরখানি ধব্ ধব্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে আগুন, আমি যে ঘরের উপর আছি, তথায় আসিয়া ধরিল। তখন এমন বোধ হইল যে, আগুনে যেন আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল। নিম্ন হইতে সকলে চেঁচাইতে লাগিলেন, যে "নাম্! নাম্! মলি, মলি!" আমিও নামিবার সুযোগ পাই না, কেননা মই নাই, চালে উঠা সহজ, নামা শক্ত। হেড মাষ্টারও যেন আমাকে চালে তুলিয়া দিয়া মহা ব্যাকুব হইলেন। আমি দৌড়াইয়া চালের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলাম, আগুন যেন আমাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। নীচের সকলেরই মহাত্রাস হইল, কিন্তু আমি তখনও সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারাই নাই। অনন্যোপায় হইয়া আমি চালের মধ্য-প্রান্তে আসিয়া গা ছাড়িয়া দিলাম, আর অমনি সড় সড় করিয়া নামিয়া ধড়াশ শব্দে নীচে পড়িয়া গেলাম। আমার, কোমরে ও পায়ে এমন চোট লাগিল যে, আর উঠিবার শক্তি রহিল না। হেড মাষ্টার মহাশয় আমাকে টানিয়া তুলিয়া আঙ্গিনার বাহিরে লইয়া গেলেন। কেননা তন্মুহূর্ত্তেই বাড়ীখানার সমস্ত ঘরগুলি জ্বলিয়া ভস্মে পরিণত হইয়া গেল।

অবশেষে সুস্থ হইলে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাসায় চলিয়া গেলেম। যদি সেই মুহূর্ত্তে সাহসে ভর না করিয়া চোট লাগিবার ভয়ে নীচে নামিতে ইতস্ততঃ করিতাম, তাহা হইলে সেই দিনই আমার জীবন্ত দাহনকার্য্য সম্পন্ন হইত।

সামাজিক অবস্থা।

এই সময়ে দিনাজপুর সহরের বাবু-সমাজের নৈতিক চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল না। ইহার বাড়াবাড়িটা মুন্সী পাড়ায়ই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইত। প্রায় প্রতি শনিবারেই কোন না কোন বাসায় ষোড়ষোপচারে পঞ্চ মকারের পূজা হইত, এবং সমস্ত রবিবার সেই পূজার ধাক্কা সামলাইতে যাইত। আমাদিগের বাবুরও বহু স্বার্থপর এয়ার লোক আসিয়া যুটিতে লাগিল। বাবুব এয়ারগণের মধ্যে কয়েক জন ঘসা উকীল, কয়েক জন আনাড়ি পুলিসের কর্ম্মচারী, এবং কয়েক জন চরিত্রহীন আমলাব কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রায় প্রতি শনিবারে কোন না কোন বাসায় ষোড়ষোপচারে পঞ্চমকারের পূজা হইত। এ পূজাও বিনা ছাগ বলিতে সম্পন্ন হইত না। দুই একটী ছাগ, শনির বার বেলায়, প্রায়ই বলি পড়িত। এদিকে "বোতলে মা ভবানী" এবং "ভৈরবীগণ" সহ পাণ্ডাগণ চক্র করিয়া পূজায় বসিতেন। ছাগ বলি হইয়া গেলে মাংস পাক করিতে বিলম্ব হইত বিধায়, পাচক ব্রাহ্মণের উপর হুকুম যাইত যে যে "ভবানীর চাটের" জন্য তাড়াতাড়ি পাঁঠার মেটে ভাজিয়া প্রস্তুত করে। এ পূজায় জাতিভেদের সংকীর্ণতা লক্ষিত হইত না। তাহার প্রমাণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণ, নীচ "জাতীয় ভৈরবী গণ" সহ, একাশনে, একচক্রে বসিয়া ভর্জ্জিত ছাগ যকৃতই ও ভর্জ্জিত তণ্ডুল কালাই প্রভৃতি উপকরণ সহ ভক্তিমনে "ভবানীর" পূজায় মত্ত হইয়া যাইতেন। এবপ্রকারে "ভৈরবী চক্রে" ভবানী পূজার জমাট বাঁধিয়া গেলে, কেহ বা "ভবানীর" আধ্যাত্মিকতায় নিমজ্জিত হইয়া কূর্ম্ম জীবনবৎ অন্তরেই সমাধিস্থ হইতেন। তাঁহাদের বাহ্য জ্ঞান কিছুকালের জন্য লোপ হইয়া যাইত, ঠিক যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বিশ্বজননীর প্রেম-সুরা পান করিয়া সময় সময় সমাধিস্থ হইতেন। কেহ বা টলিয়া টলিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেন, কেহবা ভাবে মত্ত হইয়া অবশাঙ্গ লইয়া নৃত্য করিতে চেষ্টা করিতেন এবং জড়িত-জিহ্বা দ্বারা আধ আধ স্বরে সঙ্গীত করিতে করিতে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া যাইতেন। ক্রমে সর্ব্ব সমাজেই একটা ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। যেমন ব্রাহ্মণ সমাজে

কপট গুরু পুরোহিতের অভাব নাই, ব্রাহ্মসমাজে কপট উপাসকের অভাব নাই, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কপট বৈরাগীর অভাব নাই, এবং সাধু সন্ন্যাসীর সমাজে কপট সাধুর অভাব নাই, সেই রূপ, আমাদের এই 'ভবানীর উপাসকগণের মধ্যেও কপট সাধকের অভাব ছিল না। ইঁহারা বেশ চালাক লোক ছিলেন। অল্প মাত্রায় ইঁহারা সুরা পান করিয়া অধিক মাত্রায় মত্ততার ভাণ করিয়া অপরকে ভুলাইতেন এবং বাহার দিয়া ভাল ভাল "চাটের" দফা রফা করিতেন এবং নিমন্ত্রণের ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্যের মজা লুটিতেন।

কোন কোন দিন রাত্রি একটা কি দুইটা পর্য্যন্ত "ভবানীর" সাধকগণের যোগভঙ্গ হইত না। আমাদের মত পশু-আত্মা বিশিষ্ট যত বাজে লোকের নিমন্ত্রণ হইত, তাঁহারা রন্ধন কার্য্য শেষ হইবা মাত্র গরম গরম লুচি, পোলাও কালিয়া, কোরমা ও ক্ষীর সন্দেশ প্রভৃতি চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ইত্যাদি আহার করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন ও উদরকে শান্তি প্রদান করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য পাচক ও ভৃত্যগণ হাঁ করিয়া রাত্রি দুটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইত। প্রকৃত সাধকগণের যোগভঙ্গ হইয়া বাহ্যজ্ঞান লাভ হইলেই ভক্তিহীন, কপট সাধকগণের চেষ্টায় চক্রভঙ্গ হইয়া গিয়া সকলে আহারের স্থানে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু যাঁহারা একবার যোগামৃত পান করিয়া তাহাতে ডুবিয়াছেন, তাঁহাদের কি পার্থীব পানাহারে রুচি থাকিতে পারে? তাই কেহ পাতের নিকট বসিয়াই হয়ত পা দিয়া ভোজ্য পাত্র খানি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন, কেহবা তথায় মুত্রত্যাগ করিয়া ফেলিলেন, কেহবা ন্যাকার করিয়া স্থানটী ভাসাইয়া দিলেন, আর কেহবা সেই পাতের উপর শুইয়া পড়িলেন। অদ্য রাত্রির মত ইহাদের আহার এই পর্য্যন্তই শেষ হইল।

সজ্ঞানিগণ নিজেরা যেমন তেমন করিয়া আহার করিয়া "ভৈরবীগণের" ভোজনের প্রতি বিশেষ খেয়াল করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিলেন যে, "ঠাকুর এ পাতে আর একটু মাংস ও পোলাও দাও," আর একজন বলিলেন যে, আরে এপাতে আর কিছু ক্ষীর ও রসগোল্লা দাও। এই আহারাদি শেষ হইলে যাঁহারা পাতের নিকট এত কেলেঙ্কারী করিলেন, তাঁহাদিগকে ভৃত্যগণ টানিয়া লইয়া গিয়া ফরাসের উপর বিছানায় ফেলিয়া রাখিল। রাত্রি তিন-টার সময় অভিনয় সমাপ্ত হইল।

পর দিন বেলা বারটার একটা সময় ইঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া বিষণ্ণ মনে বসিয়া পূর্ব্বে রাত্রির নিজের কুকীর্ত্তির বিষয় চিন্তা করিতে-থাকিতেন। একেত

শরীর ও মন অবসন্ন, তাহাতে লজ্জা ও মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়ায় কেহ কেহ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "আর এমন কুকর্ম্ম করব না।" কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সোম মঙ্গল কি বুধবার পর্য্যন্ত দৃঢ় থাকিত। শনিবার যতই নিকটবর্ত্তী হইত প্রতিজ্ঞাও ক্রমে ততই শিথিল হইতে থাকিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেও একটু স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিত। অবশেষে সে কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। শনিবারের দিন প্রবৃত্তি সাড়ে ষোল আনা জাগিয়া উঠিত।

বাবুদের পিতামাতার এক দৃষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক বাসায় এই প্রকার মদের শ্রাদ্ধ হইত। তবে যত দিন আমাদের বাবু জায়া বাসায় ছিলেন, তত দিন এই বীভৎস কাণ্ড আমাদের বাসায় হইতে পারে নাই।

একদিন কোন এক মজলিশে মদের অল্পতা বশত একটী বাবু স্বয়ং মদ ক্রয় করিবার জন্য দোকানে গমন করিলেন, কারণ রাত্রি দশটার পর ভৃত্যের নিকট মদ কেহ বিক্রয় করিবে না। তিনি বোতলটি লইয়া যেই রাস্তায় বাহির হইয়াছেন, অমনি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থানায় কয়েদ হইলেন। পর দিন কোর্টের বিচারে পাঁচ টাকা জরিমানা দিয়া তবে খালাশ।

এই সকল নীতিহীন সমাজে যোগদান করিয়া আমাদিগের বাবু ক্রমে বিগড়াইতে লাগিলেন। তিনি কোন নিমন্ত্রণে গেলে সে রাত্রি আর বাসায় ফিরিতেন না। এই প্রকার মাঝে মাঝে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতে লাগিলেন। তবে অনুসন্ধানে টের পাইলাম যে, তিনি সুরাদেবীতে আসক্ত ছিলেন না, সুরা তিনি আদতেই পান করিতেন না। তবে মজলিশের ব্যয়টা বহন করিতেন ও চাট-রূপ প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। যেমন আধুনিক নব্য শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকের পূজাদিতে বিশ্বাস নাই, অথচ পূজার ব্যয়টা বহন করিয়া থাকেন এবং পূজান্তে প্রসাদ ভক্ষণে তৃপ্তিলাভ করেন। আমাদের রায় বাবুও দশের সামিলে বাধ্য হইয়াই হউক, চক্ষু লজ্জায় হউক মজলিশের খরচটা সময় সময় বহন করিতেন। তাঁহার অন্য দোষটী প্রবল ছিল।

ইতিপূর্ব্বে কিছুদিন হইতে বাবু-জায়ার মুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় মলিন ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন এ বিষয়ে তত একটা খেয়াল করি নাই। এখন ক্রমশঃ তাহার কারণ বুঝিতে লাগিলাম। বাবু স্বয়ং তাঁহাকে এখন আর বড় দেখা দিতেন না। যেদিন বাহিরে না গিয়া বাটীতেই থাকিতেন, সেদিনও রাত্রিকালে গৃহিণীর শয়ন গৃহে গমন করিতেন না। বাবু-গৃহিণী একাকিনী সমস্ত রাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কাটাইতেন। কেহ তাঁহাকে

বাটীর ভিতর গিয়া শয়ন করিবার কথা বলিলে বলিতেন "বাটীর ভিতর বড় গরম।" ক্রমে যখন অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বাবুজায়া মধ্যে মাঝে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কত আক্ষেপ করিতেন। কেন না তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসিতেন এবং আমিও তাঁহাকে মান্য করিতাম। একদিন তিনি লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন যে, "উনি যে সকল লোকের বাড়ী যান্, তাঁহারাত আমার বাঁ পায়ের কেণি আঙ্গুলের যোগ্য লোকও নয়। তাহারা কি আমা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী?"

দশম অধ্যায়।

আমার পণ্ডিতি।

বাবুর কন্যার নাম সৌদামিনী এবং পুত্রের নাম প্রফুল্ল। বাসায় পৌছার পর হইতেই সৌদামিনী ও প্রফুল্লের শিক্ষার ভার আমার উপর পড়িল। তাহারা আমাকে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সুতরাং বাসায় আমি পণ্ডিত আখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু আমার মত "বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য"কে পণ্ডিত বলিয়া ডাকিলে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বালক ও বালিকাকে বলিলাম, তাহারা যেন আমাকে পণ্ডিত বলিয়া না ডাকে, কিন্তু তাহারা তা মানে কই? তাহাদের মা যাহা শিখাইয়া দিয়াছেন, তাহারা তাহা বলিবেই। সেই দেখাদেখি চাকরগণ ও অপর সকলেও আমাকে পণ্ডিত বলিয়া জ্বালাতন করিয়া তুলিল। কিন্তু শেষে সয়ে গেল। আর লজ্জা বোধ হইত না। আমি মূর্খ পণ্ডিত হইলেও ছাত্র ও ছাত্রীদ্বয় কিন্তু আমার শত মুখে প্রশংসা করিয়া পিতামাতার নিকট গর্ব্ব করিয়া বলিত যে "আজ আমাদের পণ্ডিত মহাশয় ইহা শিখাইয়াছেন, আজ উহা শিখাইয়াছেন, তিনি খুব ভাল শিক্ষা দেন ইত্যাদি। তাহারা ক্রমে আমার বড় বাধ্য হইয়া উঠিল, অথচ আমাকে বিশেষ ভয় ও ভক্তি করিতে লাগিল। আমি কোন বিষয়ে তাহাদের ক্রটী ধরিব মনে করিয়া তাহারা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। বাবুজায়া ইহাতে বেশ আনন্দ অনুভব করিতেন। এই জন্য তাঁহার নিকট ও কর্ত্তার নিকট আমার আরো প্রতিপত্তি বাড়িল।

তাঁহার রূপের বর্ণনা পূর্ব্বে করিয়াছি, কিন্তু গুণের কথা বলি নাই। রূপসী রমণীগণ প্রায়ই কিছু গর্ব্বিতা ও বিলাসিনী হইয়া থাকেন, কিন্তু রায়-গৃহিণীর সে

দোষ আদবেই ছিল না। তিনি অহঙ্কার কাহাকে বলে, জানিতেন না, এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষিণী ছিলেন। তাঁহার শিল্প কার্য্যে বেশ পটুতা ছিল এবং রন্ধন কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তাঁহার নিকটই আমি উলের কার্য্য এবং রন্ধন কার্য্য শিক্ষা করি। পোলাও, কালিয়া, কোরমা, কোপ্তা প্রভৃতি র‍াঁধিতে তিনিই আমাকে শিক্ষা দেন। এদিকে লেখাপড়াও দস্তুর মত বেশ জানিতেন। সর্ব্বদাই কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। বিনা কাজে এক মুহূর্ত্ত কাটাইতে পারিতেন না। তিনি পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন থাকিতেন, কিন্তু বৃথা সাজ-সজ্জা করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না।

আমি স্কুলে পড়াশুনা করা এবং বাসায় পণ্ডিতি করা, এই দুই কার্য্য লইয়া থাকিলাম। ক্লাসে আমি খুব ভাল ছেলেও ছিলাম না, আবার তেমন গাধাও ছিলাম না। স্কুলে তত ভাল না হওয়ার প্রধান কাবণ এই যে, অযথা চিন্তা করিতে করিতে আমার অনেক সময় নষ্ট হইত এবং পড়াশুনার ভিতর মন ভাল প্রবেশ করিত না। তাহা না হইলে মস্তিষ্কের জোর যতটুকু ছিল, তাহাতে পরিশ্রম করিয়া পড়িলে আরো কিছু ভাল ভাবে চালাইতে পাবিতাম। আমার সেই চিন্তা করা স্বভাবটা এত বদ হইয়া উঠিল যে, পুস্তক খুলিয়া পড়িতে বসিলে, দুচাবি ছত্র আয়ত্ত কবিতে করিতেই অলক্ষিত ভাবে একটী ভাবনা আসিয়া মনেতে ঢুকিত। তাই লইয়া আগাগোড়া চিন্তা করিতে কবিতে বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া, বামকৃষ্ণ পবমহংসেব ন্যায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিতাম। ক্ষণকাল পরেই সাঁ করিয়া চৈতন্য হইত, তখন আবাব পডিতে আরম্ভ কবিতাম। চিন্তার বিষয়টা কি? তবে কি কোন দুশ্চিন্তা? না, তাহা নহে। কখনও কোন প্রবল দুর্ব্বলের উপর অযথা অত্যাচাব করিল, কোন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান কোন নিরীহ ভদ্র লোককে অপমান করিল, কোন ব্যক্তি মিথ্যা মোকর্দ্দমা করিয়া কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়াইল, এই বিষয় লইয়া মনে নানা চিন্তার উদয় হইত, সময় সময় লোকের অন্যায় ব্যবহারে মনে বড় বেদনা পাইতাম, বড়ই অশান্তিতে কোন কোন দিন কাটিত। কখন কখন মনে করিতাম যে, দূর হউক পরের কথা লইয়া চিন্তা কবিয়া কেন নিজের ক্ষতি কবি? কিন্তু স্বভাব-দোষ ছাড়ান বড় কষ্ট। যখন দেখিতাম যে, সেই দুর্ব্বৃত্ত বা অত্যাচারীর উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, তখন মনে আনন্দ হইত, মাথাটা অনেক পাতলা হইত। আমার এই চিন্তার স্বভাব ও পণ্ডিতির জন্য অনেকটা সময় নষ্ট হইত, সুতরাং ক্লাসের পড়াশুনা খুব ভাল চলিতে লাগিল না। বাসায় পৌঁছিয়া দুবেলা হাঁড়ি ঠেলার

দায় হইতে রক্ষা পাইলাম, কেননা বাবু দয়া করিয়া একজন পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া দিয়াছিলেন। আমার সহপাঠীগণের মধ্যে আমার চিন্তার স্বভাবটার কথা বলিলে কেহ কেহ বলিতেন যে "চিন্তা করা স্বভাবটা ভাল। যাহারা এরূপ চিন্তা করিতে অভ্যাস করে, তাহারা কালে চিন্তাশীল বড় লোক হইয়া থাকে।" আমি বলি কি ? আমি কালে বড় লোক হইব ? লেখাপড়া না শিক্ষা করিলে কেমন করিয়া বড় লোক হইব, জানিনা।

একাদশ অধ্যায়।

ব্যায়াম শিক্ষা।

আমাদিগের স্কুলে একটী হিন্দুস্থানী ছেলে পড়িত। সে মিলিটারি পুলিশের সুভাদারের ছেলে ছিল। তাহার নাম ছিল লছমন সিং। একদিন ঘোড় দৌড়ের মাঠের নিকট বিকাল বেলা বেড়াইতেছি, এমন সময়ে লছমন সিংহ হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গা ঝাড়া দিয়া বলিলাম যে "তুই অনর্থক আমাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলি কেন ? আমি তোর উপযুক্ত শাস্তি দিব।" সে তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় অল্প কথা বলিতে পারিত এবং তখন আমারও হিন্দি জবান তাহারই বাঙ্গালা জবানের মত ছিল। সে আমার আস্পর্দ্ধা-যুক্ত কথায় ইষৎ হাসিয়া বলিল যে "তুমি হামাকে কি মজা দেখাবো, তুমি ত আছ বাঙ্গালীকো লেড়কা।" এই বলিয়া তাহার আর বাঙ্গালায় কুলাইল না, সে হিন্দিতে বলিতে লাগিল, "দেখ হাম রুটি আউর ঘি খানেওয়ালা, আউর তোম হ্যায় চাউল, আউর তেল খানে-ওয়ালা। রুটি ঘি খানেওয়ালা কা ছাৎ চাউল-তেল-খানেওয়ালা কবি ছেকেগা নেই।" তাহার বাঙ্গালী জাতির প্রতি অবজ্ঞা এবং নিজের জাতির প্রতি গর্ব্ব যুক্ত কথায়, আমার আপদ মস্তক যেন জ্বলিয়া উঠিল। আমি কোমর কসিয়া বাঁধিলাম এবং বলিলাম যে "আয়, আজ তোর মজা দেখাই।"

লছমন সিং কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিক্রমের সহিত আসিয়া আমার ঘাড়ে মুড়ে ঠাসিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ জড়াজড়ির পর, সে কায়দা করিয়া আমাকে নীচে ফেলিয়া দিয়া আমার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া কহিল যে, "এখন ক্যামান আছে, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানীকো ছাৎ লড়াইমে পারঙ্গে, কবি নেহি।" তখন আমি

নিরুপায়,অথচ ক্রোধে শরীর জ্বলিতেছে। আমি তথন বাঙ্গালী-সুলভ অসার দম্ভে বলিলাম যে "আচ্ছা, বেটা উঠে বুকের উপর হতে, আমি তোকে নীচে ফেলতে পারতাম, তা হইলে তোর মজা দেখাতাম।" আমার কথায় সে হাসিয়া বলিল যে "ফেলতে পারলেতো মজা দেখাবো" এই বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বুকের উপর হইতে উঠিয়া গেল। তথন আমি উঠিয়া গায়ের মাটি ঝাড়িয়া একেবারে সরাসর বাসায় ফিরিলাম।

এ অপমান মনে বড় লাগিল। এ যদি ব্যক্তিগত কথা হইত, তাহা হইলে এত মনোকষ্ট হইত না। একটা নগণ্য ছোকরা একটা জাতিকে উল্লেখ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করে? এমন অপদার্থ জাতিতেও জন্ম ধারণ করিয়াছি?

আজ বাসায় আসিয়া নিস্তেজ হইয়া কেবল আগাগোড়া জাতীয় অধোগতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। পড়া শুনা আর করিতে পারিলাম না। মাষ্টার প্রফুল্ল আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "পণ্ডিত মশায়, আপনি ভাবেন কি?" আমি তাহার কথাব কোন উত্তর দিলাম না, সেও আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমার পূর্ব্বের স্বভাব ছিল যে লোকের আকৃতি দেখিয়া শক্তির বিচার করিতাম। মনে করিতাম যে, অধিকাংশ হিন্দুস্থানীর আকৃতি বাঙ্গালীর আকৃতির মত, তাহাদের শরীরে বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক শক্তি কোথা হইতে আসিবে? তবে বাঙ্গালীর সাহস ও তেজ নাই, ইহা জানিতাম। কিন্তু সম-অবয়ব-বিশিষ্ট বাঙ্গালী অপেক্ষা যে একজন হিন্দুস্থানীর শরীরে অধিক শক্তি থাকিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতাম না। আমার সে ধোকা আজ ঘুচিল। লছমন সিং দেখিতে আমা অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইত, আজ সে আমাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া বুকের উপর চড়িয়া বসিল, আর আমি নিরুপায় হইয়া নীচে পড়িয়া রহিলাম!! এই দুই জাতির মধ্যে এই প্রকার পার্থক্য হইবার কারণ কি,দিবা রাত্রি তাহাই চিন্তা করিতাম। চিন্তা করিতে করিতে ধারণা হইল যে, বাঙ্গালীর অবয়ব লম্বা চওড়া হইলেও তাহাতে পদার্থ নাই, সে শরীর ঢিলা, ঢোপ্‌সা মাংসের পিণ্ড বিশেষ। বাঙ্গালীর শরীরের হাড় শক্ত নয়। বাঙ্গালীর শরীরের অবস্থা এরূপ হইবার কারণ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ব্যায়াম ও কুস্তির চর্চ্চা নাই। মনুষ্যোচিত ক্রীড়ার অভাবেই তাহার শারীরিক দুর্গতির কারণ। তাহার পর লছমন সিং যে কথাটা বলিয়াছে, তাহাও ঠিক। খাদ্য দ্রব্যের উপর শক্তির ইতর বিশেষ নির্ভর করে। বাঙ্গালা ভাত ও তেল খাইয়া কিরূপে বলিষ্ঠ

হইবে? পক্ষান্তরে হিন্দুস্থানীদিগের লাঠী কুস্তি ও তলোয়ার খেলা সকলেই জানে, তাহাদের আহারও ঘি ও রুটি।

আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, "আজকার অপমানের প্রতিশোধ যদি না লইতে পারি, তবে আর এ জীবন ধারণ করিব না। এবং আজ হইতেই জীবনের আর একটী লক্ষ্য হইল যে, "যুদ্ধ শিখিব, যুদ্ধ করিব এবং যুদ্ধতে যদি মৃত্যু হয়, তবে জীবনকে ধন্য মনে করিব।"

লছমন সিং আমাদের স্কুলের ছেলেদের মধ্যে সময় সময় আমাদের মল্ল যুদ্ধের কথা উত্থাপন করিয়া আমাকে বড় লজ্জা দিতে লাগিল। আমিও নিরুত্তর থাকিতাম।

ইতি মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে সহরে বড় ধূম পড়িয়া গেল। রাস্তা ঘাট্ পত্র পুষ্পে শোভিত হইল। এক দরবারের অয়োজন হইল। আমরা দরবার দেখিতে গেলাম। মাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। দরবারে দুই শ্রেণীতে দুই জাতীয় লোক আসন গ্রহণ করিলেন, এক শ্রেণীতে শাদা চামড়া ও অপর শ্রেণীতে কালা বা কটা চামড়ার লোক উপবেশন করিলেন। মহারাণীর ঘোষণা পত্র পাঠ হইল। কয়েক জন কাল চামড়াধারী ব্যক্তি রাজা ও রায়বাহাদুর খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া গর্ব্বে বক্ষস্ফীত করিলেন। মাজিষ্ট্রেট দক্ষিণ হস্তে একখানি থালা লইয়া বাম হস্ত দ্বারা কৃষ্ণ চর্ম্মধারিদিগকে পান ও আতর বিতরণ করিলেন। শ্বেতচর্ম্মধারিগণ দাঁড়াইয়া হিপ্ হিপ্ হুররো বলিয়া তিনবার ডাক ছাড়িবার পর দরবার ভঙ্গ হইল। এই উপলক্ষে রাজভক্তি দেখাইবার জন্যই হউক, আর স্বদেশভক্তির জন্যই হউক, দিনাজপুর রাজ সরকার হইতে মহা ধূম-ধামে এক ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা হইতে একজন ব্যায়াম শিক্ষকের আমদানি করা হইল। ইনি লোকটা খুব স্বদেশভক্ত ছিলেন। ইংরেজী জ্ঞান দস্তুর মত ছিল এবং বাঙ্গালা লিখিবার শক্তি ইঁহার বেশ ছিল।

আমরা গবর্ণমেণ্টের স্কুলের অনেক ছাত্র এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলাম। মহোৎসাহে প্রত্যহ ব্যায়াম শিক্ষা করিতে লাগিলাম। ছোলা ভিজান ও আখিগুড় জলপানের ব্যবস্থা হইল। কয়েক জন ছাত্র হোরাইজেণ্টাল বারে এবং প্যারেলাল বারে বেশ দক্ষতা লাভ করিল। আমি মেটেকুস্তি, লাঠি ও তরবারি খেলা এবং দড়াবাজিতে বেশ সুখ্যাতি লাভ করিলাম। কিছুদিনের

মধ্যে আমার শরীরের চেহারার বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। শরীরে রক্ত বৃদ্ধি হইল। মনে দ্বিগুণ স্ফূর্ত্তি হইল। আমরা কতকগুলি ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ছাত্র কিছুদিনের জন্য কাহাকেও গ্রাহ্য করিতাম না, রাস্তায় চলিতে কাওয়াতের ধরণে পদবিক্ষেপে চলিতাম, রাস্তা ঘাটে অপর কাহারো সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, অমনি জামার আস্তানি গুটাইয়া ঘুঁসি উত্তোলন করিতাম। মূল কথা তখন ব্যায়াম গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধরাখানা যেন শরাখানার মত দেখিতে লাগিলাম।

প্রত্যহ ব্যায়ামান্তে, জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার মহাশয় কাওয়াত করাইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখন "জয় ভারতের জয়, কি ভয়! কি ভয়!" এই গানটী সকল ছেলের এত প্রিয় ছিল যে, সকলের মুখেই এই গান শুনা যাইত। মাষ্টারের উদ্যোগে এক সমিতি গঠিত হইল, তাহার নাম হইল "মিত্র সমিতি।" এবং এই সমিতি হইতে "মিত্র" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইল।

এখন আমার লছমন সিংয়ের অপমানের প্রতিশোধ লইবার সময় উপস্থিত হইল। আমি তাহা ভুলি নাই। একদিন তাহাকে বলিলাম "লছমন, তোমরা সঙ্গে হাম লড়েগা।" সে বলিল "ক্যায়ছা লড়েগা? তোমরা লজ্জা নেহি আছে। একবারে তোমারা আক্কেল নেহি হুয়া?" আমি বলিলাম, "নেহি, আমারা লজ্জা নেহি আছে, আক্কেল নেহি হুয়া।" সে বলিল যে "হামি বুঝেছি, তোম্ জিমনাষ্টি ছিক্‌কে হাম্‌রা ছাৎ লড়েগা, আচ্ছা চল।" আমি তাহাকে লইয়া ব্যায়াম বিদ্যালয়ের কুস্তিখোলায় গেলেম। আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। অপর ছেলেরা কৌতুহল পরবশ হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। আমি পালোয়ানদিগের মত কাপড় পরিয়া কোমর বাঁধিলাম। লছমন সিংও কুস্তি জানে, সেও রীতিমত কোমর কসিয়া বাঁধিল। আমার কোমর বাঁধা শেষ হইল কুস্তিখোলা হইতে একটু মাটি লইয়া পালোয়ানদিগের মত দুই বাহুতে বেশ করিয়া ডলিয়া মালিশ করিলাম এবং কুস্তির কায়দানুসারে দাঁড়াইয়া তাল ঠুকিয়া লছমনকে যুদ্ধে আহ্বান করিলাম "আও।" সেও কায়দা করিয়া বলিল "আও।" লছমন সিং এবার আমার কায়দা দেখিয়া প্রথম বারকার মত আর ঘাড়ে মুড়ে ঠাসিয়া ধরিতে সাহস পাইল না। সে এখন আর বড় অগ্রসর হইতেছে না। দুইজনেই ঘাড় বাঁকাইয়া কায়দা করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণের সুযোগ চেষ্টায় রহিলাম। তখন আমাদের

ভাব হইল ঠিক যেমন দুইটা মোরগের লড়াইয়ের মত। মোরক দুইটী যেমন ঘাড় ফুলাইয়া একে অন্তকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে, আমরাও সেইমত করিতে লাগিলাম। লছমনের বিলম্ব দেখিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি সাবধানে কায়দামত লছমনকে ধরিলাম; কিন্তু সেও কায়দা করিয়া ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। আবার দুইজনে ফাঁক হইলাম। পুনরায় আমি অগ্রসর হইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লছমন সিংয়ের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া জোরে টান দিয়া হেলাইয়া আমার বামহস্ত দ্বারা তাহার গলা বাঁধিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে মুখখুঁসি মারিয়া আবার আমার বাঁধ ছাড়াইয়া গেল। তখন আমি খেলান দিয়া প্রলোভন দেখাইয়া আমার মাথাটী নত ও অগ্রসর করিয়া দিয়া আমাকে বাঁধিবার সুযোগ তাহাকে দিলাম। লছমন অমনি আমার উপর পড়িয়া বাহুদ্বারা আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। আমি মাথাটি আরো একটু অগ্রসর করিয়া (অর্থাৎ আমার মাথাটি তাহার পেটের সঙ্গে ঠেকাইয়া দিয়া) একদিকে মাথাদ্বারা তাহার পেটে জোরে চাঁড় দিলাম, অপর দিকে দুই হস্ত তাহার পাছার তলদেশে স্থাপন করিয়া টানিয়া তাহাকে শূন্য করিয়া একেবারে উল্টাইয়া আমার পিঠের উপর দিয়া ধড়াশ করিয়া ফেলিয়া দিলাম। যেই তাহার পতন, অমনি ফিরিয়া তাহার উপরে চড়িয়া বসিয়া বলিলাম "কেমন রুটি খানেওয়ালা, এখন ভাত খানেওয়ালাকো নীচু পড় পড় গিয়া।" তখন সে বড় লজ্জিত হইল। এবং বলিল "ভাই ছোড় দাও, ছোড় দাও।" ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম "আচ্ছা বল আগে হামারা সঙ্গে আউর লড়াই করিবি কি না?" সে বলিল "নেহি করিব।" তবুও আমি তাহাকে ছাড়ি নাই। সে তখন বলিল, "কুড়হন, ছোড় দাও, সেপাই লোক ঐ দেখো আতাহায়। ওন্‌লোক হামকো এইছা দেখেনেছে, বাপকো বোল দেগা। বাঙ্গালীকো সাৎ কুস্তিমে হার গিয়া শুন্‌নেসে, বাপ হামকো ঘর্‌সে নেকাল দেগা।" তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। মনে মনে ভাবিলাম যে, ভিন্ন দেশী লোকগুলি বাঙ্গালীকে কত অবজ্ঞা করে, তাহা এই ছোকরার কথায় একটু আভাস পাইলাম।

বৎসরাবধি ব্যায়াম বিদ্যালয় বেশ চলিল; কিন্তু শিক্ষকের অন্যান্য গুণ থাকা সত্বেও অন্য এক বিশেষ গুরুতর দোষ প্রকাশ পাওয়ায় ছাত্রসংখ্যা কমিতে লাগিল এবং বিদ্যালয়টিকে লোকে তখন প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল না। লোক-চরিত্র বোঝা বড় ভার।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নিজ বাড়ীর কথা।

বিবাহের বরযাত্রী গিয়া পলাইবার পর পাঁচ ছয় মাস যাবত বাটীর কোন সংবাদই পাই নাই। ইতিমধ্যে একদিন আমার নামে বাবুর ঠিকানায় একখান পত্র আসিয়া পৌঁছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

প্রাণাধিকেষু—

বিবাহের ফেরত বরযাত্রীগণের মুখে তোমার হঠাৎ নিরুদ্দেশের কথা শুনিয়া আমরা ব্যস্ত হইয়া দেশের নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া এযাবৎ তোমার কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। তোমার সম্বন্ধে কত জনে কত হৃদয়বিদারক কথা বলিয়াছে, তাহাতে আমাদের প্রাণে যে কি দারুণ ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা তোমার বুঝিবার সাধ্য নাই এবং আমাদিগেরও তোমাকে সে কথা বুঝাইবার সাধ্য নাই। কারণ যাহার ছেলে থাকে, সেই ছেলের শোকের কি যাতনা, তাহা বুঝিতে পারে, তোমার মত নিষ্ঠুর ছেলে তাহা কি করিয়া বুঝিবে? তোমার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আমরা বড়ই মাটি খাওয়া কার্য্য করিয়াছি। তুমি যে এমন, তাহা জানিলে, এমন কাজ কখনই করিতাম না। আমরাও নাকে খৎ দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর জীবনে তোমার বিবাহের কোন কথা বলিব না। তোমার মা তোমার শোকে, আহার-নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাকে যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে একবার দেখা দিয়া যাও। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবা। তোমার পত্র পাইলে এবিষয় আর আর বিস্তারিত পরে লিখিব। ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২ সন।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীহারাধন শর্ম্মণঃ চক্রবর্ত্তী।

পুঃ তোমার বাটী আসিতে এখন আর কোন ভয় নাই, কারণ যে মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছিল, তাহার অন্যত্র বিবাহ হইয়াছে। ইতি।

বাবু ও বাবু গৃহিণীকে পত্রখানি দেখাইলে তাঁহারা খুসী হইয়া একটু

হাসিলেন, তাঁহারা আমার কথা যে সত্য তাহা এখন বুঝিলেন। এবং কহিলেন যে "পত্রের উত্তর সত্বর দাও। এখানে পৌঁছিয়াই তোমার বাটী পত্র লেখা উচিত ছিল। তাহা না লিখিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছ।"

আমি, পিতা মাতা ও খুড়া মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কত কাকুতি মিনতি করিয়া পত্র লিখিলাম। আমি এত দিন লজ্জায় পত্র লিখি নাই, এই এক কারণ দর্শাইলাম। ইহার পর হইতেই পত্রাদি লেখা চলিতে লাগিল। বাটীর, পর পত্রে এবং একজন রসিক বন্ধুর পত্রে যাহা জানিলাম, তাহার মর্ম্ম এখানে লিখিলাম। কোথায়ও আমার খোঁজ না পাইয়া পিতা এক ফকিরের নিকট আমার বিষয় জানিবার জন্য গমন করেন। সে ফকীরের নিয়ম ছিল এই যে, যে কেহ একটী টাকা বা কিছু পয়সা সেলামী দিয়া গিয়া বসিত, বিনা জিজ্ঞাসায় ফকির তাহার মনের কথা বলিয়া দিত। আমার পিতা-ঠাকুরও ফকীরের আস্তানায় গিয়া একটী টাকা রাখিয়া বসিলেন। ফকির তাঁহার আগাগোড়া দৃষ্টি করিয়া, কতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া, বলিল যে "মানুষ হারাই-য়াছে, উত্তর দিকে গেছে, ভাল আছে।" এই তিনটী কথার বেশী সে বলিল না। পিতা আরো কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহার উত্তর দিল না। তখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আমার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে না পারিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন।

আমি দেশে থাকিতে এই ফকীরের কথা শুনিয়াছিলাম। ইহার আস্তানা এমন স্থানে ছিল যে,তথায় দুইটী পথ ভিন্ন অন্য পথে যাইবার সাধ্য নাই। ফকি-রের চরগণ আস্তানা হইতে অনেক দূরে, এই দুই পথের ধারে গোয়েন্দা রূপে বসিয়া থাকিত। কোন আগন্তুক তথায় গেলে ডাকিয়া বসাইত এবং তামাকু সেবন করাইবার জন্য যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিত। সন্দেহহীন সরল পথিক আপন মনের কথা, কথায় কথায় বলিয়া ফেলিত। গুপ্ত চরগণের কেহ উঠিয়া, অন্যমনস্ক ভাবের পরিচয় দিয়া, সরিয়া পড়িয়া, গিয়া ফকীরকে বলিয়া দিত। এইমত প্রায়ই ফকীর আগন্তুকগণের মনের ভাব পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারিত। সেইজন্য কাহারো যদি ঘোড়া হারাইত, তাহা হইলে সে বলিত যে "চারি পায়ার উপর, দোপায়া চড়িয়া, পশ্চিমদিকে গিয়াছে" এবং কাহারো গরু হারাইলে বলিত যে"একটী চারিপায়াকে, একটী দোপায়া,গলায় দড়ি দিয়া লইয়া দক্ষিণ দিক গিয়াছে।" কাহারো কোন ফৌজদারী মোকর্দ্দমা থাকিলে, মোক-র্দ্দমার হাল পূর্ব্বাহ্নে অবগত হইয়া তাহাকে বলিত "আগে ভাল, মধ্যে মন্দ,

পাছে ভাল।" তাহার অর্থ এই যে,আগে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া জিতিয়াছে,মধ্যে জেল হবে,শেষে আপিলে খালাস পাইবে ইত্যাদি। ফকীর এই প্রকার কৌশলে অনেক অর্থ ও যশ লাভ করিয়া করিয়াছিল। তখন মানুষ হারাইলে গণকগণ প্রায়ই বলিত "উত্তরদিকে গেছে," কারণঃ-বাটী হইতে তখন যাহারা গোপনে বাহির হইয়া যাইত, তাহারা প্রায়ই রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য যাইত।

গ্রাম হইতে এক প্রহরের পথ দূরে, এক নমশূদ্রের গ্রামে এক রমণীর উপর "কালীর বার" আসিয়াছে। তথায় এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, প্রত্যহ পূজা হয়। বহুদূর হইতে কত যাত্রীগণ এইস্থলে আসিয়া থাকে। কেহ পাঁঠা মানস করে, কেহ দুধ চিনি দিয়া থাকে। কাহারও যদি কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত রমণীকে বলিলে,সে একদিন উপবাসী থাকিয়া "কালীর নিকট ধরনা দেয়।" কালী তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন। আমার খুড়ামহাশয়ও তথায় গিয়া একটী পাঁঠা মানস করিয়া,তাহাকে মনের কথা কহিলেন যে, "আমাদের একটী ছেলে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সে জীবিত আছে কিনা এবং দেশে আসিবে কিনা ?" কালীর বারগা যুক্তা উক্ত রমণী উপবাস থাকিয়া ধরনা দিল। পরদিন সে কহিল যে "মা স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন যে, তোমাদের ছেলে ভাল আছে, কিন্তু তাহাকে একটী পরীতে ধরিয়াছে। তাহা দ্বারা তোমাদের কোন বিশেষ ফল হইবে না। তাহাকে বিয়ে দিতে তোমরা পারবে না।"

বলা বাহুল্য,কাকা আমাকে পরীতে ধরার কথা শুনিয়া বড় চিন্তিত হইলেন এবং বাটীতে আসিয়া কালীর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। সকলেই এ সংবাদে বড় চিন্তিত ও দুঃখিত হইলেন। কেন না পরীতে ধরা কথাটা সহজ নয়।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন কাশীনাথ হাজরা নামক একজন "কাক্-চরিত্র" আসিয়া উপস্থিত হইয়া,"ছেলে পালায়েছে, ভাল হয়েছে বিদ্যা শিখছে," এই কথা বলিতে বলিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ত্তারা কেহ বাটীতে ছিলেন না। মা, গণক ঠাকুরের মুখে ছেলে পালানের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিলেন এবং "কাকচরিত্র" ঠাকুরকে বসিতে আসন দিলেন। জেঠিমা প্রভৃতি আরো অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া জমা হইলেন। গণকের মুখে ছেলে পালানের কথা শুনিয়া, মা তাহার আশ্চর্য্য

দৈবশক্তির পরিচয় পাইয়া কহিলেন যে,"দৈবজ্ঞ ঠাকুর,ভাল করিয়া গণিয়া পড়িয়া বলত, আমার ছেলে ভাল আছে কিনা এবং দেশে ফিরিবে কিনা?" দৈবজ্ঞ ঠাকুর মাটীতে আঁক পাড়িয়া, আঁক পাড়িয়া, কতক্ষণ হিসাব করিয়া বলিল "তোমার ছেলের নাম দেখতে পাচ্ছি কুড়ণ।" তাহাতে মা বড় খুসী হইয়া কহিলেন যে, "ঠিক, ঠিক, আমার ছেলের নাম কুড়ণই বটে।" গণক জিজ্ঞাসা করিল "তাহার রাশিটা কি?" মা কহিলেন যে, "তাহার সিংহ-রাশি।"

গণক আবার গণিতে লাগিল। মেয়ে মানুষের পেটে কোন কথা থাকে না। মা, জেঠাই-মা প্রভৃতি আমার সমস্ত ইতিহাস আওড়াইতে লাগিলেন এবং তাহা দ্বারা গণককে গণিবার আরো স্থবিধা করিয়া দিলেন।

গণক। ঠাকুরাণ। তোমার ছেলেটা বড় দুরন্ত দেখতে পাচ্ছি, তাহার মাথার উপর অনেক বিপদ পড়িবে। সে বিয়ে করবে না বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এবং বিয়ের বরযাত্রী গিয়া পলাইয়াছে। বড় একটা রিষ্টি দেখতে পাচ্ছি।

জেঠাই মা। ঠিক, সে বড় একগোঁয়ে। বিয়ে করবে না এবং বরযাত্রী গিয়া পলাইয়াছে, তাহাও ঠিক।

মা। ঠাকুর! আমি জানতে চাই, সে ভাল আছে কিনা এবং দেশে ফিরবে কিনা?

গণক। (আবার গণিয়া বলিল যে) পাঁচশিকার পয়সা আন, আমি একটা কবজ দিচ্ছি। এই কবজটা প্রত্যহ স্নান করিয়া, পূজা করিয়া, ধুইয়া জল খাইবা। তোমার ছেলের কোন অমঙ্গল হবে না। তিন বৎসরের মধ্যে সে বাড়াতে ফিরবে। তাহার পাছে যে রিষ্টি আছে, তাহা এই কবজে কাটিয়া লইবে।

মা এই কবজের কথা শুনিয়া,তাড়াতাড়ি পাঁচসিকারপয়সা আনিয়া দিলেন। কাশীনাথ হাজরা তাহার ঝোলার মধ্য হইতে কি একটু গাছের শিকড় লইয়া, একটা তামার তাবিজে পূরিয়া, মাকে দিল। মা আমার মঙ্গল কামনার জন্য তাবিজটীকে কপালে ছেঁায়াইয়া গলায় ধারণ করিলেন। গণক চলিয়া গেল।

একদিন পাবনা জেলা হইতে একটি ভদ্রলোক, আমাদের গ্রামে কোন কুটুম্ববাডী আসিয়া গল্প করিয়া বটাইলেন যে, কিছুদিন হইল ব্রহ্মপুত্রের চড়ার মধ্যে ডাকাইতে একখানা নৌকা মারিয়াছে এবং তাহার চড়নদারগণকে খুন করিয়াছে। সে সঙ্গে একটি অল্পবয়সী ব্রাহ্মণের ছেলেও খুন হইয়াছে। এই

কথা আমার বাড়ীর লোকে শুনিয়া মহাব্যস্ত হইলেন এবং মা কাঁদিতে লাগিলেন।

গ্রামের তাশপাশা, দাবার আড্ডায় আমার সম্বন্ধে কত গাঁজাখোরী গল্প হইতে লাগিল। কেহ বলিল যে,"কুড়ণ জীবিত নাই,নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা না হইলে বাটীতে অবশ্যই সংবাদ দিত।" কেহ বলিল যে,যশোর জেলার এক বাড়ীতে একটি বিদেশী ব্রাহ্মণের ছেলে থাকিত,তাহাকে সাপে কাটিয়া মারিয়াছে। বোধ হয় সে কুড়ণই বা হইবে।" লোকে এইমত যত আজগবি সংবাদ সকল আমার নামে রটাইয়া, আমার পিতামাতাকে আরো ব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে যে গ্রামে আমরা বিবাহের বরযাত্রী গিয়াছিলাম, সেই বিবাহ বাড়ীর একটি ভদ্রলোক গ্রামের মজুমদারদিগের বাড়ীতে আসিয়া, নানা কথায় কথায় কহিলেন যে, "সম্প্রতি আমাদের গ্রামের রায় মহাশয়ের স্ত্রী দিনাজপুর হইতে পত্র লিখিয়াছেন যে "আমাদের সঙ্গে যে একটী ব্রাহ্মণের ছেলে আসিয়াছে, সে স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়াশুনা করিতেছে।" এই কথা আমার বাটীর লোকে শুনিয়া রায় বাবুর ঠিকানা লইয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন।

যে পাত্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, তাহাকে আর সমঘরে বা ভাল ঘরে বিবাহ দিতে না পারিয়া নীচ ঘরে বিবাহ দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদার হানি হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নানা কথা।

(১)

প্রেমের আভাস।

সৌদামিনীও তাহার মায়ের মত সুন্দরী ছিল। তাহার সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কান্তি, পরিপুষ্ট, রঞ্জিত গণ্ডদেশ, উজ্জ্বল, কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয়, অর্দ্ধ বৃত্তাকার কৃষ্ণ ভ্রূদ্বয়, গোলাপী বর্ণের পাতলা ওষ্ঠ দুখানি, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ কুঞ্চিত, কৃষ্ণ কেশদাম এবং সরু কোমরের গঠনে, তাহার ভাবী লাবণ্যের ছায়া প্রতিফলিত হইত। ইহার উপর তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গৃহকার্য্যে পটুতা, লেখা

পড়ার উৎকর্ষতা ও মৃদু স্বভাব থাকায় তাহাতে যেন সোণার সোহাগায় মিল হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রফুল্ল ও সৌদামিনী আমার বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে আমায় সৌহার্দ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সৌদামিনী আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। সে ভালবাসা নিরেট খাঁটি ভালবাসা, তাহাতে স্বার্থের লেশ মাত্র ছিল না। সে নিশ্চয়ই আমাকে শিক্ষক বলিয়া ভালবাসিত, তাহাতে কি কোন সন্দেহ হইতে পারে? কেন না, বার তের বৎসর বয়সের বালিকার প্রাণে সবল ভাবের ভালবাসা ভিন্ন অন্য প্রকার ভালবাসা সম্ভবে না। এ বয়সে যে তাহার অঙ্গের গঠন সম্পূর্ণ হয় না। ইউরোপ, ব্রহ্মদেশ, চীনদেশ ও জাপানে এ বয়সের বালিকার, কোন যুবকের প্রতি ভালবাসা, খাঁটি সবল ভাবের ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। কারণ এই সকল দেশে, এই সকল বয়সের বালিকাদিগকে স্ত্রীত্বে পরিণত করিতে তাহারা অনভ্যস্ত। ইহা কেবল দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষেই শোভা পায়! এবং উপন্যাস লেখকগণও এই বয়সের বালিকাদিগকে প্রেমরাজ্যে টানিয়া লইয়া বাঞ্ছিত বরের সঙ্গে বিবাহ ঘটাইয়া থাকেন। কিন্তু এই বয়সে, সেই বালিকার মনে কি দাম্পত্য প্রেম জাগিতে পারে? কখনই না। তবে অভ্যাস, সমাজ ও সংসর্গগুণে, কোন্ দেশে কি না সম্ভবে? কাঁচা কাঁঠাল পাকান যেমন সম্ভব হয়, এ পোড়া দেশে ঈদৃশ বালিকাগণকে জোর করিয়া স্ত্রীত্বে পরিণত করাও তাদৃশ! হরি! হরি! একথা মনে করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। পাঠক পাঠিকাগণ! মাপ করিবেন, আমার এই কথায় যদি কোন অশ্লীলতা বা অযুক্তি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ভরসা করি যে; তাহা আপনারা নিজগুণে উপেক্ষার চক্ষে দৃষ্টি করিবেন না।

সৌদামিনী আমার আহারের জন্য বিশেষ যত্ন করিত। স্কুল হইতে কোন দিন বাসায় পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে, তাহার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিত। আমাকেও বাধ্য হইয়া তাহার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইত, তাহা না দিলে সে ছাড়িত না। সময় সময় এমনও বলিত যে পণ্ডিত মহাশয়কে বাসায় না দেখিলে যেন বাসা খালি খালি বোধ হয়। সৌদামিনীর মাও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনিও কোন দিন বাসায় ফিরিতে বিলম্ব হইলে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন।

সৌদামিনীর প্রতি আমার আকর্ষণটা যেন দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সত্যের অনুরোধে লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার প্রতি তাহার যে ভালবাসা, তাহা নিঃস্বার্থ ও সরল ভাবের হইলেও, তাহার প্রতি আমার যে ভালবাসা, তাহা যেন সরলতার সীমা অতিক্রম করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এমন হইল যেন তাহার সেই নিখুঁৎ সুন্দর ছবি খানি আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া পড়িল। তাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে যেন প্রাণ উদাস বোধ হইতে লাগিল। তাহার মুখখানি দেখিলে এবং তাহার সঙ্গে দুটা কথা বলিতে পারিলে, মনে যেন অপার আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। তাহার সেই গোলাপী রং এর পাতলা ওষ্ঠ দুখানি বিস্ফারিত করিয়া সে যখন ঈষৎ হাসিত এবং তাহার সেই সরলতাব্যঞ্জক, পটলচেরা, কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু দুটি দিয়া আমার প্রতি যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, তখন বাস্তবিকই আমি আত্মহারা হইয়া যাইতাম। আমার মনের এই ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া, আমাকে যেন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। আমার যে চিন্তা করার অভ্যাস এবং যতগুলি চিন্তার বিষয় আশু মজুত ছিল, তাহার মধ্যে সৌদামিনীর ছবিখানি আসিয়া উপস্থিত হইয়া আর একটী চিন্তার বিষয় বৃদ্ধি পাইল। এখন এমন হইল যে, কখনও কোন বিষয় চিন্তা করিতেছি অথবা পড়াশুনায় মনোযোগ দিয়াছি, অমনি হঠাৎ সৌদামিনীর চিত্র আসিয়া অন্য সকল চিন্তার বিষয় গ্রাস করিয়া ফেলিতে লাগিল।

আগাগোড়া ভাবিয়া ভাবিয়া কখন কখন বুদ্ধির গোড়ে জল যাইত। তখন ভাবিতাম, আমি কি বাতুল! আমি এত দিনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চলিলাম। পিতা বিবাহ দিবার জন্য সম্বন্ধ স্থির করিলেন, আমি জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব বলিয়া বিবাহের ভয়ে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগকে কত কাঁদাইলাম এবং একটী নির্দ্দোষী বালিকাকে কলঙ্কিত করিলাম। জীবনের যে মহৎ কার্য্য করিব বলিয়া বাল্যকাল হইতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি, আজ সেই কঠিন, অটল হৃদয় একটী বালিকার জন্য দমিয়া গেল! উঃ! মানুষের হৃদয় কি দুর্ব্বল! মানুষের সংকল্প কি ক্ষণভঙ্গুর! মানুষ কেমন অলক্ষিতভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হয়!! এই সকল চিন্তা মনে উদয় হইয়া, কখন কখন আবার একটু প্রতিক্রিয়া হইতে লাগিল।

আবার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, কেন সৌদামিনীর প্রতি আমার ভালবাসাটী কি অস্বাভাবিক, না নীতিবিরুদ্ধ? বরং সাংসারিক লোকের পক্ষে এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে ইহাই স্বাভাবিক। এত অপবিত্র ভাব নয়, এ যে বিশুদ্ধ প্রেমের ভাব। দেব ভাব!

প্রলুব্ধ মনের গতির অনুকূলে যে ভাব ও যুক্তি মনে উদয় হয়, তাহা অতি প্রীতিকর। সেইজন্য উপরের লিখিত ভাব ও যুক্তিটী যখন মনে উদয় হইত, তখন মনে শান্তি উপস্থিত হইত, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। তৎক্ষণাৎই মনের মধ্যে পুনরায় প্রশ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল যে, আচ্ছা তাহা হইলেত এ বালিকাকে ভালবাসিয়া পরিণামে দুঃখ পাইতে হইবে। কেন না তাহার পিতা অবস্থাপন্ন লোক, আর আমি একজন অজ্ঞাত কুলশীল, অর্থশূন্য আশ্রিত ব্যক্তি। বামন হয়ে চাঁদে হাত! তাহাতে আবার আমি তাদৃশ রূপবান ও বিদ্বান নই। এ প্রকার বৈষম্য বিদ্যমানে দুঃখ পাওয়া ভিন্ন আর কি? আর যদিই অঘটন ঘটে, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে তাহা হইলে আমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কৈ? ধিক্ আমাকে। আমি তাহাকে নির্দ্দোষ ভাবে ভালবাসিব, ঠিক, সে যেমন আমাকে ভাল বাসে। একটী সরল শিশুর ন্যায় আমি তাহাকে ভালবাসিব।

কিন্তু দুষ্ট মনকে বুঝান বড় দায়। মনের মধ্যে দিবানিশি এই ভাবে দেবা-সুরের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে জয় পরাজয় কাহার, তাহা স্থির হইল না। কখনও দেবতার জয়, কখন বা অসুরের জয় হইতে লাগিল। এই মহাহবে আমার হৃদয়-রাজ্য যেন ছারখার হইতে লাগিল। অসুরগণ, ন্যায় ও ধর্ম্মের মাথা খাইয়া, সেই নির্দ্দোষী দেবীকে আমার হৃদয় রাজ্যের সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দেবগণ তাহাতে সম্পূর্ণ নারাজ। দেবগণ বলেন যে, তাহা হইলে ধর্ম্ম রহিল কই? বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা আসিয়া পড়িল যে? এই দুই পক্ষের এক পক্ষের স্থায়ী জয় না হইলে, চিত্ত-রাজ্যে শান্তি নাই। আমার চিত্ত-রাজ্যে, রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হইয়া, অসুরগণের দিন দিন প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, দেবগণ, ক্ষুব্ধ হইলেন।

(২)

তিন জনের তিন বিপরীত ভাব। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাবুর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। বাবু জায়া, বাবুর চরি-ত্রের বিষয় পূর্ব্বে অনেকটা অবগত ছিলেন, কিন্তু এবারকার সঙ্গদোষে তাঁহার অবস্থা যে এত বিগ্ড়াইয়া যাইবে, তাহা তিনি মনেও ভাবেন নাই। এবং তাঁহার হিতৈষী বন্ধুগণও এ বিষয় মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করেন নাই। অর্থের প্রচুর সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। নিমন্ত্রণের ভাণ করিয়া বাবু প্রায় প্রত্যহ অনুপস্থিত রহিতে লাগিলেন। বাসার ও পরিবারের প্রতি খেয়াল একেবারে

কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এক দিকে মহানন্দ, অপর দিকে ঘোর বিষাদের ছায়া পড়িল। বাবু-জায়া মনোকষ্টে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৌদামিনী পিতৃ চরিত্রের এবং মাতৃ মনকষ্টের বিবয় বুঝিত, কিন্তু অবোধ প্রফুল্ল না-ছোড়। সে মাকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিলে জিজ্ঞাসা করিত, "মা, তুমি কাঁদ কেন? বাবু কি তোমাকে মেরেছে, না বকেছে?" প্রফুল্ল বাপকে বাবা বলিত না, 'বাবু' বলিয়া ডাকিত। তাহার মা এ শিশুকে আর কি জবাব দিবেন? তিনি নীরব থাকিতেন। প্রফুল্ল মায়ের কাছে কোন উত্তর না পাইয়া, বাপকে বাসায় পাইলে বাপেব গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত "হাঁ বাবু! তুমি বুঝি মাকে বকেছ, তুমি মাকে ভালবাস না, সেই জন্য মা সকল সময়েই কাঁদেন?" বাবু আর এ কথায় কি উত্তর দিবেন? তিনি প্রফুল্লের কথা শুনিয়া বলিলেন "দূব পাগ্‌লা, এ কথা তোকে কে বল্লে?"

প্রফুল্ল। তবে তুমি বাসায় থাক না কেন, যাও কোথায়?

বাবু। আমার নানা কাজ, কাজ করিতে যাই, কখনও নিমন্ত্রণ খাইতে যাই, কখনও বেড়াইতে যাই।

প্রফুল্ল নাছোড়বান্দা! সে বাপের কৈফিয়ৎ লইয়া আবাব দৌড়িয়া গিয়া মায়ের কোলে বসিয়া মাকে কহিল, "মা! আমি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে তুমি বুঝি মাকে ভালবাস না, সেইজন্য মা সর্ব্বদা কাঁদেন। তাহাতে বাবু বলিলেন যে, দূর পাগলা, মিথ্যা কথা, তোর মা অনর্থক কাঁদে। বাবু আরো বলিলেন যে, তাঁহার অনেক কাজ, তিনি কাজ করিতে যান, কখনও নিমন্ত্রণ খাইতে যান, কখনও বেড়াইতে যান। হাঁ মা! একি সত্যি কথা? মা বাবু রাত্রিকালে তোমার ঘরে আসেন না, সেইজন্য তুমি কাঁদ?"

বাবু-জায়া। চুপ কর পাজী ছেলে, তা শুনে তোর দরকার কি?

প্রফুল্ল। তবে বল তুমি কাঁদ কেন? তাহা না বলিলে আমি ছাড়ব না।

বাবু-জায়া। তাঁর ওসব মিথ্যা কথা, কাজ কাম কিছুই না।

প্রফুল্ল। তবে বল তিনি কোথায় যান?

বাবু-জায়া। (ছেলের হাত এড়াইতে না পারিয়া) তিনি তোমার অন্য মায়ের বাড়ী যান।

এই কথা শুনিয়া ছেলের মুখ লাল হইল, সে বলিল "কি বাবু অন্য মায়ের বাড়ী যান?"

অন্য মা আবার কে? আমার মা থাক্‌তে অন্য মায়ের বাড়ী যান!

আচ্ছা আজ বাবু বাড়ী আসিলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিব, অন্য মাটা কে ?"

ইহার কিছু কাল পরেই বাবু বাসায় আসিলেন। প্রফুল্ল, বাবু আসিবার সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া বাহির বাড়ীতে গেল এবং বাবুর নিকটে সরোষে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু তাহাকে কোলে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আজ সে বাবুর কোলে কিছুতেই গেল না। প্রফুল্ল আরক্তিম লোচনে রোশভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবু, তুমি নাকি অন্য মায়ের বাড়ী যাও ? তোমার কাজ কামের কথা সব মিথ্যা। তুমি আমার মার বাড়া ছেড়ে, অন্য মায়ের বাড়ী যাও, ছি ! ছি ! মা বলেছেন আমরা এখানে আর থাকব না, দেশে চলে যাব। থাক তুমি অন্য মা নিয়ে।" বাবু শিশুর ছোট মুখে, ক্রোধব্যঞ্জক এত বড় কড়া কথা শুনে মুখখানি কালী করিয়া ফেলিলেন। লজ্জায় অধোবদন হইলেন। নিকটে একটী বাবু ছিলেন, তাঁহার এ বিষয়টা আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

বালক প্রফুল্ল, বাবাকে জব্দ করিয়া ক্রোধে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়া,মায়ের কোলে বসিয়া বাবাকে যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সমস্ত বলিল এবং তাহার বাপ যে লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর রহিলেন, তাহাও বলিল। তাহার মা শিশুর মুখচুম্বন করিয়া আবার অশ্রু বর্ষণ করিলেন।

আজ তৃতীয় বর্ষে পতিত হইল, আমরা দিনাজপুরে আসিয়াছি, কিন্তু এ প্রকার অশান্তি বাসায় আর কখনও লক্ষ্য করি নাই। তিন জনের তিন বিপরীত অবস্থার মধ্যে বাবুজায়া ও বাবুর কথা বলিলাম এবং আমার কথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সৌদামিনীর বয়স এখন তেরতে পতিত হইয়াছে। ক্রমেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, আর তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর যৌবনের রশ্মি আসিয়া পড়িয়া, তাহার লাবণ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার লাবণ্য যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আমার আকর্ষণটা তাহার উপর ততই বাড়িতে লাগিল। মনোমধ্যে সেই দেবাসুরের যুদ্ধে, অসুরেরই জয় হইবে, এমন বোধ হইতে লাগিল। এই তিন জনেই মনের শান্তি হারাইলাম। আমার এবার শেষ পরীক্ষা, কিন্তু পড়াশুনা জাহান্নামে গেল। ক্লাসে ক্রমে অধোগামী হইতে আরম্ভ করিলাম। সহপাঠীগণ আমার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে "হায় ভগবান ! এ বিপদ হইতে কত দিনে কি প্রকারে রক্ষা

পাইব ? আমার ভবিষ্যৎ যে মাটী হইতে চলিল। ইতিমধ্যে একটী ঘটনা ঘটিল, তাহাতেই আমি রক্ষা পাইলাম।

(৩)

একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, রায়-গৃহিণীর শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ। সৌদামিনী ও প্রফুল্ল সকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইলে পর, তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ বাসায় কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। যখন বেলা প্রায় এক প্রহর হইল,তখন সৌদামিনী মাকে ডাকিল,প্রফুল্ল'মা মা' করিয়া কত ডাকিল, কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বাসায় চাকরগণের সন্দেহ হইল, আমিও অতি সন্দেহযুক্ত ও ভীত হইলাম। ভিতরে যে কোন লোক আছে, তাহা বোধ হইল না। তখন প্রফুল্ল ও সৌদামিনী 'মা মা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাবু বাসায় নাই। চাকর দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। তিনিও ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কক্ষের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর গিয়া দেখেন যে ঠাকুরাণী অজ্ঞানবস্থায় পড়িয়া আছেন। বাবু ত্রাসযুক্ত হইয়া দৌড়িয়া গিয়া গাড়ী করিয়া সিবিল সার্জ্জনকে আনিলেন। ডাক্তার সাহেব আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া অহিফেন সেবনদ্বারা এরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিলেন। নাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসও স্বাভাবিক কিন্তু ডাকিলে কথা বলেন না। সম্পূর্ণ অচৈতন্যতার চিহ্ন বিদ্যমান। ডাক্তার সাহেব ষ্টমাক্ পাম্প নামক যন্ত্র দ্বারা তাঁহার পাকস্থলি ধৌত করিয়া যে জল বাহির করিলেন, তাহা কালবর্ণের ও অহিফেনের গন্ধযুক্ত। রোগীর বাহুর চর্ম্মমধ্যে এট্রোপিন নামক ঔষধের পিচকারি দিলেন, রোগীকে চা ও কাপির জল ঘন ঘন পান করাইতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে, দুইজন লোক তাঁহাকে ধরিয়া হাঁটাতে থাকুক এবং একখানি কাপড় পাকাইয়া দড়ার মত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া চৈতন্য জন্মাইতে চেষ্টা করা হউক। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। ঠাকুরাণীর অবস্থা দেখিয়া বাবু "হায়! হায়!" করিতে লাগিলেন এবং ছেলে পিলে কাঁদিয়া অধীর হইল।

সাহেব, ঠাকুরাণীর অহিফেন সেবনের কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন এবং তজ্জন্য বাবুকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। যাইবার কালীন একটী উকীল বাবুকে গোপনে কিছু বলিয়া গেলেন।

এই সংবাদ সহরময় টেলিগ্রাফের সংবাদের মত রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। উকীল,

মোক্তার ও আমলাগণে বাসা ভরিয়া পড়িল। অনেক মহিলাগণ আসিয়া বাসায় মজুদ হইলেন। বাবুর প্রতি, হিতৈষী বন্ধুগণের (অবশ্য স্বার্থাপর বন্ধুগণ নয়) তীব্র-ভর্ৎসনায় বাবুর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

এদিকে বাবুজায়াকে জোর করিয়া হাঁটান ও মাঝে মাঝে প্রহারের চোটে তিনি হাঁ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন এবং ডাকিলে দুই একবার "আঁ" করিয়া সাড়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার সংজ্ঞা লাভ হইতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে জড়তাযুক্ত জিহ্বায় দুই একটা কথার জবাব দিলেন, সকলের মনে ভরসা হইল। আস্তে আস্তে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। তখন চক্ষু মেলিয়া তাকাইলেন।

তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছিল, ডাক্তার সাহেবও যাইবার কালীন সেই উকীল বন্ধুকে তাহা বলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষণ বাহ্যিক যত গুরুতর প্রকাশ পাইয়াছিল, বাস্তবিক তাহা তত গুরুতর হইয়াছিল না। প্রকৃত পক্ষে তিনি অজ্ঞান আদবেই হইয়াছিলেন না এবং তাঁহার মরিবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। তবে যে পরিমাণে আফিং তিনি খাইয়াছিলেন, তাহাতে ঘোর নেশা হইয়াছিল এবং সময়মত চিকিৎসা না করিলে অবস্থা সম্ভবত গুরুতর হইত। কিন্তু সজ্ঞান থাকিয়া যে প্রথম প্রথম কোন কথার সাড়া দিয়াছিলেন না এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্যতার ভান করিয়াছিলেন, সে কেবল বাবুকে ভয় দেখাইবার জন্য। বাবুজায়ার সুস্থ হইতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। দর্শকগণ চলিয়া গেলেন এবং বাবুও কয়েক দিন যাবৎ কুস্থানে যাওয়া বন্ধ করিলেন।

বাবুর বন্ধু বান্ধবগণের পরামর্শে পরিবার দেশে পাঠানের সংকল্প হইল। একটী বাবু সপরিবারে দেশে যাইবেন, তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরাণীকে দেশে পাঠান স্থির হইল। তাঁহাদের যাত্রা করিবার দিন ধার্য্য হইল।

বাবু-গৃহিণীর যাত্রার দিনে বাসায় এক রোল কান্না পড়িয়া গেল। তিনি স্বয়ং কাঁদিয়া অধীর হইলেন, স্বামী নির্দ্দয় হইলেও সতী স্ত্রী কি তাঁহাকে ভুলিতে পারে? বাবুকে "ডাকিনীর" হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন, এই তাঁহার কান্নার প্রধান কারণ। আর তিনি এখানে এ অবস্থায় থাকিয়াই বা কি করেন? চক্ষের উপর এত অন্যায় দেখা অপেক্ষা দূরে আড়ালে গিয়া থাকাই ভাল। তাঁহার পক্ষে উভয় সঙ্কট হইল। প্রফুল্ল কাঁদিল, সৌদামিনী তাহার বাপের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইল। সেই সঙ্গে আমিও কাঁদিয়া আরো গুল-

জার করিয়া তুলিলাম। বাবু-জায়া আমাকে এত ভাল বাসিতেন এবং প্রফুল্ল আমার এত বাধ্য ছিল যে, তাঁহাদিগকে ছাড়িতে আমার মনে বড় কষ্ট হইলেও আমার কাঁদার প্রধান কারণ হইল, সৌদামিনী। সৌদামিনীকে না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকিব, সেই জন্য আমি আরো কাঁদিলাম। বাবুজায়া যাত্রা-কালে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন যে, "তুমি যখন বাড়ী যাও, তখন আমার সঙ্গে অবশ্য২ সাক্ষাৎ করিবা।" এবং সৌদামিনীও কাঁদিতে ২ আমাকে প্রণাম করিয়া কহিল "পণ্ডিত মহাশয় বাড়ী গেলে অবশ্য ২ আমাদের বাড়ীতে একবার যাইবেন।" আমিও কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে অনুরোধে সম্মতি প্রদান করিলাম। সকলে প্রস্থান করিলেন, কতক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া যত দূর দৃষ্টি চলিল, তত দূর পথ পানে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যখন তাঁহারা দৃষ্টির অগোচর হইলেন, তখন ভগ্নমনে বাসায় ফিরিলাম। বাসায় ফিরিয়া কি সুস্থ থাকিবার সাধ্য! যেখানে সৌদামিনী বসিয়া লেখা পড়া করিত, যেখানে সে কার্য্যাদি করিত,—সেই সকল স্থানে শূন্য দেখিয়া প্রাণ যেন আই ঢাই করিত। স্কুলে যতক্ষণ থাকিতাম, ততক্ষণ ভাল থাকিতাম। কিন্তু বাসায় আসিয়া মন উদাস হইয়া যাইত। পড়া শুনা হইত না। তখন বাসায় না থাকিয়া অন্যত্র বেড়াইতে যাইতাম। বিচ্ছেদ যাতনাটা দায়ে পড়িয়া ক্রমে সইয়া যাইতে লাগিল। কোন রাত্রিতে স্বপনে সৌদামিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ আকুল হইত। সে যেন আসিয়া পণ্ডিতমহাশয় বলিয়া ডাকিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছে। প্রফুল্ল যেন দৌড়িয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কত নূতন সংবাদ আমাকে দিতেছে। কালে সকলই সহ্য হয়, এ যাতনাও ক্রমে সহ্য হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহাদের কথা ভুলিতে লাগিলাম। সৌদামিনীকে ভুলিবার সঙ্গে ২ অসুরগণ দায়ে পড়িয়া পরাস্ত হইল, দেবগণের জয় হইল।

বাবু গৃহিণী বাসা পরিত্যাগের পর কিছু দিন পরে, বাবুর অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল। আমাদের চক্ষে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় বলিয়া অনুভূত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে দূরের গঙ্গা নিকটে আসিয়া, যে বীভৎস কাণ্ড অন্যত্র হইত, তাহার অভিনয় এখন বাসায় হইতে আরম্ভ হইল। অবিদ্যা স্বশরীরে বাসায় বিদ্যমানা হইল। একেত মনসা, তাহাতে ধূনার গন্ধ। অল্প দিন মধ্যে ক্রমে তিনটী ভাতুড়ে এয়ার আসিয়া বাসায় জুটিল। বাবুর এই এয়ার ত্রয়ের মধ্যে এক এক জন, এক এক সাবজেক্টের মাষ্টার ছিলেন। এক জনের নাম ছিল ঘোষ, তিনি গঞ্জিকায় এত পটু ছিলেন যে,এক দমে কল্‌কে ফাটাইতে

পারিতেন। আর একজনের নাম ছিল সান্নাল, তিনি এক বৈঠকে একটী বোতল ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি উদরস্থ করিয়াও অটল থাকিতেন। তৃতীয় জনের নাম ছিল মজুমদার। ইনি চণ্ডুর নেশায় দিবানিশি ঢুলু ঢুলু হইয়া থাকিতেন। কিন্তু ইহাদের এক এক জনে এক এক বিষয়ে অনার হইলেও, অপর সবজেক্টগুলিতেও সকলেরই অধিকার ছিল, মজলিশে ইহা বলিবার সাধ্য ছিল না যে "আমি উহাতে নয় মহাশয়" মূল কথা, মাতাল, গেঁজেল, আফিংখোর এবং বেশ্যার অভিনয়ে বাসাটী যেন নরককুণ্ডে পরিণত হইল। তখন মনে মনে ভাবিতাম হায়! এ নারকীয় সংসর্গে আর কত দিন বাস করিব। বাসায় একটী উড়ীষ্যা দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি ও আমি এই দুই জনে "পশু-আত্মা" বিশিষ্ট ছিলাম। আমাদিগকে কি কেহ মনুষ্যের মধ্যে তখন গণ্য করিত? বাসার অবস্থা দিন দিন এমন হীন হইল যে, ভদ্রলোকেরা এ বাসায় আসা পরিত্যাগ করিল। কোন ভদ্রলোক বাসায় আসিতে পাইত না, কারণ সর্ব্বদাই বাসার সদর দরজা বন্ধ থাকিত। কোন কোন দিন স্কুল হইতে বাসায় ফিরিলে এই প্রকার দরজা বন্ধ দেখিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাসায় ঢুকিতে হইত।

(৪)

আমার তহবীল।

যখন পল্লীগ্রামে মাইনর স্কুলে পড়িতাম,তখন আমার সম্বল সেই ফলাহারের দক্ষিণা ২৫ পঁচিশ টাকা ছিল। ঐ টাকার কতক কোঁচার খোঁটে, কতক কাছার কিনারায় বাঁধিয়া রাখিতাম। একথা পাঠকের স্মরণ আছে। স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় এক বস্ত্র হইতে বস্ত্রান্তরে উহা নীত হইত। বাটী পরিত্যাগ করা অবধি আমার আয় একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। দিনাজপুর সহরে আসিয়া যত ফলহার খাইলাম,তাহাতে এক পয়সাও আয় হইল না। রাত্রিকালে কায়স্থ, বৈদ্যগণের পিতৃ মাতৃ একদৃষ্ট শ্রদ্ধাদ্ধের যত নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলাম, তাহাতে দক্ষিণা পাওয়া দূরের কথা, মাতালগণের হাতের অর্দ্ধচন্দ্র লাভ হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকিত। সুতরাং সহরে ও বাহিরে মড়ক লাগিলেও তাহাতে আমার লাভ মাত্র ছিল না। এই দুই তিন বৎসরের আয়ের পরিবর্ত্তে আমার সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হইতে লাগিল। কখনও নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করিতে হইত; মাঝে মাঝে আমৃতি ও রসগোল্লা নিজে খাইতাম এবং সৌদামিনী ও প্রফুল্লকে খাওয়াইতাম। এই সকল বাবদে তিন বৎসরে আমার পনর টাকা খরচ হইয়া গেল, মাত্র দশটি টাকা হাতে

রহিল। মনে মনে চিন্তিত হইলাম। ভাবিলাম হায়! কৃপণের ধন বুঝি এই মতই যায়। তিন বৎসরে পনর টাকা খরচ সোজা কথা নয়?

মনে মনে চিন্তা হইল কি করিয়া নষ্ট ধনের উদ্ধার করিব। তবে ইচ্ছা থাকিলেই উপায় আসিয়া যুটে। এক দিন স্কুলে এক সাহেবের ঘোড়ার চিটি খেলিবার এক ফর্দ্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘোড়াটীর মূল্য তিন শত টাকা। পাঁচ টাকা করিয়া এক এক টিকিট। আমি সাহসে নির্ভর করিয়া এক টিকিট লইলাম। শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কয়েক খানা টিকিট লইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে চিটি খেলিবার নোটিশ আসিল। আমি তথায় গেলাম। ষাটটী নম্বরের মধ্যে আমার নাম মধ্যে। প্রথম কয়েক জন সাহেবের নাম। তাহারা খেলিল, তাহাদের কাহারো ২৫, ৩০, ৩৫ নম্বরের উপর পাইল। অবশেষে আমার নম্বর উপস্থিত হইল। আমি অতি ভক্তিমনে যত্নের সহিত তিনবার ছক নিক্ষেপ করিলাম। আমার নম্বর হইল ৫৪, ইহা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও হতাশ হইল। পরে আর যতজন নিক্ষেপ করিল, কেহই আমাকে ছাড়াইতে পারিল না। কাহারো চল্লিশ, কাহরো উনপঞ্চাশ, এইমত হইল। সুতরাং ঘোড়াটী আমার ভাগ্যেই পড়িল। আমি মহানন্দে ঘোড়াটী লইয়া বাসায় আসিলাম। কয়েক জন লোক আমার ঘোড়া খরিদ করিবার জন্য আসিল। আমি তিন শত টাকা হাঁকিয়া বসিয়া রহিলাম। খরিদারগণও জানিত যে আমি স্কুলের ছেলে, এত বড় ঘোড়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাহারা সস্তা মূল্যে খরিদ করিবার জন্য ইচ্ছুক রহিল। অবশেষে দুই শত টাকা মূল্যে রফা হইল। আমিও নগদ দুই শত টাকা গণিয়া লইয়া রক্ষা পাইলাম। কেন না ঐ ঘোড়া যত দিন রাখিব, প্রত্যহ তাহার খোরাকীখরচ ও একজন সইসের বেতন লাগিবে।

টাকা দুই শত রাখিব কোথায়? অন্যত্র কাহাকে বিশ্বাস করে রাখা যায় না। অবশেষে বাবুর হাতে টাকাগুলি দিলাম। আমার প্রথম ভোজন দক্ষিণা চারি আনায় দুই শত টাকা জমিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বাটী প্রত্যাগমন।

কয়েক মাস পরে স্কুলে শেষ টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেল। পরীক্ষার ফল জানিতে পারিলাম যে, আমি টেষ্ট পরীক্ষায় ফেল হইয়াছি। পরীক্ষায় আমার ফেল হইবার কোন কথা ছিল না। পরীক্ষায় ফেল হইয়া বড় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম যে সৌদামিনীই যে আমার ফেলের কারণ তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তবে সৌদামিনী নিশ্চয়ই সেজন্য দায়ী নহে, আমি সেজন্য দায়ী।

বাটী হইতে মাস মাস পত্র আসিতে লাগিল। তিন বৎসর বাড়ী ছাড়া, বাটী যাওয়াই সংকল্প করিলাম, কারণ বাসায় আর ভদ্র লোকের বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বাবু স্বয়ং পাপে ডুবিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার আর অন্য কিছু দেখিবার অবসর নাই।

জল পথে বাটী যাওয়ায় কোন সঙ্গী পাইলাম না। স্থল পথে যাইতে সংকল্প করিলাম। দিনাজপুর হইতে ১৮ ক্রোশ উত্তরে ঠাকুরগঞ্জ আমার পরিচিত একটী আত্মীয় মুন্‌সেফ কোর্টের নাজির ছিলেন। তিনি দেশে যাই-বেন। তাঁহার সঙ্গে যাওয়া স্থির হইল। বাবুকে বলিলাম, তিনি আর কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু আমার গচ্ছিত টাকাগুলি দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইলেন। গঞ্জিকা সেবী, ভাতুড়ে এয়ারটী আমাকে বলিল যে, তোমার টাকাগুলি বাবু-প্রিয়ার হস্তগত হইয়াছে, তাহা আশু বাহির করা কঠিন। আপাতত বাবু তোমাকে এই পঁচিশ টাকা দিলেন, অবশিষ্ট টাকা পরে পাঠা-ইয়া দিবেন। আমি তাহাতেই তথাস্তু বলিয়া দিনাজপুর পরিত্যাগ করিলাম। দুই দিনে ঠাকুরগঞ্জ পৌঁছিলাম। তখন তথায় এ অঞ্চলে বাঘের বড় ভয় ছিল। ঠাকুরগঞ্জ হইতে আমরা বাঘের ভয় যুক্ত জঙ্গল সকল ভয়ে ভয়ে অতি-ক্রম করিয়া কৃষ্ণগঞ্জে উপস্থিত হইলাম। গরুর গাড়ীই আমাদিগের যান। কৃষ্ণগঞ্জ হইতে পূর্ণিয়া, পূর্ণি হইতে কাড়াগোলা, তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া সাহেবগঞ্জ উপস্থিত হইয়া রেলে বরাবর চলিয়া গিয়া নামিয়া নৌকা যোগে বাটীতে পৌঁছিলাম।

বাটী পৌঁছিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া কত কাঁদিলেন এবং পিতা আনন্দ-অশ্রু বর্ষণ করিলেন। মা কহিলেন যে "তোমার মত নিষ্ঠুর ছেলে যেন শত্রুর ঘরেও জন্মে না। তুমি আমাদিগকে যেমন ভাবে কাঁদাইয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি যে, "তোমার ছেলে তোমাকে যেন সেইমত কাঁদায়।" মায়ের আশীর্ব্বাদে মনে কৌতুহল জন্মিল, বলিলাম যে "তোমার এ আশীর্ব্বাদের ভয় আমি করি না, কারণ আমি বিয়ে করলে ত ছেলে?" যাঁহারা আমার সঙ্গে কৌতুক করিতে পারেন, তাঁহারা আমাকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিলেন যে, "সে মেয়ের কিন্তু বিয়ে হয় নাই, তোকে ফাঁকি দিয়া বাড়ীতে আনিয়াছে। বিয়ের দিন আবার ঠিক হইয়াছে।" কেহ বলিলেন যে "পালা! পালা! বিয়ে আস্‌তেছে, পালা" ইত্যাদি।

আমার ধর্ম্মমত (৩)

বাল্যকালে উপনয়ন হইবার পর হইতেই হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত গোঁড়া হইয়াছিলাম। রীতিমত ত্রিসন্ধ্যা, একাদশীর উপবাস ইত্যাদি করিতাম। দিনাজপুর যাওয়ার পর হইতেই সন্ধ্যার মাত্রা ক্রমে কমিয়া গেল। তথায় কূপজলে স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি পৈতার মধ্যে হাত দিয়া কয়েকবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যার কার্য্য সারিতে লাগিলাম। কুসংস্কার সাড়ে ষোল আনা ছিল। জুতা পায় দিয়া কোন দ্রব্য পানাহার করিতাম না। বিনা গায়িত্রী উচ্চারণে ভুলক্রমে এক দিন আহার করিয়াছিলাম, সেজন্য সমস্ত দিন মনে গ্লানি উপস্থিত হইয়া মনকে কষ্ট দিয়াছিল। একদিন কয়েকজন বন্ধুসহ দূরে কোন একস্থানে এক মেলা দেখিতে যাই। তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে বড় জলপিপাসা ও ক্ষুধা বোধ হইল। মেলা হইতে কোমলা এবং সন্দেসাদি খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। পথ চলিতে হইবে অথচ কোমলা খাইব, কিন্তু জুতা পায়, কি করিয়া কোমলা খাইব! তখন জুতা খুলিয়া বাঁম হাতে লইয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোমলা খাইতে লাগিলাম এবং পথ চলিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে একজন সঙ্গী ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিল "তুমিত বড় খাঁটি গোড়া হিন্দু দেখতে পাচ্ছি?" আমি বলিলাম "কেন? জুতাটা পায় দিয়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন দ্রব্য পানাহার করা অবৈধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ"। তাহাতে তিনি হাঁসিয়া বলিলেন "বেশ! জুতা পায় দিয়া কিছু খাওয়াটা ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় দোষ, কিন্তু হাতে করিয়া খাইতে কোন দোষ নাই! কেমন?" তখন আমার চৈতন্য হইল, ঠিকত আমি আর এ কি গোড়ামী করিতেছি, পায়ে জুতাত ভালই, এ যে হাতে

আরো দোষের! আমার মত মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ লোকত আর নাই। বাস্তবিক কুসংস্কারবশত লোকে সময় সময় এমন ভুল করে যে, তাহা উপহাসাস্পদ হয়।

দিনাজপুর স্কুলে অধ্যয়ন কালে আমার অত্যন্ত গোঁড়ামি দেখিয়া দুইটি সমপাঠী ব্রাহ্ম ছাত্র আমার স্কন্ধে চাপিল। তাহারা প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল এবং সময় সময় আমার আচার ব্যবহারকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল। আমিও কোমর বাঁধিয়া তাহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলাম। প্রথম প্রথম তাহাদের যুক্তি আমি অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলাম। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম যে, নিজ ধর্ম্মের মত কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিব না। মুখের জোরেই হউক আর যুক্তি বলেই হউক, তর্ক দ্বারা তাহাদিগকে জব্দ করিয়া নিরস্ত রাখিতে লাগিলাম, কিন্তু যখন একাকী থাকিতাম, তখন তাহাদের যুক্তিগুলির সত্যাসত্যতা লইয়া মনের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইতে লাগিল। সময় সময় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে লাগিলাম। নিজ ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রথম প্রথম কোন কথা কেহ বলিলে মনে বড় কষ্ট বোধ হয় এবং সে কথা যে বলে,তাহার প্রতি রাগ হয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত সেই সকল কথা শুনিতে শুনিতে শেষে কিন্তু তাহাতে তাদৃশ রাগ জন্মে না। তখন মনে তাদৃশ কষ্টও হয় না। আমার সম্বন্ধেও তাহাই হইল। ব্রাহ্ম-বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়ার মাত্রা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল, তাঁহাদের কোন কোন যুক্তি মনে ধরিল। সময় সময় তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা শুনিতে যাইতে লাগিলাম বটে, কিন্তু মনে দৃঢ় সংকল্প রহিল যে, আপন বাপ পিতামহের ধর্ম্ম কিছুতেই ছাড়ব না। তবে সমাজের বক্তৃতা শুনায় হানি কি?

কিছুদিন এই ভাবে চলিল, মনের নানা ধোকা নানা ভাবে খণ্ডন করিতে লাগিলাম। সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বিষয়ের চিন্তা ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। মনের ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। অবশেষে আমি পার্থক্য বুঝিতে পারিলাম যে, আমি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। উর্দ্ধগামী হইয়াছি কি অধগামী হইয়াছি, সে বিচার করার ক্ষমতা আমার রহিল না। কিন্তু বিনা চেষ্টায় অলক্ষিত ভাবে মনের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল। অসংখ্য দেবদেবীর পূজায় যেন অনাস্থা উপস্থিত হইল। নিজের এ সকল বিষয়ে অনাস্থা জন্মিলেও নেটিব খ্রীষ্ঠানগণ যখন হিন্দুদিগের ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা করিত, তাহা কিন্তু তখন প্রাণে সহ্য হইত না। তখন গলাবাজি দ্বারাই হউক, আর

গায়ের জোরেই হউক, তর্ক করিয়া খ্রীষ্টানদিগকে জব্দ করিতাম। এখন কিন্তু সে কথা ভাবিতেও লজ্জা বোধ হয়। ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনায় মন আকৃষ্ট হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে সন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ এবং মনে মনে একেশ্বরের উপাসনা চলিতে লাগিল।

আবার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন।

আমাদিগের গ্রামের একটী ভদ্রলোক ওকালতী পাশ করিয়া কলিকাতা কালীঘাটে হাইকোর্টের কোন উকীলের বাসায় থাকিতেন। সেই উকীলটী হিন্দুধর্ম্মে বড় গোঁড়া ছিলেন,তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া এই নূতন উকীল বাবুটীরও ধর্ম্ম-মত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ইনি পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন না। তিনি ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতে এত আকাঙ্ক্ষী হইলেন যে, তান্ত্রিক মতে যোগ শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ রাত্রিকালে কালীবাড়ীতে গিয়া যোগাসনে বসিয়া তান্ত্রিক মতে যোগসিদ্ধির আনুসঙ্গিক যত অভ্যাস, তাহা আয়ত্ব করিতে চেষ্টাবান হইলেন। এক নাক দ্বারা নিশ্বাস প্রবাস গ্রহণ, নিশ্বাস প্রশ্বাসের হ্রস্বতা করণ, এবং যোগাসনে বসিয়া মৃত্তিকা হইতে উর্দ্ধগামী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বভাবের নিয়মের বিরুদ্ধে নিশ্বাস প্রশ্বাসের খর্ব্বতা প্রভৃতি কারণের অস্বাভাবিক চেষ্টায় তাঁহার ফুসফুসের রোগ জন্মিল, সময় সময় রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। পীড়িত হইয়া তিনি বাটীতে আসিলেন।

তিনি সুস্থ হইলে আমার নূতন ধর্ম্ম মতের সঙ্গে তাঁহার মতের সংঘর্ষ হইতে লাগিল। আমার যুক্তিগুলি তিনি ক্রমে খণ্ডন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোন কোন তর্কে আমি আঁটিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার নূতন ধর্ম্ম মতের উপর সন্দেহের ছাঁয়া আসিয়া পড়িল। আমার মত আবার পরিবর্ত্তন হইল।

ইতিমধ্যে গুরু ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মন্ত্র দান করিয়া আমার দেহটী পবিত্র করিবার প্রস্তাব করিলেন। মন্ত্র গ্রহণের দিন ধার্য্য হইল। কিন্তু আশু মন্ত্র গ্রহণের এক বিঘ্ন ঘটিল।

আমাদিগের ঠাকুর গোষ্টির তিন সরিক ছিলেন। আমরা যে সরিকের শিষ্য ছিলাম, তাঁহারা নির্ব্বংশ হওয়ায়, আমরা অপর সরিকগণের ভাগে পরিলাম। এই দুই সরিকের কোন্ ভাগে আমি পড়িব, কে আমাকে মন্ত্র দিবেন, এই বিষয়ের সত্ব সাব্যস্ত লইয়া গোল বাধিল। একদিন দুই সরিকের দুই ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা কাহার সত্ব, ইহা লইয়া তাঁহারা মহা ঝগড়া আরম্ভ

করিলেন। তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে এত শক্রতা যে, দুই জন এক বারান্দায় আসন গ্রহণ করিলেন না। দুই জন দুই বারান্দায় বসিয়া কেবল ঝগড়া করিতে লাগিলেন। দুইজনের প্রত্যেকেই বলেন, আমার নিকট মন্ত্র লও। আমরা নিরুত্তর। কারণ এক জনের নিকট মন্ত্র লইলে অপরে নির্ব্বংশ করিবেন।

বেলা যখন দুই প্রহর হইল, তখন ঠাকুর মহাশয়দিগকে পাক করিবার জন্ত অনুরোধ করা হইল। তাঁহারাও ঝগড়ায় ক্লান্ত হইয়া শেষে স্নান করিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। দুইজনের দুই হাঁড়ি, দুই স্থানে পাক আরম্ভ হইল। তাঁহারা পাক সমাপ্ত করিয়া আমার পিতাকে ডাকিলেন এবং একজন বলিলেন যে "বল আগে যে আমার নিকট তোমার ছেলে মন্ত্র লইবে, তাহা হইলে তোমার অন্ন গ্রহণ করি, নচেৎ রইল তোমার ভাত, আমি চলিলাম।" বলা বাহুল্য, যে অপর ঠাকুরেরও সেই কথা। পিতাঠাকুর মহা বিপদে পরিলেন। তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট এবং কাহাকেও নারাজ করিতে পারেন না। তিনি বলিলেন যে "ঠাকুর মহাশয়রা, আপনারা দুইজন আপোষে মীমাংসা করুন, আপনারা যাঁহার নিকট মন্ত্র লইতে বলিবেন, ছেলে তাঁহার নিকটই মন্ত্র লইবে। আমরা এ বি·ে উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। কিন্তু ঠাকুরগণ তাহা গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারা প্রত্যেকেই বলেন যে "আমার নিকট মন্ত্র লও।" এই রূপ ভাবে সকলেরই রাঁধা ভাত শুকাইয়া যাইতে লাগিল। আমাদের বাটীরও কাহারো আহার হয় নাই, কারণ গুরু ঠাকুর আহার না করিলে কি করিয়া শিষ্যগণ আহার করিবেন।

বেলা প্রায় সাড়ে তিন প্রহর অতীত হইল কিন্তু কাহারও ভাগ্যে রাঁধা ভাত জুটিল না। পিতা উভয়ের পা ধরিয়া কত অনুরোধ করিলেন এবং উভয়েই রাগের চোটে পা টানিয়া লইতে লাগিলেন। অবশেষে পিতাঠাকুর গলবস্ত্র হইয়া উভয়কেই প্রণাম করিয়া কহিলেন যে "প্রভুরা এখন আহার করুন, আমাদের ছেলে পিলেরাও ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে। অদ্য রাত্রিটা সময় দিন। আমি আমার ছেলে ও ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাদের যে অভিপ্রায় তাহা রাত্রিকালে নিবেদন করিব।" ঠাকুরদিগেরও ক্ষুধার জ্বালায় জেদটা অনেক অনেক কমিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনটী বলিলেন "বেশ কথা আমি রাজি আছি।" কিন্তু অপর ঠাকুর কহিলেন তুমি আমার তিন বৎসরের বার্ষিক দেও না, তিন বৎসরের বার্ষিকের তিনটী টাকা আনত খাই, নচে রহিল তোমার ভাত, আমি চলিলাম।" পিতাঠাকুর নিরুপায় হইয়া তিনটী টাকা

আনিয়া দিয়া প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহারা আহার করিলেন।

আমরা আহার করিতে বসিলাম, পিতাঠাকুর, গুরুঠাকুরদের পাতের প্রসাদ অতি যত্নসহকারে আনিয়া আমাদিগের সকলের পাতে দিলেন। আমি কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে উক্ত উচ্ছিষ্টান্ন আমার পাতা হইতে কাচিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলাম। বাবা তাহা দেখিয়া কহিলেন "করিলি কি, কি করিলি! ঠাকুরের পাতের প্রসাদ কাচিয়া ফেলিয়া দিলি!" আমি বলিলাম যে "আপনাদের প্রবৃত্তি হয়, আপনারা আহার করুন, কিন্তু অন্যের মুখের লালাযুক্ত খাদ্য আমার খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ ছোট ঠাকুরের গায়ে যেন গরমির ঘায়ের ন্যায় চাকা চাকা ঘা সকল ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, এবং তিনি বোধ হয় পারা খাইয়া থাকিবেন, তাই তাঁহার মুখ দিয়া সর্ব্বদা লালা নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। আর বড় ঠাকুরের যক্ষ্মা কাশির ন্যায় পুরাতন কাশির বেয়ারাম আছে। ইহাঁদের মুখ সংযুক্ত খাদ্য দ্রব্য আমি তা খাইতে পারিব না।" আমার কথা শুনিয়া পিতাঠাকুরের মনেও যেন অতৃপ্তির উদয় হইল, তবু তিনি জোর করিয়া "প্রসাদ" পাইলেন, কিন্তু কাকা আর তাহা গ্রহণ করিলেন না। বাটীর অপর সকলেও তাহা খাইল না। কাকা বলিলেন যে "কথাটা যা বলেছে তা ঠিক।"

আমার ধর্ম্মমত।

বাবা রাত্রিকালে আমাকে ও খুড়ামহাশয়কে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি কর্ত্তব্য? কাকা চুপ করিয়া রহিলেন! আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি মত? আমি বলিলাম "গুরুঠাকুরদিগের যে প্রকার ব্যবহার, তাহাতে কাহারো নিকট আমার মন্ত্র লওয়ার প্রবৃত্তি হয় না। তবে আপনি যদি নিতান্তই আমাকে মন্ত্র লইতে জেদ করেন, তাহা হইলে বড় ঠাকুরের নিকট মন্ত্র লওয়াই কর্ত্তব্য। কেননা তিনি বয়সে প্রবীণ, তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান এবং লেখাপড়া বোধ আছে। কিন্তু ছোট জনের লেখাপড়া জ্ঞান আদবেই নাই। তাহাতে তাঁহার লম্পট স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ লোককে আমি গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। তাহাতে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইলে নিরুপায়।" বাপ খুড়া উভয়েই বলিলেন যে তাঁহাদেরও সেই মত। কিন্তু পিতা বলিলেন যে "ছোট জন যখন অসন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপ দিবেন, নির্ব্বংশ করিবেন, তখন উপায় কি?" আমি বলিলাম যে, আপনার

সে জন্য কোন চিন্তা নাই। লম্পট, কপট ও অক্রিয়ান্বিত গুরুর শাপে আমাদিগের কিছুই হইবে না। আপনি সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া পরিষ্কার থাকিবেন। আমাকে অভিশাপ দিবেন, সে জন্য ভয় নাই, আমার নির্ব্বংশ হওয়ার ভয় আদবেই নাই।" পিতা মহাচিন্তিত ভাবে সেই প্রস্তাবেই সন্মত হইলেন।

পর দিন দুই ঠাকুর যখন প্রাতকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তামাক টানিতেছেন, তখন আমার পিতা দুই জনকেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন যে, "আমার ছেলের ইচ্ছা যে, সে বড় টাকুরের নিকট মন্ত্র লয়। আমি যদি তাহার বিরুদ্ধে মত দেই বা তাহাকে শাসন করি, তাহা হইলে হয়ত সে আবার পলাইয়া দেশছাড়িবে। একবার তাহার মতের বিরুদ্ধে বিবাহের জোগাড় করিয়া কত কাঁদিয়াছি এবং কত লাঞ্ছনা পাইয়াছি, তাহা আপনারা জানেন।" তখন বড় ঠাকুর মহা খুসি হইয়া আমার পিতার মাথায় হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন যে, "দীর্ঘজীবী হও, ধনে বংশে সুখী থাক। তা হবেইত, কুড়ন লেখা পড়া জানা ছেলে, ওর মত সৎবুদ্ধির ছেলে এ গাঁয়ে কয়টা আছে।" অপর দিকে ছোট ঠাকুর গর্জ্জিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন যে, "হারা ধন চক্রবর্ত্তী (আমার পিতার নাম) তুমি যে ভাবে আমাকে বঞ্চিত করিলে, স্বয়ং ভগবান তাহার বিচার করিবেন। তোমার ছেলে বেটাত ইংরাজী পড়ে খ্রীষ্টীয়ানি মত হইয়া বিগড়াইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমারও মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। আমার প্রাণে যেমন ব্যথা দিলে, ভগবান তোমাকে যেন নির্ব্বংশ করেন, তুমি যেন মাঙ্গিতেও দানা পাওনা। তোমার ভিটায় যেন ঘু ঘু চরে।" পিতাঠাকুর ছোট ঠাকুরের পা ধরিয়া কহিলেন "ঠাকুর এমন সংঘাতিক শাপ দিবেন না।" ঠাকুর পিতার মাথায় এক লাথি মারিয়া সক্রোধে আমাদের গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

পিতা গুরুঠাকুরের এই প্রকার গুরুতর অভিশাপের ভয়ে বড় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন এবং নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। যেমন একজন অভিসম্পাত করিলেন, তেমন আর একজন আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন হরে দরে সমানই হইল। পরমেশ্বর এই দুই জনের কাহারো কথানুযায়ী কার্য্য করিবেন না। আমরা যেমন আছি, তেমনই থাকিব। ভাবনা কি?" পিতা কহিলেন "হাজার হউক, গুরুঠাকুর ত ত্রাণকর্ত্তা, ভাল করতে পারুন আর না পারুন

মন্দটুকু করতে সহজেই পারেন। বাড়ীতে কাহারো কোন শারীরিক অনিষ্ট হইলে মনে সর্ব্বদাই সেই অভিশাপের কথা মনে পড়িবে।”

আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে “বাবা! আচ্ছা গুরুঠাকুরও যে ব্রাহ্মণ, আমরাও সেই ব্রাহ্মণ। বেদ, গায়ত্রি, সন্ধ্যা, শাস্ত্র ও আদি পুরুষ, উভয়েরই যখন এক, তখন গুরুঠাকুরের এমন দেবত্ব কোথা হইতে আসিল? এবং আমরাই বা কেন এত অধগামী হইলাম? তিনি যেমন অন্যায় করিয়া অভিসম্পাত করিলেন, তেমন আমিও তাঁহাকে অভিসম্পাত করি যে, তাঁহারও যেন বংশ থাকে না, তিনিও যেন মাঙ্গিতে অন্ন পান না।” তাহাতে বাবা কহিলেন “চুপ, চুপ! অমন কথা বলতে আছে? তোরা ইংরেজী পড়া ছেলে, তোদের বুঝাই আলাহিদা। আমরা যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন এই বিশ্বাসেই চলিব, আমরা মরে গেলে তোমাদের যা খুসি তাহা করিও।” আমি তবুও পিতাকে উচিত কথা বলিতে ছাড়িলাম না,আমি বলিলাম যে, “যিনি ধর্ম্মে গুরু,মহাজ্ঞানী, নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত, স্বার্থশূন্য, ন্যায়বান ও সাধুব্যক্তি, তিনিই গুরুতর যোগ্য লোক। গুরুদেব অজ্ঞানী শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া জ্ঞান দান করিয়া, তাঁহাকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। যে গুরুর উপদেশে আত্মা-পবিত্র ও উন্নত হয় এবং যিনি পরিত্রাণের পথ দেখাইয়া দেন, তিনিই আসল গুরু। আর আমাদের একি গুরু, নীচাশয়, স্বার্থপর, হিংসুক ও কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি কি গুরুর যোগ্য? যাহার নিজের জ্ঞান নাই, সে অন্যকে জ্ঞান কি করিয়া দান করিবে? যে নিজে নরকে যাইবে, সে তাহার শিষ্যকে কি করিয়া নরক হইতে উদ্ধার করিবে? এই গুরুমন্ত্র গ্রহণের প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিত হইয়া আসিতেছে, তখন সাত্ত্বিক গুরুগণই অজ্ঞশিষ্যকে মন্ত্রদান করিয়া জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতেন। এখন সেই পবিত্র প্রথা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আমরা কি ছাগল ভেড়া, না কেনা গোলাম যে, যখন যাহার ইচ্ছা, তাহার ভাগে পড়িব। বংশানুক্রমিক গুরুত্বে আমি বিশ্বাস করি না। যিনি গুরুর উপযুক্ত, তাঁহাকেই আমি গুরুপদে বরণ করিতে প্রস্তুত আছি।” আমি এই সকল অতি ক্রোধের সঙ্গে জোরে বলিতে লাগিলাম, পিতা আমার উত্তেজনা দেখিয়া কিছু নরম হইলেন, কিন্তু আমার কথাগুলির মর্ম্ম যে তিনি গ্রহণ করিলেন, তাহা বোধ হইল না। এই প্রকার গুরুগণ যে সমাজের আদর্শ, সে সমাজ যে অধঃপাতে যাইবে, তাহার বিচিত্র কি? এক অন্ধ কি অন্য অন্ধের পথ দেখাইতে পারে? দেখাইতে চেষ্টা করিলেও দুই জনেই হয়ত এক খানার

মধ্যে পড়িয়া যায়। বাবা আমার কোন কথায় উত্তর না দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

বড় ঠাকুর মহাশয় পঞ্জিকা দেখিয়া মন্ত্র গ্রহণের দিন ধার্য্য করিলেন। মন্ত্র গ্রহণের সমস্ত আয়োজন হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে ঠাকুব আসিলেন। আমাকে সর্ব্ব প্রথমে শিব পূজা গ্রহণ করাইলেন। শিবের ধ্যান লিখিয়া দিলেন—

ধ্যানত্বং মহেশং, রজত গিরীনিভং।

চারু চন্দ্রাবতং শং, রত্নকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং॥ ইত্যাদি

শিবপূজা গ্রহণ করার পর শাক্তমতে ইষ্টপূজার আয়োজন হইল, পূজাদি ও যজ্ঞ প্রভৃতি করিয়া আমার কাণে তিনবার অতি গোপনে মন্ত্র শুনাইলেন। আমি কিন্তু তাঁহার মন্ত্রের কোন অর্থ বুঝিলাম না। এবং যে মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিব, তাহা ধারণা হইল না। অবশ্য ইষ্টদেবীর মন্ত্রের ধ্যানটী পড়িলে তাঁহার কতকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু বীজ মন্ত্রটী একটী দুর্ব্বোধ্য শব্দ তাহার সঙ্গে ধ্যানের শব্দের সঙ্গে কোন মিল নাই। গুরুঠাকুর ইষ্ট দেবীর পূজার এক খানি পটল লিখিয়া দিলেন। বাবা আমাকে গুরুর পাদপদ্ম পূজা করিতে বলিলেন। আমি জানি না, গুরুর পাদপদ্ম কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়। তিনি সমস্ত প্রস্তুত করিলেন, একখানি তামার টাটে রক্তচন্দন মাখিয়া শুখান হইয়াছিল। তাহার উপর গুরুদেবের দক্ষিণ পাদপদ্ম খানি স্থাপিত হইল এবং বাবা আমাকে গুরুর ধ্যান পড়াইয়া ফুলচন্দন গুরুর পায়ে দিতে বলিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে ও বিবেকের বিরুদ্ধ হইলেও পিতৃ আদেশ এস্থলে পালন করিলাম। মনে বলি, হায়! ধর্ম্মের কি অধোগতি! মানুষের পাও কি মানুষের পূজা করা উচিত এবং যিনি পূজা গ্রহণ করেন, তাঁহারও কি এই প্রকার নিজ পা পূজা করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অবশেষে পিতাঠাকুর একটী ক্ষুদবাটী পূরিয়া জল আনিলেন এবং গুরুঠাকুরের দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া এবং অঙ্গুলিটী বেশ করিয়া সেই জলদ্বারা ধৌত করিয়া লইয়া তিনি তাহার কতকটা দক্ষিণ হস্তের তালুতে গ্রহণ করিয়া পান করিলেন, কপালে ছোঁয়াইলেন এবং বক্ষে স্পর্শ করাইলেন এবং আমার হাতেও কতকটা দিয়া পান করিতে বলিলেন। গুরুর চরণামৃত যুক্ত হস্তখানি মুখের নিকট লইয়া জল-টুকু ফেলিয়া দিলাম। কাহারো পা-ধোয়া জল কি উদরস্থ করিতে ইচ্ছা হয়? আমার মনে একটু ঘৃণাবোধ হইল। উপায় নাই, মন্ত্র লইতে যখন স্বীকার

করিয়াছিলাম, তখনই ভুল হইয়াছিল। সে ভুল কি আর সংশোধন এখন হয়?

মন্ত্র গ্রহণ করিলাম, বেশ জাঁকজমকের সহিত প্রত্যহ পূজা করিতে লাগিলাম। মহাদেবের ধ্যান বেশ মনপুত হইল, কিন্তু ইষ্টদেবীর পূজায় মনটা বড় পরিষ্কার হইল না। নানা প্রকার ধোকা মনে উপস্থিত হইতে লাগিল। কারণ যে মন্ত্রটী জপ করি, তাহার অর্থ বুঝিতে পারি না, মন তৃপ্তি না হওয়ায় আমাদের সেই উকীল বাবুটীর নিকট গেলেম। নানা কথায় কথায় গুরুঠাকুরদের কাণ্ডগুলি বিশেষতঃ ছোট ঠাকুরের ব্যবহার সমস্ত তাঁহার নিকট বলিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আচ্ছা বলুন দেখি, এ প্রকার হিংসুক ও স্বার্থপর লোককে কি গুরু বলিয়া মান্য করিতে ইচ্ছা হয়? এরূপ গুরুর পা টাটের উপর রাখিয়া পূজা করিলে কি মুক্তির পথ পরিষ্কার হইবে? আমার কথায় তিনি কহিলেন যে, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক এবং এই প্রকার গুরু পুরোহিতদিগের নেতৃত্বে সমাজ জাহান্নামে গেল। কিন্তু উপায় নাই, দেশের সর্ব্বত্রই প্রায় এই প্রকার দশা উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল গুরু পুরুতের দ্বারাই কাজ চালাইতে হইবে। আমার মতে এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া এবং গুরুঠাকুরের দোষ ধরিয়া মনে মনে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে নিজেদের পরকাল নষ্ট হইবে। গুরুদেব নিজে যেমনই হউন না, তিনি যে উপদেশ দিবেন, সেই অনুসারে কার্য্য করা উচিত। গুরু ও শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত দোষ না ধরিয়া তাঁহারা তোমাকে যাহা বলিবেন, তাহা শুনা ও মানা কর্ত্তব্য। তিনি যে মন্ত্রটী তোমাকে দিয়াছেন, তাহা মনোমধ্যে ধারণ করিয়া ভক্তিভাবে ইষ্টপূজা করিতে থাক, তাহাতেই মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইবে। তর্কদ্বারা কোন ধর্ম্মমতের মীমাংসা হইতে পারে না।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, "আপনার এ যুক্তিগুলি মনে ধরিল না। কেন না, মাতাল শিক্ষক যদি আমাকে উপদেশ দেন যে 'সুরাপান কদাপি করিবে না, সুরা পান করা মহা পাপ ও নানা অনিষ্টের মূল। তিনি আমাকে এই উপদেশ দিয়াই যদি নিজে মদ্য পান করিয়া মাতলামি করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমার মনে কি বলিবে? আমি কি মনে করিব না যে, ইনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, তাহা কপট উপদেশ, সুরাপান ভাল কার্য্য না হইলে তিনি নিজে তাহা কেন পান করিবেন? নিজের উপদেশের সঙ্গে

নিজ চরিত্রের সামঞ্জস্য থাকা চাই। নিজের চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা যেমন ছাত্র কি শিষ্যকে উন্নত করা যায়, কেবল মুখের উপদেশে তাহা হয় না; কেমন এ কথা সত্য কি না? আমার কথায় তিনি কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন যে "নিজে ভাল হইলেই জগতকে ভাল বলিয়া মনে করা যায়। কথায় বলে যে 'কৃষ্ণ কেমন, যার মন যেমন।' ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মনে করেন এবং তাঁহার যত কার্য্য তাহা আধ্যাত্মিক ভাবে হৃদয়ে ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন লম্পট লোকে শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট ভিন্ন মনে করে না। ভক্তি ও বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল"

আমি তাঁহাকে বলিলাম যে "তবে কোন তর্ক যুক্তির ধার না ধারিয়া কেবল অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মজীবন গঠন করিব?" তিনি কহিলেন, "হাঁ আমার মতে তাহাই ঠিক।" আমি বলিলাম "আচ্ছা, আপনার কথা মান্য করিলাম। দেখি কিছু দিন অন্ধের মত চক্ষু বুঁজিয়া ধর্ম্মালোচনা করি, তাহাতে যদি জীবনের উন্নতি ও আত্মার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হয় এবং মনে শান্তি পাই, তাহাই ভাল।"

এই প্রকার তর্ক বিতর্ক না করিয়া দৃঢ়তার সহিত শিবপূজা ও ইষ্টদেবীর পূজা করিব, সঙ্কল্প করিলাম। মা প্রত্যহ আঠাল মাটি দিয়া শিব গড়িয়া পূজার আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ সকালে স্নান করিয়া শিব-পূজা ও ইষ্টদেবীর পূজা করিতে লাগিলাম। ইহা ভিন্ন বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি, প্রভৃতি স্থাপিত এক পাল বিগ্রহের পূজা প্রায়ই করিতাম। ক্রমে একটু নেশার মত হইল, প্রত্যূষে উঠিয়াই বাগিচায় বাগিচায় ঘুরিয়া ভাল ভাল ফুল সংগ্রহ করিতাম, শক্তি পূজার জন্য রক্তজবা, শিব পূজার জন্য বিল্বপত্র এবং শালগ্রাম শিলার জন্য তুলসী চয়ন করিতে লাগিলাম।

তুলস্যামৃত—নামাশি সদাত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনমিত্বং বরদা ভব সেবনে॥

এই মন্ত্র পড়িয়া তুলসী চয়ন করিতাম। মাথায় আস্তে আস্তে একটী "আর্ক-ফলার" সৃষ্টি করিলাম। পূজান্তে কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, মাথায় ও কাণে ফুল গুঁজিয়া কিছু দিন সগর্ব্বে সাত্বিক ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণের মত চলিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শিবের ধ্যানটী বেশ মনোমত হইয়াছিল। শিব পূজার সময় শিবের ধ্যান, "ধ্যানম্বং মহেশং, রজত গিরিনিভং, চারুচন্দ্রাবতংসং"

ইত্যাদি পাঠ করিয়া চক্ষু মুদিয়া শূন্যমার্গে সেই "রজত গিগিনিভং" মূর্ত্তি কল্পনার চক্ষে দেখিতে লাগিলাম এবং তাহাতে কিছু দিন মনে শান্তি পাইলাম, কিন্তু দেবীর ধ্যানের ভাবানুযায়ী কোন বিশেষ একটা মূর্ত্তি হৃদয়ে কল্পনা করিতে পারিলাম না। তবে ভাবে যত দূর বুঝিলাম, তাহাতে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে কোন মূর্ত্তি আরাধ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাহাতে মনে শান্তি পাইলাম না। মূল কথা ইষ্ট পূজায় মনটা বড় ডুবিল না।

কিছু দিন এই ভাবে চলিল, কিন্তু আমার সেই চিন্তা করা বদ স্বভাবটা আর আমাকে ছাড়ে না। উহা আমার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, কোন বিষয় তর্ক বিতর্ক না করিয়া চুপ করিয়া ধর্ম্মকার্য্য সমাপন করিব। তথাপিও মনের অজ্ঞাতসারে কখন কখন মনের মাঝে চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, শিব পূজার ধ্যানটী যেমন চমৎকার বর্ণনাবিশিষ্ট, যাঁহার এমন সুন্দর মূর্ত্তির বর্ণনা ধ্যানে পাই, তাঁহার পূজা কেন অশ্লীল নামযুক্ত একটা কাদার গড়নের উপর হয়? সেই সুন্দর মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া প্রত্যহ কেন একটা মাটীর গড়া শিবলিঙ্গের উপর ফুল বেলের পাতা দিই? আবার পূজার সময় "যোনি মুদ্রা" দেখাইয়া তবে প্রণাম করিতে হয়। এই পূজা প্রসঙ্গে যে উপাখ্যানটীর বিষয় শুনিয়াছি, তাহা এত অশ্লীল যে, ভাবিতেও লজ্জা বোধ হয়। আমাদের গুরু পুরোহিতগণ কেমন করিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া কুলরমণীগণকে শিব পূজা লওয়াইয়া এই প্রকার "যোনি মুদ্রা" দেখাইতে শিক্ষা দেন। একথাটা অতি লজ্জা ও সঙ্কোচের সহিত লিখিলাম বটে, কিন্তু যাহার অভিনয় প্রত্যহ ঘরে ঘরে হইতেছে, তাহা মুখে বলিতে দোষ কি? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে শিবলিঙ্গ পূজার প্রতি অভক্তি জন্মিল।

এক দিন মাকে বলিলাম যে "মা তুমি আর শিব গড়িও না। আমি বিনা শিবেই উদ্দেশ্যে ফুল বেলের পাতা দ্বারা শিব পূজা করিব। মা বলিলেন "নূতন নূতন মন্ত্র লইয়া হাউসে হাউসে কয়েক দিন পূজা করিয়া বুঝি ভক্তিটা এখন চটিয়া গেল।" আমি নীরব। মায়ের কথাটা ত মিথ্যা নয়!

কিছু দিন মূর্ত্তিবিহীন পূজা চলিল। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দুই তিন ঘণ্টা যাবত পূজা ও ধ্যানে মত্ত থাকিতাম। আহারের সময় গরিব বেচারি "পঞ্চ দেবতাকে" মাটীতে পাঁচটী অন্ন রাখিয়া নিবেদন করিয়া নিতাম, ইষ্ট দেবীকে সমুদায় ভোজ্যান্ন নিবেদন না করিয়া আহার করিতাম না। ইষ্ট দেবীকে ভোজ্যান্ন

নিবেদনের সময় প্রাচীনগণের দেখাদেখি আমিও একটু মৎস বা মাংস না হইলে নিবেদন করিতাম না। আহারান্তে ও আহারান্তে গণ্ডূষ না করিয়া ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতাম না। মূল কথা, হিন্দু ধর্ম্মে যত দূর গোঁড়ামী হওয়া সম্ভব, সমস্তেরই অভিনয় করিতে লাগিলাম।

শক্তি পূজা মৎস মাংস না হইলে সম্পন্ন হয় না। কিন্তু নারায়ণ পূজার তাহার বিপরীত। তাহাতে সমস্তই নিরামিষ। এমন কি, নারায়ণের ভোগ যে গৃহে রাঁধা হয়, সে গৃহে মাছ মাংসের কারবার হইতে পারে না, নিয়ম এত কড়া। আমাদের বাটীর বিধবাগণ সকলেই শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিতা, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ হস্তে দেবীর পূজা মৎস্য মাংস দিয়া করিতে পারেন না। মৎস্য মাংস-যুক্ত শক্তি পূজার প্রসাদ পর্য্যন্ত তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। কেন? মনে মনে এই খটকা উপস্থিত হইল। বিধবাগণের শক্তি দেবী কিছু স্বতন্ত্র কেহ নহেন, তাঁহারাও যে শক্তির পূজা করেন, পুরুষগণও সেই শক্তির পূজা করেন, তাহা হইলে সকলেরই এক দেবতা হইল। এক দেবতা হইলে অপর কেহ মৎস্য মাংস দিয়া শক্তি পূজা করিলে, সেই ভোগ বিধবাগণ কেন গ্রহণ করিতে পারেন না? স্বয়ং দেবী কালী, দুর্গা নিশ্চয়ই আমাদিগের বিধবাগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তবে সেই সর্ব্বময়ী দেবীর ভোগে যাহা লাগিবে, তাহা হইতে বিধবাগণ কেন বঞ্চিত হইবেন? আর মৎস্য মাংসই যদি নিকৃষ্ট খাদ্য হইবে, তবে তাহা দেবীর ভোগে দিবার কারণ কি? এই সকল বিষয় লইয়া মনে চিন্তা উপস্থিত হইল। মনটা যেন অশান্তিময় হইল।

নিজের যখন শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তখন ইহার মীমাংসা আমার পক্ষে অসাধ্য। তখন চিন্তা করিতে করিতে একদিন ও বাড়ীর বুড় ঠাকুর দাদার নিকট এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আদায় করিয়া লইব, স্থির করিলাম। তিনি আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন এবং আমার পিতার খুড়া সম্পর্কে হইতেন। তাঁহার বয়স তখন আশী বৎসর হইয়াছিল। আমি তাঁহার নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম।

ঠাকুর দাদা। কিরে কুড়ন, কি মনে করে? আবার মনে মনে কোন মতলব আঁটিয়াছিস নাকি?

আমি। আজ্ঞে, না ঠাকুর দাদা, অন্য কোন মতলব আজকাল নাই, আপনার নিকট একটা কথা মীমাংসার জন্য আসিয়াছি।

ঠাকুর দাদা! কি কথার মীমাংসা?

আমি। আচ্ছা ঠাকুর দাদা, আমরা পুরুষেরা ও আমাদের বিধবারা সকলেই এক শক্তির উপাসক, আমরা মৎস্য মাংস দ্বারা শক্তিপূজা করিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করি, কিন্তু আমাদের বিধবাগণ কেন সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহারা শক্তিকে মৎস্য মাংস দিয়া পূজাও করিতে পারেন না? ইহার কারণ কি? আপনি বিষয়টা বুঝাইয়া দিলে মনের ধোকা ঘুচিত।

ঠাকুর দাদা। ওরে! এই কথা! আমি মনে করিয়াছিলাম আর বা কোন গুরুতর কথা হইবে? তা এত সোজা কথা, এই কথা বুঝিতে তোর এত গলিতঘর্ম্ম হয়েছে!

আমি। আচ্ছা, আপনি আমাকে যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেন না কেন?

ঠাকুর দাদা। আরে ভেড়ে, ইহার আবার যুক্তি ফুক্তি কি? শাস্ত্রে আছে যে, পুরুষগণ ও সধবাগণ মৎস্য মাংস খাবে। আর বিধবাগণ মৎস মাংস খাবে—বে—না—আ। শাস্ত্রে যখন তাঁহাদের মৎস মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, তখন শক্তিপূজার মৎস্য-মাংস যুক্ত-প্রসাদ কেমন করিয়া তাঁহারা খাইবেন? এখন বুঝলি কি না?

আমি। এই বুঝি আপনার যুক্তি হইল? বিধবাগণ মৎস্য মাংস খা—বে—না—আ বলিয়া জোরের সঙ্গে কথাটা টানিয়া বলিলেই শাস্ত্র বলিয়া প্রমাণ হইল? ঠাকুর দাদা, আপনার ন্যায়শাস্ত্রে যেমন অধিকার, তাহাতে আপনি ন্যায়পঞ্চানন উপাধি পান নাই, এই আশ্চর্য্য!

ঠাকুর দাদা। আরে শালা! তোমার মত ত আমি বিয়ের ভয়ে পালাইয়া দেশছাড়া হই নাই। তোমা অপেক্ষা আমার শাস্ত্রে একটু অধিক বোধ নিশ্চয়ই আছে।

আমি। ভাল! বেশ কথা পাড়িয়া আমাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিলেন। আমার বিয়ের ভয়ে পালানের সঙ্গে আমার শাস্ত্রজ্ঞানের কি সম্বন্ধ হইল? "ধান পোড়ে চুলয়, আর জল ঢালে ভাগাড়ে?"

ঠাকুর দাদা। কেন? আমি কি অসঙ্গত কথাটা বলেছি। তোর যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাক্‌ত, তাহলে কি তুই পত্র করা মেয়েটার পরকাল নষ্ট করতে পারিস? দেখ দেখি, আমি যখন বিয়ে করি, তখন আমার বয়স ছিল ৪১ বৎসর,

আর তোর ঠাকুর মায়ের বয়স তখন ছিল ৬ ছয় বৎসর। ছয় বৎসরের মেয়েকে ৬০০৲ শত টাকা পণ দিয়া বিয়ে করি। কত উৎসাহের সহিত নেচে পিচে বিয়ে কর্‌তে যাই। আর তুই ষোল বৎসর বয়সে দশ বৎসরের পাত্রী পা'লি, তবুও তুই পালাইয়া দেশছাড়া হলি।

আমি। ঠাকুর দাদা! ঠাকুর মাত তখন আপনার নাতিনীর বয়সী ছিলেন। এতটুকু মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে আপনার একটু লজ্জাবোধও হইল না?

ঠাকুর দাদা। আরে কি করি? বামনের বিয়ে হওয়াই দুষ্কর ছিল। এখন যেন বিয়ে একটু সস্তা হয়েছে, আমাদের কালে বিয়ে বড্ড মাগ্‌গী ছিল। সংসার ধর্ম্ম না করিলে ত বংশ রক্ষা হয় না, কি করি?

আমি। আমি শুনেছি যে ঠাকুর মা নাকি বিয়ের রাত্রিতে আপনার যণ্ডামার্ক চেহারা দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিলেন। ঠাকুর মা বড় হলে, আপনাকে দুই চক্ষে দেখতে পার্‌তেন না। আপনাকে সর্ব্বদা "কালা পাঁঠা, কালা অসুর" ছাড়া বল্‌তেন না। এবং আপনার মুখে ঝাঁটা না মেরে জলগ্রহণ করিতেন না। সত্যি কি না?

ঠাকুর দাদা। দূর ভেড়ে, সে কি সত্যি সত্যিই আমার মুখে ঝাঁটা মার্‌ত, তা নয়। তবে মুখে বল্‌ত সত্য। তা মেয়ে মানুষ দুরন্ত হলে প্রায় সকলের ভাগ্যেই ঝাঁটা ঘটে। সে বড় হলে যখন আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ত, আমাকে দেখতে পার্‌ত না, আমিও তখন বলতাম যে "যাদু, যাবে কোথা? সাত পাক্ ঘুরিয়ে নিয়েছি, এ পাক্ আর খসবার নয়। তা এই কালা পাঁঠার হাতেই জীবন কাটাতে হবে। এখন যৌবনের ভরে টের পাচ্ছ না, শেষে টের পাবা স্বামী কেমন ধন।"

আমি। দেখুন্ ঠাকুর দাদা, আপনি নগদ ৬০০৲ শত টাকা দিয়া ঝাঁটার লোভে ঠাকুরমাকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু আমি বিনা পয়সায় পাইলেও সে ঝাঁটার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। সে বার বিয়ে কল্লেও আমার ভাগ্যে হয়ত এতদিন ঝাঁটা মিল্‌ত? কেননা পয়সা কড়ি নাই, বিদ্যাবুদ্ধি নাই।

ঠাকুর দাদা। তা, তুই আহম্মক, বে-রসিক। বউতে ঝাঁটা মারলেও সে মিষ্টি ঝাঁটা। অন্যে একটী কথা বল্লে সয় না, কিন্তু বউতে ঝাঁটা মাল্লেও যেন ইচ্ছে ইচ্ছে করে।

দেখদেখি তোর প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রের কথায় তোর বিয়ের কথা যে পাড়লাম, তাহার কারণ এই যে, আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে কেমন সুন্দর নিয়ম।

একবার বিয়ে করে সাত পাক ঘুরাইতে পারলে সে পাক আর খুলে না। আমরা যদি মুসলমান কি খ্রীষ্টিয়ান হতাম, তাহা হইলে হয়ত তোর ঠাকুর মা আমাকে তালাক দিয়ে বসত, না হয় রাগের চোটে আমিই তাহাকে তালাক দিতাম। তাহা হইলে তাহারও আবার ভাতার তালাশ করতে হত, আমারও আবার বউ চুঁড়তে হত। আমাদের হিন্দুধর্ম্মের এই সনাতন নিয়ম এই যে, একবার ফাঁদে ফেল্‌তে পার্‌লে, আর ছুটবার সাধ্য নাই।

আমি। হাঁ, তা ঠিক। কিন্তু "বেঁধে মার্‌লে বড় সয়।"

আমাদিগের এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ঠাকুর মা সেই কথা পাতলি দিয়া শুনিয়া গর্জ্জিয়া আসিয়া কহিলেন "পোড়ারমুখো বুড়র মরণ নাই। নিজের গুণপনা এই সকল ছোট নাতিদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। ওরা যে আমাকে ক্ষ্যাপাইয়া পাগল করিবে।"

যেমন ঠাকুরদাদা, তেমনি ঠাকুর মা। ঠাকুরদাদা কহিলেন "তুইত নচ্ছার মাগী, আজীবনটা আমার হাড় জ্বালাইলি। তোর গুণের কথা মনে পড়লে তোর মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি যে, যদিই বুড় ও কুশ্রী হয়েছিলাম, তাহা হইলে আমাকে তালাক দিয়ে, ফিরে নিকা বস্‌লে পারতিস্। তবে এতকাল এ কালা পাঁঠার ঘর করলি কেন?" দুইজনে বেশ ঠ্যাকারে কোঁদল আরম্ভ হইল, আমি আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলাম।

আমার প্রশ্নের মীমাংসা করা ঠাকুরদাদার মত মোটাবুদ্ধির লোকের পক্ষে সহজ হইলেও আমার মন তাহাতে পরিষ্কার হইল না। তখন বেড়াইতে বেড়াইতে আবার সেই উকীল বাবুটীর নিকট গমন করিলাম এবং তাঁহাকে যথাযথ পূর্ব্ববৎ আমার মনের ভাবটা খুলিয়া বলিলাম।

তিনি কহিলেন, বিধবাদিগকে মাছ মাংস হইতে বঞ্চিত করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য আছে। হিন্দুধর্ম্মে স্বামী ও স্ত্রীতে যে সম্বন্ধ, তাহা শুধু এজন্মের জন্য নহে। পরকালেও দুইজনের আত্মার পুনর্ম্মিলনের আশা অনেকে করিয়া থাকেন। এই কারণে বিধবাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা তাহাদের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যাহাতে মনে কোন বিলাসিতা উপস্থিত হইতে না পারে, সেইজন্য তাহাদিগকে দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন, শ্বেতবস্ত্র পরিধান, কোন শুভ কার্য্য ও উৎসবাদিতে যোগদানে নিষেধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন না মৎস্য মাংসাদি আহার করিলে মনে

পশুভাব উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা হইলেই রিপু সকল উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগকে কুপথগামিনী করিবার সম্ভাবনা থাকে। মাসে দুই বার যে একাদশী করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাও এইজন্য। সংযত ভাব, অল্লাহার ও অনুত্তেজক বস্তু খাদ্যের ব্যবস্থা থাকিলে ধর্মকার্য্যে যেমন মনোনিবেশ হয়, অমিতাহার,শিথিল স্বভাব ও উত্তেজক দ্রব্যাদি পানাহার করিলে তাদৃশ কখনই সম্ভবে না। এই সকল মৃতস্বামীর বিচ্ছেদে শোক প্রকাশের চিহ্ন বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সেইজন্য শক্তিপূজার মাছমাংস-যুক্ত ভোগ বিধবা-গণকে আহার করিতে দিলে তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইবে।

আমি বলিলাম যে, মাছ মাংস যদি এমন নিকৃষ্ট বস্তুই হইবে, যাহাতে মনে পশুভাবের উৎপত্তি হইয়া ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইতে পারে, তাহা আদ্যাশক্তি ভগবতীর ভোগে কেন ব্যবহার হইবে? এমন অপবিত্র দ্রব্য দেবভোগে উৎসর্গ করিবার কারণ কি? তিনি আর এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল ধান খাই চাল খাই করিয়া নানা বাজে কথার অবতারণা করিলেন।

উকীল বাবুর যুক্তি আমার ঠাকুরদাদার যুক্তি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও আসল কথার উত্তর পাইলাম না। তিনি যে বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, সে চর্ব্বিত চর্ব্বণ কথাগুলি আমার জানা ছিল। মনের খট্‌কা দূর হইল না।

ইতিমধ্যে একদিন গুরুঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে যে "পটল" দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছে কিনা এবং সেই অনুসারে আমি পূজাদি করি কিনা, তাহা পরীক্ষা করিলেন। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছেন, এমন সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে "ঠাকুর মহাশয়, একটা বিষয়ে আমার মনে ধোকা উপস্থিত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আমার মনের সংশয়টা দূর করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।" তখন তিনি বলিলেন "আচ্ছা কি ধোকা জিজ্ঞাসা কর।" আমি তখন পূর্ব্ববৎ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর মহাশয় আমার প্রশ্ন শুনিয়াই অবাক হইয়া কহিলেন "ও হরি! ও হারাধন! শোন শোন! তোমার ছেলের গুণ শোন! আমি মনে করেছিলাম যে, তোমার ছেলে লেখা পড়া জানা ছেলে, বুদ্ধিশুদ্ধি বুঝি ভালই আছে। এখন দেখতে পাচ্ছি ইহার পেটে কিছুই নাই। আমি বৃথা ব্যানাবনে মুক্তা ছড়িয়াছি, ব'লে কি "কালী দুর্গার মাছ মাংস যুক্ত প্রসাদ বিধবাগণকে খাইতে পারিবে না, তাহার কারণ তাহাকে যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া

দেও!" আমার এত বিদ্যা নাই যে এই কথা তাহাকে বুঝাইতে পারি। আমাব এত বয়স হইয়াছে, কত শত শিষ্যকে মন্ত্রদানে দীক্ষিত করিয়াছি। কিন্তু এমন শিষ্যের হাতে ত কখনও পড়ি নাই। ইংরেজী বিদ্যায় এদেশে কি অধোগতি হইতে চলিল। হারাধন! তুমি অভাবে হয়ত এছেলে বলে বসবে যে, মাকে একটা নিকা কেন দেওয়া হউক না, তাহাতে হানি কি? তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দাও!

ঠাকুর মহাশয়ের কথায় পিতাঠাকুর কহিলেন যে "আর ওকেই বা বল্‌ব কি, শুনেন নাই কি যে দুর্গামোহন দাসেরা আপনাদের বিমাতাকে নিকে দিয়ে বস্‌ল! তার কি বলুন? ঠাকুর মহাশয় কহিলেন "আরে তাকি শুনি নাই, তারা যেন খ্রীষ্টীয়ান হইয়া গিয়াছে। তোমার ছেলেব সঙ্গে কি তাদের তুলনা খাটে? তোমার ছেলে কি তাদের মত ক্ষমতাবান? আমি বেকুবটীর মত মাথা নোয়াইয়া রহিলাম, আমার সম্পর্কে এই প্রকার তীব্র সমালোচন হইতে লাগিল। সংবাদটী ক্ষণকালের মধ্যে গ্রামময় রাষ্ট হইয়া পড়িল।

গুরু ঠাকুর কিছু সাম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন যে, 'তুমি আমার মন্ত্র-শিষ্য, তোমাকে আমি আর কটু কথা বলতে ইচ্ছা করিনা। দেখ প্রাচীন শাস্ত্র-কারেরা আহম্মক ছিলেন না। তাঁহারা লোকের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যাহা যাহা ভাল ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যবস্থা তোমার আমার মত লোকে কি উল্টাইতে পারে? আর জনে জনে সমাজের প্রাচীন ব্যবস্থা সকল উল্টাইলে সে সমাজের কি মঙ্গল হয়? সে সমাজ শিঘ্রই ছারখার হইয়া যায়। বিধবাগণকে যদি এই প্রকার কড়াকড় নিয়মের অধীন রাখা না যাইত, তাহা হইলে আজ হিন্দু সমাজের দশাটা কি হইত? তোমার জেঠিমা প্রভৃতি বিধবা হইয়া কি ঘরে থাকিতেন, হয়ত অন্য স্বামী লইয়া স্থানান্তর চলিয়া যাইতেন, সেই মত বিধবা ভগ্নী, মাসী ও পিসী প্রভৃতি আর হিন্দুর ঘরে দেখা যাইত না। দেখদেখি এই সকল বিধবা ঘরে থাকায় কত আরাম। তাহারা বিনা পয়সায় কেনা বাঁদীর মত। তাহারা সংসারে থাকিয়া দিন রাত্রি কাজ করিয়া দেয়। তাহাদের জন্য খরচ কি? দিনান্তে আধ্‌সের চাউল আর বৎসরে তিন চারি খানা কাপড় হইলেই যথেষ্ট। বিধবাদিগকে মাছ মাংস খাইতে প্রশ্রয় দিলে, তাহাদের গহনা ও পোষাকাদি পরিতে দিলে এবং অন্যান্য সুখ বিলাসিতার প্রশ্রয় দিলে, আজ এই পবিত্র হিন্দু সমাজে যাবনিক ভাব বিরাজ করিত।

শাস্ত্রকারগণ ভবিষ্যৎ জানিয়াই বিধবাগণ সম্বন্ধে এমন কঠিন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, আর নড়াচড়ার সাধ্য নাই। তোমার শাস্ত্রে অধিকার নাই, তাই মোটা ভাবে কথাটা তোমাকে বলিলাম, নচেৎ শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিতে পারিতাম। আর একটা কথা আছে যে "আপ্তবৎ সেবা"। পুরুষগণ ও সধবাগণ মৎস্ত মাংস আহার করিয়া থাকেন, সেইজন্য শক্তিপূজায় তাঁহারা মৎস্ত মাংস দিয়া ভোগ দেন। বিধবাগণ যখন মৎস্ত মাংস হইতে বঞ্চিতা, তখন তাহাদের নিরামিষ ভোজন শাস্ত্রের ব্যবস্থা। সুতরাং তাঁহারাও ইষ্টদেবীকে "আপ্তবৎ সেবা" করিয়া থাকেন; মৎস্য মাংস যুক্ত ভোগ তাহারা কেমন করিয়া খাইবেন? আবার তান্ত্রিক মতে যাঁহারা শক্তি পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মদ মাংস দ্বারা "মা"কে পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি মদ খান না, তিনি শক্তিপূজার ভোগে মদ দেন না। এখন বুঝলে কি না? সেই-রূপ বৈষ্ণবগণ যদি দুর্গা পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সে পূজায় পাঁটা বলি দেন না, বৈষ্ণবী পূজা করিয়া থাকেন। ঠাকুরের কথায় আমি বলিলাম, "আজ্ঞে বুঝলাম বটে, কিন্তু মনের ধোকা দূর হইল না। আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইলাম না।" ঠাকুর কহিলেন যে "আবার ইহাতে কি ধোকা রহিল? আমার কথাগুলিত জলের মত পরিষ্কার। ইহা যে বুঝিতে পারে না, সে ত নিতান্ত মূর্খ!" আমি বলিলাম যে "আজ্ঞে যদি রাগ না করেন, তবে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি ভ্রম সংশোধন করিয়া না দিলে আর কে করিবে?"

গুরু-ঠাকুর। আচ্ছা বল রাগ করব না।

আমি। আচ্ছা আপ্তবৎ পূজাই যদি প্রশস্ত হইল, তাহা হইলে নমঃশূদ্রগণ কালীপূজায় বরাহ মাংস দ্বারা ভোগ দেয় না কেন? তাহারা ত বরাহ মাংস ভোজন করে?

ঠাকুর। আঃ মল, মাটী করলে দেখছি! আরে আপ্তবৎ সেবা করবে বল্লেই কি সকল সময়ে সকলের পক্ষে তাহা খাটে? নমঃশূদ্রাদি নীচ জাতীয় লোকের দৃষ্টান্ত আনিয়া কি এখানে খাটান যায়? তাহাদের বিধবা-গুলি যে মাছ খায়, একাদশী করে না। আর শূকর ও পাঁঠা কি সমান হয়? পাঁঠা ঘাস খায় আর শূকরে নানা ময়লা দ্রব্য খায়। সেইজন্য শূকরের মাংস দেবভোগে দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ শাস্ত্রে দেবভোগে বরাহ মাংস দিবার ব্যবস্থা নাই। আর এক কথা, নমঃশূদ্রাদি জাতির লোকেরা

কালী পূজা করিলে তাহারা কাঁচা * ভোগ দিবার অধিকারী, পাকাভোগ তাহারা দিতে পারে না।

আমি। আজ্ঞে, আর একটী কথা। বৈষ্ণবগণ দুর্গা পূজা করিয়া থাকিলে তাঁহারা বৈষ্ণবী পূজা করেন, অর্থাৎ তাহাতে পাঁঠা বলি দেন না, বা আমিষ যুক্ত ভোগ দেন না? যদিও শক্তির ভোগে মাছ মাংস লাগে, তবুও আপ্তবৎ সেবা বলিয়া তাঁহারা মাংস ব্যবহার করে না। আমরা, মদ মাংস খোর শাক্তগণ যখন নারায়ণ পূজা করি, তখন আমরা নারায়ণের ভোগে পাঁঠার মাংস ও মদ কেন দেই না? সেও ত আমাদের আপ্তবৎ সেবা হইবে।

আমার শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর আর কোন কথা বলিলেন না, মুখটা বিকৃতি করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও আর বকাবকিতে কোন ফল নাই বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম।

ঢাকা যাত্রা।

ইহার কিছুদিন পরে বাটী হইতে ঢাকা যাত্রা করিলাম। তথায় কোন ভদ্রলোকের সাহায্যে এণ্ট্রাঞ্চ স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। এখানে আসিয়া অবধি আমার শিবপূজা ও ইষ্টপূজা প্রত্যহ জল ছিটাইয়াই সম্পন্ন করিতে হইল, কারণ এখানে ফুল বেলের পাতা ও পূজার সজ্জা আমাকে জোগাড় করিয়া কে দিবে?

ঢাকায় আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলে পর, আমার গ্রাম্য স্কুলের সহপাঠী ও প্রতিদ্বন্দী সেই জমিদার পুত্র আসিয়াও আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তিনিও অনেক স্থান ঘুরিয়া আসিয়াছেন এবং আমার মত তিনিও প্রথম বার টেষ্ট পরীক্ষায় ফেল হইয়াছিলেন। এবার তাঁহাতে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, এ লোক যে সেই লোক, তাহা বুঝা ভার। তিনি প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এবার আর তাঁহার সে অহঙ্কার ও গর্ব্ব নাই, সে উদ্ধত স্বভাব নাই এবং পাড়াগাঁয়ের মনের ক্ষুদ্রভাব আর তাঁহাতে নাই। এখন তাঁহার চরিত্র উদার ও পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। বক্তৃতা করা অভ্যাস করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক করিয়া অন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলার স্বভাবটা বেশ জন্মিয়াছে। আমার সঙ্গে তাঁহার বেশ প্রণয় জন্মিল এবং ছোটবেলায় ক্রীকেট খেলায় যে আমি তাঁহাকে ঠ্যাঙ্গাইয়াছিলাম, সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাকে হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত গোঁড়া দেখিয়া তিনি আমার স্কন্ধে ভর করিলেন। তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক চলিল।

* কাঁচা ভোগার্থ এস্থলে অপক্কান্ন বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমি দিনাজপুর হইতে বাটীতে আসিয়া মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া মাথায় একটী আর্কফলা বনাম "চৈতনফক্কা" বা টিকির সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আমার মাথায় টিকি দেখিয়া তিনি মনে মনে বড় চটিয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় যখন হাত পা ধুইয়া একখানি কুশাসনে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছি, এমন সময়ে কচ্ করিয়া মাথার চুলকাটার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি তিনি। তিনি আমার শিখাটী কাঁচি দ্বারা কাটিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমি মনে মনে বড় চটিলাম, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলাম যে "ভাই একি অন্যায় কার্য্য তোমার? ধর্ম্মকার্য্যে কি চাতুরি ভাল? দেখত কি অন্যায় করলে?

জমিদার বন্ধু। কি অন্যায় কাজটা করেছি? এ একটা উপসর্গ মাথায় রেখে ফল কি? লাভের মধ্যে কাহারও সঙ্গে মারামারি বাধিলে সে অনায়াসেই টিকিটা ধরিয়া তোমাকে পাড়িয়া ফেলিবে।

আমি। দেখ দেখি, ইষ্ট পূজার সময় মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যহ শিখাটী বাঁধিতে হয়, এখন আমি বাঁধি কি?

জমিদার বন্ধু। লোকে লেখা পড়া শিখে ক্রমে কুসংস্কার বর্জ্জিত হয়, কিন্তু তোমার কুসংস্কার আরো বৃদ্ধি পাইতেছে! ইষ্ট পূজা করবে অন্তরের ভিতর, বাহ্যিক আচার ব্যবহারে কি দরকার? অন্তরের সহিত যে ভক্তি বিশ্বাস করিয়া ইষ্ট পূজা করে, সেই পূজাই খাঁটী, তাহা ইষ্ট দেবী গ্রহণ করেন, আর অন্তরে যদি তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকিল, তাহা হইলে তোমার বাহ্যিক আচার ব্যবহার সমস্তই বৃথা, ভোগলামি মাত্র। তুমি শিখা রাখ আর না রাখ, বাঁধ আর না বাঁধ, ইষ্টদেবী তাহা দেখিবেন না। ওটা একটা লোকদেখান ভড়কান মাত্র যে, আমি সাত্বিক হিন্দু, ইষ্ট পূজা করিয়া থাকি।

বন্ধুর কথাটা ঠিক হইলেও আশু কয়েক দিন যেন মনটা বিরক্ত বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল এবং মাথাটা খালি খালি বোধ হইল। কিন্তু বাস্তবিকই সে উপসর্গটার অভাব আর শেষে বোধ হইত না।

একদিন কাণে পৈতা গুঁজিয়া, কাছা খুলিয়া এবং একটী ঝারি লইয়া প্রস্রাব করিতে বসিয়াছি। এমন সময় সেই বন্ধুটী পশ্চাৎদিক হইতে চুপে চুপে আসিয়া কয়েক গাছা দূর্ব্বা তুলিয়া আমার মাথার উপর দিয়া উলুধ্বনি করে উঠিলেন। আমি প্রস্রাব করিতে বসিয়া কথা বলিব না। তাই চুপ করিয়া রহিলাম। প্রস্রাব সারা হইলে উঠিয়া বলিলাম, "ভাই, একি? তোমার সকল বিষয়েই যে এই প্রকার বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্ছি।

জমিদার বন্ধু। ভাই, আমি তোমাকে তামসা করতেছি না, তুমি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রস্রাব করতে বসেছ, তাই তোমার মঙ্গল কামনার্থ ধান দূর্ব্বা দিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করলাম।

আমি। মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলাম কি করে? এত ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্ম, এ আর নূতন কি?

জমিদার বন্ধু। আরে বাবা প্রস্রাব করিবে, তাহাতে কাছা খোলা, পৈতা কাণে তোলা, এবং একটা ঝারি টানিয়া আনার দরকার কি? এত আড়ম্বর কেন?

আমি। দেখ তুমিও ব্রাহ্মণ, জান যে কাছা খোলা হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম, কর্ণে গঙ্গার অবস্থিতি বলিয়া পৈতাটি প্রস্রাব বাহ্য করিবার সময় কর্ণে তুলিয়া রাখিলে অপবিত্র হয় না। এবং প্রস্রাবান্তে জল ব্যবহার করা শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

জমিদার বন্ধু। দেখ কাছা খোলা এখন আর লম্বা কাছাওয়ালা বাঙ্গালীর দরকার হয় না। কারণ এ নিয়ম পূর্ব্বে দরকার হইত, তখন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ঠ্যাঙ্গ কাপড় ব্যবহার করিতেন এবং হিন্দুস্থানীদিগের মত মাল কাছা দিয়া কাপড় পরিতেন। তখন কাছা না খুলিলে প্রস্রাব করার অসুবিধা হইত, তাই কাছা খোলার নিয়ম হইয়াছিল।

আর পৈতাটা কাণে তুলিলেই পবিত্র হইল? তোমার পেটের ভিতর যে সর্ব্বদাই মল মূত্র জমা থাকে, তাহাতে তোমার পৈতা অপবিত্র হয় না, কেবল যখন তাহা ত্যাগ কর, তখনই অপবিত্র হইল। এ বড় কুসংস্কার। তবে জলটা ব্যবহার করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, না করিলেও যে সর্ব্বাঙ্গ এমন অপবিত্র হইবে, তাহাও বিশ্বাস করি না।

আমি। হাঁ যুক্তিমত তা ঠিক বটে। কিন্তু সমাজ তাহা শোনে কই? সামাজিক যে আচার ব্যবহার আছে, সেমতে না চলিলে লোকে যে নিন্দা করে, তার কি?

জমিদার বন্ধু। ঐত হয়েছে রোগের ঘর। লোকে নিন্দা করিবে সেই ভয়ে অর্থশূন্য আচার ব্যবহার বাধ্য হইয়া করিতে হইবে। ইহাতে যে কপটতা প্রকাশ হয়। যাহা যুক্তি মত ভাল বোঝা যায়, তাহাই সাহসের সহিত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোন কোন বিষয় লোকে প্রথম প্রথম ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিবে সত্য, কিন্তু আর দশ জন তাহা যখন

অবলম্বন করিবে, তখন আর প্রকাশ্য কেহ নিন্দা করিতে পারিবেনা। সমাজ সংস্কার করা সৎ সাহসের দরকার।

আমি। তা সত্য। কিন্তু প্রাচীন আচার ব্যবহার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে মনের জোর চাই, তাহা হয় কই?

জমিদার বন্ধু। হওয়াইলেই হয়। মনের জোর বাঁধিতে আর কাঠ খুঁটির দরকার হয় না, কেবল নিজের ইচ্ছা আর কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রবলচাই। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় ও সাহস আসিয়া জোটে।

বন্ধুর সঙ্গে এইরূপ সামাজিক আচার ব্যবহার, নিরাকার ও সাকার উপাসনা প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বদাই তর্ক চলিতে লাগিল। সময় সময় তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা শুনিতে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু এদিকে পূজার মাত্রা সংকীর্ণ হইয়া আসিলেও প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যাহ্নিক ও পূজাদিও সংক্ষেপে চলিল। কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে তর্ক বিতর্কে, ব্রাহ্মসমাজের সারমর্ম্ম ও বক্তৃতাদি শুনিয়া মনে অশান্তি উপস্থিত হইল। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে এখানে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা মনে বড় ধরিত। তিনি কোন ধর্ম্মবিশেষকে আক্রমণ করিতেন না। নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মবিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতেন। একদিন এক বক্তৃতায় বলিলেন যে "মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। সে ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায় বিশেষের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যিনি ধর্ম্মপিপাসু, তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্তই হন না কেন, তাঁহাকে তথায় প্রথমতঃ দণ্ডায়মান হইয়া ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অনুসন্ধান করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যিনি আজীবন ধর্ম্ম-চর্চ্চায় একস্থানে না থাকিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিবেন, তিনি শেষকালে বুঝিতে পারিবেন যে,সাম্প্রদায়িকত্বের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি নূতন এক মুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তাঁহার ধর্ম্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মের মূল ও সারাংশের কোন অনৈক্যতা লক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মমত সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মমতে পরিণত হয়। অর্থাৎ হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মমতের যত সারাংশ লইয়া তাঁহার ধর্ম্মমত গৃহীত হইয়া থাকে।"

এই উপদেশটা মনে বড় ধরিল। ইতিপূর্ব্বেই আমার জমিদার-বন্ধুর প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতের সঙ্গে আমার ক্যাথলিক মতের সংঘর্ষে আমার অন্ধবিশ্বাসটা অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশানু-সারে মনে করিলাম বেশ কথা ত, দেখি একবার চেষ্টা করিয়া আমি ধর্ম্মপথে

অগ্রসর হইতে পারি কিনা। আমার ত দাঁড়াইবার স্থান আমার বাপ পিতামহের হিন্দুধর্ম্ম আছে। সহসাই "ও তৎসৎ" বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইব না। মনের ইচ্ছা থাকিলেও কিছুদিন দাঁত মুখ চিপিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু মনের নানা সংশয় দূর করিবার উপযুক্ত লোক পাই না। মনে মনে সংকল্প করিয়াছি যে, ব্রাহ্মদিগের নিকট ধর্ম্মবিষয়ে কোন মত জিজ্ঞাসা করিব না। তাঁহাদের নিকট কোন মত জিজ্ঞাসা করিলে সকলই উল্টা ব্যাখ্যা করিবেন। হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ কোন নিরপেক্ষ বিজ্ঞলোকও খুঁজিয়া পাই না। তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অগ্রসর হই কি করিয়া?

ইতিমধ্যে রাজসাহীর হিন্দুসমাজ হইতে একজন বিদ্যাবাগীশ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য বক্তৃতা করিতে ঢাকায় আসিলেন। এই সংবাদে মনে বড় আনন্দ হইল। মনে মনে স্থির করিলাম যে আমার মনের যত গলদ, তাহা এই বারে সব পরিষ্কার করিয়া লইব। বিদ্যাবাগীশের প্রথম বক্তৃতায় অন্য ফল যত ফলুক আর না ফলুক, মুসলমান রুটিওয়ালাদিগের রুটি একপ্রকার বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। কারণ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার ব্যাখ্যা করিলেন যে, "পাঁওরুটির" অর্থ পা দিয়া ময়দা মথিয়া রুটি প্রস্তুত করা হয়। এই প্রকার রুটির বিরুদ্ধে আরো ঘৃণাজনক নানা ব্যাখ্যা করিবার পর যে সকল স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ মুসলমানের প্রস্তুত পাওরুটি খাইয়া অমনি মুখ মুছিয়াই ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইত, সেই সকল ছাত্র আর কিছু দিনের জন্য রুটি খাইত না। সুতরাং ঢাকার মুসলমান রুটিওয়ালাগণ বিদ্যাবাগীশকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

আমার মনের ভ্রম সকল সংশোধন করিবার জন্য পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট গমন করিলাম। তথায় গিয়া দেখি, আরো দুই তিনটী ভদ্রলোক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে নানা শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। আমি উপস্থিত হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বসিলাম।

১ম ভদ্রলোক। আচ্ছা নিরাকার ও সাকার উপাসনা লইয়া যে এত বাদ প্রতিবাদ শুনিতেছি, দুই উপাসনার সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণও উপস্থিত করিয়া আপন আপন মতের সমর্থন অনেকে করিতেছেন। কিন্তু আপনার মতে কোন্ উপাসনা-প্রণালী শ্রেষ্ঠ?

বিদ্যাবাগীশ। নিরাকার উপাসনা মুখে বল্‌তে যত সহজ, কার্য্যে তাহা নহে। নিরাকার উপাসনা গৃহীর পক্ষে এবং সাধারণ অজ্ঞলোকের পক্ষে অসম্ভ-

বারেই অসম্ভব। কারণ সাধারণ লোকে নিরাকার বস্তুটা কি, তাহাই আদবে মনে ধারণা করিতে পারে না। যাহা মনের মধ্যে ধারণা না হইল, তাঁহার উপাসনা কি করিয়া করিবে? তাহাদের পক্ষে নিরাকার উপাসনাটা যেন "ঘোড়ার ডিম" শব্দটার মত একটা অর্থশূন্য শব্দ। উপাসনা করিবার সময় সম্মুখে একটা মূর্ত্তি থাকিলে যেমন সেই মূর্ত্তিটার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তবে উপাসনা করিতে পারা যায়, সম্মুখে কিছু একটা উপলক্ষ্য না থাকিলে তাহার আরাধ্য বস্তুর কোন ধারণাই জন্মিবে না। সংসারত্যাগী মহাযোগী ও জ্ঞানী-গণের পক্ষে নিরাকার ধারণা সম্ভব।

ভদ্রলোক। আচ্ছা ব্রাহ্মেরা সমাজে গিয়া নিরাকার উপাসনা করে, তাহা-দের সম্মুখেত কোন উপলক্ষ্য থাকে না।

বিদ্যাবাগীশ। বিলক্ষণ! ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে হিন্দুর তুলনা হয়? হিন্দুধর্ম্মভ্রষ্ট যত বেটা জাতনাশা একত্র হইয়া সপ্তাহে একদিন সমাজে গিয়া চক্ষু বুজিয়া "হে পরমেশ্বর, আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকেতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃততে লইয়া যাও" ইত্যাদি বলিয়া উপাসনা সাঙ্গ করে। এই সময়ের মধ্যে কেহ চক্ষু বুজিয়া মিট্ মিট্ করিয়া অন্যের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি নজর করিতে থাকে, কেহবা মাত্র অন্যের দেখা দেখি চক্ষু বুজিয়া থাকে মাত্র, আর আস্তে আস্তে দেখিতে থাকে আর সকলে চক্ষু মেলিল কিনা। সকলে চক্ষু মেলিলে সেও চক্ষু মেলে, এই ত ব্রাহ্মদিগের নিরাকার উপাসনা। লম্বা লম্বা কথায় কি নিরাকার ধারণা হয়? যাহারা নিজকে আলোক প্রাপ্ত মনে করে, তাহারা নিজেরাই অন্ধকারে থাকে এবং থাকিবেও। নিরাকার উপাসনা এত সহজ হইলে কি যোগীঋষীগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া বন জঙ্গল মধ্যে বাস করিয়া আজীবন কাটাইতেন? তাহা হইলে কি জগতে আর পাপী থাকিত? মূলকথা জাত বিচার না করিয়া সহজে পানাহার করা স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া এবং সাত দিন অন্তর একদিন সমাজে গিয়া "হে পরমেশ্বর আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও" ইত্যাদি বলা বেশ সহজ। কোন ঝঞ্চাট নাই, তাই কতক গুলি বদমাইস একত্র যুটে এই ব্রাহ্মসমাজ করেছে। হিন্দুধর্ম্মে থাকিলে জাত বিচার করিয়া চলিতে হয়, সন্ধ্যাহ্নিক ও পূজাদি নিত্য কর্ম্ম করিতে হয়, এ কত ঝঞ্চাট। পথে ঘাটে, সহরে বাজারে চলিতে আহারের ও পানীয়ের কষ্ট সহ্য করিতে হয়। ইহার পরিবর্ত্তে সাতদিন অন্তর এক দিন সমাজে গিয়া চক্ষু বুজিয়া আসিলেই খালাস, আর ছয় দিন বেশ মজা করিয়া আহার বিহার করিয়া

বেড়াও। ইহাতে ধর্ম্ম হয় না। যাহারা ধর্ম্মের "ধ" জানে না, তাহারাও ব্রহ্মোপাসক। বিদ্যাবাগীশের শাস্ত্রব্যাখ্যায় মনে একটু কষ্ট বোধ হইল।

আমি। সাকার পূজা করিতে হইলে কোন্ মূর্ত্তি পূজা করা প্রশস্ত? হিন্দু শাস্ত্রে ত অসংখ্যদেব দেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। শাক্তগণ কালী, দুর্গার মূর্ত্তি পূজা করেন, বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ রাধিকার মূর্ত্তি এবং শৈবগণ শিবলিঙ্গ ও শিব মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন। আবার অনেক শাক্তের বাড়ীতে কৃষ্ণ বলরাম, শালগ্রাম শীলা, শিবলিঙ্গ, কালীর দুর্গার মূর্ত্তি, মনসার মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। যিনি প্রত্যহ এই সকল বিগ্রহ ক্ষণকাল মধ্যে পূজা করিয়া শেষ করেন, তাঁহার পক্ষে অন্তরের পূজা করা অসম্ভব? তিনি মাত্র বাহ্যিক পূজা করিয়া থাকেন। মন্ত্র পড়িয়া চাল, ফুল ও জল ছিটায়া থাকেন মাত্র। এ প্রকার বাহ্যিক পূজায় কি কাহারো মুক্তির আশা থাকে? কোন দেবতাকে পূজা করিতে হইলে অহর্নিশ তাঁহাকেই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে প্রকৃত ধর্ম্ম হয়। নচেৎ ভণ্ডামি ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। যদি মূর্ত্তি পূজাই হিন্দুধর্ম্মে করা প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্র এক প্রকার মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। কিছু দিন হইতে আমার মনে এই বিষয় লইয়া নানা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু একটা মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না।

বিদ্যাবাগীশ। (আমার প্রতি কিঞ্চিৎ রোষ কটাক্ষপাত করিয়া) তোমার গায়ে যেন ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম গন্ধ পাচ্ছি।

আমি। আজ্ঞে, কয়েক দিন ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়াছিলাম, তাহাতে বুঝি গায়ে গন্ধ হইয়া থাকিবে। এতটা আমি বুঝিতে পারিনি।

আমার টাটকা জবাবে পণ্ডিত আরো কিছু রুষ্ট হইলেন, কিন্তু স্পষ্ট সে ভাব প্রকাশ করিলেন না।

বিদ্যাবাগীশ। দেখ হিন্দু শাস্ত্রটা কিছু এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই। যুগযুগান্তর হইতে দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থা ও ভজন প্রণালী সকল ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। আর যাঁহারা সেই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কিছু তোমার আমার মত মূর্খ ছিলেন না। সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রটী বহু যুগের চিন্তা ও গবেষণার ফল। এই ধর্ম্ম যেমন প্রশস্ত পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্ম তাদৃশ দৃষ্ট হইবে না। কারণ ইহাতে জ্ঞানী, মূর্খ, বালক বৃদ্ধ, পুরুষ রমণী সকলের পক্ষেই অবস্থানুসারে ব্যবস্থা আছে। একথা সত্য যে হিন্দু শাস্ত্রে অসংখ্য দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এককালের

পক্ষেই যে সেই সমস্ত দেবদেবীকে পূজা করিতে হইবে, এমন কোন কঠোর ব্যবস্থা নাই। যাহার যেমন অবস্থা, যেমন বিশ্বাস ও জ্ঞান, সে সেই অনুসারে যে দেব দেবীকে খুসি, তাঁহার পূজা করিতে পারে। এ বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে ঘৃণা বা বারণ করিতে পারে না।

ছোট ছোট বালিকাগণ ফলদানের ব্রত, পূর্ণপুকুর প্রভৃতি ব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ পঞ্চমীর ব্রত, অনন্তব্রত, দুর্গাষ্টমীর ব্রত প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকার্য্য শিক্ষা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বালকগণের নয় দশ বৎসর বয়সের সময় উপনয়ন হইলেই তাহারা ত্রিসন্ধ্যা, গায়ত্রী পাঠ ইত্যাদি শিক্ষা দ্বারা ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ করিয়া থাকে। ক্রমে বয়প্রাপ্ত হইলেই গুরুদেব তাহাদিগকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। সেই ইষ্টমন্ত্রই জানিবা বীজমন্ত্র। গুরুদেব যাহাকে যে দেবতাকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে উপাসনা করিতে গোপনে আদেশ করিয়া থাকেন,সেই দেবতাকে আরাধনা করিলেই তাহার মুক্তি হইবে। এই এক ইষ্টদেবতা বা দেবীকে মনে প্রাণে দিবারাত্রি ধারণা করিতে হইবে। আর যদি কাহারো বাটীতে কৃষ্ণ-বলরাম, শিবদুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তি স্থাপিত থাকেন এবং তাঁহাদিগকে তিনি স্থাপিত বিগ্রহ মনে করিয়া যদি প্রত্যহ পূজা করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তাঁহার সে পূজা বাহ্যিকপূজার মধ্যেই গণ্য হইবে।

অন্য কোন ধর্ম্মে কিন্তু তুমি এ প্রকার প্রশস্ত ব্যবস্থা দেখিতে পাইবে না। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের জ্ঞানী মূর্খ সকলকেই বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিতে হইবে যে, যিশুখ্রীষ্টের মারফত না হইলে কাহারো পরিত্রাণ নাই। মুসলমান ধর্ম্মের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, সেই প্রেরিত পুরুষ হজরতমহম্মদের উপদেশমত কোরাণের বিধানানুসারে এক খোদাতালাকে ভজনা করিলেই মুক্তি। তাহা না হইলে কাহারো মুক্তি নাই। এ কথা অজ্ঞলোক বুঝুক আর না বুঝুক, জোর করিয়া তাহাকে মানাইতেই হইবে। সে যদি তাহা না মানে, তবে সে কাফের। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নানা রাস্তা, যাহার যে পথে খুসি সেই পথেই যাইতে পারে, কিন্তু আখেরিতে শেষ সীমায় সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবেই হইবে।

আমি। আজ্ঞে, "আখেরিতে শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে হইবে, তাহার অর্থ বুঝিলাম না। শেষ সীমাটা কি ?

বিদ্যাবাগীশ। শেষ সীমাটা সেই এক পরমেশ্বর। খৃষ্টিয়ানদিগের গড্,

মুসলমানের অল্লাতালা, এবং ব্রাহ্মদিগের নিরাকার ব্রহ্ম,যে নামেই বল সেই এক পরমেশ্বরকে বুঝাইবে। সাকার উপাসনার শেষ সীমা সেই নিরাকার ঈশ্বর।

আমি। আজ্ঞে, বীজমন্ত্রগুলিও বোধকরি সকল সম্প্রদায়ের এক প্রকার নহে। বৈষ্ণবগণের বীজমন্ত্র বোধ করি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বা রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ, শৈবগণের "শিব শিব", রামোপাসকগণের "রাম রাম", এবং শাক্তগণের কালীদুর্গার কোন অবোধ্য শব্দযুক্ত নাম হইবে। বৈষ্ণবগণ বীজমন্ত্র জপের সময় নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের সেই ব্রজলীলা, গোপীগণ লইয়া ক্রীড়া, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি নানা বীভৎস দৃশ্য ধ্যানে ধারণা করিয়া থাকেন। শৈবগণের বীজমন্ত্র জপের সময় মহাদেবের সেই ভাং ধুতরা খাইয়া কুঁচনিপাড়া বেড়ানের কথা তাঁহাদের মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। শক্তির উপাসকগণ, পূজার সময় সেই কালী করালবদনির উলঙ্গ মূর্ত্তি, গ্যাংটা শিবের বুকের উপর দাঁড়ান, ভাবটী চিত্তমধ্যে কল্পনা করিয়া থাকেন। রামোপাসকগণের সেই বানর ভালুক লইয়া লঙ্কাকাণ্ডের দৃশ্য নয়নে পতিত হয়। দেখুন দেখি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও রামাইত, এই চারি সম্প্রদায়ের উপাসকগণের আধ্যাত্মিক ভাব চারি প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে ধারণা হইয়া থাকে। কাহারো সঙ্গে কাহারো কোন সংশ্রব নাই। সুতরাং এই তিন শ্রেণীর উপাসকগণ "আথেরিতে" কি করিয়া শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারেন, বুঝিলাম না।

বিদ্যাবাগীশ। রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব সকলেই সেই এক ঈশ্বরের অংশ ও অবতার বিশেষ? পরমেশ্বর যুগে যুগে শিক্ষার জন্য এবং দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনের জন্য এক এক অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তা যে যে নাম করিয়া যে ভাবে তাঁহাকে ডাকে, তাহাতেই তাহার ঈশ্বর লাভ হয়। এখন বুঝলে কি না?

আমি। আজ্ঞে, অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমার নিজের কথাই বলিতে পারি। আমিও গত বৎসর মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু গুরুদেব যে বীজমন্ত্র কাণে দিয়াছেন, তাহার অর্থ আমি বুঝি না। ভাবে বুঝি, কালী দুর্গার কোন নাম বা হইবে, কিন্তু আমার এখন পর্য্যন্তও সেই এক পরমেশ্বরের দিকে লক্ষ্য হয় নাই।

বিদ্যাবাগীশ। এমন কি কথা যাহা তুমি বুঝতে পার নাই?

আমি। আজ্ঞে আমার বীজমন্ত্রটী একটী জটীল দুর্ব্বোধ্য শব্দ, সে শব্দটী

"হ্রীং" কিন্তু ইহার অর্থও বুঝিনা, সুতরাং পরমেশ্বরেরও কোন ধারণা হয় না।

বিদ্যাবাগীশ। আঃ! কল্লে কি! কল্লে কি! সর্ব্বনাশ কল্লে, গুরুর বীজ মন্ত্র সকলের কাছে বলে ফেল্লে! গুরুর বীজমন্ত্র অপর কাহাকেও বল্লে যে সে পাগল হয়?

আমি। তবে আমিও বুঝি পাগল হয়েছি, ততটা বুঝতে পারিতেছি না।

বিদ্যাবাগীশ। তুমি যে দেখ ছি ডাহা খৃষ্টান, আগে ব্রাহ্ম বলে সন্দেহ করেছিলাম, এখন দেখি তাহারও এক কাঠি উপরে! হরি বল! হল কি! বাপু তোমার কোন প্রশ্নের মীমাংসা করা আমার সাধ্য নাই, তুমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে যাও।

আমি। আজ্ঞে মাপ করুন্, হঠাৎ বলে ফেলেছি, আর না বল্লেইবা বুঝাইবার লোক কই! যদি "আখেরিতে" সেই এক পরমেশ্বরই সকলের লক্ষ্য হইল, তাহা হইলে এত গোলমাল না করিয়া সিদাসিদি এক পরিষ্কার পথ ধরাই ভাল। অনর্থক কাঁটা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া জীবনটা বৃথা নষ্ট করি কেন?

আমার কথায় বিদ্যাবগীশ আর কোন জবাব দিলেন না। কেবল বলিলেন, তোমার যাহা খুসি তাহাই করিতে পার। অপর ভদ্র লোক তিনটীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। তাঁহারাও আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটী কহিলেন "মহাশয়! যান, এখানে আপনার কোন কথার মীমাংসা হইবে না।" আমি অনন্যোপায় হইয়া বিদ্যাবাগীশকে একটী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলাম।

পণ্ডিতকে চটাইয়াছি বলিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলাম। কিন্তু উপায় নাই। মনের ভ্রান্তি দূর করিতে গিয়া তর্ক করিলে যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, তাহাতে নাচার। মনে মনে ধারণা হইল আমাদের পণ্ডিতগুলই বা কেমন, নিজের মতের বিরুদ্ধে তর্ক করিলেই চটিয়া লাল হয়। যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিতে তাঁহাদের ধৈর্য্যে কুলায় না।

বাসায় আসিয়া বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার সমস্ত কথা গুলি আমার জমিদার বন্ধুর নিকট বলিয়া, শেষে যে বীজ মন্ত্রটীও বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহাও বলিলাম। উনি পণ্ডিতের বিরাগ প্রকাশের জন্য একটু হাসিলেন এবং আমার সৎসাহসের জন্য প্রশংসা করিলেন। তখন তিনি বলিলেন যে "আজ তুমি ধর্ম্মের সোপানের একধাপ উপরে চড়িয়াছ।"

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে যদি আখেরিতে সেই এক পরমেশ্বরই ধার্য্য হইল, গোস্বামী ও বিদ্যাবাগীশের মতে ত তাহা হইলে বিশেষ কোন অনৈক্য রহিল না, তবে কেন না প্রকাশ্যভাবে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করি। এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে কেন যোগদান না করি? মনের ইচ্ছা এই প্রকার হইলেও চিরসংস্কারের বিরুদ্ধে সহসা যাইতে সাহসে কুলাইল না। কিন্তু এখন বিনা সংকোচে ব্রাহ্মসমাজে গিয়া বক্তৃতা ও ধর্ম্মের উপদেশ শুনিতে লাগিলাম।

এই সময়ে ঢাকা সহরে বক্তৃতার বড় ধূম পড়িয়া গেল। বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতার ঢেউ কালস্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে দেখিয়া, কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে শস্ত্রী মহাশয় ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় যেদিন একেশ্বর বাদের যুক্তি দেখাইয়া বক্তৃতা করিতেন, বিদ্যাবাগীশ তাহার পরদিন কার বক্তৃতায় সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া তাহার সাড়ে ষোল আনা উত্তর দিতে লাগিলেন। সে উত্তর কবির খেউড় বিশেষ। বিদ্যাবাগীশ সুবক্তা হইলেও সুভাষী ও সুরুচিপূর্ণ ছিলেন না। একদিন এক হরিসভায় বক্তৃতা করিবার সময় ব্রাহ্মদিগের কুষ্ঠি এমন করিয়া কাটিলেন যে, যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাহা শুনিয়াছিলেন, তিনিই ঘৃণায় ও লজ্জায় ছি! ছি! করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মদিগকে জালছেঁড়া শূকরের সঙ্গে তুলনা করিলেন এবং রাম মোহন রায়কে কাণকাটা চোরের সঙ্গে তুলনা করিলেন।

হরিসভার সভ্যগণের রুচিও বিদ্যাবাগীশের রুচি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না। কেন না যখনই বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মদিগকে গালি দিতে লাগিলেন, তখনই চারি দিক হইতে হরিধ্বনি, শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি এবং রমণী-মহল হইতে উলুধ্বনিতে কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলিতে লাগিল। বক্তৃতার অন্য অংশে যেখানে ব্রাহ্ম-দিগের কথা উল্লেখ হয় নাই, সেস্থানে হরিধ্বনি ত বড় শুনা গেল না। হরি-সভার বক্তা ও শ্রোতাগণের ব্যবহারে মনে বড় কষ্ট উপস্থিত হইল, কেন না যাহাদের ধর্ম্মজীবন কেবল অপরকে গালি দিবার জন্য গঠিত হয়, তাহারা অত্যন্ত ঘৃণিত প্রকৃতির লোক।

বিদ্যাবাগীশের এ মিশনে ডবল স্বার্থ সিদ্ধ হইল। প্রথম স্বার্থ ব্রাহ্মদিগকে জব্দ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মাথা তোলান, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্রাহ্মদিগকে গালি দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা। শুনিলাম ঢাকা হইতে তাঁহার এই মিশনের পুরস্কার স্বরূপ আড়াই হাজার টাকা তোলা হইয়াছিল, সত্য মিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না।

বিদ্যাবাগীশের খেউড়ের উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া ব্রাহ্মমিশনারি রণে ভঙ্গ দিলেন। এই সময়ে ঢাকায় এত আন্দোলন উপস্থিত হইল যে, পথে ঘাটে হাটে বাজারে দুই দলে সর্ব্বদা তর্ক হইতে লাগিল। তর্কটা ছাত্রমহলেই বেশী, কেহ বলে বিদ্যাবাগীশ বড়, কেহ বলে শিবনাথ শাস্ত্রী। কে বড় তাহা লইয়া সময় সময় মারামারি উপস্থিত হইবার যোগাড় হইত। হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মহা আন্দোলন দেখিয়া পাটনা হইতে এক মৌলবী আসিয়া মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আবার সহর মাতাইয়া তুলিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সাধনানন্দ স্বামী।

আমি এখন দুই ধর্ম্মমতের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কি করি, কোন দিকে পড়ি, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। দুই নৌকায় দুই পা দিয়া বিপদে পড়িব আশঙ্কা হইল। ইতিমধ্যে শুনিলাম যে ঢাকেশ্বরীর বাড়ীর নিকট এক গাছতলায় একটী সন্ন্যাসী আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন বড় ব্যস্ত হইল। একদিন তাঁহাকে দেখিতে গমন করিলাম।

সন্ন্যাসীটী নেংটী পরা বা উলঙ্গ নহে এবং তাঁহার গায়ে ছাইভস্মও মাখা নাই। পরিধানে গৈরিকবসনের একখানি ধূতি, গায়ে লম্বা একটী আলখেল্লা, মাথা প্রায়ই উন্মুক্ত থাকে, কোথাও চলিতে হইলে একটা ক্ষুদ্র পাগড়ির মত ব্যবহার করেন। মাথার লম্বা কেশগুলি জটায় পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা এবং দক্ষিণ বাহুতে ঐ প্রকার এক ছড়া মালা দৃষ্ট হইল। বাঘছালের আসনের পার্শ্বে লম্বা একখানি চিমটা দেখিতে পাইলাম।

লোকটী দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট ও আকর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। তাঁহার অঙ্গটী সুগঠিত এবং চেহারাটী প্রতিভাশালী বলিয়া বোধ হয়। মুখে শশ্রু আছে, সঙ্গে একটী পুস্তকের বস্তানি ও ক্ষুদ্র একটী বোচকা; ভোজনপাত্র, জলপাত্র এবং একটী রন্ধনপাত্র মাত্র আছে।

যখন আমি তথায় যাই তখন দেখি যে তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন।

আমি প্রণাম করিয়া নিকটে যোগাসনে ভক্তিমনে বসিলাম। কিছুক্ষণ এই প্রকার ধ্যানমগ্ন থাকিয়া এক একবার চক্ষু মেলেন। আবার চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকেন। কাহারো সঙ্গে বাজে কথা কহেন না কিন্তু কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইলে সংক্ষেপে দু'চার কথা কহিয়া থাকেন। লোকটা হিন্দুস্থানী কি বাঙ্গালী, তাহা চেহারা দেখিয়া ভাবিয়া ঠিক করা কঠিন। আমার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চাও ? আমি বলিলাম যে "আপনার নাম শুনে আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।" তাহাতে তিনি কহিলেন যে, "আমি ফকির মানুষ, আমাতে দর্শনযোগ্য এমন কি আছে ?" এই বলিয়া পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন, আমিও সর্ব্বপ্রথমে কোন কথা পাড়া ভাল বিবেচনা করিলাম না, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলাম।

ইহার দুই তিন দিন পরে কোন পর্ব্বোপলক্ষে একদিনের জন্য স্কুল বন্ধ হইল। আমি এই সুযোগে পুনরায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলাম। এবার খালি হাতে যাওয়াটা ভাল মনে করিলাম না। 'দোকান হইতে কিছু মিষ্টি এবং কিছু ফল ও এক বোতল দুধ লইয়া প্রাতঃকালে গেলেম। এবারও যাইয়া দেখি তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন। আমি খাদ্য দ্রব্যগুলি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া যোগাসনে ভক্তিমনে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী চক্ষু মেলিলেন এবং আমার প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যোপহার তথায় দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না। তিনি এবার আর পুনরায় ধ্যানমগ্ন না হইয়া অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন আমার আগাগোড়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ যাবত উভয়েই নীরব রহিলাম। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মনে যে সমস্ত বিষয় লইয়া আন্দোলিত হইতেছে, তাহা আভাসে আমি বুঝিতে পারিতেছি। কোন ধর্ম্ম কথার মীমাংসা লইয়া তুমি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছ।"

আমি। আজ্ঞে, সে কথা ঠিক, সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া মন মধ্যে বড় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কোন পথ অবলম্বন করি, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।

সন্ন্যাসী। সাকার উপাসনা লইয়া যাহাদের মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হইবে, তাহাদের তৎক্ষণাৎ সেই উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কেন না সন্দিগ্ধ মনে আসলধর্ম্মের ভাব মনে স্থান পায় না। এ

বিষয়ে সমাজের শাসনে কাহাকেও জোর করিয়া সাকার সাধনায় বাধ্য করান কর্ত্তব্য নহে। সেইমত যে ব্যক্তি সাকারেই সন্তুষ্ট, যাহার মনে নিরাকার ভাব তিলমাত্র স্থান পায় না, তাহাকেও বলপূর্ব্বক সাকার পরিত্যাগ করাইয়া নিরাকার ভজনায় বাধ্য করা কর্ত্তব্য নহে।

আমি। আজ্ঞে, সাকার উপাসনায় কি প্রকৃত ঈশ্বরের ধারণা মনে জন্মে? বহুলোকে আজীবন কেবল সাকার ভজনা করিয়াই যায়, তাহাদের মনে কি খাঁটিধর্ম্ম স্থান পায়? তাহারা কেবল চলিত দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়াই খালাস হয়।

সন্ন্যাসী। সাকার উপাসকগণের মধ্যেও প্রকৃত সাধক আছেন, কিন্তু তাঁহাদেব সংখ্যা অতি বিরল। হাজার করা একটী মেলে কিনা সন্দেহ। সাকার উপাসকগণের মধ্যে যে সকল মহাজন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি রামপ্রসাদ সেনের আধ্যাত্মিক ভাব, তাঁহার স্বরচিত গান গুলি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। শুনিয়াছি নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণও একজন প্রকৃতসাধক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এই প্রকার মহাসাধকগণের ধর্ম্মের ভাব কিন্তু সাকারেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তাঁহারা নামমাত্র সাকারকে উপলক্ষ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাঁহাদের চিত্ত সেই সীমাবদ্ধ সাকার মূর্ত্তি ছাড়িয়া অনন্ত নিরাকারে ভ্রমণ করিতে থাকে। তবে যে তাঁহারা সাকার মূর্ত্তি সম্মুখে রাখেন, সে, কেহ কেহ সমাজের ভয়ে, কেহ বা অভ্যাসবশতঃ। আবার সেইমত নিরাকার উপাসকগণের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁহাদের মন ভাল নহে। তাঁহারা অনন্তব্রহ্মের ভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন না, কেবল দশের সঙ্গে যে বাহ্যিক ভাব অবলম্বন করিতে হইবে এবং যে যে মুখস্থ বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহাই করিয়া খালাস হন। শুদ্ধ ও ঐকান্তিক মন না হইলে ঈশ্বরের নিরাকার ভাব ধারণা করা কঠিন। এবিষয়ে দোষগুণ উভয় মতেই লক্ষ্য হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্ম ও শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন।

আমি। তবে কোন্ পথ প্রশস্ত?

সন্ন্যাসী। আমার মতে শিক্ষিত লোকের পক্ষে নিরাকার উপাসনাই প্রশস্ত। শিক্ষিত অন্তঃকরণে উপযুক্ত উপদেষ্টা দ্বারা যদি সর্ব্বময় পরমেশ্বরের মহিমা ও মহত্ত্বের বিষয় একবার ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যায়, তাহ'লে চমৎকার ফল ফলে। তখন সেই শিক্ষিত আগ্রহশালী অন্তঃকরণ ধর্ম্মজ্ঞানের আলোচনায় পুলকিত হয়। তাহার হৃদয়ে সর্ব্বময় পরমেশ্বরের অলৌকিক শক্তি আসিয়া

কার্য্য করিতে থাকে। তাহার হৃদয়মধ্যে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। সে তখন সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভিন্ন হৃদয়ে আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না। এই প্রকার ব্যক্তি ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও কৃপার সঙ্গে নিজের হীনতা ও পাপময় জীবনের তুলনা করিয়া সময় সময় কাঁদিয়া ফেলে। কৃতপাপের জন্য তাহার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। কিন্তু শিক্ষিত লোক শব্দে তোমরা আমরা সচরাচর যাহা বুঝি, তাহা অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক। প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান স্বতন্ত্র জিনিষ। অধিক লেখা পড়া শিখিলেই সকলের সে জ্ঞান জন্মে না। কেবল পুস্তকগত বিদ্যা মুখস্থ করিয়াই লোকে জ্ঞানী হইতে পারে না। যাহার প্রবৃত্তি উন্নত, বিশ্বাস দৃঢ়, ভক্তি অটল, লেখাপড়া জানা তেমন লোকের মনে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া দিতে পারিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া কালে এক মহা-বৃক্ষে পরিণত হয়। আর লেখাপড়া জানা অথচ কুপ্রবৃত্তির বশীভূত বিশ্বাসহীন, ভক্তিশূন্য, আগ্রহবিবর্জ্জিত অন্তঃকরণে সেই ধর্ম্মের বীজ আদবে অঙ্কুরিতই হয় না। হইলেও তাহা অচিরে শুষ্ক হইয়া যায়। যেমন দুইখানি কর্ষিতক্ষেত্রের মধ্যে একখানিতে যথেষ্ট সার আছে এবং তাহাতে বারি সিঞ্চিৎ রহিয়াছে, অপর খানি কর্ষিত হইলেও তাহা সার ও বারিশূন্য। এই দুইখানি ক্ষেত্রে যদি এক সময়ে বীজ বপন করা যায়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শস্যশালিনী হইবে, আর শেষোক্তক্ষেত্রে বীজ হয়ত অঙ্কুরিতই হইবে না, হইলেও অচিরে নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাতে কোন ফলই ফলিবে না। পূর্ব্বোক্ত দুই জন লেখাপড়া জানা লোকের সঙ্গে এই দুইখানি ক্ষেত্রের তুলনা করিয়া এখন বুঝিয়া লও।

আবার কর্ষিত সারযুক্ত শিক্তভূমিতে বীজ বপন করিয়া যদি তাহার আবর্জ্জনা অর্থাৎ ঘাস জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে আশানুযায়ী ফসলোৎপন্ন হয় না, যেমন আবর্জ্জনাবিহীন ক্ষেত্রে ফসল ফলে। এবং সারবিহীন শুষ্ক আবর্জ্জনা পূর্ণ কর্ষিত ক্ষেত্র আরো মন্দ। সেই-মত সাকার উপাসকগণের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত ও যাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ভক্তি ও বিশ্বাস যুক্ত, তাঁহাদের অন্তঃকরণে প্রকৃতধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, বর্দ্ধিত হইলেও অসংখ্য দেবদেবী ও নানা সামাজিক কুসংস্কাররূপ আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া অনেক সময় তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন তাদৃশ উন্নত হইতে পারে না, যেমন একজন বিশুদ্ধ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী নিরাকার উপাসকের পক্ষে সম্ভবে। উর্ব্বরা-কর্ষিত ক্ষেত্রে আবর্জ্জনা যেমন ভাল ফসলের অন্তরায়, বিশুদ্ধ-প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস

যুক্ত শিক্ষিত মনে নানা কুসংস্কার ও সামাজিক আচার এবং অসংখ্য দেবদেবী সকল আবর্জ্জনা রূপে প্রতিবন্ধক হইয়া তাঁহার ধর্ম্মোন্নতির বাধা জন্মায়।

আমি। আজ্ঞে, আপনার উপদেশটা মনে বড় ধরিল। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার সঙ্গে আপনার উপদেশ অনেকটা মিলিল বটে। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলেন যে, নিরাকার ধারণা গৃহীর পক্ষে অসম্ভব।

সন্ন্যাসী। তাহা সত্য নহে। অনেক লোক গৃহে পরিবার বেষ্টিত থাকিয়াও খাঁটি নিরাকার ভজনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ আছে। মহর্ষি জনক তাহার দৃষ্টান্ত। ভক্তি-বিশ্বাস-শূন্য লেখাপড়া জানা লোকগুলি প্রায়ই Atheist বা নাস্তিক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। এই কারণবশতঃ অনেক গ্রাজুয়েটকে এই ঈশ্বরবিহীন ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। Their hearts are just like that cultivated but a dried piece of land.

আমি। হাঁ, এ দৃষ্টান্তটী বেশ খাটিয়াছে।

আমি সন্ন্যাসীর ইংরেজী বোল শুনিয়া অবাক্ হইলাম। ইনি যে রীতিমত ইংরাজী জানেন, তাহা বেশ বোধ হইল, কিন্তু তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সংকোচ বোধ হইল। ইনি যে একজন নিরাকার উপাসক, তাহা তাঁহার সম্মুখে কোন মূর্ত্তি না থাকায় এবং সর্ব্বদা ধ্যান-মগ্ন থাকায় প্রতিপন্ন হইল।

সন্ন্যাসী। তোমার চেহারাটী যেন দৃঢ়তাব্যঞ্জক এবং কষ্টসহিষ্ণুতার ও তেজস্বিতার পরিচায়ক। তুমি এখানে বোধ করি স্কুলে পড়?

আমি। আজ্ঞে হাঁ, আমি এখানে স্কুলে পড়ি।

সন্ন্যাসী। তোমার সাংসারিক অবস্থা যেন খুব ভাল বোধ হয় না। কিন্তু তোমার মনে যে উচ্চ আশা জাগিতেছে, যে লক্ষ্য করিয়া তুমি সংসারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহা প্রশংসার্হ। তাহাতে তোমার মন-বাঞ্ছা অনেকটা পূর্ণ হইবে। ধর্ম্মই তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যেন তোমার জীবনের এক সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য।

আমি সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া আবার অবাক্ হইলাম। মনে মনে বলি যে, এ লোকটার ফিজিয়গনমী ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে যেন বেশ দখল আছে, বোধ হইতেছে। সন্ন্যাসীর কথায় মনে বড় ভক্তি জন্মিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এই মত লোকের সঙ্গে আজীবনটা কাটাইতে পারিলে জীবনটা সার্থক হইত।

প্রকাশ্যে বলিলাম যে "বর্ত্তমান সময়ে দেশের যে দুরাবস্থা,তাহা চিন্তা করিয়া সময় সময় হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি, সকল বিষয়েই আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন যে, সকলই কালের গতিকের জন্য। একটা জাতীয় জীবন ঠিক একটা মানুষের জীবনের মত। একজন মানুষের জীবন,জন্ম হইতে শৈশবাবস্থা, বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থা ও অবশেষ বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়া কালে তাহার মৃত্যু ঘটে, একটী জাতি সম্বন্ধেও তাদৃশ। আমাদিগের জাতীয় জীবনের এখন মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। কাজে কাজেই চারি দিকে অসাড়তা, নিরানন্দ ও বিষাদের ছায়া পতিত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মে যেমন বিশ্বাস করে যে, একজনের মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মা পুনরায় জন্ম ধারণ করে, আমারও আশা হইতেছে যেন আমাদের জাতীয় জীবনটার পুনর্জন্ম হইবে।

আমি। আমার ত আর আশা হয় না যে, এজাতি আবার জাগিবে।

সন্ন্যাসী। তুমি বাঙ্গালার এক কোণে ব'সে আছ, তাই সমস্ত ভারতের খবর রাখ না। আমি সমস্ত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি, যেখানেই যে জাতীয় লোকের সংস্পর্শে আমি বাস করিয়াছি, সেই স্থানেই নূতন জীবনের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। শীতল সান্নিপাতগ্রস্ত রোগীর নাড়ীর ন্যায় ভারতীয় জাতীয় নাড়ী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই নাড়ী যেন এখন তির তির করিয়া উঠিতেছে, এমন আমার স্পষ্ট বোধ হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানই জানিবা সেই "কোলাপ্‌স"-গ্রস্ত বা অবসন্ন নাড়ীর এক মাত্র রসায়ন। রসায়ন নাড়ীতে ধরিয়াছে, আস্তে আস্তে তাহা সবল হইলে পরে রোগীর চৈতন্যোদয় হইবে। নাড়ীতে রসায়ন ধরিতে প্রায় সিকি শতাব্দী গত হইয়াছে। চৈতন্য লাভ করিতে রোগীর আরো বিশ পঁচিশ বৎসরের দরকার হইবে। আর প্রায় পঁচিশ বৎসর দরকার হইবে শরীরে বল সঞ্চয় করিতে এবং শেষে আর পঁচিশ বৎসরে রোগী সম্ভবতঃ নিজ পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এখন আমার কথাটা বুঝলে কি না?

সন্ন্যাসীর বিজ্ঞ রাজনৈতিক ভাবের আশা পূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন আদবেই ছিল না। বোধ করি, সেইবার বা পর বৎসর বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম কংগ্রেস হয়।

আমি। আমাদিগকে নিজ পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে এত সময়েরই দরকার হইবে ?

সন্ন্যাসী। (ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন) একটা জাতির পক্ষে বিশেষতঃ ভারতীয় জাতির পক্ষে একশত বৎসর অতি সামান্য সময়। এই সময়ের মধ্যে যদি হয়, সেও বহু ভাগ্য। কেন না শরীরটার অবস্থাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখনা কেন ? যেমন সান্নিপাতিক রোগীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি-হীন ও অবশ, সেই রূপ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অঙ্গ অবশ। সংজ্ঞাহীন রোগীর চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে জাতীয় জীবনের জ্ঞান-বিকাশের তুলনা করা যাইতে পারে ! রোগীর মানসিক ও নৈতিক বলের সঙ্গে সেই জাতির ধর্ম্মের তুলনা করা যাইতে পারে, রোগীর হস্ত দ্বয়ের সঙ্গে সেই জাতির সামাজিক আচারের এবং রোগীর পদদ্বয়ের সঙ্গে ঐ জাতির রাজনীতির তুলনা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় জাতীয় জীবনের অজ্ঞানান্ধকার যত দিনে দূর না হইবে, কলুষিত ধর্ম্ম এবং সামাজিক রীতির যত দিন সংস্কার না হইবে এবং আধুনিক রাজনীতি যত দিন শিক্ষা না হইবে, তত দিন স্বপদে ভর করিয়া দাঁড়ানের আশা নাই। এই সকল যদি এক শত বৎসরেও সম্পন্ন হয়, সেও ভাল।

আমি। আজ্ঞে, বুঝিলাম। কিন্তু আপনার মতে কি এক শত বৎসরের মধ্যে দেশের জাতিভেদ প্রভৃতির লোপ হইবে, মনে করেন ?

সন্ন্যাসী। জাতিভেদ যে একেবারে লোপ হইবে, সে আশা আমারও নাই, তবে তাহার কঠোরতা দিন দিন হ্রাস হইবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বৃদ্ধি হইবে। জাতীয় উন্নতির পক্ষে যে সকল স্থলে জাতিভেদ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, সে স্থলে সে বাধা টিকিবে না।

সন্ন্যাসীর রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বোধ হইল যেন ইনি কেবল ধর্ম্মযোগী নহে; একজন পলিটিক্যাল যোগীও বা হইবেন। ইনি যে কেবল নিজ জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহা নহে, ইনি যে সমগ্র জাতিটার মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তাহা এখন স্পষ্ট বোধ হইল। আমি করযোড়ে সন্ন্যাসীর নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, তিনি যদি দয়া করিয়া আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট থাকিয়া ধর্ম্ম ও রাজনীতি শিক্ষা করিতাম। তাহাতে তিনি কহিলেন যে "তোমার এখন লেখাপড়া শিক্ষার সময়, রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় নহে। সম্মুখে সময় অনেক আছে। এখন মনোযোগ দিয়া

লেখাপড়া শিক্ষা কর। আমার বোধ হইতেছে যে তোমার সঙ্গে পুনরায় স্থানান্তরে দেখা হইবে। তোমার নামটি কি?"

আ। আমার নাম কুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সন্ন্যাসী। দেখ তোমার সঙ্গে যে সকল রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা হইল, তাহা গোপনীয় কথা বলিয়া মনে করিয়া রাখিবে। অন্যের নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করিবে না। কেন না আমি সহসা কাহারো নিকট এ বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশ করি না। তোমার চেহারা দেখিয়াই বিশ্বাস করিয়া এই সকল কথা বলিলাম।

আমি। আজ্ঞে না, অন্য কাহারো নিকট আমি এ সকল কথা বলিব

সন্ন্যাসী। তবে তোমাকে আরো দুটি কথা বলিয়া রাখি। দুষ্ট দমন করিতে দৃঢ় সংকল্প হইবে। প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। নারীর মানরক্ষা করিতে যদি প্রাণও যায়, তাহাও শ্রেয় মনে করিবে।

আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদাই একখানি ছুরিকা সঙ্গে থাকা ভাল। তাই বলিয়া সাবধান যেন বিনা কারণে সে ছুরিকার অপব্যবহার না কর।

আমি। তথাস্তু, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। এ আমার জীবনের সংকল্প বিশেষ। পূর্ব্ব হইতেই আমার মন এ বিষয় সংকল্পাবদ্ধ আছে।

সন্ন্যাসী। বেশ, সুখী হইলাম!

আমাদের কথাবার্ত্তা, ধর্ম্ম ও রাজনীতি আলোচনা করিতে করিতে অনেক বেলা হইল, সন্ন্যাসী কহিলেন "তুমি ব'স, আমি স্নান করিয়া আসি।" তিনি নদীতে স্নান করিতে গেলেন। এই সুযোগে তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম।

তাঁহার সঙ্গে একটী হিন্দুস্থানী ভৃত্য আছে, তাহার বয়স প্রায় বৎসর কুড়ি হইবে। সে বাঙ্গালা কথা আদবেই জানে না। ভৃত্যের নাম রামদাস। আমি তাহাকে সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, রামদাস হিন্দিতে বলিতে লাগিল।

রামদাস। বাবাজীকো মোকাম কাশীজীমে। ওন্‌কা বালবাচ্ছা সব কাশীমে হ্যায়। ওন্‌নে পহেলা ইস্কুলমে লেড়কা পড়াতাথা। আজ পাঁচ বরিস্ হুয়া ঘরছে নেকালা। বাবাজী তামাম হিন্দুস্থান ঘুম্‌কে আয়া। কাশ্মীরমে গিয়া থা, লাহোর, পেশোয়ার মে গিয়া থা, বোম্বাই মান্দ্রাজ মে গিয়াথা।

আমি। আভি হিঁয়াছে কাঁহা জায়গা?

রামদাস। আভি হিঁয়াছে চাটগাঁ হোকে কাছাড়, মনিপুর পৌঁছকে, ছঁয়াছে টামুহোকে মাণ্ডালে জায়গা, মাণ্ডালেসে রিঙ্গুন যাকে, কালাপানি হোকে, লঙ্কামে জায়গা, এই ছা হাম্‌কো বোলা হ্যায়।

আমি। এতনা মুলুক ঘুম্‌কে ক্যা করতেহেঁ ?

রামদাস। বাবুজি, হামকো কুছ মালুম নেহি আয়া। হামতো দেখতা যাহাঁ যাহাঁ রতা, ছঁয়েই বটকে ক্যাক্যা লেখতা, কবি কবি নক্‌সা বি খেঁচতা, কবি তসবিবী খেঁচতাহেঁ।

আমি। তসবিবী ক্যায়ছা খেঁচতা ? ওনকো পাছ নেকালনে কো কই

রামদাস। হ্যায় বাবুজি ! ছোট একটো পেচী হ্যায়, ওছকো বিচমে শিশা হ্যায়। আউর ক্যা ক্যা হ্যায়।

আমি। ওনকা নাম ক্যা হ্যায় ?

রামদাস। ওনকা নাম হ্যায় সাধনানন্দ স্বামী, জাত ত শুনকা ব্রামন হ্যায়। পহেলা বাঙ্গালাকো রহেনে ওয়ালা থা।

সন্ন্যাসীর ভৃত্য রামদাসের মুখে তাঁহার পরিচয় পাইলাম। ইঁহার নাম সাধনানন্দ স্বামী, কাশীতে ইহার পরিবার আছে। ইনি স্কুলের মাষ্টার ছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান বেড়াইয়া আসিয়াছেন এবং এখান হইতে কাছাড়, মণিপুর, মাণ্ডালে, রেঙ্গুন হইয়া লঙ্কায় যাইবেন। এত সামান্য সন্ন্যাসী নহে, এযে পলিটিক্যাল সন্ন্যাসী দেখছি।

সাধনানন্দ স্বামী স্নান করিয়া আসিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আজ যাই, আর এক দিন আসিব।" এই বলিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বাসায় গিয়া আমার জমিদার বন্ধুকে সন্ন্যাসীর ধর্ম্মমতের কথা বলিলাম। তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। দুই দিন পরে আমরা আবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম, কিন্তু তিনি তথায় নাই। কেহ বলিতে পারিল না যে তিনি কোন্ দিকে কোথায় গিয়াছেন। আমরা দুঃখিত হইয়া ফিরিলাম।

মনের ধাঁধা ঘুচিল। সাকার নিরাকারের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কিছুদিন অশান্তি ভোগ করিয়াছি, এখন মনে শান্তি হইল। একেশ্বরোপাসনায় মন প্রাণ ঢালিয়া দিলাম। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিতে যাইতে লাগিলাম, কিন্তু প্রকাশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিলাম না।

এবার পরীক্ষা নিকট আসিতেছে, মনোযোগ দিয়া পড়িতে লাগিলাম, টেষ্ট পরীক্ষায় এলাউ হইলাম। টেষ্ট পরীক্ষান্তে খুব মনোযোগের সহিত রাত্রি জাগিয়া পড়িয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। শেষ পরীক্ষা দিয়া বাটী ফিরিলাম।

বাটী ফিরিলে সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। এবার মা, আমার পূজা আহ্নিকে অরুচি দেখিয়া বলিলেন "ঢাকা গিয়া দেবধর্ম্ম বুঝি সকল ভাতে দিয়া খেয়েছ?" আমি আর এ কথার উত্তরে কি বলিব, বলিলাম "প্রায় সেই মতই।" পূর্ব্বে ত্রিসন্ধ্যা, শিবপূজা, ইষ্টপূজার পরিবর্ত্তে মা দেখিতে লাগিলেন, আমি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়া থাকি। আবার সন্ধ্যাকালেও সেই মত দুই এক ঘণ্টা নির্জ্জনে বসিয়া নিরাকার ভজনা করি। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "এরূপ চক্ষু বোঁজাভাব তোকে কে শিখাল, গুরুমন্ত্র কোথায় গেল? মাথার টিকিটী কি হল?" আমি নীরব।

এতদিন পরে সৌদামিনীদিগের কথা মনে পড়িল। আমি তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলাম। আমাকে হঠাৎ দেখিয়া বাবুজায়া মহা খুসী হইলেন। সৌদামিনী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এতদিনে বুঝি আমাদের কথা মনে পড়েছে?" মাষ্টার প্রফুল্ল দৌড়িয়া আসিয়া আমার কোলে চড়িয়া কহিল, "পণ্ডিতমশায়,আমার জন্য আমৃতি আনেন নাই," সে সেই দিনাজপুরের আমৃতির কথা ভুলিতে পারে নাই। আমি মহা লজ্জিত হইলাম। আমাদের পাড়াগাঁয়ে আমৃতি কোথায় পাব? তবে ছেলেদের জন্য যে কিছু সন্দেশাদি মিষ্টিদ্রব্য আনা উচিত ছিল, তাহা তখন স্মরণ হইল না। আমি দুঃখিত হইয়া কহিলাম, "পাড়াগাঁয়ে কি আমৃতি জন্মে? তবে আমি তোমাকে আজ রসগোল্লা আনিয়া দিব।" সে "আচ্ছা" বলিয়া খুসি হইল। সেইদিন নিকটবর্ত্তী একটী বাজার হইতে তাহাকে রসগোল্লা আনিয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইলাম।

সৌদামিনী আর এখন সে সৌদামিনী নাই। তাহার বিবাহ হইয়াছে, বিয়ের জল তার গায়ে পড়িয়া তাহার চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যৌবন-ভরে তাহার মস্তক এখন অবনত হইয়াছে। সে এখন ষোল কলায় পূর্ণ। সে যখন হাসিয়া কথা বলে, তখন যেন বিদ্যুৎজ্যোতি তাহার চক্ষু ও মুখ হইতে বাহির হইয়া আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকাকীর্ণ করে। সৌদামিনীর মা কহিলেন, "সৌদামিনীর বিয়ের সময় পত্র দিলাম, এলেনা কেন?" আমি বলিলাম "তখন আমি বাটীতে ছিলাম না,ঢাকায় ছিলাম।"

বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাবু-জায়া নিশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল যে "বাবু, দিদির বিয়ের সময় আসিয়া দুই মাস বাড়ীতে ছিলেন, আবার দিনাজপুরে সেই মার বাড়ী গিয়াছেন।" সৌদামিনী বলিল "চুপ কর গাধা,, অমন কথা বল্‌তে নাই।" প্রফুল্ল দিদির গালে এক থাপড় মারিয়া কহিল "তুই চুপ কর, আমি কি মিথ্যা কথা বলেছি? যদি আমার সঙ্গে অমন তমন করিস্‌, তা'হলে তোর জামাইয়ের কথা পণ্ডিত মহাশয়কে বলে দিব।" প্রফুল্লের এই ভয় প্রদর্শনে আমরা হাঁসিয়া উঠিলাম। কিন্তু সৌদামিনী মুখখানি লজ্জাবতী গাছের পাতার মত নোয়াইয়া ফেলিল।

প্রফুল্লের কথায় আমার মনে কৌতূহল জন্মিল, জামাইয়ের এমন কি কথা যে,তাহা বলিয়া সে তাহার দিদিকে জব্দ করতে চায়? আমি প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিলাম"কিরে প্রফুল্ল,তোর দিদির জামাইয়ের কথাটা কি?" তাহার পেটে যেন কথাটা গজ গজ করিতেছিল, ব'লে ফেল্লেই বাঁচে,তাহাতে সে কহিল যে "দিদির জামাই বি-এ পাশ, বাইশ বৎসর বয়স, এখনই সে চশমা চখে না দিলে চক্ষে দেখেনা।" আমি বলিলাম "এই কথা, তবে ত বড় শক্ত নিন্দার কথা।" তাহাতে তাহার মা কহিলেন যে, জামাই চশমা ব্যবহার করেন বলিয়া প্রফুল্ল জামাইকে ক্ষেপাইত এবং সৌদামিনীকেও এই কথা বলিয়া ক্ষ্যাপাইয়া জব্দ করে। বলে যে তোর কাণা জামাই, বুড় জামাই, চশমা না হলে চখে দেখে না।"

আমার টাকাগুলি যে বাবুর নিকট আমানত ছিল, তাহার সংবাদ বাবুজায়া শুনিয়াছিলেন। তিনি এখন জানিতে পারিলেন যে, আমার টাকাটা এখনও দেওয়া হয় নাই, তাই সৌদামিনীকে দিয়া তাহার বাপের নিকট এক কড়া চিঠি লেখাইলেন। আমি নিষেধ করিলাম, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না।

সৌদামিনীদিগের বাটী হইতে দুই দিন পরে ফিরিলাম, বাটী আসিয়া সংবাদ পাইলাম যে, আমি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছি এবং আমার জমিদার বন্ধু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ হইয়াছেন।

আবার আমার বিবাহের ঘটক আসা আরম্ভ হইল। এবার পিতা আর সাহস করিয়া আমাকে কিছু বলিলেন না। মা একদিন সংকোচচিত্তে কহিলেন যে, নানা স্থান হইতে বিয়ের সম্বন্ধ আস্‌ছে, যদি বলিস তবে কথাবার্ত্তা ঠিক করি। একটী সম্বন্ধ যে এসেছে, সে মেয়েটী পরমাসুন্দরী, বয়স ১৩ বৎসর, লেখাপড়া জানে।" আমি মাকে বলিলাম যে "আবার বিয়ের কথা বলত,

তবে কিন্তু আবার পালাব।" তাহা শুনিয়া মা কহিলেন যে "না তোমার আর পলাইয়া কাজ নাই, আমি আর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করিব না, আমার পুত্রবধূর মুখ দেখা অদৃষ্টে নাই, তাহা আমি বুঝেছি। আমি বলিলাম যে, পুত্রবধূর মুখ দেখা যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে মাঙ্গনকে বিয়ে দিয়া বউ ঘরে আন। মাঙ্গন আমার ছোট ভাইয়ের নাম। তাহার বয়স তখন সবে ১২ বৎসর। মা চুপ করিলেন। পিতা মাতা উভয়েই আমার ব্যবহারে মহা দুঃখিত হইলেন।

ইহার পরদিন মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপ্ত করিয়া সকলে বসিয়া আছি, এমন সময় লাঠি ভর দিয়া ঠাকুরদাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিরা কহিলাম "ঠাকুরদাদা কি মনে করে? বড় যে সৌভাগ্য।"

ঠাকুরদাদা। সে সৌভাগ্য তোমার নয় আমার, তাই তোমার বাড়ীতে আসিয়া দর্শন পাইলাম। আজ কতদিন বাড়ীতে আছ, একদিনও দেখা দেও নাই।

আমি। ঠাকুরদাদা, কাজটা অন্যায়ই হইয়াছে, কিন্তু আমি গেলে পাছে, সেই বারকার মত ঠাকুরমার সঙ্গে আপনার কোন্দল বাধে,সেই ভয়ে যাই নাই।

আমার কথায় সকলে হসিয়া উঠিলেন!

ঠাকুরদাদা। আচ্ছা কুড়ন, তোর ভাবটা কি বলত? তুই এখন আর ত ছোট নয়। তুই এখন ইংরেজী বিদ্যায় লায়েক হলি, পরীক্ষা পাশ করিলি, এখনও তোর সেই ছোটবেলার বুদ্ধিটা গেল না।

আমি। কোন্ বুদ্ধিটা ঠাকুরদাদা? ছোট বেলার কোন্ বুদ্ধিটা এখনও গেল না?

ঠাকুরদাদা। আরে আর ন্যাকামি করিস না, সেই যে একবার পালাইয়েছিলি, আবার নাকি পালাব্যর ভয় দেখাস্! তোর মত পণ্ডিত মূর্খত দুটী দেখতে পাই না। এখন তোর যুয়ন কাল, এখন খুসি হয়ে বিয়ে করবি, ঘর গেরস্থালি করবি তা না একি! আমার এত বয়স হয়েছে তোর মত একটী ছেলেও ত এযাবত দেখি নাই। দেখদেখি বউ এসে ঘর জুড়ে বস্‌বে, বউ যখন ঘোমটা দিয়া, ঝামুর ঝুমুর ক'রে, শাঁখা নাড়া দিয়া, নত ঝুলাইয়া আসিয়া ভাত দিবে, তখন আহ্লাদে গাটা যেন কাঁটা কাঁটা হইয়া আসিবে। এমন যে বউ তা তুই পেতে চাস্ না। তোর মত বেরসিক লোক আর নাই। যার এ রস জ্ঞান নাই, তাকে আমি পশু আখ্যা দিই। ঠাকুরদাদার কথায় সকলে

হাসিয়া উঠিলেন, আমি আর তাঁহার কথায় কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, কারণ তথায় বাপ-খুড়া মহাশয়রা উপস্থিত ছিলেন না। আমার মৌনভাব দেখিয়া ঠাকুরদাদা কহিলেন, "আমার কাছে কোন জবাব দিলি না, তোর ঠাকুর মা এখন আসিবে", এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর মার প্রবেশ। তিনি আসিয়াই আমার উপর নানা বিদ্রুপ-বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

ঠাকুরমা। ত্থাখ, তোর জেঠীমার বয়স হয়েছে, তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। তোমার মারও বয়স হইল, আজ এতকাল তোমাদের সংসারে থেটে শরীর ক্ষয় করলেন। তোমার মায়ের হাতের দোসর কেউ নাই। তিনি অভাবে এমন কেউ নাই যে, তোমাদের ভাত জল দেয়। এমন অবস্থায় তোমার বিয়ে না করা লোকত ধর্ম্মত অন্যায়। বুড় মা বাপকে শুশ্রূষা করিবার জন্যও একটু ভাবা উচিত।

আমি। বলি ঠাকুর মা "কেউ" নাই বল্লেই ত একটা "কেউ" করতে পারিনে। পয়সা কড়ি নাই, বিষয় সম্পত্তি তাদৃশ নাই, এমন অবস্থায় একটা "কেউ" করে জ্বালাতন হওয়া বইত নয়। যেমন ঠাকুরদাদা আপনাকে "কেউ" করে ছিলেন। শেষে আপনি তাঁকে নাকে কাঁদাইয়া ছাড়িতেন। আমার "কেউ" যদি সেই মত হয়, তবে যে যন্ত্রণার শেষ থাকবে না।

ঠাকুরমা। কেন? তোমার ঠাকুরদাদা "কেউ" করে কি ঠকে ছিলেন? এ "কেউ" না করলে এখন তাঁর বুড়কালে ভাত জল দিত কে? এই "কেউ" না থাকলে তাঁহার কি উপায় হত? অবশ্য প্রথম বয়সে আমি তাঁহাকে খুব জব্দ করিয়া হাতের মুঠের মধ্যে রাখতাম এবং আমাকেও তিনি বড় ভয় করতেন। এখন আর সে ভাব নাই।

আমি। দেখুন ঠাকুরমা, আমার ইচ্ছা এই যে, যদি কখনও মানুষ হই, অর্থের স্বচ্ছলতা হয়, তবে বিয়ে করব। নচেৎ না। অর্থহীন অবস্থায় বিয়ে করে, কেবল যে স্ত্রীর যন্ত্রণা সহ্য করা, তা নহে। ছেলেপিলে হইলে যদি তাহাদের উপযুক্ত মত ভরণপোষণ করতে না পারি, তাহাদের উপযুক্ত মত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারি, তাহা হইলে কেবল এক দরিদ্র পরিবারের সৃষ্টি করিয়া "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া বেড়ান কি ভাল? অন্ন বস্ত্র দিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারিলে সে পাপের কার্য্য।

ঠাকুরমা। তোর কথাও ঠিক। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী জাতির এই

ভাবেই ত চিরকাল চলিয়া যাইতেছে। তোর মত যদি সকলের বুদ্ধি হত, তাহা হইলে কি কাহারো বংশ থাকত?

ঠাকুরমা আমাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া আমার মাকে কহিলেন "না বাছা তোমার ছেলের সঙ্গে কথায় পারবে যে, সে আজ পর্য্যন্ত জন্মে নাই। এক কথা বল্লে চৌদ্দবুড়ি কথা শুনায়। সে বিয়ে করবে না। তোমাদের কপালে যে দুঃখ, তাহা সাথের সাথী, তবে আর দু-চার বৎসর পরে যদি ছোট ছেলের বিয়ে দিতে পার।" এই বলিয়া ঠাকুরমা রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন। বিবাহের আন্দোলন থামিয়া গেল।

ষোড়শ অধ্যায়

পৌত্তলিকতায় অনাস্থা।

আমি বাটীতে বেকার বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। গ্রাম্য নিমন্ত্রণ ও তাশ পাশার আড্ডায় আর আমার মন আকর্ষণ করিতে পারিল না। সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে কোথায় যাব কি করিব, কি উপায়ে "জীবনের লক্ষ্য" সিদ্ধ হইবে, তাহাই ভাবনার বিষয় হইল।

বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা, রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি বিগ্রহ ছিলেন। এবার আর আমার দ্বারা তাঁহাদের পূজা করাইতে কেহ পারেন নাই। এক দিন বাড়ীতে কেহ নাই। ঠাকুর পূজার লোক মেলে না। মা আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে "দ্যাখ্, এক পাল ঠাকুর ঘরের মধ্যে উপস্ করে থাকলেন, কেউ বাড়ীতে নাই, তুই আজ ঠাকুরদের ঘাড়ে একটু জল দে।" আমি বলিলাম "মা, আমার ও সকল ঠাকুরের উপর ভক্তি চটে গেছে, আমি পূজা করতে পারিব না। আমার দ্বারা পূজা করাইলে তোমাদের অক্রিয়া হইবে।"

মা কহিলেন "তুই যা, য্যামন করে তোর খুসি সেইমত পূজাটা সেরে ফেল।"

আমি বলিলাম, "যখন আমার ঐ সকল পাথরের নোড়া ও পিত্তলের পুতুলে বিশ্বাস নাই, মা, তখন আমার পক্ষে তাহা পূজা করিলে ভণ্ডামি প্রকাশ পায়।"

মা কহিলেন "হল হল ভণ্ডামি, যা, মাতৃ আজ্ঞা পালন কর।" আমি অগত্যা

মায়ের আদেশ পালন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন ঠাকুরগুলিকে একসঙ্গে তাম্রকুণ্ডের মধ্যে রাখিয়া, কোষা হইতে তাঁহাদের মাথায় ঢালিয়া দিয়া, মোছাইয়া, টাঠের উপর বসাইয়া, চন্দনের ছিটে তাঁহাদের গায়ে দিয়া, ফুল, তুলসী ও আলো চা'ল ছড়াইয়া দিয়া পূজা সমাপ্ত করিলাম।

ইহার কয়েক দিন পরে এক দিন ঠাকুর ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া শেয়াল ঘরে গিয়া শালগ্রাম শীলাটী মুখে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহা আর খুজিয়া পাওয়া গেল না। অনেক তল্লাসের পর ঘরের কাঁনাছিতে তাহা পাওয়া গেল। পিতা-ঠাকুর মহাশয় "পঞ্চগব্য" দ্বারা তাহা স্নান করাইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। আমি মাকে বলিলাম "এ্যামন ঠাকুরকেও তুমি পূজা করতে বল। শেয়ালের হাত হইতে যে আত্মরক্ষা করতে পারে না, তার আবার পূজা কি জন্য ?"

মা কহিলেন "অমন কথা বলিতে নাই। শালগ্রাম নারায়ণ।"

কিছু দিন পরে নবশাকদিগের "বিশকরম পূজা" বা বিশ্বকর্ম্মার পূজা আসিল। কামার, কুমার, নাপিত প্রভৃতি নবশাকগণ এই পূজা করিয়া থাকে। বাড়ীর কাছে নাপিতদিগের পুরোহিতের অসুখ হওয়ায়, তিনি আসিতে পারেন নাই। তাহাদের পূজা করিবার লোক নাই। তাহারা আসিয়া আমাকে ধরিল। তাহারা আমার বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের খবর রাখে না। তাহারা জানে আমি শিবপূজা ও মন্ত্র লইয়াছি, আমি শুদ্ধ শান্ত ব্রাহ্মণটী। আমি তাহাদের প্রার্থনা সটান অগ্রাহ্য করিলাম যে, "আমি বিশকরম পূজা জানি না। আমার দ্বারা তোমাদের পূজা করাইলে ক্রিয়া শুদ্ধ হইবে না।" তাহা তাহারা কিছুতেই মানিল না, আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল। এবং বলিল যে "আপনি যা জানেন সেই ভাল, ব্রাহ্মণের ছেলে ত, ব্রাহ্মণ নারায়ণ, আমাদের কাছে সকল ব্রাহ্মণই সমান। তাহাদের হাত এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা দুঃখিতান্তঃকরণে যাইতে বাধ্য হইলাম। কি করি, একেত বিশ্বাস নাই, তাহাতে মন্ত্রাদি জানি না। নাপিত বাড়ীতে পূজার সজ্জা সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার সম্মুখে ক্ষুর, নরুণ, বাটী, শীল, এবং চামড়ার থলেটী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। আমি কুশাসনের উপর বসিয়া একটু জল লইয়া আঁচমনের ভান করিয়া "ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু" করিয়া মনে মনে বিড়বিড় করিয়া ফুল ছড়াইলাম এবং আতপ চাউল কিছু হাতে লইয়া ক্ষুরায় নমঃ, নরুণায় নমঃ, চামট্যায় নমঃ, বাট্যায় নমঃ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা সাঙ্গ

করিলাম। নাপিতগণ মহা খুসী হইল। ইতিমধ্যে এক বৃদ্ধ, ক্ষুদ্র একটী বাটিতে এক বাটি জল লইয়া আসিয়া আমার চরণামৃত লইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল। আমি নিজের পা ধোয়া জল অন্যকে পান করিতে দিতে বড় নারাজ হইলাম। আমি বলিলাম "ছিঃ ছিঃ,একজনের পা ধোয়া জল অন্যের খাওয়া কি উচিত? ইহা যে দেয় তাহার পাপ, যে খায় তাহারও পাপ, তাহাতে তুমি বৃদ্ধ, আমি বালক।" তখন বৃদ্ধ বলিল "ঠাকুর মহাশয়, অমন কথা বলিতে নাই। আপনারা ব্রাহ্মণ, নারায়ণ, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, ছোট সাপেরও যে বিষ, বড় সাপেরও সেই বিষ" ইহা বলিয়া সে জোর করিয়া আমার পা ধরিয়া, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটীকে বাটীর মধ্যে স্থাপন করিয়া ধৌত করিয়া লইয়া কতক পান করিয়া, কতক কপালে ও বুকে মালিস করিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম "ঠিক সাধনানন্দ স্বামীর কথাই ঠিক, নানা সামাজিক আবর্জ্জনায় খাঁটি মন থাকিলেও অনেক সময় খাঁটি ধর্ম্মালোচনায় ব্যাঘাত ঘটে। কি কুসংস্কার! কি সামাজিক অধোগতি! বৃদ্ধের কার্য্য তাহার নিকট খুব বাহাদুরী বোধ হইলেও আমার নিকট তাহার কার্য্যটী বিষবৎ বোধ হইল।

ইতি মধ্যে আমার নামে একটা মনিঅর্ডার আসিয়াছে, এমন সংবাদ পাইলাম। ডাক ঘরে গিয়া জানিলাম যে, রায় বাবু দিনাজপুর হইতে পৌনে দুইশত টাকা আমার নামে পাঠাইয়াছেন। টাকা গুলি পাইয়া বড় আনন্দ হইল। বাটীতে আসিয়া মাকে ২৫৲ ও বাবাকে পঁচিশ টাকা দিয়া প্রণাম করিলাম, তাঁহারা আমার উপার্জ্জনের এই সর্ব্ব প্রথম অর্থ পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। সকলে উৎসুক হইয়া এই টাকার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি তখন সেই কুণ্ডু বাড়ীর শ্রাদ্ধ ও পালেদের বুড়ীর শ্রাদ্ধ হইতে সুরু করিয়া ঘোড়ার চিঠী খেলা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলিলাম। সকলে শুনিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন।

খরচাভাবে আর পড়ার কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না। আমি বাবাকে কহিলাম যে, আমি কলিকাতা গিয়া একটা চাকরির চেষ্টা দেখিব। তাঁহারা আমাকে দূরে যাইতে নিষেধ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সুভদ্রা জেলেনী।

আমি তবুও বাটী হইতে বাহির হইব হইব করিতেছি, এমন সময় এমন একটা ঘটনা ঘটিল যে, আশু বাটী ত্যাগ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এক দিন বাড়ী হইতে প্রায় চার মাইল দূরে একটী হাটে কোন দ্রব্যাদি খরিদ করিতে গিয়াছিলাম, বাটী ফিরিতে হাটের উপরই সন্ধ্যা হইল। আমার পাঁচ জন সাথী ছিল। তাহার দুই জন ব্রাহ্মণ, দুই জন কায়স্থ এবং এক জন সাউ। আমরা সকলে একত্র হইয়া বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রায় মাইল দেড়েক আসিয়াছি, এমন সময় বামদিকস্থ গ্রাম খানির মধ্যে হঠাৎ গোলমাল উপস্থিত হইল। হাউ মাউ গোলমালের পরই যেন একটী লোকের আর্ত্ত-নাদের শব্দ শুনা গেল, সে আওয়াজটী যেন স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজের মত বোধ হইল। ইহার পর মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে, "ওরে তোরা, এগরে! আমাকে নিয়ে গেলরে!" ইহার পর গোঁ গোঁ শব্দ শুনিলাম, ক্রমে তাহাও আর শুনা গেল না। আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। নিশ্চয় বোধ হইল যে, লোকের কথার আওয়াজ, গ্রামের নিকট হইতে ক্রমে মাঠের মধ্যে বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু এ আওয়াজটী লোকের মৃদু কথার আওয়াজের মত শুনা যাইতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে হৈ হৈ, হাউমাউ রব ক্রমে যেন কমিতে আরম্ভ করিল।

আমাদের সঙ্গের সাহাজী মহাশয় ভয়েতে কাঁপিতে লাগিলেন, আর সকলেও কতকটা ভীত হইলেন। ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হই-লাম। আমার নিশ্চয় বোধ হইল যে, কোন স্ত্রীলোককে কেহ জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই কথা ধারণা ও রমণীর আর্ত্তনাদের কথা মনে পড়িয়া মন অধীর হইল। "ভয় নাই, এই আমরা এগোচ্ছি" বলিয়া, আমি, যে দিকে লোকের কথার আওয়াজ শুনিলাম, সেই দিকপানে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম। আমার সঙ্গীগণ আমার এ ব্যবহারে নিতান্তই নারাজ, তাঁহারা বলিলেন যে "যা মন্ লয় তাই হক্, আমাদের হাটুরের কেন কাঁধে শাল। চল আমরা বাড়ী যাই।" আমি তখন ক্রোধভরে কহিলাম যে, "তোমরা

কেমন লোক হে? একটা স্ত্রীলোককে দুর্বৃত্তগণ জোর করিয়া লইয়া যাইতেছে; যদি আমাদের সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহার জাত মান রক্ষা করিতে পারি, তবে জীবন ধারণ যে সার্থক হইবে। এই প্রকার অসহায়া রমণীকে বিপদে পতিত দেখিয়া যে পুরুষ নিরস্ত থাকিতে পারে, তাহাকে পুরুষাখ্যা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ধিক এমন পুরুষের, যে রমণীর মান ও জাত রক্ষা করিতে ভীত হয়।" আমার কথায় সাহাজী ভিন্ন আর সকলেরই মনের গতি ফিরিল, কিন্তু তাঁহারা বলিলেন যে "কেমন করিয়া আমরা এই অন্ধকার রাত্রিতে এই মাঠের মধ্যে বিপন্ন স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা করিব? আমরা নিরস্ত্র।" তখন আমি বলিলাম "ইচ্ছা থাকিলেই উপায় আসিয়া জুটে, চল দেখিনা কেন, ব্যাপার খানাই কি? লোক গুলিইবা কে?" তখন আমি একখানা মরিচের ক্ষেতের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহার খুঁটি তুলিয়া লইলাম এবং আর সকলকেও এক এক খানা দিলাম। এবং সেই বাঁশ ঘাড়ে করিয়া দৌড়িতে লাগিলাম। একাকী বাড়ী যাইতে সাহাজীর সাহস হইল না বলিয়া অগত্যা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হইয়া তিনিও দৌড়িতে লাগিলেন। আমি খুব জোরে চেঁচাইয়া চীৎকার করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহস দিতে লাগিলাম। আমার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গিগণও চীৎকার ও আস্ফালন করিয়া নিস্তব্ধ ময়দান কাঁপাইয়া তুলিলেন। রাত্রি, সম্মুখ আঁধার, চারি দণ্ড বাদে চন্দ্র উদয় হইবে। অন্ধকারের গাঢ়তা যেন ক্রমে কমিতে লাগিল। আমরা লোকের চুপি চুপি কথার শব্দানুসরণ করিয়া এক বিলের ধারে উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের কথার শব্দ শুনিয়া গ্রামের মধ্য হইতেও লোকজন গোলমাল করিয়া যেন আমাদিগের দিকে আসিতে লাগিল।

ইতি মধ্যে ক্ষুদ্র একখানি রূপার থালার ন্যায় চন্দ্রদেব যেন গভীর অন্ধকার রূপ মহাসমুদ্র ভেদ করিয়া ভাসিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দূরে যেন চারি পাঁচ জন লোকের মত বোধ হইল। আমি অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, একজন পুরুষ একটী রমণীর মুখ বাঁধিয়া টানিয়া লই য়া যাইতেছে, আর তিন জন তাহাকে ঘেরিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। আমরা দৌড়িয়া সকলেই হাঁফাইতেছি। হাঁফাইতে, হাঁফাইতে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলাম যে,"আরে বেটারা তোরা কে, থাম, স্ত্রীলোকটাকে ছেড়েদে, তাহা না হইলে ভাল হবে না।" লোকগুলি কোন উত্তর না দিয়া, আরো তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। আমাদিগের এই প্রকার চীৎকার শুনিয়া গ্রামের লোকগুলি,

যাহারা আমাদিকে, স্বপক্ষ কি বিপক্ষ, তাহা জানিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস পাইতেছিল না, তাহারা দৌড়িয়া আমাদের নিকটে আসিল। আমরা বিষয়টা কি, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তাহাদের একজন হাঁফাইতে হাঁফাইতে ব্যস্ততা সহকারে বলিল যে "গদাই মাঝির বিধবা মেয়েকে মুসলমানেরা বাড়ীর উপর হইতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।" একথা শুনিয়া ক্রোধে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, আমি আর কোন তর্ক বিতর্ক বা অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহাদিগকে বলিলাম যে "ঐ যে দূরে বদমাইসেরা মেয়েটাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তোমরা দুই ভাগ হইয়া দুই দিক দিয়া অর্থাৎ আমাদের ডাইন ও বাম দিক হইয়া দৌড়িয়া চল এবং আমরা মধ্যে থাকিয়া চলিতে থাকি। তিন দিক দিয়া; তিন দলে বদমাইস্‌-দিগকে ঘেরিয়া ফেলিলে, হয়ত তাহারা মেয়েটাকে ছাড়িয়া দিয়া পালাইতে পারে।" আমরা এ প্রকার দুঃসাহসিক প্রস্তাবে জেলে মহাশয়েরা যেন ভয়ে থতমত খাইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাদের ভাব দেখিয়া আমি জোরে চীৎকার করিয়া ভৎর্সনা করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম যে, "ধিক তোদের জীবনে,তোরা মানুষ না ভূত,এই বলিয়া উত্তেজিত করিলাম। আমার উত্তেজনায় এবং ধিক্কারে তাহারা আমার প্রস্তাবানুযায়ী দুই ভাগ হইয়া দুই দিক দিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। আমরা মধ্য দিয়া দৌড়িতে লাগিলাম এবং আমি চীৎকার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম যে "বেটা পাজিরা—থাম, মেয়েটাকে ছেড়েদে, নচেৎ জাহান্নাবে যাবি।" কিন্তু তবুও তাহারা কোন উত্তর করিল না। আমরা তাহাদের অনেক নিকটবর্ত্তী হইলাম। তখন বদমাইসগণ আমাদিগের আস্পর্দ্ধাযুক্ত কথা শুনিয়া এবং নিতান্ত নাছোড় মনে করিয়া, ভয় দেখাইয়া, আমাদিগকে তাড়াইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা মাত্র চারি জন লোক, একজন স্ত্রীলোকটীকে ধরিয়া রাখিল এবং অপর তিনজন আমা-দিগের তিনদিকের তিনদলকে তাড়াইবার জন্য অগ্রসর হইল। তাহাদের এক জনের হাতে মাত্র একগাছা সড়কী এবং দুইজনের হাতে লাঠি। বলা বাহুল্য যে,আমাদিগের বাম ও দক্ষিণের দুইদল জেলেকে দুইজন লোকে ভেড়ির-পালের মত তাড়াইয়া লইয়া চলিল। জেলেরা দৌড়াইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। আমাদিগকে তাড়াইবার জন্য যে লোকটা আসিতেছিল, তাহার হাতে সড়কী, সে প্রসিদ্ধ একজন লাঠিয়াল। সে কায়দা করিয়া সড়কী ভাঁজিতে ভাঁজিতে, আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া জেলেদের মত তাড়াইবে, এমন চেষ্টায় রহিল।

তাহার বিক্রম দেখিয়া আমার দলের সাজী মশায় ও অপর দুইজন দৌড়িয়া প্রায় বিশগজ দূরে গিয়া দাঁড়াইল। আমি ও নবকুমার দত্ত দুইজনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাদিগের দৃঢ়ভাব দেখিয়া লোকটা একটু থামিল এবং ক্ষণ পরেই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি আমার সঙ্গীদিগকে নানা কটুকথায় গালি দিয়া কহিলাম যে,"তোদের পরমেশ্বরের দোহাই,তোদের মা বাপের দোহাই,যদি তোরা আমাদিগকে ছাড়িয়া পালাস।" আমার কথায় সাহাজী ভিন্ন অপর দুই জন আসিয়া আমাদের পাছে দাঁড়াইল, সাহাজীও অগ্রসর হইল বটে,কিন্তু নিজের গায়ে কোন আঁচড় না লাগে সেইজন্য হাত দশেক দূরে রহিল।

বদমাইস লোকটা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে, আমি নবকুমার প্রভৃতিকে বলিলাম যে, যদি আমি সড়কীর কোপে আঘাত পাইয়া পড়িয়া যাই, তাহা হইলে তোমরা কোন মতেই পলাইবা না, সকলে একযোগে লাঠি ঝাড়িয়া বেটাকে পাড়িয়া ফেলিবা। আমরা পাঁচজনে যদি একটা লোকের সঙ্গে না পারি, তাহা হইলে আমাদের মরণই ভাল, এমন জীবন রাখা না রাখা সমান। আমার কথায় সকলের মনে একটু জেদ ও সাহসের সঞ্চার হইল।

লোকটা আসিয়া আমার উপর সড়কীর কোপ ঝাড়িল। সে কোপ যেন আমাকে ভয় দেখাইয়া হটাইবার জন্য বলিয়া বোধ হইল। আমি লাঠির আঘাতে সে কোপ ব্যর্থ করিয়া দিলাম। এইরূপ দুই একবার তাহার কোপ ব্যর্থ হওয়ায়, আমার দৃঢ়তা ও জেদ দেখিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া ঝাঁ করিয়া আমার উরুতে আঘাত করিল। সে আঘাত নিবারণের কোন উপায় না দেখিয়া, আমি ফস্ করিয়া তাহার সড়কী চাপিয়া ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলাম। সুযোগ বুঝিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নবকুমার তাহার মাথায় এক লাঠির বাড়ি ঝাড়িল। অমনি লোকটা ঘুরিয়া ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেল। সে পড়িয়া যাওয়ামাত্র দীননাথ সরকার প্রভৃতি তাহাকে ঠাসিয়া ধরিয়া পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সাহাজীর আস্ফালন বৃদ্ধি পাইল। (লোকটার হুঁশ হইলেই সে সাহায্যের জন্য চেঁচাইতে লাগিল। তাহার চীৎকারে জেলে তাড়ান দুইজন লোক লাঠি হাতে ভয়ানক বেগে আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিল। বন্দী বদমাইসকে সাহাজীর জিম্বা করিয়া দিয়া, আমরা চারিজন দুইভাগ হইলাম নবকুমার ও দীননাথকে বামদিগের শত্রুকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইতে বলিলাম,এবং আমার সঙ্গে বেণীমণ্ডলকে থাকিতে বলিলাম। আমি আবার ইহাদিগকে কত দিব্যি দিয়া বলিলাম,"তোরা কিছুতেই হটিবি না, হটিসতো তোমাদের পরমেশ্বরের দোহাই লাগে।" আবার নানা কটু

ভাষায় জেলেদিগকে গালি দিতে লাগিলাম। তাহারা আবার আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু সাহস করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না।

বন্দী লাঠিয়ালটীর সড়কীগাছা আমাদের হস্তগত হইল বটে; কিন্তু তাহা আমি আত্মরক্ষার্থ ব্যবহার করিতে ভাল মনে করিলাম না। তাহার কারণ, ঢাল থাকিলে লাঠির বিরুদ্ধে সড়কী লইয়া লড়াই করা ভাল, কেননা ঢালদ্বারা মাথা বাঁচাইয়া, সড়কী দ্বারা বিপক্ষকে আঘাত করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত লাঠিয়ালের সঙ্গে শুধু সড়কী দ্বারা লড়াই করিতে হইলে একেবারেই ব্যর্থমনোরথ হইতে হয়।

আমাদিগের আক্রমণকারী লাঠিয়ালদ্বয় জেলে তাড়াইয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া, আমাদিগকে জেলে মনে করিয়া, অতিবিক্রমের সঙ্গে আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমাকে যে আক্রমণ করিল, সে লাঠিয়ালি কায়দা করিয়া লাঠি ভাঁজাইতে ভাঁজাইতে আসিতে লাগিল। আমারও দিনাজপুরে অবস্থান কালে ব্যায়ামবিদ্যালয়ে লাঠিখেলার শিক্ষা কতকটা ছিল। আমিও তাদৃশ বিক্রমের সহিত লাঠি ভাঁজিতে আরম্ভ করিলাম। সে আমার সাহস ও কায়দা দেখিয়া কিছু দমিয়া গেল, এমন বোধ হইল। প্রথমত কিছুকাল তাহাতে ও আমাতে লাঠিতে লাঠিতে ঠুকাঠুকী চলিল। আমি কেবল আপন মাথা বাঁচাইতে লাগিলাম, তাহাকে মারিবার অবকাশ মোটেই পাইলাম না। তাহার অনেক বাড়ি ঠেকাইতে ঠেকাইতেও গায়ে মাথায় ও হাতে অনেক চোট লাগিল। তাহার লাঠির তেজ সহ্য করিয়া দাঁড়ান আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। কারণ লোকটা যে খুব ভাল খেলোয়াড়, তাহার বেশ পরিচয় পাইলাম। এদিকে আমার সঙ্গীর দ্বারা আমার কোনই আনুকূল্য হইল না, সে তাহার লাঠির চোট্ দেখিয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। আমিও আস্তে আস্তে পশ্চাতে হটিতে আরম্ভ করিলাম। লড়াই করিতে করিতে, হটিতে হটিতে পশ্চাতে ক্ষুদ্র একটী গর্ত্তে পা পড়িয়া যাওয়ায়, আমি পড়িয়া গেলাম। লোকটা আমাকে ঘাড়ে মুড়ে আসিয়া ঠাসিয়া ধরিল। তখন বেণী মণ্ডল ভয়ে দৌড় দিল। অনন্যোপায় হইয়া লোকটার সঙ্গে জড়াজড়ি করিতে করিতে "কিংকর্ত্তব্য" ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সাধনানন্দ স্বামীর সেই উপদেশটার কথা মনে পড়িল। ডান হাত খানা ছাড়াইয়া অমনি আমার পকেট হইতে গুপ্ত ছোট ছোরা খানা বাহির করিয়া ঝাঁ করিয়া, লোকটার পেটে দুই তিনবার আঘাত করিবা মাত্র "ইরে

আল্লারে মরেছিরে, খোয়াজে ভাইরে” বলিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। তখন আমি উঠিয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিলাম। এই সুযোগে বেণী মণ্ডল আসিয়া লোকটার দুই হাত বাঁধিয়া ফেলিল।

এই লোকটার পতনে মাঝি মহাশয়দিগের দ্বিগুণ জোর ও সাহস হইল, তখন তাহারা তৃতীয় বদমাইসকে সকলে একত্র যোগে আক্রমণ করিল। সে তাহার সর্দ্দারদ্বয়ের দুরবস্থা দেখিয়া দৌড় দিল এবং যে লোকটা গদাই ধাঝির মেয়েকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল যে, “মেনাজদ্দি পলারে পলা।” মেনাজদ্দীও মেয়েটাকে ছাড়িয়া দৌড় দিল। তখন জেলেদের আস্ফালন দেখে কে? তাহারা লাফাইয়া লাফাইয়া দৌড়িয়া ঐ দুইটা লোকের পাছে পাছে তাড়া করিয়া চলিল এবং বলিতে লাগিল “এখন পালাস যে, একটু দাঁড়া, মজা দেখাই” আমি তাহাদের ডাকিয়া ফিরাইলাম এবং বলিলাম যে, “গদাই মাঝির মেয়েকে আন।” মেয়েটার নাম সুভদ্রা। তাহার মুখ খুলিয়া দিলে তাহার কান্নাতে আমাদেরও চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। গদাই মাঝিও অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। যুদ্ধ জয়ী হইয়া আমরা সকলে আনন্দে আত্মহারা হইলাম।

আমি এ যাবত মানসিক উত্তেজনায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া এমন ভাবে মত্ত হইয়াছিলাম যে, গায়ের জামা ও পরিধানের ধুতি ভিজিয়া রক্তস্রাব হইতেছে, তাহা আদবেই গ্রাহ্য করি নাই। তখন আমার হুঁশ হইল, অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতেছে দেখিয়া মনটা যেন একটু আশঙ্কিত হইল। গায়ের চাদরটী চিরিয়া,দুই ভাগ করিয়া একখণ্ড মাথায় বাঁধিলাম, আর একখণ্ড উরুতে কসিয়া বাঁধিলাম। শরীর যেন অবসন্ন ও দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এক নবকুমার দত্ত ভিন্ন আমাদের দলের বা জেলেদের কাহারও গাত্রে আঁচড়টুক পর্য্যন্ত লাগে নাই।

গদাই মাঝি ও আর সকলে আমার এত রক্তস্রাব দেখিয়া আতঙ্কিত হইল। গদাই আসিয়া আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল যে, “বাবু! আজ আপনি আমার জাত রক্ষা করিয়াছেন, আপনাদের গুণ আমি আর এ জীবনে শোধ দিতে পারিব না। আপনারা না হইলে আমার সুভদ্রাকে আজ উদ্ধার করিতে কিছুতেই পারিতাম মা। ধন্য আপনার সাহস। আপনারা ব্রাহ্মণ ভদ্রের ছেলে, আপনার যে এত সাহস ও পরের প্রতি এত মমতা, তাহা কথনও মনেও ভাবি নাই, এবং এরূপ কথা কখনও কাণেও শুনি নাই। আমরা

সকলে ত ভয়ে হতাশ হইয়া, কেবল হায়! হায়! করিতেছিলাম। আমাদের এমন সাহস হইত না যে, বদমাইস লাঠিয়ালগণের সঙ্গে লড়াই করিয়া মেয়েকে উদ্ধার করি। আমরা জেলে মানুষ, অতি ভয়াতুর। মুসলমান দেখলে আমাদের ভয় করে।" গদাই মাঝির কথা সাঙ্গ হইলে, অপরাপর জেলে মহাশয়েরা একে একে আসিয়া আমাদিগকে প্রণাম করিল এবং নানা উচ্চ ভাষায় শত মুখে আমাদিগের প্রশংসা করিল।

যে দুইটা লোককে বাঁধিয়াছিলাম,তাহাদের প্রথম ব্যক্তির মাথা ফাটিয়া যথেষ্ট রক্তস্রাব হইতেছিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির পেটে ছুরির আঘাতযুক্ত স্থান সকল হইতে রক্তস্রাব হইতেছিল। তাহার পেটে তিনটী ক্ষত হইয়াছে—তাহার দুইটী ক্ষত গভীর বলিয়া বোধ হইল। এবং একটী হইতে পেটের ভিতরকার পরদা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। লোকটা অর্দ্ধজ্ঞানবৎ হইয়া পড়িয়াছে। লোক গুলিকে আমরা চিনিলাম। তাহারা আমাদের চেনা লোক। লোক দুটাকে ধরাধরি করিয়া জেলেদের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। পঞ্চায়েৎ ও চৌকিদারগণ আসিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। গদাই মাঝিকে কন্যাসহ থানায় পাঠানের বন্দোবস্ত করিয়া, তাহাকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলাম এবং বলিলাম যে, সে আগাগোড়া সত্য ঘটনা যেন বলে, একটী কথাও যেন মিথ্যা না বলে। এবং আমার রক্তমাখা ছোরা খানিও পঞ্চায়েৎ মহাশয়ের হাতে দিলাম এবং আমাকে সাক্ষী মান্য করিতে বলিলাম। সেই রাত্রিতেই পঞ্চায়েৎ গদাই মাঝি ও তাহার কন্যাকে থানায় প্রেরণ করিলেন।

সেই রাত্রিতে আমাদিগের বাড়ী পৌছিতে প্রায় রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল। হাট হইতে ফিরিতে এত বিলম্ব দেখিয়া আমাদিগের বাড়ীর লোক মহা ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আমরা বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, বিলম্বের কারণ অবগত হইয়া, ও আমার রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া পিতা মাতা অস্থির হইলেন। পাড়ার লোক আসিয়া জমা হইল। গ্রামে তখন এক জন ডাক্তার ছিলেন। তিনি আসিয়া আমার ক্ষতে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলেন। ঘটনার বিবরণ শুনিয়া লোকেরা স্তম্ভিত হইল। অভিভাবকগণ আমাকে ভৎর্সনা করিলেন। অপর লোকে নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ বলিল "ছি! ভদ্র লোকের ছেলের কি এমন কাম! চাষার সঙ্গে মারামারি করিতে গিয়া আপন ইজ্জাত নষ্ট করা কি কর্ত্তব্য? আজ যে প্রাণ যায় নাই, সেই পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যির জোর।

ব্রাহ্মণের ছেলে এত গোয়াঁব হইলে কি তাহার ভাল হয়? তাও ছোট জাত জেলের জন্য, নিজের জন্য হইলেও বা কতক সম্ভব হইত" ইত্যাদি।

আমি একেত মাথা ও উরুর বেদনায় কাতব হইয়াছি, তাহাতে গ্রামের কতকগুলি অপদার্থ লোকের নিন্দা ও কটু কথায় মনে আবো কষ্ট পাইলাম। চুপ করিয়া কতক্ষণ যাবত লোকের কথা শুনিয়া শুনিয়া শেষে আর সহ্য হইলনা, জবাব দিয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিতে হইল। আমি বলিলাম যে "আমি কি এতই কুকর্ম্ম করিয়াছি যে, তোমাদের সকলের তিরস্কাব ও নিন্দার ভাজন হইয়া পড়িলাম। আমিত মনে কবিতেছি যে, আমি আজ এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন বরিয়াছি। আজ আমার জীবন ধন্য মনে কবিলাম। আজ একটী নির্দ্দোষী রমণীকে দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া এক জনের জাত রক্ষা করিয়াছি। এই কার্য্যে যদি আমার প্রাণও যাইত তাহা হইলেও এ জীবনকে ধন্য মনে করিতাম। তোমাদেব মত নীচাশয ও ভীরু লোকের পক্ষে আমাব আজকার এই কার্য্যের মহত্ব বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নয়। মনে কব, আজ সুভদ্রা জেলেনী না হইয়া যদি দুর্ব্বৃত্তগণ তোমাদের মা ভগ্নীদিগেব কাহাকেও টানিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে তোমরা কি কবিতে? নিশ্চয়ই গাঁয়ে আঁচড় লাগিবার ভয়ে, ইজ্জতেব ভয়ে সাহস কবিয়া কেহই দুর্ব্বৃত্তদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে না। কেমন বল সত্য কথা কি না? ধিক তোমাদেব এমন জীবনে, যে জীবন রমণীর সতীত্ব ও মান রক্ষার জন্য দিতে প্রস্তুত না হয়। কোথায় তোমরা আমাকে প্রশংসা করিবে এবং আমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে, না, আরো আমাকে নিন্দা করিয়া জব্দ করিতেছ।" আমার তেজপূর্ণ উচিত কথায় সকলে নিস্তব্ধ হইল, আমার কথায় আর কেহ জবাব দিলনা। তখন দুই এক জন লোকে আমাকে সাধুবাদ দিলেন এবং আমার সৎসাহসের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ক্ষত ও শরীরের বেদনায় অতিকষ্টে রাত্রি প্রভাত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পুলিশ তদন্ত।

পরদিন জেলেদের গ্রামে দারোগা জমাদার ও পুলিশ কনষ্টবল আসিয়া গ্রাম খানি টল মল করিয়া তুলিল। আমাদিগেরও তথায় তলব হইল। আমার সঙ্গিগণের সকলেই পলায়ন করিলেন। আমার হাঁটিয়া যাওয়ার সাধ্য নাই, সুতরাং ডুলি করিয়া যাইতে হইল। দারোগাটী মুসলমান কিন্তু জমাদারটী কায়েস্থ ভদ্রলোক। আমি উপস্থিত হইলে দারোগা সাহেবের মুখের বাণী শুনিয়াই আমি অবাক হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই কহিলেন "এ সেই খুনি আসামী? ঠাকুর, মানুষ খুন করে পলাইয়া ছিলে?" আমি আর একথার কি উত্তর দিব। আমি নীরব রহিলাম। ব্যাপার খানা আর বুঝিতে বাঁকী রহিলনা। আমি যে গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী শ্রেণীভুক্ত হইলাম, তাহা সহজেই বুঝিলাম। চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের জোটবদ্ধ মুসলমানগণ একপক্ষে, আর অপর পক্ষে একতাশূন্য, দুর্ব্বল, ভীরু, জেলেগণ। গ্রামের পঞ্চায়েৎটী ব্রাহ্মণ, তিনি জেলেদের পক্ষে থাকিলেও স্পষ্ট ভাবে মুসলমানদিগের বিপক্ষতাচরণ করিয়া জেলেদের সাহায্য করিতে সাহস পাইলেননা। অপর সকল হিন্দুদের মনে মনে জেলেদের প্রতি সহানুভূতি থাকিলেও কার্য্যত তাহাদের দ্বারা কোন ফলই হইলনা। ফলে সকলেই দূরে থাকিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

চারিজন দুর্ব্বৃত্তের মধ্যে আমাদিগকে যে সড়কী লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার নাম পিজিরুদ্দিন। যাহার পেটে ছুরি মারিয়াছিলাম, তাহার নাম নছিরুদ্দিন, অপর দুইজনের এক জনের নাম খোয়াজ মহম্মদ, আর একজনের নাম মেনাজদ্দিন। মেনাজদ্দি ও খোয়াজ মহম্মদ রাত্রিকালে দৌড়িয়া পলাইয়াছিল। দারোগার পক্ষপাতিত্বে এবং তাহাদের গ্রাম্য লোকের একতার জোরে তাহারা আসিয়া সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইল এবং পিজিরুদ্দিন ও নছিরুদ্দিনকে ফরিয়াদি শ্রেণী ভুক্ত করিয়া, আমাকে নবকুমার ও গদাই মাঝি প্রভৃতিকে আসামী শ্রেণী ভুক্ত করিয়া মোকর্দ্দমাটী সাজান হইল। মূলকথা দুইটী মোকর্দ্দমা সৃষ্টি হইল।

দারোগা সর্ব্ব প্রথম গদাই মাঝির জবানবন্দী লইতে আরম্ভ করিলেন।

গদাই মাঝির উক্তি "আমার নাম গদাই মাঝি, পিতার নাম মৃত রামসুন্দর মাঝি, বয়স ৪৫ বৎসর, সাকিম মদনপুর। পিজিরুদ্দি খাঁকে আমি চিনি। পিজিরুদ্দির বাড়ী আমার বাড়ী হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। সে মাঝে মাঝে মাছ খরিদ করিবার জন্য, কখনও বা পাখীধরা জাল কিনিবার ছুতা করিয়া আমার বাড়ীতে আসিত। কখন কখন তাহার সঙ্গে মেনাজদ্দি কি খোয়াজ মহম্মদও আসিত। আমি প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অনেক খাতির করিয়া বসাইতাম ও তামাক্ খাইতে আদর করিতাম। প্রথম প্রথম আমাদের মনে তাহার প্রতি কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যখন দেখিতে লাগিলাম যে তাহারা ঘন ঘন আসিতে লাগিল, তখন আমার মনে কিছু সন্দেহ হইল। তাহারা মাঝে মাঝে আমার মেয়ে সুভদ্রার সঙ্গে আলাপ করিতে ও হাঁসি কৌতুক করিতে চেষ্টা করিত। কখনও তাহার নিকট পান চাহিত, কখনও তাহাকে নিকটে আসিবার জন্য ডাকিত। কিন্তু সে ভয়ে পলাইয়া যাইত। এই সকল ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের প্রতি বিশেষ সন্দেহ জন্মিল এবং মনে মনে বড় বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সাহস করিয়া স্পষ্ট তাহাদিগকে কোন কথা বলি নাই।

"এক দিন আমার অনুপস্থিতকালে পিজিরুদ্দি আমার বাড়ীতে আসিয়াছিল এবং শুনিলাম আমার মেয়ের নিকট অসঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছিল। আমি বাটীতে আসিলে সুভদ্রা কাঁদিয়া সেই কথা আমাকে বলিল। তখন রাগে আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের গ্রামের সুবল মাঝি, রামকুমার মাঝি, হলধর মাঝি প্রভৃতিকে ডাকিয়া এই কথা কহিলাম এবং ইহার প্রতিকারের জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা সকলেই বলিল, চুপ করিয়া থাকাই ভাল, কারণ মুসলমানদিগের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কি আমাদের পারিবার সাধ্য আছে? গ্রামে যত হিন্দু লোক আছে, তাহাদের মধ্যে জোট নাই। একজনের সম্মুখে অপরকে মারিলে কেহ কথা বলে না। গ্রামের সকল হিন্দুর এক জোট হইলে, কার সাধ্য যে বদমাইসগণ এই প্রকার ব্যবহার করিতে পারে? তাহারা আমাকে পরামর্শ দিল যে, গ্রামের পঞ্চায়েৎ হরিমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এবিষয় জানাইয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা কর।

দারোগা। আরে শালা, ঠিক্ কথা বলিশ, তোর সকল কথাই যেন মিথ্যা

বলিয়া বোধ হচ্ছে। (এই কথা বলিয়া দারোগা বেত দ্বারা সপাং করিয়া দুই তিনটী বাড়ী গদাই মাঝির পিঠে মারিলেন)।

গদাই মাঝি। (বেতের বাড়ী খাইয়া পিঠ ডলিতে ডলিতে) হুজুর আমি সত্য কথা ছাড়া মিথ্যা কথা কখনই বলিব না। আমরা জেলে মানুষ, সাদা সিদে লোক, আমরা মিথ্যা প্রবঞ্চনার এলাকা রাখি না। আপনি আমাকে অনর্থক মারলেন।

দারোগা। আরে হারামজাদা, তোর আর ভাল মানুষি জানাতে হবে না। মিথ্যা কথা বলিশ ত কানমলা খাবি। ঠিক কথা বল।

গদাই মাঝি। যদি হুজুর আগেই আমার কথা মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করিলেন, তাহা হইলে আমার আর কোন কথাই না বলা উচিত। আপনারা পুলিশের লোক, আইন মত যে কাজ হয়, তাই করুন।

দারগা। কিরে শালা! আইন মত কাজ কর্‌ব? ও! আমারই অন্যায় হইয়াছে, এযাবত বেআইনি কাজ করেছি। (কনষ্টবলকে ডাকিয়া) মিয়াজান, এশালা জেলেকে উঠাইয়া লইয়া যাও, একটু আইন মত কাজ কর।

দারোগার হুকুম পাইবা মাত্র মিয়াজান কনষ্টবল আসিয়া সুমধুর স্বরে সম্বোধন করিয়া, গদাই মাঝির কাণ ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া রৌদ্রে দাঁড়া করাইয়া চৌদ্দপোয়া করিয়া রাখিয়া তাহার ঘাড়ের উপর একখানি চাড়া রাখিয়া দিল, এবং অপর দুই জন কনষ্টবল দুই দিক হইতে দুই খানি কাণ টানিয়া ধরিয়া রহিল। কাণের টানের চোটে গদাই মাঝি চিৎকার করিতে লাগিল এবং এ দিকে দারোগাও মাঝে মাঝে কনষ্টবলদিগকে বলিতে লাগিল,"তোরা আইনমত কাজ করিস্‌, বে আইনি কাজ কর্‌বিতো তোদের জরিমানা করিব।"

দারোগার আইনের প্রখরতা সহ্য করিতে না পারিয়া, গদাই তাহার ভাই প্রহ্লাদকে ইশারা করিল। প্রহ্লাদ মাঝি পঞ্চায়ৎ মহাশয়কে ডাকিয়া গোপনে যেন কি কথা বলিল। পঞ্চায়ৎ আবার হিন্দু জমাদার বাবুকে ডাকিয়া কাণে কাণে কি বলিলেন এবং জমাদার আবার দারোগার কাণে কাণে কি কথা বলিলেন। তখন দারোগা গদাই মাঝিকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। গদাই মাঝিকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কেমন আইনের খবর কি?" তাহাতে গদাই মাঝি জোড়হাত করিয়া কহিল, "আজ্ঞে, হুজুর, আমরা জেলে মানুষ, সর্ব্বদা জলে থাকি, ও মাছ ধরি, এত আইন জ্ঞান আমাদের থাক্‌লে কি আর এমন কথা বলি।

হুজুরের যে আইনের যে এমন সূক্ষ্ম বিচার,তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল না।" দারোগা গদাই মাঝির কথা ব্যঙ্গোক্তি মনে করিয়া আবার রুষ্ট হইলেন। তবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ ইতিমধ্যে কনষ্টবলগণ পাঁচ টাকা, জমাদার দশ টাকা এবং তাঁহার নিজ তহবীলে পঁচিশ টাকা আসিয়া পৌছিয়াছে, সুতরাং তাঁহার ক্রোধের উদ্দীপনা হইলেও বারি-নিক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইল। রূপচাঁদ এমনই জিনিষ !

দারোগা। বল বেটা পূর্ব্বে যাহা বলেছিস্, তার পর হইতে বল্

গদাই। আমি পঞ্চায়েৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া পিজিরুদ্দির ব্যবহারের কথা আগাগোড়া বলিলাম। তিনিও অনেক চিন্তা করিয়া কহিলেন যে "তুমি কি দুষ্ট মুসলমানদিগের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে ? তাহারা বড় বদমাইস্, তাহারা ঘরে আগুন দিতে পারে, মাথায় বাড়ী দিতে পারে, বুকে ছুরি দিতে পারে, তাহাদের অসাধ্য কাজ নাই। তোমাকে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। কিন্তু সাবধান থাকিবে। এবং পিজিরুদ্দিদিগকে তোমার বাড়ীতে আসিতে মানা করিয়া দিবে।" আমি কোন স্থানেই জোর না পাইয়া মনোদুঃখে চুপ করিয়া রহিলাম। ইহার দুই দিন পরেই আবার পিজিরুদ্দি ও নছিরদ্দি আমার বাড়ীতে আসিল। আমি এবার আর তাহাদের বস্‌তে আদর কর্‌লাম না, এবং বলিলাম যে, তোমরা আর আমার বাড়ীর উপর আসিও না। তাহারা রাগিয়া কহিল যে, "তোর বাড়ীর উপর আসিয়াছি বলিয়া তুই আমাদিগকে অপমান করলি, আচ্ছা থাক, ইহার প্রতিফল যদি দিতে না পারি, তবে আমরা মুসলমানের ছাওয়াল না।" এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পর, গত কাল সন্ধ্যার পর আমার মেয়ে সুভদ্রা ঘরের কাণাছিতে গিয়াছিল, অমনি সে "ইরে আমারে নিলরে নিল" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। আমি ও প্রহ্লাদ দৌড়িয়া যাইতেই একজন ধাঁ করিয়া এক লাঠির বাড়ী আমার উপর ঝাড়িল। ভাগ্যে আমার মাথা বাঁচিয়া গেল, বাড়ীটা আমার বাঁ কাঁধের উপর পড়িল। আমরা ভয়েতে দৌড়িয়া পলাইলাম। সত্য মিথ্যা এই দেখুন, আমার কাঁধে বড় দাগ হইয়া রহিয়াছে।

দারোগা—আরে এই দাগ কৃত্রিম-দাগও হইতে পারে, ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হয় যে, পিজিরুদ্দিরাই এই বাড়ী তোর কাঁধে ঝেড়েছিল ? বল তারপর কি হইল ?

গদাই—সুভদ্রা অনবরত চেঁচাইতে লাগিল যে "আরে তোমরা এগরে,

আমার জীবনের লক্ষ্য।

(উপন্যাস)

চীন-দেশের ব্রিটিশ কন্‌সালের ও কাষ্টম বিভাগের ডাক্তার, "সন্তান-শিক্ষা", "চীনদেশে সন্তান চুরী" ও "নব্যবাঙ্গালীর-কর্ত্তব্য" প্রণেতা

শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত ও প্রকাশিত।
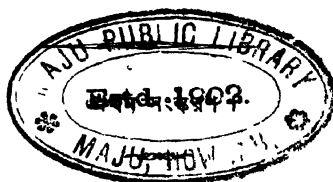
কলিকাতা,

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

আমারে "মিলরে মিলরে।" আমরাও চেঁচাইতে লাগিলাম, কিন্তু ভয়েতে আমরা তাহার নিকট যাইতে সাহস পাইলাম না। পাড়ার সমস্ত মাঝিরা আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই মার মার, ধর ধর করিতে লাগিল, কিন্তু এত লোকের মধ্যে কাহারো এগোতে সাহস হইল না। কারণ অন্ধকারের মধ্যে যদি বদমাইসগণ আবার লাঠির বাড়ি মারে। সুভদ্রার চেঁচানির পরক্ষণেই গোঁ গোঁ শব্দ শুনিলাম, তাহার পর আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। ইহার পর কোন দিক দিয়া তাহাকে লইয়া চলিল, তাহাও অন্ধকারে আমরা ঠিক করিতে পাইলাম না।

"ইহার পর মাঠের মধ্যে বিলের ধারে গোলমাল শুনিতে পাইলাম। কেহ যেন বল্‌তে লাগিল যে "ভয় নাই, এই আমরা আস্‌ছি।" এই বলিয়া ধর ধর শব্দ শুনিলাম। আমরা এই কথা শুনিয়া এগোইয়া মাঠের মাঝে গেলাম, কিন্তু ভয়ে নিকটে যাইতে সাহস হইল না। যখন স্পষ্ট বুঝিলাম যে, যাহারা ধর ধর করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই সুভদ্রাকে রক্ষার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা শত্রু বা বদমাইস নয, তখন আমরা দৌড়িয়া তাহাদের আরো নিকটে গেলেম। আমরা নিকটবর্ত্তী হ'যে দেখতে পেলেম পাঁচজন লোক। তাঁহারা আমাদিগকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলে আমরা ঘটনাটী বলিলাম। তখন কুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়,আমাদিগকে গালি দিয়া বল্লেন যে"আরে বেটার ভাবিস কি, দেখিস কি? তোরা দুই ভাগ হইয়া, দুইদিক দিয়া যা, আর আমরা মধ্যদিয়া যাই। এই তিন দিক দিয়া শালা বদমাইস্‌দিগকে ঘেরিয়া ফেলি। তাহা না হইলে মেয়েটাকে রক্ষা করা গেল না। মেয়েটাকে নিয়ে গেল যে। শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর যাও, দৌড়াও।" ঠাকুর মহাশয়ের কথামত আমরা মাঝিরা দুই ভাগ হইয়া দুই দিক দিয়া দৌড়িতে লাগিলাম এবং চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলাম যে,"বেটারা ভাল চাস্ ত মেয়েটাকে ছেড়ে দে।" ঠাকুরমহাশয়রা মধ্য দিয়া দৌড়িতে লাগিলেন। তাঁহারাও চেঁচাইয়া এক প্রকার কথা বল্‌তে লাগলেন। ইহার মধ্যে জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। আমরা চারি জন লোককে দেখতে পেলেম। তাহার একজন সুভদ্রাকে মুখ বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাচ্ছে, আর তিন জন তাহাকে ঘেরিয়া পাছ পাছ যাঁচ্ছে। আমরা প্রায় তাহাদিগকে তিনদিক হইতে ঘেরিয়া ফেলিবার যোগাড় করিলে, পিজিরদ্দি, নছিরদ্দি ও খোয়াজ মহম্মদ, এই তিন জনে আমাদের তিনদলকে তাড়াইবার জন্য অতি বিক্রমের সহিত আসতে লাগিল। পিজিরদ্দির হাতে সড়কী, সে ঠাকুর মহাশয়-

দিগকে আক্রমণ করিল। আর আমাদের জেলেদের দুই দলকে তাড়াইবার জন্য একদিকে নছিরদ্দী, অপরদিকে খোয়াজ মহম্মদ লাঠি হাতে আক্রমণ করিল। আমরা, মাঝিরা, লোক বেশী হইলেও মুসলমান লাঠিয়ালের লাঠির ভাঁজ ও কায়দা দেখিয়া ভয়েতে দৌড় দিলাম, তাহারা আমাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। ইহার মধ্যে পিজিরদ্দি "ওরে নছ্‌রা, খোয়াজে, এগোরে" বলিয়া যে চেঁচাইল, তাহা আমরা শুনিলাম। পিজরদ্দির চেঁচানি শুনিয়া খোয়াজ মামুদ ও নছিরদ্দী আমাদিগকে ছাড়িয়া পিজিরদ্দির সাহায্যের জন্য দৌড়িল।

এই সময়ে কুড়নঠাকুর চেঁচাইয়া আমাদিগকে, সাহায্যের জন্য ডাকিতে লাগিলেন এবং আমাদিগকে গালি দিতে লাগিলেন। আমরাও দৌড়িয়া গেলেম বটে, কিন্তু দূরে থাকিলাম, সাহস করিয়া তাঁহাদের খুব নিকটে যাইতে পারিলাম না। নছিরদ্দীর সঙ্গে ঠাকুর মহাশয়দিগের মারামারি হইতে হইতে, নদিরদ্দী চেঁচাইয়া বলিল 'ওরে আল্লারে, খোয়াজে ভাইরে, মরিছিরে' বলিয়া একবার চেঁচাইল, তাহা শুনিলাম। তাহার পর খোয়াজ মামুদ দৌড় দিল, আমরা তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া গেলেম। সে ডাকিয়া বলিল, মেনাজদ্দি পালারে, পালা। মেনাজদ্দিও সুভদ্রাকে ছেড়ে দৌড় দিল। আমরা বড় খুসী হইয়া সুভদ্রার নিকটে গিয়া তাহার মুখের বাঁধ খুলিয়া দিয়া তাহাকে আনিলাম। সে দুঃখে ও অপমানে কাঁদিয়া মাটীতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার দ্বারা যে আমার জাত ও মান রক্ষা হইল, তাহা জানাইলাম।"

দারোগা। আচ্ছা, তাত বুঝলাম যে, ঠাকুর মশায়ের মেহেরবাণিতে তোমার মেয়ের জাত মান রক্ষা পাইল, কিন্তু পিজিরদ্দির মাথা বা কে ভাঙ্গিল, এবং নছিরদ্দির পেটে ছুরির কোপ কে কেমন করিয়া মারিল?

গদাই মাঝি। জ্যোৎস্না রাত্রি হইলেও দূর হইতে সকল বিষয় স্পষ্ট আমরা দেখিতে ও বুঝিতে পারি নাই। তবে ঠাকুরমশায় বলিয়াছিলেন যে, পিজিরদ্দী তাঁহার উরুতে সড়কীর কোপ মারিলেই, তিনি তাহার সড়কীর ফলা চাপিয়া ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতেই তাঁহার সাথী একজন পিজিরদ্দির মাথায় বাড়ি মারিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল এবং সে পড়িয়া যাওয়া মাত্র তাহারা পিজিরদ্দীকে বাঁধিয়া ফেলিল। আর নদিরদ্দী যখন ঠাকুর মশায়কে লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল, ঠাকুর মশায় বাড়ি ঠেকাইতে ঠেকাইতে পিছে হটিতে হটিতে এক গর্ত্তে পা পড়িয়া গেলে, নদিরদ্দী তাঁহাকে ঠাসিয়া ধরে।

কেহই তাঁহার সাহায্যে সাহস করিয়া যায় না, তখন তিনি তাঁহার নিজের জামার জেবের মধ্যে যে একখানি ছুরি ছিল, তাহা দিয়া তাহার পেটে আঘাত করিলে সে "আল্লারে মরিছি" বলিয়া পড়িয়া গেল।

"যখন পিঞ্জিরদ্দী সড়কী লইয়া ঠাকুর মহাশয়দিগকে মারিবার জন্ত দৌড়িল, তখন আমাদের ভয় হইল পাছে বা আমার মেয়ের জন্য একটা ব্রহ্মহত্যা হয়। আমাদের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। শেষে দেখিলাম যে ঠাকুর মশায়ের জামা ও ধুতি ভিজে গেছে এবং রক্ত পড়িয়া তিনি অতি কাতর হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার ছোরাখানা দিয়া থানায় গিয়া এজাহার করিতে বলিলেন এবং তাঁহারা বাড়ী রওয়ানা হইলেন, আমরাও থানায় গিয়া এজাহার করিলাম।" দারোগা সাহেব আগাগোড়া গদাইমাঝির জবানবন্দী শুনিয়া মুখটা একটু বিষণ্ণ করিলেন এবং বলিলেন, তোরে এমন করিয়া বাঁধা গদ কে শিক্ষা দিয়াছে? গদাই বলিল, "হুজুর সত্যি কথা কব, তার আর বাঁধা গদ কি? মিথ্যা কথা সাজাইয়া বলিতে হইলে বাঁধা গদের দরকার হয়।" তখন দারোগা রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা বেশ চুপ কর।" গদাইমাঝি চারিজন বদমাইসকে সনাক্ত করিল।

ইহার পর দারোগা অতি মার্জ্জিত ভাষায় সুমধুর স্বরে কহিলেন "ডাক তোর মেয়েমাগীকে ডাক।"

গদাই মাঝি সুভদ্রাকে ডাকিল। তাহার জবানবন্দী আরম্ভ হইল। সেও আগুপান্ত সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণন করিল। এবং গদাই মাঝির কথার সঙ্গে মূলত সকলই ঐক্য হইল, কিন্তু সামান্য বিষয়ে দুই এক কথার অনৈক্য মাত্র হইল। তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। সুভদ্রার জবানবন্দীর সময়ে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কুড়ন ঠাকুরের সঙ্গে তোর আসনাই আছে কিনা?" তাহাতে সুভদ্রা অপমানিত ও লজ্জিত হইয়া অধোবদনে বলিল যে "ছি! আপনি হাকিম হয়ে, আমায় এমন কলঙ্কের কথা বল কেন? কুড়ন ঠাকুরকে পূর্ব্বে আমি কখনও দুই চক্ষেও ত দেখি নাই।" সুভদ্রার মিষ্টভর্ৎসনায় দারোগা কিছু লজ্জিত হইলেন, কিন্তু বদ লোকে কি নিজের ত্রুটি স্বীকার করে? তিনি কহিলেন "আরে হারাম জাদী, একথা কি আমি বলি, সকলেই বলে, তোর কথার ত বড় চোট দেখছি। তুই এমন বজ্জাত না হইলে কি এমন একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে।" দারোগার মর্ম্মভেদী কথায় সুভদ্রা আর কোন উত্তর করিল না, কেবল অধোবদনে দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল।

তাহাকে বদমাইসদিগকে সেনাক্ত করিতে কহিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহাদিগকে সোনাক্ত করিয়া দিল। অতঃপর আমার জবানবন্দী আরম্ভ হইল। আমি পূর্ব্ব লিখিত মত নির্ভয়ে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বর্ণন করিতে লাগিলাম। দারোগা আমার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং মাঝে২ কর্কশ ভাবে আমার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিতে লাগিলেন। শেষে দারোগা আমাকে বলিলেন যে "ঠাকুর সত্যি কথা বলিও। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমিই এই ঘটনার মূলীভূত কারণ। আমার বোধ হইতেছে যে তুমি খুনের দাবিতে পড়িবে। তুমি বামুনের ছেলে হয়ে এত দুর্ব্বৃত্ত।" আমি বলিলাম যে "আপনার যা খুসী বলিয়া যান। আমারও জ্ঞান বিশ্বাস মতে যাহা জানি তাহা বলিয়া যাই। আমি দুর্ব্বৃত্ত কি সুশীল, তাহা আদালতে প্রকাশ পাইবে। এখন আপনার যে কর্ত্তব্য, তাহা আপনি করিয়া যান।" আমার এই মিঠা কড়া জবাবে দারোগা আরো রুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন যে, "চুপ, বেশী কথা বলিওনা, বেশী কথা বল্লে গদাই মাঝির উপর যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি, তোমার উপরও তাহাই করিব।" আমি বলিলাম যে "আপনি মফঃস্বলের লাট সাহেব যাহা খুসী করতে পারেন, আমাদের কোন সাধ্য নাই। কিন্তু একথা মনে রাখিবেন যে আমি জেলে নই, আমাকে যদি গদাই মাঝির মত অপমান করেন, তাহা হইলে ঘটনা আদালতে পর্য্যন্ত গড়াইবে। আমাকে অপমান করিবার কোন ক্ষমতা আপনার নাই। আপনার ক্ষমতা মাত্র আমাকে খুনী আসামী করিয়া চালান দিতে, তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট নহি।" আমার দৃঢ়তা ও সাহস যুক্ত কথায় দারোগা রাগে দন্ত কড়মড় করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া গদাই মাঝির উপর যে আইন খাঁটাইয়াছেন, তাহা আমার উপর খাঁটাইতে পারিলেন না। আমি সমস্ত ঘটনা আগা গোড়া বলিলাম, অসহায় রমণীকে দুর্ব্বৃত্তদিগের হাত হইতে রক্ষা করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই মহতোদ্দেশ্যের জন্য নিজের প্রাণকে বিপদে ফেলিয়াছিলাম নিজে সাংঘাতিক আঘাত পাইলাম এবং পরিণামে আরো কত লঞ্ছনা পাইব, তাহা জানিয়াই এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে প্রাণ অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলাম, সমস্ত ঘটনা বলিলাম। দারোগা সে সমস্ত লিখিলেন কি না জানিনা।

আমার জবানবন্দী শেষ হইলে প্রহ্লাদ মাঝি ও অন্যান্য মাঝিগণের জবানবন্দী শেষ হইল, অবশেষে জখমদিগের জবানবন্দী আরম্ভ হইল। পিজিরুদ্দির উক্তি—"আমার নাম পিজিরুদ্দিন সেখ, পিতার নাম মৃতঃ আজীমদ্দীন

সেখ, বয়স ৩০ বৎসর, সাকিন খাঁর গাতি। কুড়ন চক্রবর্ত্তীর পিতার সঙ্গে আমাদের জমিজমা লইয়া বিবাদ আছে, বিবাদীয় এক খণ্ড জমি হইতে আমরা ধান কাটিয়া লইয়া যাই, সেই কারণে ঠাকুরদের আমাদের উপর প্রধান আক্রোশ। চক্রবর্ত্তী ঠাকুরেরা আমাদিগের জব্দ করিবার জন্য নানা ফিকির তালাশ করিতে থাকে। আমি কখন কখন গদাই মাঝির বাড়ীতে মাছ খরিদ করিবার জন্য যাইতাম। কুড়ন ঠাকুরকে প্রায়ই গদাই মাঝির বাড়ীতে বসা দেখিতাম। সময় সময় ঠাকুরকে গদাই মাঝির মেয়ের সঙ্গে হাঁসি কৌতুক করিতেও দেখিয়াছি, অল্প কয়েক দিন হইল, গদাই মাঝির বাড়ীতে মাছ খরিদ করিতে গিয়াছিলাম। মাছের দাম লইয়া গদাইমাঝির সঙ্গে আমাদের বচসা হয়; কারণ সে মাছের উচিত মূল্য হইতে ডবল মূল্য চাহে। আমরা তাহা দিতে নারাজ। কুড়ন ঠাকুর ও সেই দিন গদাই মাঝির বাড়ীতে বসা ছিল। মাছের দাম লইয়া গালাগালি হইলে গদাই আমাকে ধম্‌কায় যে, আমাকে সে মজা দেখাইবে। এই আক্রোশে কুড়ন ঠাকুর ও গদাই দুইজনে জোট করিয়া আমাদিগকে মারিয়াছে।"

দারোগা। কুড়ন ঠাকুর গদাই মাঝির সঙ্গে যোগ করিয়া তোমাদিগকে মারিবার কারণ কি?

পিজিরদ্দী। আমার বিশ্বাস গদাই মাঝির মেয়ের সঙ্গে কুড়ন ঠাকুরের আসনাই আছে। এই জন্য এবং পূর্ব্ব মনোবাদে ঠাকুর জেলেদিগের সঙ্গে জোট করিয়া এই কাজ করিয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে মাঝিরা ভিন্ন অন্য লাঠিয়াল ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে গদাই যে এজাহার করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কেবল নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই এই মোকর্দ্দমা সাজাইয়াছে। মেনাজদ্দি, খোয়াজ মহম্মদ এবং নজিরদ্দি আমার সাক্ষী।

দারোগা। কবে কোন্ সময়ে কি প্রকারে তোমাদের ইহারা মারিল?

পিজিরদ্দী। কাল সন্ধ্যার সময় আমি নছিরদ্দী, মেনাজদ্দী ও খোয়াজ মহম্মদ, এই চারিজনে হাট হইতে বাড়ী যাইতেছিলাম। মাঝি পাড়া ছাড়িয়া কেবল মাঠের মধ্যে পড়িয়াছি, এমন সময় বটগাছের নিকটস্থ জঙ্গলের আড়াল হইতে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন সপাৎ করিয়া আমার মাথায় এক লাঠীর বাড়ি মারিল, আমি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। ক্ষণকাল পরেই আমার হুঁশ হইল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে গদাই মাঝি আমার দুই হাত গামছা দিয়া বাঁধিয়াছে এবং নছিরদ্দীরা কাহার সঙ্গে যেন মারামারী করিতেছে,

আমি কাহাকেও ভাল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহাদের কথার আওয়াজ বুঝিলাম। আমি চেঁচাইয়া বলিলাম যে "ইরে আমারে ধ'রে বেঁধে নিলরে তোরা এগ রে।" তাহার কিছুকাল পরেই নছিরদ্দী চেঁচাইয়া বলিল "ইরে আল্লারে, মরিছি রে, খোয়াজে ভাইরে।"তার পর আর কোন কথা শুনিলাম না, আমার বোধ হইল মোনাজদ্দি ও খোয়াজ মামুদ ভয়ে দৌড়িয়া পলাইল, কারণ বিপক্ষে লোক বেশি। শেষে শুনিলাম যে, মেনাজদ্দী, খোয়াজ মামুদ ও নছিরদ্দীরা মারামারি করিতে করিতে কুড়ন ঠাকুরকে নছিরদ্দী ঠাসিয়া ধরিয়াছিল। সেই সময় ঠাকুর কোমরের ছুরিদ্বারা তাহার পেটে খোঁচা মারিয়া যখম করিয়াছিল। নছরদ্দী পড়িয়া গেলে, মেনাজদ্দী ও খোয়াজ মামুদ ভয়ে দৌড়িয়া পলাইল। আমাকে ও পিজিরদ্দীকে বাঁধিয়া কুড়ন ঠাকুর ও তাহার লোক—গদাই মাঝির বাড়ীতে লইয়া গেল এবং কতক্ষণ গোপনে কি পরামর্শ করিয়া শেষে থানায় গিয়া আমাদের নামে এজাহার দিল।

দারোগা। কুড়ন ঠাকুরের উরুতে সড়কীর কোপ কে মারিল ?

পিজিরদ্দী। আমি তাহা বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় ঠাকুর আমাদের নামে মোকদ্দমা ভারি করিবার জন্য নিজের উরুতে নিজেই বা ছুরির খোঁচা মারিয়া থাকিবে।

দারোগা। তাহারা মাথায় ও গায়ে বাড়ীর দাগ কেমন করিয়া হইল।

পিজি। আমাদিগের যখন তাহারা আক্রমণ করিয়াছিল, আমি পড়িয়া গেলে আমার সঙ্গের লোকের সঙ্গে বাড়েবাড়ীতে চোট লাগিতে পারে।

দারোগা। তোমারা লাঠী পাইলে কোথায় ? তোমরা হাটুরে লোক, হাট করিয়া যাইতেছিল।

পিজি। আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই একখানি নড়ি থাকে, নড়ি একখানা ছাড়া আমরা প্রায়ই কোন খানে যাই না। তবে তাহা বড় লাঠী নহে। হাত নড়ি বা ছড়ির মত।

অতঃপর নছিরদ্দীর জবানবন্দী আরম্ভ লইল, তাহার অবস্থা খারাপ, তাহার পেট ফুলিয়া উঠিয়া বেদনাতে অস্থির আছে। সে মোটামোটী সংক্ষেপে যাহা বলিল,প্রায় পিজিরদ্দির জবানবন্দীর মত। স্থানে স্থানে অনৈক্য হইল বটে,তাহা দারেগো লিখিলেন না। তবে সে এ কথা বলিল যে, পিজিরদ্দির সঙ্গে যখন মাছ খরিদ করিবার জন্য গদাই মাঝির বাড়ীতে যাইত, গদাইয়ের সঙ্গে পিজিরদ্দীর বচসা হয়, কুড়ন ঠাকুরের সঙ্গে তাহার মনোবাদ আছে। এবং কুড়ন

ঠাকুর লোক জন লইয়া আঁধারের মধ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করায় সে ঠাকুরকে ঠাসিয়া ধরিয়াছিল এবং সেই সময় ঠাকুর তাহার পেটে ছুরি মারিয়াছিল।

পরে মেনাজদ্দী ও খোয়াজ মামুদের জবানবন্দী হইল, তাহাতে পিজিরদ্দী যাহা যাহা বলিয়াছিল, প্রায় সেই মত মিলিল। মুসলমানপক্ষ হইতে আরো কয়েকটী সাক্ষীর জবানবন্দী দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, এ জেলেদের মোকর্দ্দমা মিথ্যা এবং পিজিরদ্দীর মোকর্দ্দমাই সত্য।

ইহার পর দারোগা আমাকে, গদাই মাঝিকে ও প্রহ্লাদকে আসামী শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া জেলায় চালান দিলেন। পিজিরুদ্দী ও নছিরুদ্দীকে জখম রূপে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন। শুনিলাম, গদাই মাঝির মোকদ্দমা মিথা বলিয়া 'সি' ফারম এবং পিজিরুদ্দীর মোকদ্দমা সত্য বলিয়া—'এ' ফারমে প্রেরণ করিলেন। আমার আর বাড়ীতে যাওয়া হইল না। জেলে বাড়ী হইতেই ডুলিতে জেলায় প্রেরিত হইলাম এবং নছিরুদ্দিকে এক ঝাঁপের উপর শোয়াইয়া, জেলেদের চারি জনকে জোর করিয়া ধরিয়া এই জখম বহিয়া লইবার জন্য কনষ্টবল মোতায়ান করিলেন। কনষ্টবলগণ তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করিল, আমি নছিরুদ্দি ও পিজিরুদ্দী হাঁসপাতালে নীত হইলাম। প্রহ্লাদ ও গদাই জেলখানার হাজতে গেল। ডাক্তার বাবু আসিয়া আমার ক্ষত পরীক্ষা করিলে আমার ক্ষত দুই ইঞ্চি গভীর ও এক ইঞ্চি চওড়া। প্রমানিত হইল, জখম গুরুতর নয়। নছিরুদ্দীর পেটের জখম দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন, এবং তাড়াতাড়ি ডাক্তার সাহেবকে পত্র লিখিলেন। সাহেব আসিয়া ক্ষত দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আরজেণ্ট চিঠি লিখিলেন যে, "অদ্য পুলিশ নছিরুদ্দী নামক এক ব্যক্তিকে অতি সাংঘাতিক জখম সহ হাঁসপাতলে আনিয়াছে। তাহার জীবন সংশয়, এখনও তাহার সংজ্ঞা আছে, তাহার মৃত্যু কালীন জবানবন্দী (dying declaration) অতি সত্বর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" বলা বাহুল্য যে, জরুরি পত্র পাওয়া মাত্র ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট আসিয়া তাহার জবানবন্দী লইয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার সাহেব নছিরুদ্দির পেটের ভিতরকার অবস্থা আর দেখিতে সাহস পাইলেন না। কারণ ইনি পাকা ডাক্তার নহেন, ইনি এপথিকারি হইতে সিবিল সার্জ্জনের চার্জ্জ পাইয়াছেন। নছিরুদ্দির অবস্থা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তাহার জীবন সংশয় দেখিয়া আমাকে খুনী আসামী গণ্য করিয়া পুলিশ সাহেব ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া আমাকে জেলখানার হাঁসপাতালে পাঠাইলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

আমার হাজত।

আমি জেলখানার হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইলাম। জেলখানার ডাক্তার বাবু লোকটী বড় ভদ্র; আমার মুখের ঘটনার হাল শুনিয়া তিনি আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিলেন এবং পথ্যাদির ভাল ব্যবস্থা করিলেন। গদাই ও প্রহ্লাদের সঙ্গে জেলখানায় সাক্ষাৎ হইল। আমার যখম আরাম হইতে প্রায় ২২ দিন লাগিল। শুনিলাম যে নছিরুদ্দি তিন দিন পরে মারা গিয়াছিল। জেলখানায় আসিবার এক সপ্তাহ পরেই আমাদিগের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তলব হইল। গদাই, প্রহ্লাদ ও আমার, তিন জনের পায়েই বেড়ী পড়িল, কেন না আমরা খুনী আসামী। ক্রমাগত কয়েক দিন যাবত পায়ে বেড়ী পরিয়া ঝামুর ঝুমুর করিতে করিতে কাছারিতে যাওয়া আসা করিতে লাগিলাম। পাহারাওলা সেপাইদের হাতের গুতাটা আরটাও মাঝে মাঝে খাইতে লাগিলাম। কারণ নিরুপায়, কথা বলিবার সাধ্য নাই। তাহাদিগকে ঘুঁষ দিয়া বশীভূত করিব সে সাধ্যও নাই।

ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট দারোগার প্রেরিত 'এ' এবং 'সি' ফারমের দুই মোকদ্দমায় সাক্ষী সাবুদ লইয়া মোকদ্দমার প্রতি তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। তিনি 'সি' ফারমের আসামী পিজিরুদ্দি, মেনাজর্দ্দি ও খোয়াজ মামুদদিগকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের জবাব লইয়া দুই মোকদ্দমাই সেসনে সোপর্দ্দ করিলেন। তাহাতে আমাদের একটু ভরসা হইল।

আমরা জেলখানায় হাজতে পচিতে লাগিলাম। সেসনের মোকর্দ্দমার দিন পড়িল প্রায় আড়াই মাস পরে। ইতিমধ্যে এক দিন পিতা আমাকে দেখিবার জন্য জেল সুপারিণ্টেণ্ডের নিকট দরখাস্ত দিয়া আদেশ লইয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। জেল দারোগা আমাকে জেলের সদর দরজায় লইয়া গেল, তথায় পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। পিতা আমার

পায়ে বেড়ী, ময়লা কাপড় ও মাথায় ঝাপসাচুল দেখিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, "তোমার এমন দশা চক্ষে দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। নিজের বুদ্ধির দোষে নিজেই বিপদ ডাকিয়া আনিলে। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়াছি। গ্রামের লোকেরা ও চতুপার্শ্বের লোকেরা তোমাকে যথেষ্ট নিন্দা করিতেছেন। তোমার মা তোমার শোকে শয্যাগত হইয়াছেন।"

আমি চুপ করিয়া পিতার কথা শুনিতে লাগিলাম, তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম "যে আপনারা কাঁদিবেন না, এবং কোন দুঃখ প্রকাশ করিবেন না। আমি চুরি বা ডাকাতি করিয়া, অথবা কোন বদমাইসী করিয়া জেলে আসি নাই। একজন অসহায়া সতী-রমণীর সতীত্ব ও জাত রক্ষা করিয়াছি। এই কার্য্যের জন্য যদি অন্যায় অবিচারে আমার ফাঁসি হয়, কি দ্বীপান্তরের আদেশ হয়, অথবা দীর্ঘকাল জেলে থাকিতে হয়, তাহাও আমি স্বর্গ বলিয়া মনে করিব। আমার মনে যথেষ্ট বল আছে, এবং এমন বিশ্বাসও আছে যে, এই কার্য্যে আমার কোন দণ্ড হইবে না। যদিই আমার ফাঁসি হয়,তাহা হইলে মনে করিবেন যে, আমার যেন কলেরা বা জ্বর বিকারে মৃত্যু হইয়াছে। তাহা হইলে কি আমাকে আপনারা মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? এজীবন নশ্বর, মৃত্যু একদিন হইবেই হইবে, তবে সেই মৃত্যু যদি একটা মহৎকার্য্যের জন্য হয়,তাহা হইলে জীবনকে গৌরবান্বিত মনে করা উচিত। আপনি হতাশ না হইয়া সাহসে নির্ভর করিয়া সুভদ্রাকে সঙ্গে করিয়া জেলার সকল উকীল বাবুদের নিকট গিয়া, ঘটনা অবগত করাইলে, সহৃদয় উকীল বাবুগণ নিশ্চয়ই আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। এবং নিজ গ্রামে ও জেলেদের গ্রামে চাঁদা করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া মোকর্দ্দমার খরচের জোগাড় করুন। মোকর্দ্দমায় ভাল উকীল দিন, এবং ভাল সম্ভ্রান্ত সাক্ষী সাপাই স্বরূপ সংগ্রহ করুন। ন্যায়ের জয় হইবেই হইবে।" আমার দৃঢ়তা ও উৎসাহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া পিতার বিষন্ন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। তিনি আচ্ছা বলিয়া আমার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। তিনি যাওয়ার সময়ে আমি তাঁহাকে গোপনে কহিলাম যে, কোন কৌশলে সেই পুলিশ জমাদারটীকে হাত করুন, সে লোকটী ভদ্রলোক, তিনি সত্যকথা বলিলে, আমার বিশেষ উপকার হইবে।

পিতাঠাকুর চলিয়া গেলেন। এবং আমার কথিত মত সুভদ্রাকে সঙ্গে

করিয়া সমস্ত উকীল মোক্তার বাবুদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। সকলেরই আমার প্রতি দয়া হইল। দুই একজন বাদে বড় উকীলগণ বিনা পয়সায় আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য ওকালত-নামা স্বাক্ষর করিলেন এবং আমাকে বাঁচাইবার জন্য মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমলা মহলে কেবল ঘুষ না দিয়া আর কাহারও সাহায্য পাইবার উপায় না থাকায় তথায় কিছু কিছু দক্ষিণা দিতে হইল।

সেসনে মোকর্দ্দমা।

আমাদের মোকর্দ্দমা সেসনে আরম্ভ হইল, আমার নাম সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। আমাকে দেখিবার জন্য কত লোক গিয়া জজ কোর্ট ভরিয়া ফেলিত। জেলখানা হইতে যখন আমাদিগকে কাছারিতে লইয়া যাইত, তখন দর্শকগণের অনেকে রুমাল উড়াইয়া আমাকে সম্ভাষণ করিত। কিন্তু আমি আর কাহারো প্রতি সম্ভাষণ করিতে পারিতাম না। জজকোর্ট লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। আমরা গিয়া প্রথম কাঠগাড়ায় দাঁড়াইলাম। আমাদিগের বিরুদ্ধে যত ইতর মুসলমান সাক্ষী দিল। আমাদিগের উপর চার্জ্জ হইল এবং জবাব দাখিল করিলাম। সাপাই সাক্ষীর ফর্দ্দ আমরা দাখিল করিলাম। অতি সম্ভ্রান্ত সাক্ষী সকল দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, আমি দেশে প্রায়ই থাকি না, অল্পদিন হইল ঢাকা হইতে বাটীতে আসিয়াছি এবং মাঝিদের বাড়ীতে কখনও যাতায়াত করি নাই, তাহাও প্রমাণ হইল। আমার পিতার সঙ্গে পিজিরদ্দির কোন জমি জমা লইয়া বিবাদ নাই, তাহারও প্রমাণ দেওয়া হইল। এবং সেই হিন্দু জমাদার-টীর সাক্ষীদ্বারা আমাদের বিশেষ ফল হইল, কেন না তিনি ঘটনাস্থলে স্বয়ং গিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বর্ণন করিলেন। সুভদ্রা জেলেনী অকুতোভয়ে সত্য ঘটনা সকল বর্ণন করিয়া জজের মনে আমাদের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। পরে গদাই মাঝির মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী হইল। মুসলমান দারোগার জবানবন্দীতে উকীলের জেরায় এত গলদ প্রকাশ হইল যে, লোকে তাঁহাকে টিট্‌কারি দিতে লাগিল. পিজেরদ্দিদিগের সাপাই সাক্ষী দিবার সময় পূর্ব্ব সাক্ষী সকল মান্য না করিয়া কতকগুলি নূতন সাক্ষী হাজির করিল। ইহা দ্বারা জজের মনে আরো সন্দেহ হইল।

ইহার পর মোকর্দ্দমার সহল-জবাব করিতে প্রায় একদিন লাগিল। পিজিরদ্দিদিগের উপর তিনটী চার্জ্জ হইয়াছিল। বাড়ীর উপর পড়িয়া বল পূর্ব্বক মানুষ চুরি করা, প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া দাঙ্গা করা ও গুরুতর আঘাত করা এবং মিথ্যা মোকর্দ্দমা স্থাপিত করা। কয়েকদিন পরে রায় প্রকাশের দিন আমাদিগকে পুনরায় কোর্টে লইয়া যাওয়া হইল। আমাদের বিরুদ্ধে যে মোকর্দ্দমা, তাহার রায় সর্ব্বপ্রথম শুনান হইল। আমরা তিন জনেই নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়া খালাশের হুকুম হইল। জজ আমাদের উপর মিথ্যা মোকর্দ্দমা সাজানের জন্য দারোগার উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে সৎসাহসের জন্য এবং নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য রায়ে প্রশংসা করিলেন। অপর পক্ষের মোকর্দ্দমার রায়ও প্রকাশিত হইল। পিজিরদ্দির পাঁচ বৎসর এবং মেনাজদ্দি ও খোয়াজ মহম্মদের প্রত্যেকের দুই বৎসরের জেল হইল। মোকর্দ্দমার সুবিচার হইয়াছে বলিয়া সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

পুনরায় আমাদিগকে জেলখানায় যাইয়া পদশৃঙ্খল মুক্ত করিতে হইল। জেল হইতে খালাশ হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখি, বহুলোক জেলখানার সম্মুখে আমার শুভাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং একখানা ঘোড়ার গাড়ীও আমার জন্য লইয়া আসিয়াছে। আমি জেলখানার বাহির হইলেই অনেকে আসিয়া আমার সঙ্গে কোলাকুলি করিল, কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আমার পিতাঠাকুরও তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তাঁহাকে গাড়ীতে বসিয়া যাইতে বলিলাম, আমি পদব্রজে যাইতে রাজি হইলাম। কিন্তু লোকে তাহা ছাড়িল না, সুতরাং পিতা সহ আমি ও আর দুইটী বন্ধু গাড়ীতে চড়িলাম। তখন "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র ছিল না, সুতরাং লোকে কৃষ্ণানন্দ হরিধ্বনি করিল। আমার গাড়ীখানা দুইটী ঘোড়াই টানিল। আমরা জনমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া প্রধান উকীল বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। গাড়ী তাঁহার বাসার নিকট থামিলে তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন যে, "বাবা, তুমি ধন্য ছেলে, তোমার জীবন ধন্য। বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন ধন্য। তোমার মত সৎসাহসী, নির্ভীক, এবং প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অসহায়া রমণীর সতীত্ব ও জাত রক্ষা করিতে পারে, বাঙ্গালীর ঘরে আর এরূপ কোন ছেলে আছে কি না, জানি না।" তাহার পর আমার পিতাকে কহিলেন যে, "চক্রবর্ত্তী

মহাশয়, এ ছেলে যে শুধু আপনার গৌরবের বস্তু, তাহা নহে, এ সমস্ত বঙ্গদেশের গৌরবের বস্তু।" ইহার মাঝে দিনাজপুর হইতে আগত একটী বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি না দিনাজপুরে রায় বাবুর বাসায় কিছু দিন ছিলে ? আমি বলিলাম "আজ্ঞা হাঁ, আমি তথায় তিন বৎসর ছিলাম।" তখন বাবুটী উকীল বাবুদের নিকট আমার আরো পরিচয় দিলেন, আমি চলন-বিলের মধ্যে কি প্রকার সাহসের সহিত ডাকাইতদিগের সঙ্গে লড়াই করিয়া, রায় বাবুর ধন প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম, সেই সকল কথা বলিলে লোকে আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমার প্রশংসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। আমি যেন একটী অপূর্ব্ব জীব বিশেষ হইয়া দাঁড়াইলাম। কত লোকেই আমাকে দেখিবার জন্য এবং আমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, এই ছেলের এত সাহস ও ক্ষমতা যে, চারিজন প্রসিদ্ধ লাঠিয়ালকে পরাস্ত করিয়া এই লোকটাকে উদ্ধার করিয়াছে, কিন্তু চেহারা দেখিলেত সেরূপ বোধ হয় না। আর একজন বলিলেন,শুনতে পেলেনা, ঐ বাবুটী বল্লেন যে চলন-বিলের মধ্যে পঁচিশ জন ডাকাইতের নৌকা একা গুলি মারিয়া হটাইয়া দিয়া তবে একটী বাবুর ধন প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। এইরূপ জেলার উপর যেখানে সেখানে আমার কথা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। আত্মপ্রশংসা আর অধিক করিয়া লিখিতে লজ্জা বোধ হয়, তাই আর অনেক কথা লিখিলাম না।

পিতাঠাকুর উকীল বাবুদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলেন, আপনারা বলেন যে, এছেলে আমার গৌরবের বিষয়, কিন্তু এই ছেলের জন্য আমি বড় অসুখে আছি। তাঁহারা অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পিতা কহিলেন যে, "প্রথম কারণ এই যে ছেলে বিবাহ করিবে না, সুতরাং ঘর গৃহস্থালী যে ইহার দ্বারা হইবে, সে আশা নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমার প্রাণ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকে যে, কোন্ সময়ে বা ইহার অপমৃত্যু ঘটে। যে রকম ইহার দুঃসাহসিকতা, দেখুন এই বারেই আপনারা দয়া করিয়া রক্ষা না করিলে হয়ত ইহার ফাঁসী হইয়া যাইত।" পিতার কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন এবং বড় বাবু কহিলেন যে "না সেজন্য আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। এরূপ কার্য্যে প্রায়ই দণ্ড হয় না, আর এ প্রকার কার্য্যে প্রাণ গেলেও সুখের বিষয়। তবে বিয়ে করবে না কেন, হয়ত উহার মনে কোন মহদুদ্দেশ্য আছে। সেজন্য আপনি ইহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া সংসারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবেন

না। কে বলতে পারে যে তাহার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধন হইবে না?" এই কথায় পিতা চুপ করিল।

সহরে দুই এক বাসায় আহারের নিমন্ত্রণ হইল। এই সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাড়ীতে ফিরিলাম। গদাই, প্রহ্লাদ ও সুভদ্রাও আমার সঙ্গে চলিল। বাড়ী গেলে গ্রামের লোক মহা উল্লসিত হইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিয়া এবং চাঁদা করিয়া এক বারওয়ারীর জোগাড় করিল। তাহাতে গানের আয়োজনও হইল। দুঃখের বিষয়, পূজা উপলক্ষে কয়েকটী ছাগমুণ্ডপাত হইল এবং কবি-ওয়ালাদিগের অশ্লীল বকাবকি শুনিতে হইল।

মাঝিদের গ্রামে ও আমাদের গ্রামে আমার প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পাইল। প্রায় প্রত্যহই মাঝিপাড়া হইতে ভাল মাছ আমার জন্য উপহাররূপে আসিতে লাগিল। তবে আমার মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর এক আপদ বৃদ্ধি পাইল। দেশের যে স্থানে মোকর্দ্দমা ও কাজিয়া দাঙ্গা হইতে লাগিল, সেই স্থানের সকলেই আসিয়া আমার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কেহ বা আমাকে সাক্ষী মানিয়া বসিত। কোন কোন সময় দুই পক্ষের কোন বিবাদ মীমাংসা করিতে গিয়া লাভের মধ্যে সাক্ষী শ্রেণী ভুক্ত হইতাম। নিজ পক্ষের কেহ বা আমার দ্বারা বিশেষ ফল পাইবার আশায় আমাকে সাক্ষী মান্য করিতে লাগিল। কিন্তু দুই এক সাক্ষীর পরই সকলের ধোকা ঘুচিত। আমার দ্বারা একটীও মিথ্যা কথা বলাইতে না পারিয়া সকলে দুঃখিত হইত এবং যাহারা সাক্ষী মানিত, আমার সত্য কথা বলায় তাঁহাদের দারুণ অনিষ্ট হইত।

বিংশ অধ্যায়।

চাকরির উমেদারি।

এই সকল উৎপাতে ত্যক্ত হইয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলাম। এক দিন মাকে বলিলাম যে, আমি কলিকাতা যাইব। এবং পিতাকেও কহিলাম যে, আমি কল্‌কাতা গিয়া একটা চাকরির চেষ্টা পাইব। পিতা কহিলেন

"কল্‌কাতা গিয়া কি হবে? সেখানে কোন সহায় নাই বা কোন পরিচিত লোক নাই, তথায় চাকরির চেষ্টা কে করিয়া দিবে? আমার সঙ্গে জেলায় চল, জেলার সমস্ত বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাঁহাদিগকে ধরিলে অনায়াসেই একটা চাকরির উপায় হইবে। তোমাকে বিদেশে পাঠাইতে আমার সাহস হয় না। আবার কোথায় একটা হাঙ্গামা করিয়া বসিয়া জেল টেল হইয়া যাইবে। তোমার দ্বারা আমার ত কোন সুখ হইবেই না, তা জানি, তবে যত দিন বেঁচে আছি, তত দিন তোমার শারীরিক মঙ্গল দেখিয়া যাই, সেই সুখের বিষয়, তোমা হইতে অন্য আশা করি না।"

পিতার কথায় আমি বলিলাম যে, "দেশে আমার থাকৃতে মাত্রই ইচ্ছা নাই। আমি সহায়হীন হইলেও আপনার আশীর্ব্বাদে যেখানে যাব, সেইখানেই সহায় জুটাইয়া লইতে পারিব। আমার অপমৃত্যু হইবে বলিয়া আপনি আশঙ্কা করেন, সে ভয় নাই, আমি যাহা করি, সর্ব্বদা সাবধান মত করি এবং কোন কার্য্যই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া করি না। অতএব আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাকে কলিকাতা যাইতে অনুমতি দেন। আমার জীবনের কোন অনিষ্ট হইবে না। কারণ ঢাকাতে প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী সাধনানন্দ স্বামী আমার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, "তুমি অনেক বিপদে পড়িবে, কিন্তু কোন বিপদেই তোমার জীবনের অনিষ্ট হইবে না। তোমার দ্বারা অনেক বীরোচিত কার্য্য হইবে, এমন বুঝিতে পারা যাইতেছে। তুমি খুব দীর্ঘজীবী হইবে।" আমার ছোট দুই ভাই মাঙ্গল এবং কাঙ্গাল রহিল, তাহারাই আপনাদের নিকট থাকিয়া আপনাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে। পায়ে ধরিয়া মিনতি করি, আমার প্রস্তাবে বাধা দিবেন না। আমি জীবনে যে লক্ষ্য ধরিয়া বাল্যকাল হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমার কার্য্যে বাধা পাইলে নিশ্চয় আমি সে লক্ষ্য হারাইব; পরন্তু ইহাতে আমার শারীরিক ও মানসিক অনিষ্টের সম্ভাবনা। তবে আমি অকৃতজ্ঞ সন্তান নহি। যেখানেই যেভাবে থাকি, সেই স্থান হইতেই পত্রাদি লিখিব এবং আমার সাধ্য মত অর্থ সাহায্য করিতেও ক্রটী করিব না।"

মা আমার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং পিতা আরও আশঙ্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে "জীবনের আবার কি একটা লক্ষ্য" যাহা লইয়া বাল্যকাল হইতে চলিতেছে। সেত কোন গুরুতর কথা হইবে। মায়ের পা ধরিয়া কাঁদিয়া অনুমতি চাহিলাম এবং বলিলাম যে, আমার কখনও

দৈব মৃত্যু হইবে না, সেজন্ম তোমাদের ভয় নাই, আমি লোহার কাঠির মত বহুকাল বাঁচিয়া থাকিব।"

পিতা মাতা আমার ধাত বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁহারা আমাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া কহিলেন "আচ্ছা যাও, যেখানে তোমার খুসী। আমরা তোমাকে আর নিষেধ করিব না।" আমার মঙ্গল কামনার্থ পুরোহিত আনিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইলেন এবং দীর্ঘ জীবনের জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাটী হইতে যাওয়ার দিন ধার্য্য হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকল গুরুজনকে প্রণাম করিয়া, ভাই দুটাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাত্রা করিলাম।

কলিকাতায় গিয়া বহুবাজারে, লেবুতলা লেনের দেশী একটী ছাত্রের বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমার সেই নিমন্ত্রণের দক্ষিণার তহবিলের জমা মাত্র ১২৫৲ টাকা সম্বল। ফৌজদারি মামলায় ইহার এক পয়সাও ব্যয় হয় নাই। কলিকাতা সহরে সমস্তই নূতন, সমস্তই আশ্চর্য্য এবং সকলেই অপরিচিত। কোথায় যাইয়া কি প্রকারে চাকরির চেষ্টা করিব, সেই চিন্তা হইল। ছোট বেলা হইতেই স্বাধীন জীবনাবলম্বন করিব, এই সংকল্প ছিল, তবে এখন যে পরাধীন চাকরির চেষ্টা করিতেছি, সে কেবল কিছুকালের জন্য একটা অবলম্বন মাত্র। কেবল একটা অবলম্বনে দাঁড়াইয়া শেষে নিজের মনের মত কার্য্যাবলম্বন করিব, সেইটীই প্রধান লক্ষ্য। আর কলিকাতা সহরে বাসাখরচ করিয়া খাইয়া পরিয়া থাকিতে হইবে, একশত পঁচিশ টাকা চারি পাঁচ মাসের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইবে, তাহা হইলে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে।

কোথায় চাকরি খালি আছে, কার নিকট গেলে অনুসন্ধান পাওয়া যায়, কিছুই জানিনা। তবে প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বাধা বিঘ্ন টিকিতে পারে না, তাহা জানা ছিল। প্রত্যহ সওদাগর আফিসে আফিসে গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। ইতি মধ্যে শুনিলাম, উমেদারদিগের চাকরি জুটাইয়া দিবার কয়েকটা আড্ডা আছে। শুনিলাম, শেয়ালদহের নিকট একটী নেটিব খ্রীষ্টিয়ান চাকরি জুটাইয়া দিবার একজন দালাল। খোঁজে খোঁজে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তাহার উপাধি সরকার। আমি যাইয়া দেখি, সরকার মহাশয় বাটীর উপরস্থ গির্জ্জায় ভজনা করিতেছেন, কেন না সেদিন রবিবার। আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, ইতি মধ্যে কয়েকজন খানসামা, দ্বারওয়ান ও বাবুর্চ্চি প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারাও চাকরির উমেদার।

এজেণ্ট বা দালাল মহাশয় উপাসনা শেষে করিয়া আসিয়া বসিলেন এবং একে একে সকলের দলিল পত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। একজন খানসামার কাগজ পত্র দেখিয়া কহিলেন যে "আসাম, জয়পুরের চা বাগিচার ম্যানেজারের একজন খানসামার প্রয়োজন, বেতন ২০ কুড়ি টাকা, সাহেবের খাদ্য দ্রব্যের ভাঁড়ার ঘর (Store-house) তাহার জিম্বায় থাকিবে।" তিনি এই চাকরি লইয়া দিতে পারিলে তাঁহাকে এক মাসের বেতন কমিশন স্বরূপ দিতে হইবে। আর এক জনের চিঠি পত্র দেখিয়া কহিলেন, আমি তোমাকে ডিব্রুগড়ের এসিষ্ট্যাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বাবুর্চ্চি নিযুক্ত করিয়া পাঠাইব। পঁচিশ টাকা বেতন। এক মাসের বেতনের টাকা আমাকে আগারি কমিশন স্বরূপ দিতে হইবে। সাহেবের বাজারের চার্জ্জ বাবুর্চ্চির হাতে থাকিবে, সুতরাং তাহাতেও যথেষ্ট লাভ হইবে।" এই মত এক এক জনকে এক একটী অতিরিক্ত প্রলোভন দেখাইলেন এবং কাহারও কাহারও নিকট হইতে অগ্রিম অর্থও গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই বাজারের পয়সা চুরি এবং ভাণ্ডারীর মনোপহরণের প্রলোভন দেখাইলে তাঁহার উপর আমার বড় অভক্তি জন্মিল। মনে মনে ভাবিলাম যে, ইনি কেমন খাঁটি খ্রীষ্টিয়ান, এই মাত্র উপাসনা করিয়া আসিয়াই লোককে চুরির উপদেশ দিতে লাগিলেন। অবশেষে আমার সার্টিফিকেট খানা দেখাইলাম। তিনি আমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়া বলিলেন যে, "আমি অনুসন্ধানে থাকিলাম, চাকরির খোঁজ পাইলে তোমাকে জানাইব।" কথা হইল যে আমার প্রথম মাসের বেতন তাঁহাকে দিতে হইবে। আর একটী সাহেব এজেণ্ট ওয়েলিংটন স্কোয়ারে থাকেন, তাহার নিকট আমি গেলাম, নাম ও ঠিকানা দিলাম এবং তিনিও চাকরি খুঁজিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহাকেও একমাসের বেতন কমিশন স্বরূপ দিতে হইবে। এদিকে সওদাগর আফিসেও যাওয়া ছাড়ি নাই। প্রত্যহই যাইতে থাকিলাম। সমস্ত দিন আফিসে আফিসে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

চাকরি জুটাইবার এজেণ্টগণের নিকট হইতে কোন সংবাদই পাইলাম না। ইতি মধ্যে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, সাওয়ালেজ কেম্পানীর বাড়ীতে কুড়ি টাকা বেতনের একটী কেরাণীগিরি খালি আছে। কথাটা ঠিক জানিয়া একখানি দরখাস্ত লিখিয়া, সার্টিফিকেটের নকল একখানি তাহার সঙ্গে গাঁথিয়া বড় বাবুর নিকট সম্ভ্রমে দরখাস্ত খানি পেশ করিলাম। দরখাস্ত খানি পড়িয়া

বাবু আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন যে "তুমি আমার বাসায় যাইও। তথায় চাকরি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইবে, আফিসে কাজের বড় ভিঁড়, কথা বলিবার অবকাশ নাই।" এই বলিয়া একখানি চোঁতা কাগজে তাঁহার ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। আমিও আশ্বস্ত হইয়া মনের সুখে বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় আসিয়া মনে মনে ভাবিলাম, বড় বাবু তাঁহার বাসায় যাইতে বলিলেন কেন? তাঁহার মনের উদ্দেশ্য কি? অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, যে ভাবেই তিনি তাঁহার বাসায় যাইতে বলুন না কেন, খালি হাতে কোন মতেই তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। তবে তাঁহার জন্য লইয়া যাইব কি? আমার হাতে যাহা দিল, তাহার অর্দ্ধেক প্রায় খরচ হইয়া গিয়াছে। চাকরি যদি না পাই, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? এই প্রকার নানা চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে মনে মনে স্থির করিলাম যে, পাঁচটী টাকা অন্ততঃ এজন্য খরচ করা উচিত। শুধু হাতে বড় বাবুর সঙ্গে বাসায় সাক্ষাৎ করিলে যদি তিনি নারাজ হইয়া চাকরি না দেন? নগদ পাঁচটী টাকা লইয়া যাওয়াতেও লজ্জা বোধ হয় এবং শঙ্কাও হয়। অতি সামান্য টাকা। তবে এই টাকা দিয়া কিছু মেঠাই কিনিয়া লইয়া গেলে দেখ্‌তেও ভাল দেখাবে, অথচ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ হইবে। এই মনে করিয়া পাঁচ টাকার সন্দেশ রসগোল্লা খরিদ করিলাম এবং এক মুটের হাতে দিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়া বড় বাবুর দর্শনে চলিলাম।

বাটীর দরজায় উপস্থিত হইয়া আমার নামের একখানি হস্তলিপি কার্ড পাঠাইলাম। চাকর আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। তথায় একটী ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে ছোট একখানি ফরাসের উপর বসিলাম। অতঃপর বাবু উপর তালা হইতে নামিয়া আসিলেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং সন্দেশ রসগোল্লার ঝুড়িটী বাবুর সাক্ষাতেই চাকরের হাতে দিলাম। ভেটের মাত্রার স্বল্পতা দেখিয়া বাবু যেন বড় খুসী হইলেন না। তবে বাহ্যিক মুখে একটু সৌজন্যতা করিয়া বলিলেন, "কেন আর পয়সা খরচ করে এ সকল কিনিয়া আনিয়াছ, এসকলের দরকার কি?" আমি বলিলাম যে, "আমি অতি হীনাবস্থার লোক, আপনার মত লোকের বাড়ীতে এ সামান্য জিনিষ আনিতে লজ্জা বোধ হয়, তবে যাহা আনিয়াছি দয়া করিয়া গ্রহণ করিলেই চরিতার্থ হইব।"

অতঃপর আমাকে বসিতে বলিলেন, বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কলিকাতায় কোন পরিচিত লোক আছে কিনা জানিতে চাহিলেন। আমি

বলিলাম, "আমার বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, কলিকাতার কতিপয় ছাত্র ভিন্ন আমার আর কোন পরিচিত লোক নাই।" বাবু কহিলেন "বাঙ্গাল দেশী লোকগুলি কাজের লোক বটে, কিন্তু বাঙ্গালরা বড় এক গুঁয়ে ও বড় গোঁয়ার।" ছোট বেলা হইতেই আমাকে কেহ বাঙ্গাল বলিলে বড় চটে যেতেম! বাঙ্গাল শব্দটা আমার নিকট অপমানসূচক বলিয়া বোধ হইত। সওদাগর আফিসের বড় বাবু আমাকে বাঙ্গাল বলায়ও বড় রাগ হইল, তবে সহ্য করিয়া থাকিত হইল।

তিনি চাকরির কথায় কহিলেন যে, এই চাকরির জন্ম পনর জন উমেদার দরখাস্ত দিয়াছে। তোমাকে লইয়া ষোল জন হইল। কেহ কেহ ছোট সাহেবের নিকট সুপারিশ আনিয়াছে। অবস্থা আমি দেখিয়া তোমার জন্ম চেষ্টা করিব। আমি তোমার জন্য সাহেবকে বলিব। কাল আফিসে যাইও। আমি এই কথায় আশা ও নিরাশার মধ্যে পড়িয়া কহিলাম যে, আচ্ছা তবে আমি কাল আফিসে উপস্থিত থাকিব। এই বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলাম। বাটীর বাহির হইতে না হইতেই আর একজন অল্প বয়সী ভদ্র লোক বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ভাবে বোধ হইল যে, ইনিও বা উমেদার হইবেন। বিষয়টা জানিবার জন্ম উৎসুক হইলাম। সেই যুবকটীর সঙ্গে আর একটী ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি রাস্তার ধারে এক দোকানে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আমিও নিতান্ত গোবেচারির ন্যায় অন্যমনস্ক ভাবে তাঁহা হইতে কিছু দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে সেই যুবকটী বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীর সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা হইতে লাগিল। সঙ্গীটী জিজ্ঞাসা করিলেন "বড় বাবু তোমাকে কি বল্লেন?" তাহাতে তিনি কহিলেন যে "বড় বাবু আমাকে খুব আশা ভরসা দিয়াছেন এবং সাহেবের নিকট আমার বিষয় খুব সুপারিশ করিবেন বলিয়াছেন। সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কিছু খরচ করতে হল অবশ্য।" তিনি কহিলেন যে, বিনা খরচে কি কলকাতার বাড়ীতে কেহ আদরের সহিত একটী কথাও বলে?" সঙ্গী কহিলেন "কত খরচ হইল?" উমেদারটী কহিলেন যে "বিংশ মুদ্রা খরচ কর্‌তে হল।"

এই কথা শুনিয়াই আমার মনে পরিতাপ হইল যে, আমি বৃথা পাঁচটী টাকা জলে ফেলে দিলাম। কুড়ি টাকা পাঁচ টাকার চতুর্গুণ ভারি, সুতরাং বাবুর নিক্তির কাঁটা কুড়ি টাকার দিকে একদম ঝুঁকিবেই ঝুঁকিবে। ভগ্নমনোরথ হইয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসাস্থ অপর কক্ষের ছাত্রের আত্মীয়ও এই কার্য্যের

একজন উমেদার। তাঁহার নিকট জানিলাম যে, তিনি পনর টাকা বড় বাবুকে দিয়াছেন এবং বড় বাবু তাঁহাকেই চাকরি লইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তখন মনে মনে বলিলাম, ও হরি, এক চাকরি বড় বাবু কতজনকে দিবেন? অথচ চাকরি দিবার ক্ষমতা তাঁহার আদবেই নাই। তিনি মাত্র দরখাস্তগুলি পেশ করিতে পারেন এবং বড় জোর দুই এক কথা কাহারও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলিতে পারেন। কার্য্যে নিযুক্ত করার ক্ষমতা বড় বা ছোট সাহেবের। কাজও পাওয়ার আশা নাই; তবুও তামাসা দেখিবার জন্য আফিসে গেলাম। আফিসে গিয়া পরস্পরের কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝিলাম যে, আরো দুই একজন বড় বাবুকে সেলামী দিয়াছেন।

বেলা প্রায় তিনটার সময় আমাদের এক এক জনের নাম ধরিয়া ডাক পড়িল। এক এক জনের দরখাস্ত খানি পড়িয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছোট সাহেব দরখাস্ত খানির উপর সজোরে লেখনী চালনা করিয়া লিখিলেন "No vacancy" এবং যাহার দরখাস্ত তাহাকে ফেরত দিলেন। যেমন পচা রদি মাল সকল বাছিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, আমাদিগকে একে একে সেইরূপ নিক্ষেপ করা হইল। ছোট সাহেবের আফিস্ হইতে ভগ্নমনোরথ হইয়া সকলে বড় বাবুর আফিসে যাইয়া তাঁহার মুখের দিকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত তাকাইয়া রহিলেন, বড় বাবুও বিষম লজ্জিত হইয়া অত্যন্ত কার্য্যব্যস্ততার ভাণ করিয়া অবনত মস্তকে কাগজ ঘাটিতে লাগিলেন। আমরা কিছু কাল অন্তে আফিস্ পরিত্যাগ করিলাম। এখন মন খুলিয়া যিনি যাহা দিয়াছিলেন, পরস্পরে বলাবলি আরম্ভ হইল। আমাদের আফিসে যাইবার অনেক পূর্ব্বেই ছোট সাহেব তাঁহার বন্ধুর সুপারিশি প্রাপ্ত উমেদারকে কর্ম্মে বহাল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পরে বামার লরি কোম্পানির বাড়ীতে আর একটী চাকরি খালির সংবাদ পাইলাম কিন্তু বড় বাবুর পূজা করিব না মনে করিয়া সে আফিসে আর গেলাম না। দুই তিন মাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম এবং চাকরির উমেদারিতে বড় ঘৃণা জন্মিল। উমেদারকে যে লোকে এত অবজ্ঞা করে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

একবিংশ অধ্যায়।

রেঙ্গুন যাত্রা।

কয়েক দিন বাসায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, বাড়ীই ফিরে যাই, না অন্যত্র যাই? তখন পিতার কলিকাতা আসিবার নিষেধ-বাণী মনে পড়ায় অনুতপ্ত হইলাম। ইতিমধ্যে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় হঠাৎ একটী বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে, রেঙ্গুনের কমিশারিয়াট আফিসে চারিজন কেরাণীর দরকার, বেতন উপযুক্ততানুসারে ৬০্ হইতে ১০০্ এক শত টাকা। যাহারা কলিকাতা হইতে নিযুক্ত হইয়া যাইবে, তাহারা ষ্টীমারের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাশ পাইবে। এণ্ট্রান্স পাশ কি এল-এ ফেল, এমন লোকদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে। আমার যখন এণ্ট্রান্স পাশের সার্টিফিকেট আছে, তখন একটু আশা হইল। একখানি দরখাস্ত লিখিয়া, সার্টিফিকেটের নকল তাহাতে গাঁথিয়া কলিকাতাস্থ কমিশারিয়াট বিভাগের বিজ্ঞাপনদাতা সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া এক লম্বা সেলাম ঠুকিয়া দরখাস্ত খানি দাখিল করিলাম। তখন রেঙ্গুন-যাত্রী বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্পই ছিল, কেহ জাতি যাইবার ভয়ে, কেহ সমুদ্র পারে মগের মুলুকের ভয়ে, যাইতে স্বীকার করিত না। সুতরাং আবেদনকারীর সংখ্যাল্পতা বিধায় আমার চাকরি পাওয়া সহজ হইল; সাহেব আমার দরখাস্ত খানি পড়িয়া এবং সার্টিফিকেটের নকল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমার দরখাস্তের উপর লিখিলেন যে—"Appointed at Rs 60/ per mensem. The applicant must leave by the next mail available. The manager is to issue a 2nd class pass to him."

অতঃপর ম্যানেজার আফিসে গেলাম এবং ম্যানেজারের নিকট গিয়া পাশের জন্য অপেক্ষা করিলাম। ঘণ্টা দুই বিলম্বের পর পাশ ও নিয়োগপত্র পাইলাম এবং হৃষ্টচিত্তে বাসায় ফিরিয়া সকলকে চাকরির কথা বলিলাম। বাসার ছাত্রগণ আমার রেঙ্গুন যাওয়ার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কেহ কেহ বলিলেন "মহাশয়, আপনার সাহস ত কম নয়, চাকরির জন্য প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মগের মুলুকে চলিলেন!" কয়লাঘাটা গিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কোন্ জাহাজ যাইবে। জানিলাম যে "গোয়ালিয়র নামক জাহাজ

আগামী কল্য রেঙ্গুন যাইবে। অতি প্রত্যূষে ৬টার সময় জাহাজ ছাড়িবে। বাসায় আসিয়া ষ্টীমারে আহারের জন্য কিছু চিড়া, গজা, সন্দেশ, আখ, পাতি লেবু প্রভৃতি খরিদ করিলাম। অতি প্রত্যূষে নিজের বিছানা, টাঙ্কটী এবং খাদ্যদ্রব্য গুলি লইয়া একখানি গাড়ী করিয়া কয়লা-ঘাটাভিমুখে ছুটিলাম। জাহাজ খানি কিনারে আসিয়া ভিড়িয়াছে। জাহাজঘাটা পাঞ্জাবী সেপাই, কুলি, ও অন্যান্য উত্তর ভারতীয় যাত্রীতে ভরিয়া পড়িয়াছে। ডেক পাশেঞ্জার-দিগের টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী-গণের যে পথ, সেই পথ দিয়া পথ-রক্ষককে পাশ খানি দেখাইয়া জাহাজে উঠিলাম। উঠিয়াই দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন্ কেবিনে আমার নাম লেখা আছে, তাহা তালাশ করিতে করিতে অবশেষে কেবিণের খোঁজ পাইলাম। এবং কেবিনের দ্বারে আমার জিনিষ-পত্র আনাইলাম।

কেবিনের দরজা খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে অল্পবয়স্ক একটী সাহেব বসিয়া আছেন। আমার কেবিনের ভিতর একজন সাহেবকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং দরজার উপরে তাকাইয়া দেখিলাম, আমার নামের উপরে লেখা আছে মিঃ টিঃ লরিমার। আমার ট্রাঙ্কাদি ভিতরে লইবামাত্র সে সক্রোধে আমার দ্রব্যাদি কেবিনের বাহিরে ফেলিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "Why have you thrown my things out of the room ? I am a passenger and have paid for the seat. I am also an appointed government servant."

সাহেব। I do not care who you are, I would not have any native in my room.

আমি। If you do not like to have any native in your room, you better go to other cabin, or ask the company to provide you with a first class cabin. This cabin is not your private property.

সাহেব আমার তেজপূর্ণ উচিত উত্তর পাইয়া রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল এবং বলিল "Shut up, do not be impertinent ; if you be, I will teach you a good lesson ?"

আমি। What ? You will teach me a good lesson ? Be careful about what you say. My I ask who are you and what is your position ?

সাহেব ক্রোধভরে দাঁড়াইয়া আস্তানি গুটাইতে গুটাইতে বলিল, If you take another word, I will kick you out." এই প্রকার অপমান-সূচক কথায় ক্রোধে আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিল এবং আমি কহিলাম "What, you will kick me out! Come on then." এই বলিয়া আমিও আস্তানি গুটাইতে লাগিলাম। আমি বয়কে ডাকিয়া বলিলাম যে, "জাহাজের চিফ অফিসারকে এ বিষয়ের সংবাদ দেও", বাটলারকে বলিলাম, কিন্তু কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। সকলেই সাহেব দেখিয়া ভয় পাইল। আমার কেবিনের পার্শ্বের কেবিনে দুই জন সুরতি মুসলমান সওদাগর এবং এক জন পাঠান সুবাদার ছিলেন। আমার যে জিনিষ পত্র সাহেবটা ফেলিয়া দিল এবং আমাকে অপমান-সূচক কথা বলিতেছে এবং লাথি মারিবে, ভয় দেখাই-তেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও কেহই আমার পক্ষ হইয়া একটী কথাও বলিলেন না। অপর এক কামরায় দুজন সাহেব ও দুইজন মেম ছিল। তাহারাও আমার পক্ষে কোন কথাই বলিল না, তাহারা বেশ তামাসা দেখিতেছে। হঠাৎ সাহেব-টার সঙ্গে বচসা হইতে হইতে সে আমার উপর এক লাথি ঝাড়িল, আমিও তৎক্ষণাৎ ঝা করিয়া তাহার সবুটচরণ খানি ধরিয়া ফেলিলাম। পাঠক মনে করি-বেন না যে, আমি সাহেবের পদসেবা করিতে বা স্তুতি মিনতি করিতে তাহার পা ধরিলাম। তাহার পাখানা ধরিয়াই এক ঝাঁটকা টানে উচু করিবামাত্র সে ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেল এবং আমি লাফ দিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলাম এবং বলিলাম Now it is my turn to teach you a lesson. আমাদের এই জ্বরাসুর বধ ব্যাপারে জাহাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অপর কামরা হইতে দুইটী সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে ঘুঁসি মারিয়া হটাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, এই সময়ে সেই সুরতি ভদ্রলোক দুইটী ও সুবাদার আসিয়া মাঝখানে পড়িলেন। তাঁহারা আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া সাহেব-দিগের সঙ্গে বচসা আরম্ভ করিলেন। আমি লরিমারকে ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম, সে উঠিয়া গা ঝাড়িয়া অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়াইল। ঘটনা চিফ অফিসার ও কাপ্তানের কাণে গেল। চিফ অফিসার আসিয়া ঘটনার বিবরণ শুনিয়া লরি-মারকে তিরস্কার করিল এবং তাহাকে অন্যত্র বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। লরিমার নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত লজ্জিতভাবে কেবিন পরিত্যাগ করিল। সমস্ত কক্ষটী আমার দখল হইল। গোলমাল থামিয়া গেলে সুরতি ভদ্রলোকগণ আমার সাহস ও তেজের প্রশংসা করিলেন।

সুরতি ভদ্রলোক। বাবু, আপ বাঙ্গালী হ্যায় ?

আমি। হাঁ সাহেব হাম বাঙ্গালী হ্যায়।

সুরতি। বাঙ্গালী কো লেড়কা এতনা হিম্মত এতনা তাগদ হ্যায়, হামরা আগাড়ি মালুম নেহি থা। আপ বাহাদুর হ্যায়। গোরা লোককা ছাৎ এতনা ঠাট্টা করনে কো হাম লোক কাবি হিম্মত নেহি হোথা।

সুবাদার। হামবি বাঙ্গালী কো বিচমে এইসা লেড়কা নাহি দেখা।

আমার জয়ে জাহাজের মেথর বাটলার প্রভৃতি মহা খুসি হইল এবং বলিতে লাগিল যে "বাবুজি! আচ্ছা কিয়া, এ শূয়র লোক হাম লোককা কুত্তাকো মাফেক সোমজথা।" আমি বলিলাম "ও হ্যামলোকক্‌া কছুর হ্যায়, হামলোককা একরূপ নেহি হ্যায় এক আদমি কো লাথ মারনেসে দোস্‌রা কই কুছ বোলতা নেহি। হাম লোক লাথ বি খাতা আউর ফিন ওস্‌কা গোড় বি পাকড়াগা।" আমার কথায় সকলেই বলিল "হাঁ হাঁ, ছাচ বাথ বাবুজি কহা।"

ডেকে তিনজন বাঙ্গালী বাবু ছিলেন, তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া তাঁহাদের নিকট বসাইলেন এবং আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি নিজ পরিচয় দিলাম, গন্তব্য স্থানের কথা বলিলাম। আমার বাড়ী পূর্ব্ব বঙ্গে, তাহা শুনিয়া তাহাদের একজন কহিলেন যে, "বাঙ্গাল দেশের মাটীর গুণ বটে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোকগুলি বড় সাহসী ও ফছাৎ প্রিয়। আপনি যে সাহসে সাহেবটাকে ঠাসিয়া ধরিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাহাকে কেবিন হইতে তাড়াইলেন, ওরূপ সাহস আমাদের নাই। কালকাতার লোকে বাঙ্গালদিগের ঘৃণা করে বটে, কিন্তু বাঙ্গালদের যেমন একতা ও সাহস, তেমন আমাদের নাই।"

আমি ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমাকে বাঙ্গাল বলিলে আমি বড় চটিয়া যাই, এই বাবুটী পুনঃ পুনঃ আমাকে বাঙ্গাল বলিলে আমার রাগ হইল, কিন্তু সে রাগটা চাপিয়া রাখিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে সাত কথা শুনাইয়া সেই রাগের ঝালটা মিটাইলাম। আমি বলিলাম, মহাশয়, বড় দুঃখের বিষয় যে, আমি একাকী সাহেবটার সঙ্গে জড়াজড়ি করিতে লাগিলাম, সে আমাকে অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সুরতি ভদ্র লোক দুইটী গিয়া আমার পক্ষ হইয়া সাহেবটার সঙ্গে বচসা করিলেন, কিন্তু আপনারা স্বদেশী ও স্বজাতীয় লোক হইয়া দূরে থাকিয়া কেবল তামাসা দেখিলেন, একবারও জিজ্ঞাসা করিলেনা যে, লোকটার কি হল ? সুরতি ভদ্র লোক দুটী আমাকে সাহায্য না

করিলে অপর দুটা সাহেব আমাকে ঘুঁসি মারিয়া যখম করিয়া ফেলিত। ধিক্ আপনাদের। আপনাদের কলকাতা অঞ্চলের লোকেরা কেবল মুখসর্ব্বস্ব ও স্বার্থপর। যাহাদের এ জ্ঞানটুকু নাই, তাহাদের আমি মনুষ্যাখ্যা দিই না।”

তখন অপর একজন ভদ্র লোক কহিলেন যে, “মশায়, আমরা চলেছি বিদেশে, এখন আপনার সঙ্গে ঝগড়া ঠাট্টায় যোগ দিয়া কি একটা মামলা মোকর্দ্দমায় পড়িব। সাহেব বেটাদের সকলেরই এক জোট। তাহাদের সঙ্গে ফছাৎ করিয়া কি আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারি? পরের জন্য নিজের ঘাড়ে ঝঞ্ঝাট কে আনে? তখন আমি তাঁহাদিগকে যোড় হস্তে নমস্কার করিয়া বলিলাম, তা বটে, এরূপ বুদ্ধি না হলে কি আর এ জাতির এমন দশা ঘটে? যে জাতির একতা নাই, যে জাতির লোকের আত্ম সম্মান বোধ নাই এবং যে জাতির লোকে এত নীচ অন্তর বিশিষ্ট হইতে পারে, তাহারা যে পরের লাথি খাইয়া হজম করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এরূপ বুদ্ধি যে জাতীয় লোকের, আত্মসম্মান ও আত্মরক্ষা করিতে যাহারা না জানে, তাহারা মানব সমাজের বাহির। এই প্রকার লোকের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক বৃথা। আমার এই প্রকার কর্কশ অথচ সত্য কথায় তৃতীয় ভদ্র লোকটী কহিলেন যে, “মশায়! ঠিক বলেছেন। আমাদের বাঙ্গালীর জাতির মধ্যে একতা, তেজ, সাহস ও আত্মসম্মান-বোধ যতদিন না জন্মিবে, ততদিন আমরা যতই কেন আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরব করি না কেন, সে কেবল জলের ফেনার মত অসার।” এই ভদ্র লোকটীর কথায় মনে একটু শান্তি উপস্থিত হইল, আমি উঠিয়া চলিয়া গেলাম। যে কয়েকদিন ষ্টীমারে ছিলাম, তাঁহাদের সঙ্গে আর আলাপ করি নাই।

জাহাজ খানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ক্যাবিনের কক্ষগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর সুবন্দোবস্ত আছে। এক একটী ক্যাবিনে চারিজন যাত্রী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। এক এক খানি শয্যাধার এক একখানি প্রশস্ত বেঞ্চের মত। একখানি বেঞ্চ সদৃশ শয্যাধারের প্রায় তিন হস্ত উচ্চে আর একখানি শয্যাধার ঝুলান আছে, সুতরাং নীচে একজন এবং তাহার উপর একজন শয়ন করিতে পারেন। ক্যাবিনের দুই পার্শ্বে এইমত চারিখানি শয্যাধার চারিজনের জন্য বন্দোবস্ত আছে। দুইজন করিয়া যাত্রীর ব্যবহারের জন্য একটী আল্‌না, একটী লম্বা ড্রাজ, একখানি বড় আয়না, মুখ ধুইবার টেব্রিল, সাবান ব্রুস সুগন্ধ

তোয়ালে, জলপানের গ্লাস, জলের কুজ ইত্যাদি স্তরে স্তরে সাজান আছে। ইহা ভিন্ন মলমূত্র ত্যাগের আধার এবং সমুদ্র-বমন হইলে বমন পাত্র ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত আছে। এক এক ক্যাবিনের জন্য এক একজন বয় নির্দ্দিষ্ট আছে। সে অতি প্রত্যূষে আসিয়া এক পেয়ালা চা এবং একখানি মাখন লিপ্ত টোষ্টরুটি রাখিয়া যায়। এবং শয্যাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার ভাবে শয্যাবিন্যাস করিয়া যায়। মেথর আসিয়া কামরাটী ঝাড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া যায়। ক্যাবিনের মধ্যে একখানি আরাম করিবার গদিযুক্ত বেঞ্চ, দুইখানি বস্ত্রমণ্ডিত টুল আছে। মধ্যস্থলে একখানি টানাপাখা ঝুলান আছে। ক্যাবিনের পার্শেই স্নানাগার। তাহার একভাগে মলত্যাগের জন্য কমোড নামক বর্গক্ষেত্রাকৃতি সেগুনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত সিন্দুকের মত আসন, তাহার মধ্যে চিনামাটির মলাধার। পার্শ্বে মলত্যা-গান্তে ব্যবহার করিবার জন্য টয়লেট নামক তৈলাক্ত কাগজ। তাহার পার্শ্বে একখানি আয়না। স্নান করিবার অংশে বড় একটি অণ্ডাকৃতি টব। সেই টবটী এতবড় যে, একজন লোক তাহার মধ্যে শয়ন করিতে পারে এবং এত গভীর যে, জলপূর্ণ করিলে তাহার মধ্যে বসিলে গলা জল হয়। স্নানের ঘরে সাবান, তোয়ালে ও আয়না আছে। এক একটী টবের সঙ্গে দুইটী কল সংলগ্ন আছে। তাহার একটীতে টিপ মারিলে গরম জল আইসে। যাহার যেমন রুচি, সে সেই অনুসারে স্নান করিতে পারে। কক্ষটীর আর একপ্রান্তে প্রস্রাব করিবার আধার আছে। সে স্থানটী ধবল শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজনাগার গুলিও যেন ইন্দ্রপুরী সদৃশ। কক্ষের মধ্যস্থলে আলম্ব একখানি চকচকে টেবিল, তাহা সবুজবর্ণের বানাত দ্বারা মোড়া। সেই টেবিলের দুধার দিয়া আরম-লেস্ বা বহুশূন্য চেয়ার সকল সজ্জিত আছে। সেই চেয়ার গুলি মেজের সঙ্গে স্ক্রুপ আবদ্ধ, কিন্তু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যেদিকে ইচ্ছা মুখ রাখিয়া বসা যায়। কক্ষপার্শ্বে খাদ্যদ্রব্য রাখিবার জন্য আলমারা, সেল্প প্রভৃতি আছে। সমস্তই এমনভাবে যত্নে রক্ষিত যেন নূতন প্রস্তুত হইয়াছে। টেবিল, চেয়ার ও আলমারি প্রভৃতি সংলগ্ন পিতলের কাজগুলি যেন সোণার মত ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে। টেবিলের উপরে একখানি বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত পাখা।

আমার পাশখানি with diet অর্থাৎ আহার সহ ভাড়ার বন্দোবস্ত ছিল। ব্রেকফাষ্টের ঘণ্টা ৮ টার সময় বাজিল। বয় আসিয়া আমাকে ডাকিল। আমার অসুখ হইয়াছে বলিয়া খাইতে গেলাম না। ধর্ম্মের গোঁড়ামী বা

কুসংস্কার এই সময় তাদৃশ না থাকিলেও, সাহাবের খানা খাইতে যেন মনে একটা অপ্রবৃত্তি জন্মিতে লাগিল। আমাদের কলার পাতা পাতিয়া মাটীতে বসিয়া ডাল ভাত খাওয়া অভ্যাস, টেবিলে অমনধারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাদ্য খাইতেও অপ্রবৃত্তি হইল। অভ্যাস এমনি একটা জিনিষ বটে! আর সকলে খাইতে গেলেন, আমি এদিকে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের সেই প্রাচীন চিড়া চর্ব্বণ করিলাম। প্রথম দিন এই রূপে কাটিল, দ্বিতীয় দিন আমার সত্য সত্যই অসুখ হইল। মাথা খাড়া করিতে, উঠিতে গা ঘুরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল এবং ন্যাকার হইতে লাগিল। সেদিন আর চিড়া চর্ব্বণ করিতে পারিলাম না, দুই একখানা :আখ্, একটুকু কোমলালেবুর রসমাত্র পান করিয়া কাটাইলাম। তৃতীয় দিবস শরীর ভাল বোধ হইল, কিন্তু ক্ষুধার চোটে প্রাণ অস্থির হইল। বাঙ্গালীর ভেতো নাড়ি ভাত বিনে যেন প্রাণটা আইঢাই করিতে লাগিল। মনে হইল যেন কতকাল ভাত খাই না। ভাত না খাইয়া আর উপায় নাই, চিড়া সন্দেশ ইত্যাদি যেন বিষবৎ বোধ হইল। প্রাতঃকালের আহারের ঘণ্টা পড়িল, আজ আমি টেবিলে খাইতে চলিলাম। সকলে আমাকে নূতন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। টেবিলে গিয়া দেখি, সাহেব মেমগণ দুসারি বসিয়া গিয়াছেন। টেবিলের উপর দুইটী সুন্দর ফুলের তোড়া রহিয়াছে। কাঁচপাত্রে বরফযুক্ত মাখন, প্রত্যেকের জন্য একখানি করিয়া বড় প্লেট, তাহার পার্শ্বে দুইখানি চামচ, দুইখানি কাটা ও দুইখানি ছুরি সজ্জিত রহিয়াছে। তাহার একপার্শ্বে একখানি ছোট প্লেটের উপর পরিষ্কার ধবধবে একখানি রুমাল এবং তাহার নিকট কর্ত্তিত একখানি পাউরুটি রহিয়াছে। প্রত্যেকের জন্য একটী করিয়া কাঁচের গ্লাস জলপানের জন্য রাখা হইয়াছে। লবণ, মশলাগুড় ও সচ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট বোতলের মধ্যে রাখিয়া এক আধার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে।

আমরা আসন গ্রহণ করিলেই বয় এক চিনামাটির আধারে কিছু সিদ্ধ আলু আনিয়া হাজির করিল। তাহার মধ্যে বড় একখানি চামচ আছে, যাহার যতটুকু খুসি, তিনি ততটা সিদ্ধ আলু চামচ দ্বারা তুলিয়া লইলেন। এইরূপ প্রত্যেকের লওয়া হইলে আর একখানি পাত্রে করিয়া মাটন চপ আনা হইল। তাহাতে একখানি কাঁটা আছে, সেই কাঁটা দ্বারা প্রত্যেকে একখানি করিয়া মাটন চপ তুলিয়া লইলাম এবং আলুর সঙ্গে সেই মাটন চপ, ছুরি ও কাঁটার সাহায্যে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে যে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে,

তাহার একখানি তালিকা প্রস্তুত হইয়া টেবিলের উপর রক্ষিত হইয়াছে। আমি তালিকা খানি দেখিয়া বয়কে বলিলাম যে, আমি মাত্র ভাত, মাটন ও আলু সিদ্ধ খাইব। অন্যান্য খাদ্য খাইলাম না, মাখন, ভাত, মাটন ও আলুসিদ্ধ, একখণ্ড রুটি খাইয়া ব্রেকফাষ্ট সমাপ্ত করিলাম।

আজ দুটা ভাত পেটে পড়িয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হইল। এক বোতল কি দুই বোতল করিয়া সোডা ও লেমনেড খাইতে লাগিলাম। জাহাজে বড় গরম, এক বোতল সোডা, কি লেমনেড এবং এক পেয়ালা চায়ের দামও চারি আনা। টিফিনের ঘণ্টা একটার সময় বাজিল। টিফিনের বন্দোবস্ত ব্রেক্ ফাষ্ট হইতে একটু পরিবর্ত্তিত ধরণের। টিফিনে চা বা কাফিপানের ব্যবস্থা আছে এবং ফলের ব্যবস্থা আছে। ডিনারের সময় আসিল, সাড়ে ছয়টা কি সাতটায় ডিনারের ঘণ্টা পড়িল। ডিনারেব টেবিলে গিয়া দেখি, ডেকের একটী বাঙ্গালী বাবু ও সেই দুইটী সুরতি ভদ্রলোকও টেবিলে বসিয়াছেন। বাঙ্গালী বাবুটী বাট্লারকে কহিলেন যে, Do not give me bief. যেমন হিন্দুর বড়দফা গো মাংস, সেই মত মুসলমানের জব্বরচিজ শূকরের মাংস। কিছুক্ষণ পরে খাদ্য পরিবেশন আরম্ভ হইলে, সুরতি একজন ভদ্র লোক কহিলেন "ভাই বাটলার, হাম লোককা সামনে, ওই জব্বরচিজ মত লাও।" অর্থাৎ শূককের ঠ্যাং হইতে প্রস্তুত খাদ্য তাঁহাদেব সম্মুখে লইতে নিষেধ করিলেন। তখন মনে মনে বলিতে লাগিলাম, 'ও হরি, সকলই আপন আপন জাতও বাঁচাইবেন এবং সাহেবী খানাও খাইবেন! এ বেশ বন্দোবস্ত ত! বাঙ্গালী বাবুটীও ভাতাভাবে কাতর হইয়া খানার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনিও আমারই মত। আমি মাটনকারি, আলু সিদ্ধ, মাখান ও ভাত ভিন্ন আর কিছুই খাইলাম না। এই সময়ে মুসলমানগণের রোজা ছিল; সুরতি ভদ্র লোক দুইটী সমস্ত দিন রোজা করিয়া সন্ধ্যাকালে সাহেবী খানা দিয়া রোজা খুলিতেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের যেমন আরাম ও সুবিধার কথা লিখিলাম, কিন্তু ডেকের যাত্রীদিগের তাহার বিপরীত। ডেকের যাত্রীদিগের বড় কষ্ট। সাহেবরা ডেকের যাত্রীদিগকে শেয়াল কুকুরের মত মনে করে। খালাসী বেটারাও তাহাদের বড় উৎপাত করে। প্রত্যহ সকালে জাহাজে "পানি মাররার" সময় ডেকের যাত্রীদিগের বিছানা পত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আপন আপন বিছানা না সামলাইলে খালাসী বেটরা জল দিয়া

ভিজাইয়া দেয়। নীচের তলার ডেকে "পানি মারিয়ার" উৎপাত নাই, কিন্তু তথায় বড় গরম ও দুর্গন্ধ। উপরে তাদৃশ গন্ধ না থাকিলেও মুরগী ও ছাগলের মল মূত্রের গন্ধ আছে। যাহারা জাহাজের সারঙ্গকে দুই এক টাকা ঘুস দিয়া কলকাব উপরে বিছানা বিছাইতে পারে, তাহারা অপেক্ষাকৃত আবামে থাকে। ঝড় বৃষ্টি হইলে জাহাজের ডেকেব যাত্রীগণের আরো অসুবিধা হয়।

প্রথম দিবস আমবা গঙ্গা সাগবের ঘোলাজলেই আসিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি "কালাপানিতে" পড়িয়াছি। আজ আর কুল কিনারা কিছুই স্থিবতর হইল না, কখনও বহু দূরে দুই খানা জাহাজ আসিতে দেখিয়া উৎসুক হইয়া দেখিবার জন্য কেহ রেল ধরিযা, কেহ ছাদেব উপর গিয়া আগ্রহচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল। জাহাজ খানি নিবটবর্ত্তী হইলে উভয় জাহাজ হইতে দূববীক্ষণ যোগে কাপ্তেনকে ও অন্যান্য ইংরাজগণ পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন। অতি নিকটবর্ত্তী হইলে উভয় জাহাজ হইতে পরস্পরের অভিবাদন স্বরূপ রুমাল উড়াইয়া দেখান হইল। অল্প সময়ের মধ্যে আগন্তুক জাহাজ খানি পাছে পড়িয়া গেল।

চিন্তাশীল ভাবুকের পক্ষে সমুদ্রের প্রকৃতিব দৃশ্য অতি মনোহর, কিন্তু ভাবশূন্য ব্যক্তির পক্ষে উহা অতি ভীতিপ্রদ ও বিরক্তিজনক। ভাবুক পথিক যদি আস্তিক হন, তাহা হইলে এই অনন্ত নীলাম্বুবাশির প্রতি তরঙ্গ, প্রতি তরঙ্গের প্রত্যেক বারি কণায় তিনি ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও অসীম জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া ভাব-সাগরে ডুবিয়া যান। আর তিনি যদি নাস্তিক হন, তবে প্রকৃতির লীলা খেলা দেখিযা মুগ্ধ হন। বিশ্বাস হইলে জল রাশির মধ্যে একমাত্র উড্ডীয়মান মৎস্য ব্যতীত আর কোন প্রাণীর দেখা পাইবার সাধ্য নাই। কূল কিনারা যে এই অনন্ত জল বাশিব প্রান্তে আছে, তাহাও বোধ হইল না। দ্বিতীয় দিবসেব বেলা একটা হইতে নভ মণ্ডলেব উত্তব পশ্চিম দিকে সামান্য এক খণ্ড মেঘ দৃষ্ট হইল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘ খানি বিস্তৃত হইল, অর্দ্ধ আকাশ জুড়িয়া পড়িল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার জোর ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বেলা যতই অবসান হইতে আরম্ভ করিল, হাওয়ার বেগ ক্রমে ঝড়ে পরিণত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। সমুদ্রের পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ সকল উন্মত্ত প্রায় হইরা সক্রোধে যেন আমাদের জাহাজ খানাকে আঘাত কবিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ কবিবার সংকল্প কবিল। জাহাজ খানিও তেমনি হাওয়ার বেগে এবং তুফানের তোড়ে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া চলিতে

চলিতে আক্রমণকারী ঢেউ সকলকে বুকে ঠেলিয়া চলিল। এখন পর্য্যন্তও কোন ভয়ের কারণ হয় নাই, কিন্তু ক্রমেই যেন অবস্থা শঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। অবস্থা আশঙ্কাজনক বুঝিয়া ডেকের সমস্ত যাত্রীকে নিম্ন তালায় পাঠান হইল। কারণ, এক একটা ঢেউ আসিয়া জাহাজের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ হইল, ডেকযাত্রীগণের অনেকের বিছানা বাক্স প্রভৃতি ভাসাইয়া সমুদ্র জলে লইয়া ফেলিয়া দিল!

রাত্রি ভয়ানক অন্ধকারময়, কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই, কেবল মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোকের সময় সমুদ্রের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আমরা দেখিতে লাগিলাম। প্রাণে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। কাহারো জাহাজের উপর দাঁড়াইবার সাধ্য নাই, দাঁড়াইলেই ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। কাপ্তান পূরা দমে কল চালাইয়া দিয়া অতি দৃঢ়ভাবে জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করিল। এক ঝঁ্যাটকায় জাহাজের উপরস্থ বড় মাস্তলটী ভাঙ্গিয়া পড়িল। জাহাজের খালাসী, এঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সকলে প্রস্তুত হইয়া আপন আপন স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। রাত্রি দুইটার সময় ঝড় এত প্রবল হইল যে, জাহাজ খানি আর যে রক্ষা পাইবে, এমন কাহারও বোধ হইল না। মুসলমানগণ আল্লা আল্লা করিতে আরম্ভ করিল, হিন্দুগণ, রাম রাম, দুর্গা দুর্গা শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। যাহাদের সঙ্গে পরিবার ও ছেলেপিলে ছিল, তাহারা স্ববংশে নির্ব্বংশ হইলাম বলিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ, জাহাজ ডুবিলে, জলে ভাসিবার জন্য বায়ুভরা রবার দ্বারা প্রস্তুত পোষাক পরিধান করিয়া সকলে উপরে গিয়া দাঁড়াইয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এক একটা ঝাপটে, ঝঁ্যাটকা বাতাস হু হু রবে গর্জ্জিয়া আসিয়া জাহাজের পাল, পরদা, দড়ি, কাছি, ছিঁড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল, যেন জাহাজ খানিকে জলের তলে খুঁসিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক ঝঁ্যাটকায়ই যেন এই ডুবিল! এই ডুবিল! বলিয়া যাত্রিগণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে লাগিল। কেহ কাঁদিতে আরম্ভ করিল, হায় স্ত্রী পুত্রের কি দশা হইবে! কত রকমের বিলাপধ্বনি করিয়া আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। সত্যের অনুরোধে বলিতেছি, সমুদ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া যে কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, অর্থাৎ ভাবুকের মন ভাবে মগ্ন হয়, আর ভাবশূন্য ব্যক্তি নীল সমুদ্র দেখিয়া ভীত হয়, এই মন্তব্য এস্থলে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ এই বিপদের সময়, কি ভাবুক, কি ভাবশূন্য, সকলেই ভীত হইলেন। এমন কি,

জাহাজের কাপ্তান প্রভৃতি, যাহারা বার মাস সমুদ্রে থাকে, তাহারাও ভীত হইয়াছিল। আমার যে এই কঠিন প্রাণ, আমারও মনে শঙ্কা হইল যে, অন্ধকার রাত্রিতে অকূল অগাধ সমুদ্র গর্ভে নিহিত হইলাম! পিতা মাতা তাহার বর্ণবিসর্গও জানিতে পারিলেন না!

মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া মনকে দৃঢ় করিয়া প্রস্তুত করিলাম। কেবিনের মধ্যে না মরি, খোলা সমুদ্রে দুই চারি মিনিট ঢেউয়ের সাহায্যে ভাসিতে পারি, সেই জন্য কেবিনের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলাম। ইতি মধ্যে এমন একটা ঝ্যাটকা আসিলে সকলে, ডুবল! ডুবল! করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল! কিন্তু জাহাজ খানা ডুবিল না, ইহার পরই হাওয়ার বেগ ক্রমে কমিতে আরম্ভ হইল। রাত্রি চারিটার সময় ঝড়ের কোপ থামিল। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল। বাতাস ক্রমে পড়িয়া গেল। জাহাজে অনেক গুলি কুলি ছিল, কয়েক জন ভেদ বমি করিয়া মরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহাদের মৃত দেহ গুলিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল। চতুর্থ দিবস আমরা আরাকানের সীমায় বুসাইয়ের পাহাড় দেখিতে পাইলাম। পাহাড় দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইল। ' যাত্রী গুলি এত নস্তানাবুদ হইয়াছে যে, তাহারা মাটী ধরিতে পারিলে রক্ষা পায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা রেঙ্গুনের খাঁড়ির মুখ দেখিতে পাইলাম। তথায় আড়কাটি জাহাজ আসিয়া আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

সেদিন রাত্রিকালে আর জাহাজ চালান হইল না, কেন না খাঁড়ির মধ্যে রাত্রিকালে বড় জাহাজ চালান বিপজ্জনক। সেই রাত্রি খাঁড়িমুখে মঙ্কি-পয়েণ্টর নিকট জাহাজ নঙ্গর করিল। আড়কাটি জাহাজের পাইলট আসিয়া আমাদের জাহাজের চার্জ্জ লইল। আমাদিগের জাহাজ হইতে তোপধ্বনি হইল, ইহাদ্বারা পৌছ সংবাদ জ্ঞাপন করা হইল। মঙ্কিপয়েণ্ট হইতে টেলিগ্রাফে রেঙ্গুণে খবর পৌছিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে জাহাজ খাঁড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। রেঙ্গুন হইতে চারি মাইল দূরে জাহাজ থামিল, ইতি-মধ্যে একখানি ষ্টীমার হুইশিল দিয়া নাচিতে নাচিতে আসিল। সেই জাহাজে ডাক্তার সাহেব অথবা জেল অফিসার ছিল। তিনি জাহাজে আসিয়া কাপ্তানের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া জাহাজের যাত্রিগণের হাল অবগত হইলেন। কাহারো কলেরা বা অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে কিনা, তাহা কাপ্তানের মুখে শুনিয়া জাহাজ খানিকে রেঙ্গুনের জেটিতে যাইতে আদেশ করিলেন।

জাহাজ রেঙ্গুণের জেটিতে লাগিল। যাত্রিগণের অনেকের বন্ধু বান্ধবগণ আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া গেলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে আর কেহই সাক্ষাৎ করিলেন না। মহা ভিড়ের মধ্যে দিয়া, কুলির মাথায় আমার জিনিষগুলি দিয়া চলিলাম। কিন্তু কিনারে উঠিতেই কয়েক জন হিন্দুস্থানী আসিয়া আমার জিনিষগুলি ধরিল এবং তাহারা খুলিয়া দেখিল যে, গাঁজা প্রভৃতি আমার সঙ্গে আছে কিনা। তালাশ করিয়া হতাশ হইয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল। উপরে উঠিয়া এখন ভাবনা হইল, যাই কোথা? ষ্টিমারের বাঙ্গালী বাবুদিগকে গল্প করিতে শুনিয়াছিলাম,রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ উকীল কুঞ্জ বাবু, তৎকালে কলিকাতা হইতে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌছিলে কোন নবাগত বাঙ্গালী পাইলে আদর করিয়া বাসায় লইয়া যাইতেন এবং চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের চাকরি করিয়া দিতেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ রেঙ্গুণে কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। আমিও অপরিচিত ভাবে উপযাচক হইয়া কাহারো গলগ্রহ হইতে চেষ্টা করিলাম না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

কমিশারিয়াট আফিস।

আমি নদীর ধারে রাস্তার উপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এখন কোথায় যাই? ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম-নিবাসী একজন দুধওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বাঙ্গালী দেখিয়া তাহার সঙ্গে বাঙ্গালায় আলাপ করিয়া জানিলাম যে, বাজারে তাহার একখানি দোকান আছে। সেও আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমার পরিচয় পাইয়া আমাকে বলিল যে, আপনি আমার বাসায় চলুন, সেখানে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারিবেন। তাহার সাদর আহ্বানে আমি অত্যন্ত খুশি হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তাহার দোকানে উপস্থিত হইলাম। তাহার মাত্র দুইটি ঘর, একটি উপরে এবং একটি নীচে। নীচের ঘরে সে দুধ দই মাখন ও মালাইয়ের কারবার করে, উপরের ঘরে শয়ন করে। আমারও বিছানা পত্র

উপরেব ঘরে লইয়া গেল। এ ব্যক্তি জাতিতে কায়স্থ, নাম নবীনচন্দ্র দে। সে আমার পাকের আয়োজন করিয়া দিল, আমি মাছের ঝোল আর ভাত পাক করিয়া অর্দ্ধেক তাহাকে দিলাম, অপর অর্দ্ধেক আমি লইয়া আহার করিতে বসিলাম। সে বলিল যে, না আগে ব্রাহ্মণের সেবা হউক; আমি শূদ্র, পাছে প্রসাদ পাইব। এই কথায় আমার মনে একটু হাসি পাইল যে, দে মশায় যদি জানতেন যে, আমি জাহাজের খানা খাওয়া ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে হয়ত আমার আশ্রয়স্থানটুকও দিতেন না। আমার অনুরোধসত্বেও সে আমার সঙ্গে খাইল না। আমার আহার হইলে শেষে সে আহার করিয়া এবং অবশিষ্ট ভাত ব্যঞ্জন পর্য্যন্ত তুলিয়া লইল। বলিল যে "অনেক দিন ব্রাহ্মণের সেবা করিতে পারি নাই, আজ দৈবাৎ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আনার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল।"

রেঙ্গুনের দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। কলকাতার সেই এক দৃশ্য, আর রেঙ্গুনের সেই এক দৃশ্য। কলিকাতা ইষ্টকময়, দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকায় পূর্ণ। রেঙ্গুন দ্বিতল ও একতলা কাষ্টময় গৃহে পূর্ণ। তখন রেঙ্গুনে ইমারতের সংখ্যা খুব কমই ছিল। কলিকাতার রাস্তা ঘাট ধূতি চাদর যুক্ত, নগ্ন-শির-বিশিষ্ট লোক পূর্ণ, আর রেঙ্গুনে রাস্তা ঘাট নগ্ন কৃষ্ণবর্ণ মাদ্রাজী ও কোরঙ্গী, কুঙ্গ, মাথায় রেশমী রুমাল বাঁধা, পরিধানে রেশমী লুঙ্গি পরা বর্ম্মগণ পূর্ণ। মাঝে মাঝে সুরঙ্গ ইহুদি, দুই চারিটী বাঙ্গালী এবং ইংরেজ ফিরিঙ্গিগণ মিশ্রিত, রাস্তার দৃশ্য এক অপূর্ব্ব রূপ ধারাণ করিয়াছে।

নবীনচন্দ্র দের নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম, কমিশারিয়াট আফিসটী কোথায় এবং রেঙ্গুনের বড় বড় বাঙ্গালী বাবুদের সংবাদও জানিলাম, কিন্তু কাহারও সঙ্গে যেন দেখা করিতে ইচ্ছা হইল না। পরদিন আহারান্তে খোঁজ করিয়া কমিশারিয়াট আফিসে উপস্থিত হইলাম। কমিশারিয়াটের ম্যানেজার একজন মান্দ্রাজী ইউরেশিয়ান্, নাম রোজারিও। তাঁহার শরীরের বর্ণনা মেটে রং বিশিষ্ট, বয়স অনুমান ৩৫ বৎসর। আফিসে কয়েকজন মান্দ্রাজী কেরাণী ও তিন জন ইউরেশিয়ান কেরাণী দেখিতে পাইলাম। মান্দ্রাজী বাবুদের শরীরের বর্ণ কাল, মস্তকের দশ আনা আন্দাজ মুক্ত, অবশিষ্ট ছয় আনা অংশে সুদাম কেশ টিকির স্থান অধিকার করিয়াছে। জরির পাড়দার সাদা কাপড়ের পাগড়ি মাথায়, গায়ে ইংলিশ কোট, কিন্তু পরিধানে একখানা মলমলের চাদর, কোঁচা নাই, কাছাও প্রায় শূন্য, তবে সেই পাতলা বস্ত্রখণ্ডের

এক কোণা তুলিয়া উপরে গুজিয়া কাছার কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। পায়ে চটি জুতা, তাহা আফিসের বাহিরে রক্ষিত হইয়াছে এবং নগ্নপদে তাঁহারা টেবেলে লেখা পড়া করিতেছেন। কাহারো কাহারো কপালে সুদীর্ঘ রক্তচন্দনের ফোঁটা, সকলেই ভাল ইংরেজী বলিতে পারেন, তাঁহাদের ইংরেজী কথার সঙ্গে আমার ইংরেজীর তুলনা করিয়া লজ্জিত হইলাম।

ইউরেসিয়ান কেরাণীগণের মধ্যে দুইজন মান্দ্রাজী এবং একজন বর্ম্মা ইউরেসিয়ান। মান্দ্রাজী ইউরেসিয়ান কেরাণীদ্বয়ের শরীরের বর্ণ কাল, বার্ণিশের মত কুচকুচে কাল, একজনের নাম গোমশ্ আর একজনের নাম ডিক্রুজ। বর্ম্মা ইউরেসিয়ানটীর বর্ণ পাণ্ডু রোগগ্রস্ত রোগীর গাত্রের ন্যায় ফ্যাকাসে বর্ণের। বলা বাহুল্য যে, সকলেই হ্যাটকোট ও নেকটাইধারী।

আমার শরীরের বর্ণ উত্তম শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট, আমিও কোট পেণ্টালুন পরা, আমার মাথায় কাল মকমলের একটী গোল টুপি।

আফিসের চাপরাশিকে বলিলাম যে, ম্যানেজারকে আমার আগমনবার্ত্তা শুনাও। সে আমার হস্তলিপি একখানা কার্ড লইয়া ম্যানেজারকে দিল। ম্যানেজার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার নিকট গিয়া "গুডমর্ণিং" বলিয়া দাঁড়াইলাম, আমার নিয়োগ পত্র খানি তাঁহার হাতে দিলাম। ম্যানেজার বলিলেন যে "তোমার Appointment সম্বন্ধে কলকাতা হইতে টেলিগ্রাম আসিবামাত্র কমিশারিয়াট অফিসার কাপ্তান রেণী কলিকাতায় যে টেলিগ্রাম দিয়াছেন, তাহা এই দেখ।" এই বলিয়া আমাকে টেলিগ্রামের নকলখানা দেখাইলেন। তাহা এই :—"Bengalee clerk is not wanted, send men of other nationalities, European or Eurasian preferable." ম্যানেজারের কথা শুনিয়া এবং টেলিগ্রামের নকল দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল। মনে বড় দুঃখ ও ঘৃণা উপস্থিত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, বাঙ্গালী বিদ্বেষটা সমুদ্র পার হইয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে! তবে উপায় নাই, আসিয়া পড়িয়াছি।

ম্যানেজার আমার নিয়োগ পত্র সহ আমাকে কাপ্তান রেণীর আফিসে পাঠাইলেন। তথায় গিয়া সেলাম ঠুকিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান রহিলাম। রেণী সাহেব আগাগোড়া আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন যে, "I did not want any Bengalee clerk in my office. Suppose if there be a war in the Upper Burma, which I think sooner or later will be, would

you be bold enough to follow the expedition or you will run away ?

আমি। Certainly sir, I am ready to go anywhere, if I am ordered to do so. I am not afraid of war.

কাপ্তান। Why have you come to Burma ?

আমি। Because I have been sent here.

সাহেব আমার চোথা ধরণের উত্তর পাইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন এবং চিন্তা করিয়া বলিলেন Very well, I will take you on probation. এই বলিয়া আমার নিয়োগ পত্রের উপর লিখিলেন "Appointed on probation. Manager please give him plenty of works, so that he might not spend his time idly."

সাহেবের ব্যবহারে আমার মনে বড় দুঃখ হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, হায়! এমন জাতিতেও জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যেখানে যাই, সেই খানেই বাঙ্গালীর প্রতি ঘৃণা। এমন অপদার্থ জাতি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইলেও ক্ষতি কি ?

ম্যানেজার আমাকে একখানি ময়লা কালীমাখা টেবেল, ভাঙ্গা একখানি চেয়ার, অপরিস্কৃত দুইটা দোয়াত, তাহার একটীতে কাল কালী এবং একটীতে লালকালী, দুইটী কলম, একখণ্ড ব্লটিং পেপার দিয়া আমার স্কন্ধে সর্ব্বপ্রথম এই গোলামী-বোঝা চাপাইলেন। প্রথম প্রথম আফিসের দাঁড়া দস্তুর না জানা থাকায় সময় সময় ভুল করিতে লাগিলাম। কোন কথা না বুঝিলে ফিরিঙ্গিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিয়া দেওয়া দূরের কথা, উপরন্তু বিদ্রুপ করিত। মান্দ্রাজী বাবুগণ এ বিষয়ে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

যেদিন গোলামী পদে অভিষিক্ত হইলাম, তাহার পরদিন আমার বন্ধু সেই লরিমার, যাহাকে জাহাজের মধ্যে চিৎ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, আফিসের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। লরিমারকে কমিশারিয়াট আফিসে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং সেও আমাকে এখানে টেবেলের ধারে বসা দেখিয়া চমৎকৃত হইল এবং মনে মনে লজ্জিত হইল। এও কলিকাতার কমিশারিয়াট আফিস হইতে কেরাণী নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে। আমারও যে কলম ঠেলা পেশা, তাহারও তাই। তবে তাহার শাদা চামড়ার গুণে, তাহার বেতন ১০০৲ এক শত টাকা, কিন্তু আমার বেতন ষাট টাকা।

লরিমার সরাসর কাপ্তান রেণীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের নিয়োগ পত্র খানা দিল। কাপ্তেন রেণী দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বসিতে চেয়ার দিলেন। দুইজন আপোষে অনেক কথা হইল, সকল কথা বুঝিলাম না, তবে এইমাত্র বুঝিলাম যে তিনি বলিলেন যে, I am very glad that you have been appointed in my office.

লরিমারের জন্য ম্যানেজার একখানি নূতন টেবেল, নূতন চেয়ার, সমস্তই নূতন সরঞ্জাম বাহির করিয়া দিলেন। লরিমার আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পূরা প্রতিহিংসার ভাব যেন প্রকাশ করিতে লাগিল। একেত মনসা, তাহাতে ধূনার গন্ধ, আমার চাকরির পরিণাম বিপজ্জনক বলিয়া বোধ হইল। কোন্ সময়ে লরিমার কাপ্তান রেণীর কর্ণে কোন কথা তুলিয়া আমাকে বিপদগ্রস্ত করিবে, এই আশঙ্কা হইল। কিন্তু উপায় নাই, সাবধান হইয়া চলিতে হইবে, তাহা মনে মনে স্থির করিলাম।

আফিসের কার্য্যে প্রথম প্রথম যে সকল ভুল হইতে লাগিল, ম্যানেজারের মিষ্ট ভর্ৎসনায় তাহা সংশোধিত করিয়া লইতে লাগিলাম। আমি প্রাণপণে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম এবং কার্য্যে ক্রমে পরিপক্ক হইতে লাগিলাম। অনুপযুক্ত বা অলস বলিয়া যে কেহ আমাকে আফিস হইতে তাড়াইতে পারিবেন না, সে সাহস হইল। কিন্তু ম্যানেজার আমার উপর কার্য্যের চাপটা খুব বেশী করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। ফিরিঙ্গি গুলি প্রায়ই গল্প করিয়া সময় কাটায় এবং চারিটা বাজিবামাত্রই কাজ বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আমার দৈনিক কার্য্য সমাপ্ত না হইলে আর আমার আফিস পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। কোন দিন পাঁচটা ছয়টা পর্য্যন্ত আফিসে থাকিতে হইত। ক্রমে এত কার্য্য আমার উপর পড়িল যে, রবিবার ও বন্ধের দিন পর্য্যন্ত আমাকে আফিসে কাজ করিতে হইত। মান্দ্রাজী বাবুরাও সময় সময় আমার মত অতিরিক্ত খাটিতেন।

ফিরিঙ্গীগণ আজ ফুটবলের ম্যাচ্, কাল ক্রিকেটের ম্যাচ উপলক্ষে ছুটি লইয়া যাইত এবং মাঝে মাঝে ভলাণ্টিয়ারদিগের প্যারেডের জন্য ছুটি পাইত। আমার ভাগ্যে গেজেটের বিজ্ঞাপিত ছুটিও ভোগ করিতে পারিতাম না। শ্বেত চর্ম্মযুক্ত লরিমার আর রঞ্জিত চর্ম্মযুক্ত ফিরিঙ্গিগণ, কার্য্যের প্রতি এত যত্ন ও পরিশ্রম করিতে দেখিয়া, আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইতে আরম্ভ করিতে লাগিল, কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, কাপ্তান রেণী যখন আমাকে

নিযুক্ত করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তিনি অল্প কাল মধ্যেই হয় ত আমাকে চাকুরি হইতে তাড়াইবেন। আমার প্রতি ইহাদের ঠেসাঠেসীর প্রধান এই এক কারণ।

এখানে ফিরিঙ্গিদিগের এক ক্লাব আছে। এই ক্লাবে কেরাণী দলের সাহেব ও ফিরিঙ্গীরাই মেম্বর। আমি এই ক্লাবে ভর্ত্তি হইবার জন্য সেক্রেটারির নিকট একখানা দরখাস্ত দিলাম। সেক্রেটারি আমার দরখাস্তের উপর এই মন্তব্য লিখিল যে "No natives are allowed in this club." এইরূপ লিখিয়া আমার দরখাস্তখানা ফেরত দিল। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, নেটিব জন্ম ধারণ করিয়া কি ভুলই করিয়াছি, এ ভুল আর সংশোধনের উপায় নাই!

আমাদের আফিসের ফিরিঙ্গী কেরাণী গুলি সকলেই ভলান্টিয়ার দলভুক্ত। যে দিন তাহারা প্যারেডের ছুটি পায়, সে দিন তাহাদের কার্য্যগুলিও আমার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। ফিরিঙ্গিদিগকে ভলান্টিয়ার দলে প্যারেড করিতে দেখিয়া আমারও ভলান্টিয়ার হইতে সাধ হইল, সাধ হইলে কি হয়? দলে ভর্ত্তি করে কে? বাসনা কাহার না হয়? আমি এক দিন ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি ভলান্টিয়ার দলে ভর্ত্তি হইতে পারি কি না? তাহাতে তিনি বলিলেন যে "No, they would not allow you in the corps, but if you like, you may go and ask the sergeant-instructor." আমি মনে মনে ভাবিলাম, "দেখিনা একবার চেষ্টা করে, চেষ্টা করায় হানি কি?

বাসায় গিয়া—বাজারে গিয়া একটী ওপেন-ব্রেষ্ট ইংলিশ কোট, একটী ওয়েষ্টকোট, এবং কপালিযুক্ত একটী ইভিনিং ক্যাপ খরিদ করিলাম। তাহার সঙ্গে নেকটাই ও কলারও কিনিলাম। পর দিন প্রাতকালে সাহেব সাজিয়া ভলান্টিয়ার প্যারেড দেখতে গেলেম। প্যারেড সারা হইলেই সারজেণ্ট-ইনষ্ট্রাক্টর কেরির পাছে তাহার বাসা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলাম। কেরি ভিতরে গেলে তাহার বয়কে দিয়া সংবাদ দিলাম যে, আমি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। বয় বলিবা মাত্রই কেরি সাহেব আমাকে ভিতরে যাইতে বলিলেন। আমি তথায় গেলে তাহার বৈঠকখানায় আমাকে বসাইল। পরস্পর গুডমর্নিং বলাবলি হইল।

কেরি—What can I do for you Mr.?

আমি—May I be enlisted as a volunteer in your corps?

কেরি—Oh, yes, certainly. I am sure you are an Eurasian.

আমি—I am sorry, I am not, I am a Bengalee Hindoo.

আমি বাঙ্গালী হিন্দু, এই কথা শুনিয়া কেরী সারজেণ্ট চমকিয়া উঠিল। এবং বলিল যে, I regret to say that I cannot take you as a volunteer in my corps, as there is no such rule that a native could be enlisted in the Corps. And moreover you are a Bengalee Hindoo. আমি অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, কিন্তু বাহিরে সৌজন্য প্রকাশ করিয়া সারজেণ্ট কেরীকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম।

যেখানে যাই, সেই খানেই নেটিব ও বাঙ্গালীর সপিণ্ডকরণ না করে,সাহেব মহলে এমন স্থান নাই!

স্পষ্ট জবাব পাইয়াও মনে মনে আশা ছাড়িলাম না। মনে মনে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম যে, শুনিয়াছিলাম যে, বোম্বাই অঞ্চলে দুইটী বাঙ্গালী নাম বদলাইয়া ভলাণ্টিয়ার দলভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম ছিল হরিশ সরকার, নাম বদলাইয়া করিয়াছিলেন Horace Shircare,আর এক জনের নাম ছিল দিনেশ সান্ন্যাল বা সাণ্ডাল, তিনি নাম করিয়াছিলেন, Daniel Sandhal. তবে আমিও কেন নামটী বদলাই না। তখন আবার মনে হইল যে, আমারত নাম বদলাইবার সাধ্য নাই। কমিশারিয়াট আফিসে আমার আসল নামের ছাপ পড়িয়াছে। নাম বদলাইলে জুয়াচুরি ধরা পড়িবে।

এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে কিছু দিন কাটিল,অনুসন্ধানে জানিলাম যে, কেরী ও তাহার মেম বড় মদখোর, এবং এই অত্যন্ত মদ খাওয়ার জন্য তাহাদের অল্প আয়ে আর কুলায় না, সর্ব্বদাই টানাটানি। মনে মনে এক ফন্দি আঁটিলাম যে,একবার কেরী সাহেবের মেমকে ধরা যাউক। তাহার বয়কে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, মেম মাঝে মাঝে ভলাণ্টিয়ারগণ হইতে উপহার গ্রহণ করিয়া থাকে। আমিও কিছু উপহার লইয়া যাইব, স্থির করিলাম। বাজারে গিয়া এক বোতল ব্রাণ্ডি, এক বোতল স্কচ হুইস্কি, তিন বোতল বিয়ার, বড় একখানি ফ্রুট কেক, এক টিন বিস্কুট এবং এক বোতল Cherry blossom সেণ্ট খরিদ করিয়া ডালি সাজাইয়া বাবায় আসিয়া পোষাক পরিয়া এক কুলির মাথায় ডালিটী দিয়া কেরী সাহেবের বাঙ্গালাভিমুখে চলি-

লাম। কেরী সাহেব তখন বাহিরে গিয়াছে, বাসায় নাই। এই অবসরে বয়কে দিয়া সংবাদ দিলে আমার ভিতরে গমনের আদেশ হইল। আমি ডালিটী সহ তথায় গিয়া "গুডমর্ণিং!" শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, ম্যাড্যাম, আপনার জন্ম এই সামান্ত জিনিষ কয়টী আনিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

তখন মেম কেরী আমার প্রদত্ত উপহার দেখিয়া কহিলেন, Oh, it is very good of you, that you have brought such a nice present for me. Oh, how I shall thank you for it. What can I do for you Baboo? আমি তখন বলিলাম যে, Madam, may I ask your favour of recommending me to Mr. Carry that he should kindly enrol my name as a volunteer in his Corps? মেম কহিলেন যে, Oh, I think I shall be able to do much for you. Certainly, I will do that for you. You better come and see me in the afternoon at about 2 P. M. আমিও Very well, thank you, Madam, বলিয়া সেলাম করিয়া বিদায় হইলাম।

সেদিন রবিবার ছিল। বাসায় যাইয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলাম এবং নানা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার ভলাণ্টিয়ার হইবার ইচ্ছা এত প্রবল হইয়াছে যে, যে কোন উপায়েই হউক, একবার অন্ততঃ কিছুদিন ভলাণ্টিয়ার দলভুক্ত হইয়া দেখিব। তাহাতে যদি চাকরিও যায়, তাহাতে দুঃখিত হইব না। বেলা দেড়টার সময় প্রস্তুত হইলাম এবং দুইটার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আমার আগমনবার্ত্তা পাঠাইলাম। আমাকে যাইতে আদেশ করা হইল। আমি তাহাদের ড্রইং রুমে গিয়া বসিলাম এবং সারজেণ্ট কেরী এবং মিসেস্ কেরী উভয়ের সঙ্গেই 'গুড্ আফটার-নুন" বলিয়া সম্ভাষণ করিলাম এবং তাঁহারাও আমাকে প্রতি-সম্ভাষণ করিলেন।

দুই জনেই সুরাপান করিয়া একটু মত্ত হইয়াছেন, আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মেম কহিল,—

Jack! What objection you have to take this Baboo in your Corps? I see he is a very good man.

Sergeant Carry—You do not know Emma, What strict rules we have got in recruiting the volunteers! This Baboo is

a Hindoo, and not only a Hindoo, he is a Bengalee too. Our rule is that any man without Christian name at least can not be enlisted as a volunteer. All volunteers are required to dine together in a party, but he is a Hindoo, he has got cast prejudices ! I will be caught when he refuses to dine with us. Besides the Bengalee is not a suitable person where fighting is concerned.

Mrs. Carry—I have seen all your volunteers, I think he is much superior to many of your members. God knows what is their origin.

Sergeant Carry—There is another thing, the Government policy is not to encourage the natives to be enlisted in the volunteer Corps.

Mrs. Carry—Oh, that is all nonsense. He is not going to snatch away the British empire from you.

Baboo, have you got any such caste-prejudice ?

I. No madam, I have no such prejudice at all.

Sergeant Carry—Yes, I know. What about the name ? He has a Hindoo mame, he must have a Christian name.

Mrs. Carry—Baboo,what is your name please ?

আমি তখন একটু চালাকি করিয়া বলিলাম—My name is Chuckerbetty.

Mrs. Carry—I think, Jack, this name could be passed for a foreign name . It may or may not sound like an English name, but this could be passed for a continental name and who will come to detect this ?

মেম সাহেবের পীড়াপীড়িতে এবং আমার হুইস্কি ব্রাণ্ডির মহিমায় সার্জেণ্ট কেরী অগত্যা আমাকে লইতে স্বীকার করিল। আমি তোমাকে ভর্ত্তি করিতে স্বীকার করিলাম, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল যখন পরিদর্শনে আসিবেন, যখন ধরা না পড়িলেই মঙ্গল।

সার্জ্জেণ্ট কেরী আমার নাম বয়স প্রভৃতি লিখিয়া লইলেন। পর দিন আমার জন্য একটী হেনরী মার্টিনী রাইফল, একটী হেলমেট, একছুট খাকির পোষাক, এক জোড়া পটি, এবং এক জোড়া এমুনিশন বুট ইস্যু করিলেন। এবং অন্যান্য ভলাণ্টিয়ারদিগকে আমার গ্রহণের জন্য নোটিশ দিলেন। ভলাণ্টিয়ারদিগের মিটিংএ আমার আফিসের কয়েক জন ভিন্ন আর আমার বিপক্ষে কেহ মত দিল না। আমি ভোটে টিকিয়া গেলেম। মহা উৎসাহের সহিত সার্জ্জেণ্ট কেরীর উপদেশানুসারে প্যারেডের কায়দা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। রেঙ্গুনে আমার আজ প্রায় নয় মাস হইল।

আবার বাড়ীর কথা।

কলিকাতায় মাঝে মাঝে পিতার নিকট পত্র লিখিতাম। কলিকাতা ত্যাগ করার পর কিছু দিন যাবত পত্রাদি বন্ধ ছিল। পরে রেঙ্গুনে আসিয়া চাকরিতে বহাল হইয়া—পিতার নিকট পত্র লিখিলাম। তাহা পিতা মাতার আক্ষেপ পূর্ণ। আমি সাত সমুদ্র পার হইয়া মগের মল্লুকে আসিয়াছি, আমার জীবনের কোন ভরসা নাই, এই প্রকার নানা কথায় পূর্ণ। আমি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া লিখিলাম যে, আমি এমন স্থানে আসি নাই যে, যেখানে লোক বাস করে না। আমি যেখানে আসিয়াছি, তাহা আমাদের বঙ্গদেশ হইতে স্বাস্থ্যকর, এখানেও বাঙ্গালী অনেক আছেন। এখানে কোন ভয়ের কারণ নাই। চাকরিতে ভর্ত্তি হইয়া অবধি কোন মাসে ২০৲ কুড়ি টাকা, কোন মাসে দশ টাকা, এই প্রকার খরচ পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম। তাহার পর ক্রমেই তাঁহাদের মনের শঙ্কা দূর হইতে লাগিল এবং আমার উপার্জ্জিত অর্থ পাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন। আমার ষাট টাকা বেতনের চাকরি হইয়াছে বলিয়া খুব নাম পড়িয়া গেল।

আফিসে ষড়যন্ত্র।

লরিমার-প্রমুখ ফিরিঙ্গির দল, আমার আফিসের নির্ভুল কার্য্য, স্বাধীনচিত্ততা দেখিয়া মনে মনে বড় ব্যথিত হইল। তাহারা মনে করিয়াছিল, কাপ্তান রেণী আমাকে কোন সূত্রে আফিস হইতে তাড়াইবেন। তাহা হইল না। বরং আমি যাচিয়া তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিতে বাসনা করি, কিন্তু তাহারা আমাকে যেন পা দিয়া ঠেলিতে চায়। আমি স্বাধীনচিত্তের লোক হইলেও অনর্থক কাহারো সঙ্গে বিবাদ করি না, বরং প্রথম প্রথম অনেক সহ্য করি, কিন্তু যদি আমাকে কেহ পুনঃ আজ্ঞা করে বা অপমান করিতে চেষ্টা

করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ছাড়িব কেন? আমি প্রাণপণে সেই অপমানের শোধ তুলিতে চেষ্টা করি।

ম্যানেজার লোকটী মন্দ নয়। বেশ সাম্যবরণের লোক, স্বজাতির প্রতি তাঁহার সহানুভূতি অপেক্ষাকৃত অধিক থাকিলেও বিনা কারণে আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব কখনও দেখান নাই। কাপ্তান রেণী তাহাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "Chuckerbutty is a hardworking, painstaking and intelligent man" কাপ্তেন রেণী যদিও আমার ছিদ্র অনুসন্ধানে ছিলেন, কিন্তু ম্যানেজারের কথায় চুপ করিয়া গেলেন।

এক দিন ম্যানেজার আমাকে বলিলেন যে, কাপ্তান রেণী আফিসের যত অধস্তন কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের কাহার কি নাম, কে কোন্ জাতীয় লোক, কাহার কি পদ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া একটী বর্ণনা (statement) প্রস্তুত করিতে হইবে। তুমি একটা ষ্টেটমেণ্ট প্রস্তুত কর। আমি ম্যানেজারের আদেশ মত রেজিষ্টরী দেখিয়া একটী বর্ণনা প্রস্তুত করিলাম। আমি বর্ণনায় অধস্তন কর্ম্মচারিদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম, অর্থাৎ ইউরোপীয় এবং নেটিব। তাহার একটু নমুনা নিম্নে পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করিলাম।

ইউরোপীয়

আর, বেলগরিও
টি, লরিমার
জি, গামশ
এইচ, থর্প
এল, ডিক্রুজ

মান্দ্রাজী হিন্দু
নেটিব কেরাণী

কুম্বস্বামী পিলে
স্বামী নাদান মুদলিয়ার
রঙ্গস্বামী নাইডু
ভ্যালিয়াপা চেটী
কে, সি চক্রবর্ত্তী, বাঙ্গালী।

কমিশারিয়েট এজেণ্ট
পাঞ্জাবী

ত্রিলোক নাথ
হরনাথ সিং

হিন্দুস্থানী

গয়াদিন পাঁড়ে
অযোধ্যা প্রসাদ ইত্যাদি

এই বিবরণটী পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া কাপ্তান রেণীর নিকট দাখিল করিলাম। কাপ্তান রেণী আমার লিখিত বর্ণনা দেখিয়া চটিয়া লাল হইলেন এবং কহিলেন :—

What have you done Chackraburty? Are Gommes, D'cruz and Thorps Europeans?

আমি এটা মতলব করিয়াই করিয়াছিলাম, কারণ বেটাদের বড্ড অহঙ্কার। তাই একটু মজা দেখিবার জন্য অজ্ঞতার ভাণ করিয়া কহিলাম—

Sir, I do not know, they are supposed to be Europeans. If I mention their names under the heading of Eurasians, they might take offence.

Captain Renny—Nonsense. This is an insult to us. If you call them Europeans again, I will fine you five rupees.

আমি। Very well Sir, I will not make such mistake again.

আমার এই ক্রটি স্বীকারের পর কাপ্তান রেণী একটু শান্ত হইয়া নিজ হাতে বর্ণনাটী কাটিয়া ইউরেশিয়ান হেডিং লিখিয়া তাহার নীচে গমেশ প্রভৃতির নাম লিখিয়া পুনরায় আমাকে নকল করিয়া লইতে বলিলেন। কাপ্তান রেণীর আফিস হইতে যাইতেই ম্যানেজার আমাকে ডাকিয়া বর্ণনাটীর কি ভুল হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া কিছু লজ্জিত হইলেন এবং আমাকে বলিলেন, তোমার উচিত ছিল, পূর্ব্বে আমাকে দেখান। ডিক্রুজ প্রভৃতিও সেই সংশোধিত বর্ণনা দেখিয়া লজ্জিত হইল। আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। ফিরিঙ্গি-দিগের আমার মতলব বুঝা বাকী রহিল না। তাহারা রাগে গড় গড় করিতে লাগিল।

ইহার কয়েক দিন পরেই আফিসের বড় কর্ম্মচারী কাপ্তান রেণী এক দিন আফিসে আসেন নাই। সেদিন সকলেরই কাজের একটু ঢিল পড়িয়া গেল। ম্যানেজারও বাহির হইয়া গিয়া অপর আফিসের কোন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। ফিরিঙ্গির দল সকলে একত্র বসিয়া নানা গল্পচ্ছলে লোকের কুৎসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মান্দ্রাজী কেরাণী বাবুরা একটু দূরে, তাঁহারা এ সকল বড় খেয়ালও করেন না। থর্প আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বাঙ্গালীদের কুলীনদিগের বহু বিবাহ প্রথা, বাঙ্গালীর কাপুরুষতা ও অপদার্থতার বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল, গমেশ মান্দ্রাজীদিগের কতকগুলি সামাজিক রীতির তীব্র সমালোচনা করিল। এই সকল যখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, তখন আমার বড় অসহ্য বোধ হইল। আমি এই আফিসে চাকরিতে ভর্ত্তি হইয়াছি অবধি অনেক কথা সহ্য করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ইহাদের ব্যবহার ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম—

Look here, don't you feel ashamed to criticise the Hindoo habits and religions? What are you all? Some of you might have a little European blood in your system, but I am sure some have none at all! If an Indian Eurasian hates a native of India he hates himself, because most of the blood of his system is Indian blood.

থর্প বর্ম্মা-ইউরেশিয়ান, সে বলিল—We are far superior to you, all damned natives.

গামশ বলিল যে, Though we have dark skin, we are not heathen like you fellows. ডিক্রুজ কহিল যে, We are classed as Imperial Ango-Indians. We have got almost all the privileges of a Europian.

আমি বলিলাম, I do not care how you are classed or what privilege you possess or not, you are no better than ourselves. We have got pure blood in our viens, but most of your people are considered bastard. The Indians call you pariahs.

আমার এই শক্ত কথায় সকলে উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইল এবং আস্তানি গুটাইয়া বলিল যে, ফের যদি এই প্রকার কথা বল, তবে ঘুসি মারিয়া তোমার মুখে শাস্তি দিব। আমি দাড়াইয়া আস্তানি গুটাইলাম এবং বলিলাম, "Come on then." আমাদের এই গোলমালে মান্দ্রাজী বাবুরা আসিয়া আমার পক্ষ হইয়া দাড়াইলেন, মারামারি আর হইল না।

পর দিন কাপ্তান রেণীর নিকট আমার তলব হইল। ফিরিঙ্গিরা আমার নামে নালিশ করিয়াছে। আমি রেণী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন—

I see Chackraburtty you are a very rowdy chap?

আমি কহিলাম, How I am a rowdy chap, Sir?

কাপ্তান। Here is a complaint againt you. You have insulted Mr. Gommes and D'cruz by calling them bastard and pariahs. I have also heard that you assaulted Mr Lorimer in the steamer.

আমি বলিলাম, Sir, I respectfuly beg that you will please listen my explanation first and if I be considered guilty you may punish me then. I also beg that you will kindly call them all here. I will state what happened in their presence.

কাপ্তান, very well বলিয়া, তাহাদিগকে ডাকিলেন। আমি আগাগোড়া ঠিক ভাবে সমস্ত কথা বলিলাম। আমি বলিলাম যে, ইহারা আমাকে অপমান করিবার জন্য আমার জাতির বিরুদ্ধে নানা কুৎসা করিতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুজাতির নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল কারণ বশতঃ আমার অসহ্য হওয়ায় আমি তাহাদিগকে বাষ্টার্ড ও পারিয়া বলিয়াছি। গমেশ প্রভৃতি কোন কোন কথা বলে নাই বলিয়া অস্বীকার করিল। আমি তখন মান্দ্রাজী বাবুদের সাক্ষী মানিয়া আমার কথা প্রমাণ করিয়া দিলাম। অবশেষে লরিমার যে ষ্টিমারের কেবীন হইতে আমার জিনিস পত্র ফেলিয়া দিয়াছিল এবং বিনা কারণে আমার উপর লাথি ওঁছাইয়াছিল, তাহাও বলিলাম। লরিমার আর কোন কথার প্রতিবাদ করিল না, নীরব রহিল। সুতরাং প্রকারান্তরে আমার কথা প্রমাণ হইল। রেণী সাহেব আমার দৃঢ়তা ও ন্যায্য কথা বলার জন্য, আমার প্রতি কোন শাস্তি বিধান করিতে পারিলেন না। সাহেব আমার কোন দোষ না পাইয়া কহিলেন—

You aught show some respect to them. You should not have insulted them like that. তখন আমি বলিলাম, Why Sir, I should show them respect ? They are not Europeans, they are only Eurasians. They are not my superiors, they are subordinates like myself. Sir, the other day I classed them as Europeans and you wanted to fine me five rupees for that.

আমার কথায় সাহেব কহিলেন যে—Oh ! they are Europeans to you, all right, I said so when you compared them with us.

সাহেবের যুক্তি ও বিচারশক্তির পরিচয় পাইয়া অবাক হইলাম। একথাটা কেমন হইল যে "মহারাজ মাকড় মারলে কি হয় ?" সেই মত। আমি তখন সাহেবকে বলিলাম, Sir, I have learnt now the definition of the words European and Eurasian. আমার কথায় সাহেব আমার দিকে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন, কিন্তু আমাকে কোন শাস্তি দিতে পারিলেন না। আমরা আপন আপন কাজে পুনরায় লিপ্ত হইলাম।

মনে মনে ভাবনা হইল যে, এত শত্রুর মধ্যে বাস করা নিরাপদ নহে। কোন সময়ে ইহারা আমাকে বিপদে ফেলিবে। হাতেও বেশী টাকা নাই যে, আশু চাকরি ইস্তাফা দিব। তাহা হইলে খরচপত্র চলিবে কি করিয়া। মাহিনায় যা পাইয়াছিলাম, অধিকাংশই নিজ খরচ ও বাটীতে পাঠানে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে বাটীতে খরচ পাঠান বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার চাকরি নয় মাস হইল। মনে মনে ভাবিলাম, এক বৎসর পূরা করিয়া চাকরি ছাড়িব। এই ভাবে সাবধানে আফিসের কার্য্যাদি চালাইতে আরম্ভ করিলাম।

আমার ভলান্টিয়ারি বহাল রাখিবার জন্য কেরীর মেমকেও মাসে মাসে কিছু ভেট পাঠাইতে হইত। আমার ভলান্টিয়ারি হইবার তিন মাস পরে—ইনস্পেক্টর জেনারেল পরিদর্শনার্থ আসিলেন। সেই উপলক্ষে General Parade হইল। আমরা ফাইলবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া Present arm করিয়া তাঁহাকে Salute করিলাম। পরে তিনি একে একে রাইফল দেখিতে লাগিলেন, আগা গোড়া প্রত্যেকের পোষাক নজর করিয়া টুকিতে লাগিলেন। কাহারো রাইফলে একটু দাগ ছিল, কাহরো পট্টি বাঁধা ভাল হয় নাই, কাহারো বুটে কালীক্রস নাই ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন।

সমস্ত ইনস্পেক্‌সন হইয়া গেলে ইনস্পেক্টর জেনারল সারজেণ্ট কেরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, Who is Chucker-betty? আমি খাঁটি নেটিব হইলেও ফিরিঙ্গির দল হইতে আমাকে তিনি চেহারা দেখিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। তখন সারজেণ্ট কেরী আমাকে দেখাইয়া দিলেন। ইনস্পেক্টর জেনারল আমার আগা গোড়া ইনস্পেক্‌সন করিয়া কহিলেন, He looks all-right. His rifle and dress are very clean and in proper order. I believe he has come from Bengal. Well, will he be able to stick to his duty in time of active service or he will run away throwing his rifle and uniform?

Sergeant Carry—He seems to be firm and bold, and very active and intelligent young man.

I. G. He belongs to the Commissariat office, does he not?

S. Carry. Yes Sir.

I. I hear there is some confusion about his real name. Well, I cannot confirm him in the corps until I ask Captain Renny about him.

আমার নামের যে গোলমাল হইয়াছে,তাহা এ সাহেব কি করিয়া জান্‌লে? তখন মনে মনে ভাবিলাম, আমার আফিসের শত্রু বেটারা নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে গোপনে দরখাস্ত দিয়া থাকিবে। ইহার ফল যে ভাল হইবে না, তাহা জানি, তবুও জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম। এক মাস কাটিয়া গেল, একদিন হঠাৎ ম্যানেজার রেণী সাহেবের লিখিত হুকুম আমাকে দেখাইলেন। Babu K. C. Chackraburty is summarily dismissed from the service with effect from this day.

Sd. G. Renny, Capt. Commt. office.

সাহেবের অর্ডার দেখিয়া আমাকে এই প্রকার সরাসরি বরখাস্ত করিবার কারণ ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু ম্যানেজার কথাটা খুলিয়া বলিলেন না। এবং মান্দ্রাজী বাবুগণও এ বিষয়ে কিছু জানে না! আফিসের ছুটি হইলে সার্জ্জেণ্ট কেরী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার বরখাস্তের কথাটা বলিলাম। তিনি বলিলেন "তোমার আফিসের ফিরিঙ্গি কেরাণীগণ তোমার বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিয়া এরূপ গোলযোগ ঘটাইয়াছে। তোমার নাম আফিসে লেখা হইয়াছে Chackraburty, কিন্তু ভলাণ্টিয়ার দলে লেখাইয়াছ Chackar-batty. এই কথা লইয়া কাপ্তান রেণীর সঙ্গে আমাদের ইনস্পেক্টর জেনারাল সাহেবের সঙ্গে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। ভলাণ্টিয়ার দলে তুমি নামের স্পেলিং বদলানের জন্য তোমাকে কমিশারিয়াট অফিসার বরখাস্ত করিয়াছেন। এবং সেই কারণেই আমাদের সাহেবও তোমার নাম কাটিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই জানি, এরূপ গোলযোগ হইবে এবং একটু সামান্য ছুতা পাইলেই তোমাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে। আমি তোমার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা হইল, তজ্জন্য বড় দুঃখিত হইলাম। আমার ভলাণ্টিয়ার দল হইতে নাম কাটিতে এক্তার আছে, কিন্তু এই সামান্য অজুহাতে যে তোমাকে চাকরি হইতে ডিস্‌মিশ্‌ করা হইল, এ বড় অবিচার হইয়াছে।" এই সামান্য

discrepanceএর জন্য তোমাকে দুইচারি টাকা ফাইন্ করিলেই যথেষ্ট হইত।”

আমি সার্জ্জেণ্ট কেরীকে কহিলাম যে,আমি যে খুব একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, তাহা নহে। কারণ আমাদের বঙ্গদেশে আপন নামের উপাধি সকল নানা ভাবে লিখিত হইয়া থাকে। যেমন বন্দ্যোপাধ্যায় একটা নাম, তাহা বানার্জ্জি, বোনার্জ্জি এবং বানুরজী, এই প্রকারে লিখিত হইয়া থাকে। যেমন বন্দ্যোপাধ্যায় নামটী খাঁটি গোঁড়া ধরণের নাম, সেই মত আমার নাম-টীও গোঁড়া ধরণে লিখিত হইয়া চক্রবর্ত্তী লিখিত হয়, কিন্তু তাহা না লিখিয়া অনেকে চাকারবটি কি চাকার-বেটী প্রভৃতি ধরণে লিখিয়া থাকেন। তাহাতে কোন মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা হয় না। যাহা হউক,আমি চাকরি হইতে ডিস্‌মিশ্ হই-য়াছি, সেজন্য আমার দুঃখ নাই—কারণ এই চাকরি অধিক দিন করিবার ইচ্ছাও ছিল না। আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। সার্জ্জেণ্ট কেরি কহিল যে, আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। যে কোন প্রকারে তোমাকে আফিস হইতে ও ভলাণ্টিয়ারের দল হইতে তাড়ানই উদ্দেশ্য, তাহা তাহাদের সিদ্ধ হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার ভলাণ্টিয়ারদিগের মধ্যে যত ভিরিঙ্গি আছে, তাহাদের কেহ কেহ আদবেই ইউরোপিয়ান নহে, তাহারা সমস্ত নেটিব খ্রীষ্টিয়ান। ইউরোপীয় নাম তাহারা গ্রহণ করিয়া ইউরোপীয়ান সাজিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই পারিয়া কছমের নিম্ন জাতীয় লোক। অনেকে ইউরোপীয়ানদিগের কবরখানায় গিয়া তথা হইতে কোন নাম নকল করিয়া আনিয়া নিজের নাম গ্রহণ করে এবং আপন পূর্ব্ব পুরুষের পরিচয় দেয়। ইহাদের অপেক্ষা তুমি শত গুণে শ্রেষ্ঠ। সার্জ্জেণ্টের সহানুভূতিতে আমার মনে অনেক শান্তি হইল। কেরীর মেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া খবরটা জানাইলাম। তিনি বড় দুঃখিত হইলেন এবং ষড়যন্ত্রকারিদিগকে এবং কমিশারিয়াট অফিসরকে অভিসম্পাৎ করিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম।

পর দিন আফিসে গিয়া চার্জ্জ দিয়া বেতনের টাকা লইয়া বাসায় আসিলাম। আমার দাসত্বশৃঙ্খল আজ হইতে মুক্ত হইল। বাসায় বসিয়া নানা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম। একবার মন বলিল যে, বাঙ্গালী বাবুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া কমপট্রোলার আফিসে একটী চাকরির চেষ্টা করি, কিন্তু মনে মনে বড় ঘৃণা বোধ হইল, চাকরির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল।
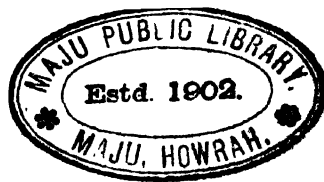
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মাণ্ডালয়ে যাত্রা।

ইংরেজ ও ট্যাঁশ ফিরিঙ্গিদিগের ব্যবহারে মনে বড় আঘাত লাগিল, মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে, আর ইংরেজের চাকরি করব না, ইংরেজের সংশ্রবে থাকিব না, এমন কি, ইংরেজের এলাকায়ও আর বাস করিব না। কারণ ইংরেজাধিকারে যেখানেই যাই, সেই খানেই বাঙ্গালীর প্রতি ঘৃণা, বাঙ্গালী কাপুরুষ, সে যুদ্ধ করিতে পারে না, সে যখম করিতে পারে না, সে মরিতে ও মারিতে পারে না, তাই কি বাঙ্গালীর প্রতি এত নিগ্রহ! বাঙ্গালী শান্তিপ্রিয় ও রাজভক্ত প্রজা! তাহাই কি বাঙ্গালীর অপরাধ, তাহাতেই কি বাঙ্গালীর প্রতি অবজ্ঞা? বাঙ্গালী যদি মারিতে ও মরিতে জানিত, তাহা হইলে বুঝি ইংরাজের কাছে সে সম্মান লাভ করিত। মনে মনে এই সকল বিষয় আন্দোলন করিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে সময় সময় অস্থির হইতে লাগিলাম। আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আমি ইংরেজকে দেখাইব যে, বাঙ্গালীর মধ্যে এমন লোক এখনও আছে যে, মরিতে বা মারিতে পারে।

মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, মাণ্ডালয়ে যাইব এবং ব্রহ্মরাজের অধীনস্থ রাজ্যে বাস করিব এবং তথায় স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে মনের সাধে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিব। সেখান আর নেটিব বলিয়া কেহ ঘৃণা করিবে না। আমার মাণ্ডালয়ে যাওয়ার কথা আমার প্রথম আশ্রয়দাতা নবীনচন্দ্র দেকে কহিলাম, সে আমাকে মাণ্ডালয়ে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল। সে বলিল "সেখানে ভয়ানক অরাজকতা, চোর ডাকাইতের ভয়, বে-আইন দেশ, তথায় গেলে হয়ত কোন মগ ডাকাতের হাতে আপনার প্রাণটা যাবে। সে আরো বলিল যে "যদি রেঙ্গুনে চাকরির কোন সুবিধা করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমার সঙ্গে থাকিয়া দুধ দইয়ের কারবার করুন।" আমার প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম এবং আমি যে নিশ্চয়ই মাণ্ডালয়ে যাইব, তাহা বলিলাম এবং আরো বলিলাম যে "আমার পক্ষে দুধ দই বেচা কেনা পোষাইবে না।"

তখনও সদাগরি-ষ্টিমার এবং যাত্রী-ষ্টিমার রেঙ্গুন হইতে থায়াটমিউ এবং তথা হইতে মাণ্ডালয়ে যাতয়াত করিত। একখানা সদাগরি ষ্টীমার মাণ্ডালয়ে যাইবে। আমি তাহার খোঁজ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার ট্রাঙ্কটী ও বিছানা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। যাত্রীগণের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না, কয়েক জন যুবতী মুসলমান, কয়েকজন জেরবাদী মুসলমান, কতকগুলি বর্ম্মা ও চীনা-যাত্রী। কোন ইউরোপীয় যাত্রী ছিল না। ষ্টীমার রেঙ্গুনের জেটী ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখে চলিল। পাঠকগণের অবগতার্থে অতি সংক্ষেপে রেঙ্গুন হইতে মাণ্ডালয়ের-পথ বর্ণনা করিব। আমরা রেঙ্গুন ছাড়িয়া রেঙ্গুনের খাড়ি দিয়া ডাডাইয়ার খাড়িতে পতিত হইলাম, তাহা অতিক্রম করিয়া মবিনের নদীতে উপস্থিত হইলাম। মবিন নদীর ধারে মবিন নামক সহরে আমরা এক রাত্রি বাস করিলাম। পরদিন উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ইরাবতী নদীর দক্ষিণ পারে ইয়াস্তন নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে তুলা ধান রাই মটর প্রভৃতির কারবার হইয়া থাকে।

ইয়াস্তন পরিত্যাগ করিয়া আমরা ডানুবিউ নামক প্রসিদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইলাম। প্রথম বর্ম্মাযুদ্ধের সময় তাৎকালীন ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ মহাযোদ্ধা মহাবন্ধুলা এই স্থানে নিহত হন। ইংরেজ সৈন্য ডানুবিউর দুর্গ আক্রমণ করিয়া দশদিন যাবত ক্রমাগত তোপ চালাইয়াছিল, এবং মহাবীর মহাবন্ধুলা অতি তেজের সহিত দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দশম দিবসে তিনি তোপাঘাতে নিহত হইলে দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হয়।

ডানুবিউ হইতে আমরা ছেনজাতা এবং তথা হইতে প্রোমে উপস্থিত হইলাম। তৎকাল রেঙ্গুন হইতে প্রোম পর্য্যন্ত রেলওয়ে দিয়া এবং প্রোম হইতে তৎকালীন ব্রিটিশ বর্ম্মার সীমা থায়াটমিউ নামক সহরে পৌঁছিলাম। ইংরেজ-বাহিনীর সঙ্গে কমিশারিয়াট বিভাগের কতকগুলি বাঙ্গালী বাবু থায়াটমিউ আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মদেশী-পত্নী গ্রহণ করিয়া এখানে কিছুদিন সংসার পাতিয়াছিলেন্। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও থায়াটমিউ প্রভৃতি স্থানে আছে।

থায়াটমিউ হইতে ব্রহ্মরাজ্যের সীমান্ত প্রদেশস্থ মিনহ্লা নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে ব্রহ্মদেশী একটী প্রধান দুর্গ ছিল। এই দুর্গটী পাহাড়ের উপর। মিনহ্লা হইতে আমরা মিন্‌বু নামক প্রসিদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত প্রদেশের একজন গবর্ণরের বাসস্থান ছিল। মিন্-

বুর অপর পারে মাগোয়ে নামক সহর। মিনবু হইতে আমরা পাগানে নামক প্রাচীন কীর্ত্তিময় স্থানে উপস্থিত হইলাম। এইস্থান প্রাচীন মঠ মন্দিরে পূর্ণ। এখানে প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তিরও অনেক নমুনা আছে এবং প্রাচীন কালে অনেক হিন্দু নামধারী নরপতি এখানে রাজত্ব করিতেন। এখান হইতে পোখোকু উপস্থিত হইলাম। পোখোকু হইতে মিনজান, তথা হইতে স্যাগাইন এবং স্যাগাইন হইতে ৪।৫ মাইল দূরে মাণ্ডালয় সহর।

মাণ্ডালয় সহর।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে বৎসর ভারতবর্ষে মিউটিনী হয়, সেই বৎসর রাজা থিবর পিতা মিন্তনমিন্ বর্ত্তমান মাণ্ডালয় নগর স্থাপিত করেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্ম-রাজ্যের রাজধানী অমরাপুর নামক স্থানে ছিল। এই অমরাপুর নগর মাণ্ডালয় হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে ইরাবতী নদীর বামধারে এবং স্যাগাইন সহরের অপর পারে অবস্থিত। মাণ্ডালয় রাজকীয় নগরটী বর্গক্ষেত্রাকৃতি পাকা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই নগরের এক এক প্রাচীর প্রায় সওয়া মাইল দীর্ঘ।" প্রাচীর গুলি ২৫ ফুট উচ্চে এবং সাড়ে তিন ফুট বেধবিশিষ্ট। এই পাকা প্রাচীর সকলকে সুদৃঢ় করিবার জন্য ভিতর গাত্রে ২৫ পঁচিশ ফুট প্রশস্ত এবং ২২ ফুট উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্ত নগরটীতে ১২টি দরজা অর্থাৎ এক এক প্রাচীর গাত্রে তিনটি করিয়া বড় বড় দরজা আছে। প্রাচীরের উপরে বড় বড় খাঁচ কাটা এবং বন্দুক চালাইবার জন্য প্রাচীরগাত্রে ছিদ্র সকল আছে। ইহা ভিন্ন ১৭৮ ফুট অন্তরই প্রাচীর গাত্রে পাকাস্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হইয়া যুদ্ধকার্য্যের উপযোগী করিয়া সুদৃঢ় করা হইয়াছে। প্রত্যেক দরজার উপর মান-মন্দির সদৃশ সপ্ততল বিশিষ্ট, সেগুণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুন্দর "কয়া-থাট" সকল নির্ম্মিত রহিয়াছে। প্রাচীর-গাত্র হইতে ৬০ ফুট দূরে সমান্তরালভাবে চতুর্দ্দিক বেষ্টিয়া পরিখা খনিত হইয়াছে। ঐ পরিখা সকল ১০০ ফুট প্রশস্ত এবং ১৪ ফুট গভীর। এই পরিখা সকলের উপর মাত্র পাঁচটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চিমদিকে দুইটী, অপর এক এক দিকে একটী করিয়া সেতু। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজকীয় নগর-প্রাচীর সকল বন্ধ করা হইয়া থাকে। এবং উচ্চ পদ কর্ম্মচারী ইহা রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকে। নগর-প্রাচীরের মধ্যের রাস্তাগুলি পরস্পর সমান্তরালভাবে নির্ম্মিত। এবং ঐ সকল রাস্তার প্রধান প্রধান গুলি এক দরজা হইতে অপর

দরজা পর্য্যন্ত সরলভাবে পৌঁছিয়াছে। এবং একে অন্যকে সমকোণে কর্ত্তিত করিয়াছে। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে রাজপুরী, সেই পুরী উচ্চ সেগুন কাষ্ঠময় খুঁটি সকল দ্বারা নির্ম্মিত প্রাচীর-বেষ্টিত। এই নগরের বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণকে জানাইবার বাঞ্ছা থাকিলেও স্থানাভাব বশতঃ সে আশা পূর্ণ হইল না।* রাজকীয় নগরের বাহিরের সহরটী অতি বিস্তৃত এবং তাহার রাস্তাগুলি অতি প্রশস্ত। অধিবাসীদিগের অধিকাংশই বর্ম্মা, চীন, সান, অল্প সংখ্যক ভারতবাসী, ও জেরবাদী মুসলমান, এবং অল্প কয়েক জন বিদেশী রাজদূত ও ভ্রমণকারিগণ ছিলেন। এই সময়ে এখানে ব্রিটিশ রেজিসেণ্ট ছিলেন না, কিন্তু ফ্রেঞ্চ ও ইটালি রেসিডেণ্ট এখানে ছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মণিপুরী সঙ্গ।

আমি তখন দুই চারিটী শব্দ ভিন্ন বর্ম্মা কথা আদবেই জানিতাম না। ষ্টীমারে আসিবার সময় একজন ইংরেজী জানা বর্ম্মা ভদ্রলোকের সঙ্গে সর্ব্বদা আলাপ করিয়া দেশের হাল অনেকটা অবগত হইলাম। সুরতি ভদ্র লোকদিগের সঙ্গে আমার বেশ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। মাণ্ডালয়ে নামিয়া তাঁহাদের সঙ্গেই তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইলাম এবং সে রাত্রি তথায়ই কাটাইলাম। মাণ্ডালয়ে আসিয়া দেখি, সকলই নূতন, সকলই আশ্চর্য্য এবং সকলই অপরিচিত। সারারাত্রি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, "রাগ করিয়া ইংরেজের রাজ্যে থাকিব না মনে করিয়া মাণ্ডালয়ে আসিলাম, কিন্তু এখানে কি ভাবে কত দিন থাকিব ? দেশের ভাষা জানিনা, পরিচিত লোক নাই, কাহার আশ্রয়ে থাকিব ? এই সুরতিদিগের নিকট কত দিন থাকিব, জীবনের যে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডালয়ে আসিলাম, তাহা পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখিনা, বর্ম্মারাজার সৈন্য দলে ভর্ত্তি হইবার উপায় কি ?" এই সকল চিন্তা করিতে করিতে ভোরে একটু নিদ্রাবেশ হইল, এবং

---

* আমার প্রণীত ব্রহ্মপর্য্যটন নামে গ্রন্থে এই নগর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, হঠাৎ জাগিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, রাস্তার উপর পায়চারি করিতেছি এবং চিন্তা করিতেছি, এমন সময় রাস্তা দিয়া একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছেন, হঠাৎ নজর পড়িল। ব্রাহ্মণটীর বয়স প্রায় ষাট বৎসর, মাথায় ঝুটি বাঁধা, তাহার চারি পাশ বেষ্টিয়া এক খণ্ড শ্বেত বস্ত্র দ্বারা বর্ম্মাদিগের ধরণে উষ্ণীষ বাঁধা, পরিধানে কাছাশূন্য এক খণ্ড শ্বেত বস্ত্র, কপালে লম্বা তীলক, গলায় মোটা কাঠের মালা ও উপবীত, পায়ে খড়মের মত এক প্রকার চটি জুতা। আমি সুন্দর মগের মুলুকে হঠাৎ ব্রাহ্মণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম "ইনি কে ?" ইহার পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম। আমি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণের ধরণে নমস্কার করিয়া খাস বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহার নাম কি এবং তিনি কোথায় থাকেন ? বৃদ্ধ আমার দিকে ফিরিয়া আমার প্রতি নজর করিয়া বুঝিলেন যে, আমি একজন হিন্দু। তিনি বাঙ্গালা কথা দু চারটা জানেন, কিন্তু বলিতে পারেন না। হিন্দি কথা মোটামোটি বলিতে পারেন, তিনি আমার বাঙ্গালা কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন "টোম্ হিন্দু হ্যায়, টোমরা নাম ক্যা হ্যায় ?"

আমি বলিলাম—"আমার নাম কুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।" বৃদ্ধ—(আশ্চর্য্যান্বিত হইল) "চক্রবর্ত্তী ! টোম্ ব্রাহমন হ্যায় ?"

আমি—হাঁ, ঠাকুরজি, হাম ব্রাহ্মণ হ্যায়।

বৃদ্ধ—আগ্রহান্বিত হইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সংক্ষেপে আমার বংশের পরিচয় দিলাম, বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় জানাইলাম, এবং অবশেষে রেঙ্গুনের চাকরি এবং কিভাবে সে চাকরি গেল, সমস্ত কথা বলিলাম। বৃদ্ধের মুখের ভাবে বোধ হইল, তিনি আমার পরিচয় পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ পাইল। কিন্তু পরক্ষণই তাঁহার মুখটায় যেন একটু মলিন ভাব দেখা গেল। আমার বোধ হইল, তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি আসল ব্রাহ্মণ কি জাল ব্রাহ্মণ। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোন্ বেদ ?"

আমি—শাম বেদ।

বৃদ্ধ—কার বংশ ?

আমি—কালিদাসের বংশ।

বৃদ্ধ—কার ধারা?

আমি—নরোত্তমের ধারা।

বৃদ্ধ—কোন্ গাঁই।

আমি—মৈত্র গাঁই।

বৃদ্ধ—কোন্ শাখা?

আমি—কুতুম শাখা।

আমার বংশের বিশেষ পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধের মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ জাল বামন এ সকল সচরাচর জানিতে পারে না। বাঙ্গালী বামনের যে পরিচয় ইনি ভাল জানেন, তাহা বেশ বোধ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোথায় আছি? আমি বলিলাম "গত কল্য মাণ্ডালয়ে পৌঁছিয়াছি এবং সম্প্রতি সুরতিদিগের দোকানে আছি।" আমি মুসলমানের দোকানে আছি বলিয়া তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "ছি! ব্রাহ্মণের ছেলের কি মুসলমানের দোকানে থাকা কর্ত্তব্য। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমার বাড়ীতে থাকতে পারবে।"

বৃদ্ধের সাদর আহ্বানে আমিও আহ্লাদিত হইলাম। একজন কুলি ডাকিয়া বিছানাটা ও তোরঙ্গটা আনাইলাম এবং সুরতি ভদ্রলোকদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তথা হইতে বিদায় হইলাম এবং বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। যাইতে যাইতে এক রাস্তা অতিক্রম করিয়া অপর রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া অর্দ্ধ মাইল পথ চলিয়া বৃদ্ধের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

বৃদ্ধের বাড়ীতে একখানি খুব বড় কাষ্ঠময় দ্বিতল গৃহ। উপরের মধ্য কক্ষটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেইটি বৈঠকখানা ও সদরকক্ষ। তাহার দুই প্রান্তে চারিটী কক্ষে বিভক্ত। নিম্নভাগে দুইটী গাই এবং একটী ঘোড়া থাকে এবং অন্যান্য সাংসারিক কার্য্যের উপযোগী বাজে দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। রন্ধনকার্য্যটীও নিম্নে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে হয়। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী তুলসীগাছ যত্নে রক্ষিত। রন্ধনশালার নিকট আর একখানি ক্ষুদ্র গৃহে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত।

বৃদ্ধের সঙ্গে উপরে বসিলাম এবং হিন্দিতে দুইচার কথা আলাপ হইতে লাগিল। আমাকে দেখিয়া সকল লোক কৌতুহল-বিশিষ্ট হইয়া আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং বৃদ্ধের সঙ্গে এক অবোধ্য ভাষায় তাহাদের পরস্পর, সম্ভবত আমার বিষয়ে, আলোচনা হইতে লাগিল। আমি বর্ম্মা বা তাহাদের

ভাষা জানি না, তাহারাও আমার বাঙ্গালা বা ইংরেজি, কি হিন্দি কথা জানে না। বিশ্বম্ভর শর্ম্মা তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের নিকট আমাকে পরিচয় করিয়া দিলেন।

বেলা প্রায় এগারটা বাজে, এমন সময় আমাকে স্নান করিবার অনুরোধ করা হইল। আমি একটু তৈল মাখিয়া কূপোদকে স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ক্ষণকাল একটু সন্ধ্যা-গায়ত্রীর ভাণ করিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলাম এবং আমার আহারের জন্য যে স্বতন্ত্র একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তথায় গিয়া আহার করিলাম। সমস্তই নিরামিষ, ইহারা মাছ মাংস খান না।

সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইল বৃদ্ধের পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম এবং তাহার সঙ্গে হিন্দিতে আলাপ করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দির সাহায্যে যতদূর জানিতে পারিলাম, তাহার মর্ম্ম পাঠকগণের অবগত্যার্থ নিম্নে উল্লেখ করিলাম ঃ—

"আমাদের আদি বাড়ী ছিল মণিপুরে। একশত বৎসর প্রায় অতীত হইল, ব্রহ্মদেশের রাজা সিন-বিউ-শিন মণিপুর আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। মণিপুরীগণের সঙ্গে বর্ম্মাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বহু শত মণিপুরী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে। মণিপুরের রাজপরিবারের সঙ্গে রাজ্যের কোন কোন লোকের শত্রুতা থাকায়ও তাহারা গোপনে মগ-সৈন্যের সহায়তা করায়, মণিপুরের এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। মণিপুরী-সৈন্য পরাভূত হইলে মগেরা মণিপুর রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করে। আমার পিতামহেরা চারি ভাই ছিলেন, তাঁহাদের তিন ভাই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাণ। আমার পিতামহ মগসৈন্যের হস্তে বন্দী হইলেন। আরো বহু মণিপুরী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণ সপরিবারে বর্ম্মাদের হস্তে বন্দী হইয়া ব্রহ্মদেশে কয়েদীরূপে নীত হইলেন। এই সকল যুদ্ধের কয়েদীদিগকে সপরিবারে আনিয়া আজীবনের তরে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে প্রথমতঃ অমরাপুরে আনিয়া রাখা হয়। কারণ তখন অমরাপুরেই ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। মিন্ডনমিন্ মাণ্ডালয়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলে আমরাও সেইসঙ্গে মাণ্ডালয়ে আসিয়া বাস করিতেছি। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রথম প্রথম বর্ম্মাদিগের হাতে বড় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনেক পুরুষ রমণী-দিগকে ক্রীত দাস দাসীর ন্যায় রাজপুরীতে জোর পূর্ব্বক রাখা হইত। কিন্তু কালের গতিতে ব্রহ্মবাসীদিগের আমাদের উপর কৃপা-নজর পড়িতে লাগিল এবং

অত্যাচার অবিচারের মাত্রাও ক্রমে কমিয়া আসিল। তাহার কারণ মণিপুরী-গণ যুদ্ধপ্রিয় লোক এবং অশ্বচালনায় তাহারা অতি দক্ষ। তাই মণিপুরীদিগকে অশ্বারোহী সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হইতে লাগিল। এখন ব্রহ্মরাজার যত অশ্বা-রোহী সৈন্য আছে, তাহার অধিকাংশই মণিপুরী। মণিপুরীদিগকে বর্ম্মারা "কাথে" বলিয়া ডাকিত, কিন্তু মণিপুরী ব্রাহ্মণদিগকে পৌনা আখ্যায় অভিহিত করে।

"আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, মৎস মাংস্য আমরা আহার করি না। ব্রহ্মদেশে তিন চারি পুরুষ যাবত বাস করিয়া আমরা অনেকটা বর্ম্মা-দিগের মত হইয়া পড়িয়াছি। স্বদেশে মণিপুরীদিগের যত জাতীয় গোঁড়ামী, এখানকার মণিপুরীদিগের তাহা নাই। আমরা মণিপুরী ভাষা, হিন্দুধর্ম্ম ও যুদ্ধ-প্রিয়তা, এই তিনটী স্বজাতীয় ভাব অদ্যাপিও রক্ষা করিতে পারিয়াছি। কালে আমাদের বংশধরগণের কি দশা হইবে, জানি না। আমার বোধ হয়, আর এক শত বৎসরে মণিপুরী ও বর্ম্মায় বড় ভেদ থাকিবে না।

মণিপুরীদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়গণই যুদ্ধপ্রিয় এবং যুদ্ধই তাহাদের ব্যবসা। আমরা ব্রাহ্মণ হইলেও প্রপিতামহের আমল হইতে যুদ্ধব্যবসা করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তাহা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, কিন্তু এই মাণ্ডালয়েই পৌনা ব্রাহ্মণের অনেকে যুদ্ধব্যবসা কোন দিনই করে না।"

বৃদ্ধকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি হিন্দি কথা কোথায় শিখিলেন? তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি রেঙ্গুন হইয়া কলিকাতা কাশী গয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। সেই সময় হিন্দি কথা কিছু শিখিয়া-ছিলাম।"

বিশ্বম্ভর শর্ম্মার পরিচয় পাইয়া মনে মনে বড় আনন্দ হইল। এবং ভাবিলাম, আমার বাসনা সিদ্ধির পথে আসিয়া ঘটনাক্রমে উপস্থিত হইলাম। "ইচ্ছা থাকিলেই একটা না একটা উপায় আসিয়া জুটে" এই মহা সত্য কথার প্রমাণ হাতে হাতে পাইলাম।

বৃদ্ধের তিন পুত্র এবং একটী কন্যা। তাঁহার দুই পুত্র রাজকীয় সৈন্য বিভাগে অশ্বারোহী সৈন্য দলভুক্ত, তৃতীয় পুত্র সাংসারিক কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করে। বিশ্বম্ভর শর্ম্মার কন্যাটীর নাম ধর্ম্ম দেবী, বয়স ১৭ বৎসর, এখনও কুমারী। ধর্ম্ম দেবীর পোষাক বর্ম্মিণীদিগের পোষাকের মত। গায়ে এঞ্জি, পরিধানে থামেন, পায়ে ফালা, গলায় রেশমী পোয়া। হিন্দু রমণীর মত মাথার

পশ্চাতে, খোঁপার পরিবর্ত্তে, মাথার মধ্যস্থলে এক দোল ভিঁটি সদৃশ এক খোঁপা রক্ষিত হইয়া তাহাতে চিরুণি ও নানা ফুল গুঁজিয়া রাখিয়াছে। তাহার মাতার ও ভ্রাতৃবধূগণের পোষাকও তাদৃশ।

বিশ্বম্ভর শর্ম্মা দয়া করিয়া আমাকে অনির্দ্দিষ্টভাবে তাঁহার বাটীতে থাকিতে অনুমতি করিলেন। আমিও মহানন্দে তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিলাম। তিনি আমাকে শীঘ্র২ বর্ম্মাভাষা শিক্ষা করিতে কহিলেন এবং বলিলেন যে, বর্ম্মা কথা শিক্ষা করিলে, তিনি রাজ সরকারে একটা চাকরির চেষ্টা করিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন যে, আমরা সর্ব্বদা নানা কাজে ব্যস্ততা বিধায় বাড়ীতে থাকিতে পারি না। তুমি ধর্ম্ম দেবীর নিকট প্রত্যহ বর্ম্মা কথা শিক্ষা করিতে আরম্ভ কর। ধর্ম্ম দেবীকেও তিনি এই কথা বলিলেন। সে আহ্লাদের সহিত স্বীকৃতা হইল।

আমি ইঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া, ইঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য প্রথম গরুটা, ঘোড়াটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, হাট বাজারটা কখন২ করিতে আরম্ভ করিলাম, কিছু দিন মধ্যেই সকলেরই কৃপা দৃষ্টি আমার উপর পড়িল, আমার সৎস্বভাব, কষ্টসহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম গুণে সকলে যেন আমাকে তাহাদের পরিবারের একজন মধ্যে গণ্য করিয়া লইল। আমার প্রতি ধর্ম্ম দেবীর সংকোচটা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার প্রতি আমার সংকোচ সহসা হ্রাস হইল না। তাহার কারণ, আমরা বঙ্গদেশের লোক, কোন ভদ্র পরিবারের যুবতী কন্যা বা বধূদিগের সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ করিতে অভ্যস্ত নই। প্রথম২ তাহার চখের মুখের প্রতি তাকাইয়া কথা বলিতে লজ্জা বোধ হইত, সে যখন কোন কথা বলিত বা জিজ্ঞাসা করিত, তখন আমি মাথা নোয়াইয়া তাহার সঙ্গে কথা শুনিতাম এবং মনে মনে শঙ্কা হইত, পাছে বুঝি কেহ দেখিল যে, আমি তাহার সহিত কথা বলিতেছি, পাছে কেহবা আমার ব্যবহারে সন্দেহ করে, সর্ব্বদাই এই কথা মনে আন্দোলন হইত। ধর্ম্মদেবী আমাকে নিকটে যাইতে ডাকিলে আমি দূরে দাঁড়াইতাম। সে আমার ব্যবহার দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইত এবং একদিন তাহার পিতা [illegible] আমার লাজুক স্বভাবটার কথা বলিয়া ফেলিল। তাহাতে বৃদ্ধ আমাকে অভয়দান করিয়া কহিলেন, তুমি কোন সংকোচ করিবা না। আপন বাড়ীর মত 'আপন মা ভগ্নীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার কর, আমার স্ত্রী ও কন্যাদিগের প্রতি সেই ব্যবহার করিও। এ তোমার

বাঙ্গালা দেশ নয়, যেখানে স্ত্রীলোকগণ মুখ ঢাকিয়া থাকে এবং অপর পুরুষ দেখিলে কাঁপিয়া অস্থির হয়। বাস্তবিকই আমার এ অনর্থক বিড়ম্বনা, ব্রহ্মদেশে যুবক যুবতীগণ পরস্পরের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে কথা বলিয়া থাকে, এবং হাঁসি কৌতুক পর্য্যন্ত করে, তাহাতে তাহাদের সমাজে নিন্দা হয় না। এবং এদেশী স্ত্রী পুরুষের অন্তঃকরণও এত সঙ্কীর্ণ নহে যে, একজন অন্যের সঙ্গে কি কথা কহিবে, তাহার নিন্দাবাদ করে। বাস্তবিক আমার প্রতি ধর্ম্মদেবীর অভিযোগে বড় লজ্জা পাইলাম। বৃদ্ধের কথায় সাহস হইল। তবে চিরন্তন জাতীয় প্রকৃতিটী সহসা পরিবর্ত্তিত না হইয়া আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল।

বিশ্বম্বর শর্ম্মার পরিবারের
ব্যক্তিবর্গের নামের পরিচয়।

বিশ্বম্বর শর্ম্মার প্রথম পুত্রের নাম বিষ্ণুরাম শর্ম্মা, বয়স ৩০ বৎসর, দ্বিতীয় পুত্রের নাম হরিরাম শর্ম্মা, বয়স ২৬ বৎসর। তৃতীয় পুত্রের নাম কানাই রাম শর্ম্মা, বয়স ২০ বৎসর। ধর্ম্মদেবী সকলের ছোট, বয়স ১৭ বৎসর।

বিশ্বম্বরের স্ত্রীর নাম মায়াদেবী এবং দুই পুত্রবধূদিগের নাম যথাক্রমে ইন্দিরা দেবী ও কমলা দেবী।

ইহাদের সকলেরই বর্ম্মানাম আছে এবং বর্ম্মা মহলে সেই সেই নামেই ইহারা পরিচিত। বর্ম্মারা হিন্দু নাম জানে না। *

বিশ্বম্বর শর্ম্মা	উ তা ম
বিষ্ণুরাম শর্ম্মা	মং বা
হরিরাম শর্ম্মা	মং পোনিয়া
কানাইরাম শর্ম্মা	মাং তিন
মায়া দেবী	ড তে
ধর্ম্ম দেবী	মা মিয়া
ইন্দিরা দেবী	মা ডোয়ে
কমলা দেবী	মা কোয়া

এই অবস্থায় আমারও একটা নামের প্রয়োজন হইল। বর্ম্মা নাম থাকিলে ব্রহ্মদেশে আদর পাওয়া যায়, কেন না বিদেশী নাম বর্ম্মারা সহসা উচ্চারণ

* ব্রহ্মদেশী স্ত্রী পুরুষের নামের পরিচয় মৎপ্রণীত চীনদেশে সন্তান চুরী নামক প্রবন্ধের ২১ পৃষ্ঠা এবং স্ত্রীলোকের পোষাকের পরিচয় ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

করিতে পারে না। এই কারণ বশতঃ বিশ্বম্বর ঠাকুর আমার নাম রাখিলেন মং কালা। "কালা" শব্দের অর্থ বিদেশী * তাহার পূর্ব্বে একটা মং জুড়িয়া দিয়া দিব্যি বর্ম্মা নাম হইল। তাহা না হইলে কুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামটী উচ্চারণ করিতে হয়ত বর্ম্মাদিগের গলিত-ঘর্ম্ম হইত।

নাম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমার পোষাকেরও পবিবর্ত্তন করিতে হইল। পরিধানে লুঙ্গি, মাথায় রেসমী পোয়া, গায়ে বর্ম্মা এঞ্জি এবং পায়ে ফানা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া খাস বর্ম্মা সাজিয়া বসিলাম। এবং মাথায় চুল রাখ দিয়া বর্ম্মাদের চুলের মত লম্বা চুলের সৃষ্টি করিলাম।

ধর্ম্ম দেবী।

ধর্ম্ম দেবীর দেহটী নাতি খর্ব্ব নাতিদীর্ঘ, সুগঠিত ও গৌরবর্ণ। মুখের চেহারাটিতে আকর্ষণী শক্তি আছে। নাসিকাটী বর্ম্মিনীদিগেব নাকের ন্যায় চাপা নহে। চক্ষু দুইটী মৃগনয়নীও নহে, আবার তাহাকে গোলোচনী বলা যায় না, মাঝামাঝি গোছের। ভ্রূযুগল ঈষৎ বক্র, তাহা মসি দ্বারা কৃষ্ণ বর্ণে পরিণত করিয়া রাখা হয়। মুখ-গহ্বব মধ্যমাকার, ওষ্ঠ দুইখানি পাতলা ও গোলাপী রং বিশিষ্ট। গণ্ডদেশ পরিপুষ্ট,ললাট প্রশস্ত, কিন্তু জুলপী কাটা চুলেব দ্বারা তাহা প্রায় অর্দ্ধাবৃত্ত ভাবে থাকে। মাথার কেশদাম ছাড়িয়া দিলে নিতম্ব দেশ ছাড়িয়া নিম্নে পতিত হয়। বাহুদ্বয় গোলাকাব। কোমর তাদৃশ সরুও নহে, আবার অধিক মোটাও নহে,হাতে দুই গাছা সোণার বালা,কাণে সোণার উপর রুবি পাথর বসান দুইটী পাশা, হাতে রুবিব আংটি। এদেশেব রমণীগণ ভারতীয় রমণীগণের মত নাক ছিদ্র করে না এবং কোমরে, বাহুতে বা পায়ে কোন অলঙ্কার পরিধান করে না।

ধর্ম্ম দেবীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যেব উপর যখন সে ফুলদার বেসমী আমেন পরিয়া, গায়ে সাটিনের জামা আঁটিয়া, মাথার উপর কেশ গুচ্ছ দোলমঞ্চেব মত স্থাপন করিয়া তাহাতে একখানি হাড়ের চিরুণী গুজিয়া, তাহার পার্শ্বে নানা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক ফুল সকল আবদ্ধ করিয়া মুখে তানাখা নামক সুভ্র লেপন লেপিয়া গলায় পশমী রুমাল ঝুলাইয়া এবং মকমল-মণ্ডিত বর্ম্মা ফানা পায় দিয়া দাঁড়ায়, তখন এমন যুবক কে আছে, যার মন তাহার দিকে আকৃষ্ট না হয়?

---

* এই "কালা" শব্দের বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "চীনদেশে সন্তান চুরি" নামক গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠাব দ্রষ্টব্য।

তাহার স্বভাবটী কতকটা চঞ্চল এবং আমার নিকট কিছু বাচালতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু অন্তঃকরণটী সরল ও খাঁটি, তাহার পরিচয় পাইলাম। মণিপুরী বালিকারা অনেকেই ছোট বেলা অর্থাৎ দশ হইতে পনর ষোল বা ততোধিক বয়স পর্য্যন্ত নৃত্য গীতের ব্যবসা করিয়া থাকে। বয়স হইলে বিবাহ হইবার পর হইতে তাহারা আর সে ব্যবসা করে না। কিন্তু বিশ্বম্বর শর্ম্মা ধর্ম্ম দেবীকে সে সংশ্রবে যাইতে দেন নাই। ধর্ম্ম দেবী বর্ম্মা ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারে।

আমার বর্ম্মা ভাষা শিক্ষা।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিশ্বম্বর শর্ম্মা ধর্ম্ম দেবীকে আমাকে বর্ম্মার ভাষা শিক্ষা দিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। কারণ পুরুষগণ প্রায় সর্ব্বদাই কার্য্যান্তরে, বাটীতে থাকিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম দেবীই আমার প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইল। সেও বাঙ্গালা, ইংরাজী বা হিন্দি জানে না, আমিও মণিপুরী বা বর্ম্মা কথা জানি না। তবে এরূপ শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রের মধ্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কেমন করিয়া সম্ভবে? বাস্তবিকও প্রথম বড়ই কষ্ট বোধ হইত। সেও মনের ভাব খুলিয়া আমাকে বুঝাইতে পারে না, আমারও তথৈবচ। প্রথম কিছুদিন ইসারায় কথা চলিতে আরম্ভ হইল। যখন কোন কথা সে আমাকে ইসারা দ্বারাও বুঝাইতে পারে না বা আমিও বুঝি না, তখনকার সে কথা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্য মুলতবী থাকিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধও হিন্দি কথা ভাল জানে না, তবে "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামাই ভাল"। সকল কথা বিশ্বম্বর শর্ম্মাও খুলিয়া বুঝাইতে পারিতেন না। তবে "ধান খাই চাল খাই" করিয়া যাহা বলিতেন, তাহা হইতে একটা ভাব সংগ্রহ করিয়া লইতাম।

আমি একখানি নোট বুক লইয়া আমার বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি দ্রব্যের নাম লিখিয়া লইতে আরম্ভ করিলাম, পরে তাহার বর্ম্মা নাম কি, সেই সকল ধর্ম্ম দেবীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া বা সেই দ্রব্যটী তাহাকে দেখাইয়া তাহার বর্ম্মা নামটী লিখিয়া লইয়া মুখস্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। কেবল বিজাতীয় ভাষা প্রথম শিক্ষা করিবার সময় পদ গুলির প্রকৃত আওয়াজ যেন প্রথম কর্ণকুহরে ভাল মন প্রবেশ করে না, একটি শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে এবং মুখে বলিতে বলিতে, অভ্যাস করিতে করিতে শেষে তাহা আয়ত্ত হয়। বর্ম্মারা যখন কথা বলিত, প্রথম প্রথম তাহা আমার নিকট

যেন হাউ, মাউ, কাউ, শব্দের মত বোধ হইল। কিন্তু যখন ক্রমে অনেক গুলি শব্দের অর্থ বুঝিলাম, এক শব্দ হইতে অপর শব্দের পার্থক্য থাকাতে বেশ ধারণা হইতে লাগিল।

আবার বিজাতীয় ভাষার ঠিক শব্দের উচ্চারণ নিজ ভাষায় শুদ্ধ মত লেখা বড় কষ্ট কর। সেই উচ্চারণ কেবল কাণে শুনিয়া এবং মুখে বলিয়া অভ্যাস করা দরকার। ধর্ম্ম দেবীর নিকট হইতে যত বর্ম্ম কথা নোট বুকে লিখিয়া মুখস্ত করিতাম, তাহা যদি বিশ্বস্বর বা তাহার পুত্রদিগের নিকট আবৃত করিতাম, তাঁহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। শেষে সেই জিনিষটী বা বিষয়টী তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বা বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা সেই শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ বলিয়া দিতেন, তাহা আমার নোটবুকের লেখার সঙ্গে মিলিত না। তখন মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমার সমস্ত শ্রম পণ্ড হইল। তবে সে যে ধর্ম্ম দেবীর বলার দোষ, তাহা নহে, আমারই শোনার ও লিখিবার দোষ। কিরূপ অসুবিধা, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যেমন পাঁচটী শব্দ যথা—লে, লেয়ে, লেঃ, ল্ল, লঃ,। ইহার একটির অর্থ হাত, একটির অর্থ বাতাস, একটীর অর্থ জমি, একটীর অর্থ গরুগাড়ী এবং অপরটীর অর্থ নৌকা। সাধারণতঃ নূতন লোকের পক্ষে সকল গুলিরই প্রায় এক মত উচ্চারণ বোধ হয়। তবে বর্ম্মা কথা বাঙ্গালায় লেখা মাত্র সহজ, অন্য ভাষায় তাদৃশ সহজ নহে। কারণ বাঙ্গালা ভাষার অক্ষরে ও ফলা বানান দ্বারাই বাঙ্গালা দেশীয় ভাষার গঠন হইয়াছে। কিন্তু উচ্চারণ একেবারে উল্টিয়া গিয়াছে।

আমাকে বর্ম্মা ভাষা শিখাইবার জন্য ধর্ম্ম দেবীর বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল। সে এক কথা পাঁচ সাত বার করিয়া আমাকে আবৃত্তি করিয়া শিখাইতে আরম্ভ করিল। তবু সময় সময় কোন শব্দের বিপরীত উচ্চারণ করিয়া তাহার নিকট হাস্যাস্পদ হইতে লাগিলাম। সে কখন কখন তাহার সমবয়স্কদিগের নিকট আমার উচ্চারণের আলোচনা করিয়া বেশ কৌতুক করিত, এবং আমাকেও সেই ব্যঙ্গোচ্চারণ দ্বারা ঠাট্টা করিতেও ছাড়িত না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িল। ঢাকা অবস্থান কালে তথাকার মিডফোর্ট হস্পিট্যালের একজন ইংরেজ এপথিকারি হাউস সার্জ্জন ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার শিক্ষক যাহা বলিয়া দিতেন, তিনি নোটবুকে লিখিয়া তাহা শিক্ষা করিতেন। এই

ব্যক্তি নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণের চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি নর্ম্ম্যাল স্কুলে যাইবার পর ছাত্রগণ তাঁহাকে সেলাম করিলেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "অভিবাদন করিবার অভিলাষে" "পরিষ্কার" পরিষ্কার বলিয়া—তাহাদের প্রতি অভিবাদন করিবা মাত্রই ছাত্রগণ হাসিয়া উঠিল। তিনি ইহাতে নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন এবং ছাত্রেরা কেন হাসিল, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া বরাবর হাঁসপাতালে আসিয়া মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণ তখন তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া কহিল যে, পরিষ্কার শব্দের অর্থ neat and clean কিন্তু তাঁহার বলা উচিত ছিল নমস্কার। সাহেব নমস্কার শব্দটী ভুলিয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার বলিয়া ফেলিয়া উপহাসাস্পদ হইলেন।

আমার ভাগ্যেও এই প্রকার উপহাস যথেষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্ম দেবীর একান্ত আগ্রহ, আমার প্রতি বিশেষ যত্ন ও অমায়িক ব্যবহারে আমি এই সকল ভুল ভ্রান্তি ও কৌতুকে মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

এই ভাবে আমার মাণ্ডালে প্রায় ৬ মাস কাটিল, বর্ম্মাকথা অনেক আয়ত্ত হইয়াছে, মোটামোটি কথাবার্ত্তা অনেক বলিতে অভ্যাস হইয়াছে। ধর্ম্ম দেবীর আগ্রহ ও আকর্ষণটা যেন আমার প্রতি ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সে মাঝে মাঝে কৌতুক করিত এবং আমিও ভাঙ্গা ভাঙ্গা বর্ম্মা ভাষায় তাহার কৌতুকের জবাব দিতে আরম্ভ করিলাম।

এক দিন সে আড়ালে বসিয়া আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া এই বাঙ্গালা গানটী গাইতেছে। আমি তাহার সুমিষ্ট স্বরে, তাল মানে, এই গানটী গাহিতে শুনিয়া আশ্চর্য্যন্বিত হইলাম। মনে করিলাম, মগের মুলুকে এমন সুন্দর ভাবে বাঙ্গালা গান গাহিতে পারে, ইহা কখনও মনেও ভাবি নাই। বহু দিন পরে বাঙ্গালা গান শুনিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। ধর্ম্মদেবী এ গান কোথায় পাইল এবং কে তাহাকে এই গান শিখাইল, জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম।

"আয়লো অলী কুসুম তুলি ভরিয়ে ডালা"

বিশ্বম্বর শর্ম্মা বাটীতে আসিলে তাহাকে ধর্ম্মদেবীর বাঙ্গালা গান শিক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন যে, আমাদের প্রতিবেশী মণিপুরী বালিকারা নাচ গানের ব্যবসা করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের জাহাজের খালাসীরা যখন মাণ্ডালে আইসে, তখন তাহারা মাঝে মাঝে নাচ দিয়া থাকে।

তাহাদের ভুলাইয়া পয়সা লইবার জন্য রাঙ্গালী ওস্তাদের নিকট বাঙ্গালা গান ইহারা শিক্ষা করিয়াছে। ধর্ম্মদেবী সেই সকল বালিকাদিগের নিকট এই গান শিখিয়াছে। কথাটা মনে ধরিল বটে, কিন্তু ধর্ম্মদেবীর আমাকে শুনাইয়া এই গান গাহিবার কারণ কি? সে কি আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে? তাহার যে আমার প্রতি এত আগ্রহ, আমাকে বর্ম্মা ভাষা শিখাইবার জন্য এত যত্ন, সে কি তবে আমাকে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য? তবে কি সে আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? তাহার হাব ভাব, হাত নাড়া, ও আমার প্রতি কটাক্ষপাত, এসকল কি তাহার প্রেমের আভাস? এই সকল মনের মধ্যে সর্ব্বদা আলোড়িত হইতে লাগিল।

আমার এই যে সংযমী কঠিন প্রাণ, তাহাও যেন আস্তে আস্তে মনের অজ্ঞাতসারে জোয়ারের জলের ন্যায় আনন্দ-স্ফীত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। অথচ মনে মনে ভাবি, মন যেন খাঁটি আছে; প্রতিজ্ঞাও দৃঢ় আছে এবং জীবনের লক্ষ্যও ঠিক আছে। প্রথম কয়েক মাস মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু বর্ম্মাকথা যতই অভ্যাস হইতে লাগিল, ততই তাহার সঙ্গে কৌতুক করিতে করিতে আমারও যেন মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, ধর্ম্মদেবীর প্রতি আমার আকর্ষণটা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এ স্বভাবের নিয়ম। কেননা যুবক যুবতীদিগকে স্বাধীন ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে দিলে এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। শেষে এমন হইল যে, সেও আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারে না, আমার মনের গতিও তাদৃশ হইল যেন তার সঙ্গে দুটা কথা বল্‌তে পারিলে মনে মহানন্দ উপস্থিত হয়। মনে মনে ভাবিলাম যে, সাহেবদিগের কোর্টশিপ্-প্রণয় বুঝি এই রূপেই স্থাপিত হয়। পাঠকের স্মরণ আছে আমার মনের ভাব কেমন, যেন দিনাজপুরে সৌদামিনীর কথা প্রসঙ্গে যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছি, তাদৃশ হইল। তবে সৌদামিনী ছিল ছোট ছাত্রী, আমি ছিলাম পণ্ডিত, এখানে উল্টা ব্যবস্থা। এখানে ধর্ম্মদেবী পণ্ডিতা বা শিক্ষয়িত্রী, আমি হইলাম ছাত্র, তথায় ছিলাম ছাত্রাবস্থায়, এখানে আমি স্বাধীনাস্থায়। তথায় অপরিণত-বয়স্কা সৌদামিনীর আমার প্রতি খাঁটি সরল ভালবাসা, এখানে পূর্ণ যুবতীর "প্রেমরূপ" ভালবাসা! এই দুয়ের কত পার্থক্য! মনে মনে আশঙ্কা হইল, ধর্ম্ম দেবীর প্রেম-জালে জড়িত হইয়া একরূপ লক্ষচ্যুত হইতে চলিলাম। হায়! মানুষের প্রাণ কি এত দুর্ব্বল, সকল মানুষই কি আমার মত দুর্ব্বল? প্রেমের কি এমনই সম্মোহিনী শক্তি,

যাহাতে একবার ডুবিলে আর ভাসিয়া উঠা দায় হয়! এই সকল চিন্তা করিতে করিতে নিজকে নিজে কত ধিকার দিতে লাগিলাম। আমার চিত্ত-রাজ্যে আবার দেবাসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

যুদ্ধ শিক্ষা।

বিশ্বম্বর শর্ম্মার ও বিষ্ণুরাম শর্ম্মার সুপারিশে ও যোগাড়ে আমি বর্ম্মার রাজকীয় সৈন্যদলে ও অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হইলাম। বিষ্ণুরাম শর্ম্মার সঙ্গে আমি কুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রত্যহ কাওয়াত ক্ষেত্রে গমন করিয়া অশ্বারোহণ ও যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। দেশে থাকৃতে সামান্য ভাবে ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস ছিল। তবে বাঙ্গালা দেশী ঘোড়াগুলি ব্রহ্মদেশী ঘোড়ার মত তেজিয়ান ও দ্রুতগামী নহে। প্রথম প্রথম এদেশী গোড়াগুলির চাল চলন ভাল ভাবে লক্ষ্য করিয়া ক্রমে অভ্যস্ত হইলাম। ধর্ম্মদেবীর আগ্রহ আমাকে বর্ম্মা ভাষা শিক্ষা দিবে, এক্ষেত্রে বিষ্ণুরামের আগ্রহ আমাকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিবে, প্রকাশ পাইল। সে অতি মনোযোগ ও যত্নের সহিত, আমার সঙ্গে অশ্বারোহণ করিয়া, কি প্রকারে খাল নালা ডিঙ্গাইতে হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেড়া বা অবরোধ্য উলঙ্ঘন করিয়া যাইতে হয়, আমাকে প্রত্যহ সেই সকল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। এ সকল এক প্রকার অভ্যাস হইলে, পরে বর্শা হাতে ঘোড়া ছাড়িয়া কি প্রকারে পার্শ্বের শত্রুকে আঘাত করিতে হয়, সেই সকল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল।

বিষ্ণুরাম অশ্বারোহণে ও বর্শা চালনে এক প্রকার সিদ্ধহস্ত। সে ঘোড়া খুব দ্রুতবেগে ছাড়িয়া খালানালা সকল অনায়াসে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায় এবং বর্শা হাতে দ্রুত বেগে ঘোড়া ছাড়িয়া মৃত্তিকাস্থ ক্ষুদ্র একটী বস্তু বর্শায় তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে। আমার ঘোড়ায় চড়া ভাল মত অভ্যাস হইলে অপর সৈন্যগণের সঙ্গে আমাকে কাওয়াত করিতে মিলাইয়া দিল। আমি মহানন্দে যুদ্ধ কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি দুর্ব্বল ভীরু

কাপুরুষ বাঙ্গালী, আমার ভাগ্যে যে একটী স্বাধীন রাজ্যের সৈন্য দলে ভর্ত্তি হইয়া যুদ্ধ কার্য্য শিক্ষা করিবার সুযোগ ঘটিবে, তাহা মনেও ভাবি নাই। তবে ছোট বেলা হইতে মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে, কোন গতিকেই হউক যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিব। মনের প্রবল ইচ্ছার নিকট কোন বাধা বিঘ্নই টিকিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। চাই সাহস, চাই দৃঢ় অন্তঃকরণ, চাই মনের প্রবল ইচ্ছা। এই তিনটী যাহার আছে, সে কি কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারে, যাহা অন্য মানুষে সম্পন্ন করিয়াছে? আমি যুদ্ধ কার্য্য শিক্ষা করিতে এমন মাতিয়া গেলাম যে, আমার দেশের কথা, মা বাপ ভাইয়ের কথা কিছু কালের জন্য ডুবিয়া গেল।

বর্ম্মা অশ্বারোহী সৈন্যগণের হস্তে দীর্ঘ বর্শা, কোমরে ব্রহ্মদেশী খড়্গ। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অশ্বারোহী সৈন্যগণের মত তাহাদের পিঠে বন্দুক বাঁধা থাকে না। ব্রহ্মদেশী পদাতিক সৈন্য দলের হাতে বন্দুক এবং কোমরে খড়্গ, ঠিক যেমন গুর্খার কোমরে খুকরি বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু ইহাদের বেয়নেট বা সঙ্গীন নাই। বন্দুকগুলিও অধিকাংশ ক্যাপদার।

অশ্বারোহী সৈন্যের পদ।

দশজন অশ্বারোহী সৈন্যের উপরস্থ কর্ম্মচারীকে মিন্‌তুজি বলে
পঞ্চাশজন ... ... মিন্ গাউং বলে।
একশতজন ... ... মিন্ ছায়া বলে।
কয়েকজন মিন্ ছায়ার উপরস্থ কর্ম্মচারীকে মিন ডাউক বলে।
সর্ব্বোপরি এক রোজমোলের উপরস্থ কর্ম্মচারী মিম্ উন বলে।

পদাতিক সৈন্যের পদ।

দশজন সৈন্যের উপরস্থ কর্ম্মচারীকে আ-ক্যাট্টর, পাঁচজন আক্যাট্টর উপরস্থ কর্ম্মচারীকে তোয়ে-থুজি, একশত সৈন্যের উপরস্থ কর্ম্মচারিকে টাট্‌মু বলে। বহুসংখ্যক টাট-মমুর উপরস্থ কর্ম্মচারীকে বো বলে। এক ডিবিশন বা এক বিভাগীয় সমস্ত সৈন্যের উপরস্ত কর্ম্মচারীকে সিট্‌-বো-জী বলে। রাজকীয় সমস্ত সৈন্যের উপরস্থ কর্ম্মচারীকে সিট্ বা তুল বলে।

এই সময়ে ব্রহ্মদেশে স্থায়ী সৈন্য সংখ্যা অতি অল্পই ছিল, রাজধানী ও রাজপুরী রক্ষায় যত সৈন্যের প্রয়োজন হইত, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্থায়ী সৈন্য রক্ষিত হইত। এই সৈন্য ভিন্ন নদীতে অনেকগুলি বহর মজুত

থাকিত। নদীর ধারের গ্রাম সকল হইতে যুদ্ধকালে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নৌসৈন্যের কার্য্য চালান হইত। ইহা ভিন্ন আদেশ ছিল যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সতর বৎসর হইতে ষাট বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষকেই অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে।

রাজপুরীতে কতকগুলি লৌহ ও পিতল-নির্ম্মিত তোপ আছে, কিন্তু তাহার ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

রাজ্য ও রাজপুরীর কথা।

আমি পরাধীন দেশের লোক, স্বাধীন রাজ্যে আসিয়া স্বাধীনভাবে অস্ত্র চালনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া আনন্দে আমার বক্ষ যেন স্ফীত হইয়া উঠিল। এখানে আর অস্ত্র আইনের ভয় নাই, যাহার যত ইচ্ছা, অস্ত্র রাখিতে পারে। এখানে আর ধলায় কালায় প্রভেদ নাই, উপযুক্ত ও সৎ হইলে কালে সকলেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে।

শাসন প্রণালী।

ব্রহ্মদেশের রাজা স্বেচ্ছাচারী। রাজ্যের যে সমস্ত ভূমি, বন-জঙ্গল, জলা, পর্ব্বত-পাহাড়, নদী নালা, সমস্তই রাজার নিজস্ব সম্পত্তি। রাজার আদেশ ভিন্ন রাজ্যের কোন ভূমি ইত্যাদি অন্য প্রজা ভোগ দখল করিতে পারে না। বর্ম্মার রাজার প্রভুত্ব ও কত গর্ব্ব, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উপাধি সকল হইতে জানা যাইবে।

রাজার উপাধি সকল।

১। রাজ্যের সমস্ত হস্তির অধীশ্বর।

২। বহুসংখ্যক শ্বেত-হস্তির মালিক।

৩। যাবতীয় স্বর্ণ,রৌপ্য, হীরক, রুবি প্রভৃতি বহুমূল্য ধন রত্নের মালিক।

৪। তুনাপারত্ন (Thunnaparathna) জম্বুদ্বীপ, এবং অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের ও দেশের এবং যত ছত্রধারী রাজাগণের অধীশ্বর।

৫। ধর্ম্মের পোষাক।

৬। সূর্য্যোবংশোদ্ভব।

৭। জীবনের অভয়দাতা।

৮। ধার্ম্মিকদিগের রাজা।

৯। রাজাধিরাজ।

১০। অসীম রাজ্যের এবং অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী।

দুইটী সভা দ্বারা রাজ্যশাসিত হইয়া থাকে। প্রথমটীকেহ্লাড (Hladow) বা প্রধান মন্ত্রী সভা বলে। এই সভা চারিটী মন্ত্রী কর্ত্তৃক গঠিত। এই মন্ত্রী-দিগকে উনজী বলে। ইহাদের উপর বাহ্য শাসনের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। প্রত্যেক মন্ত্রীর অধীন একজন করিয়া সহকারী মন্ত্রী আছেন। সেই সকল মন্ত্রীকে উন্ ডাউক বলে। এই সকল কর্ম্মচারী ভিন্ন কার্য্য সম্পাদনার্থ কতকগুলি কার্য্য-সম্পাদক বা সেক্রেটারী আছেন। তাঁহাদিগকে ছায়া-ডাউজি বলে। এই হ্লাড বা প্রধান মন্ত্রী সভার সভাপতি রাজা স্বয়ং।

এই মন্ত্রী-সভা আইন প্রণয়ন, বিদেশী রাজদূতগণের সঙ্গে অন্তর্জাতিক সমস্যা সকলের মীমাংসা, এবং প্রাদেশিক বিচারাদালত প্রভৃতি হইতে মোক-দ্দমা সকলের আপীল ইত্যাদি নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় সভাটীও চারিটী মন্ত্রী কর্ত্তৃক গঠিত। এই সভার অধিবেশন রাজ-প্রাসাদের কোন কক্ষে হইয়া থাকে। ইহাকে বাই-ডাইক্ বা রাজার প্রিভি-কাউনসেল বলা যাইতে পারে। এই মন্ত্রীগণ রাজ্যসম্বন্ধীয় গুরুতর ও গোপনীয় বিষয় সকল রাজার সঙ্গে, এই সভায় মন্ত্রণা করিয়া থাকেন। এবং কোন সভ্য কর্ত্তৃক রাজাদেশ সকল প্রধান মন্ত্রী সভা হ্লাডকে প্রেরিত করিয়া থাকে।

রাজ্য শাসনের সুবিধার্থ রাজ্যটী নানা প্রদেশ বা মিউতে বিভাগ করা হইয়াছে। এই এক এক প্রদেশের শাসন কর্ত্তাকে উন্ বলে। এক এক প্রদেশ বা মিউ আবার কয়েকটী-টাউন বা ডিষ্ট্রীক্টে বিভক্ত। আবার এক এক ডিষ্ট্রীক্ট টাউন-শিপে, এবং প্রত্যেক টাউন-শিপ আবার বহু সংখ্যক গ্রামে বা ইওয়াতে বিভক্ত।

এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অধীনে এক ডিষ্ট্রীক্টের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্ম-চারীকে উন-ছায়া বলে। সর্ব্ব নিম্নে গ্রাম্য তুজী বা পঞ্চায়ৎ সকল আছেন। এই পঞ্চায়ৎ সকল প্রায় বংশানুক্রমে এই পদ অধিকার করিয়া থাকে।

ইহারা ভূমির রাজস্ব ও কর সকল আদায় করিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সকলের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে।

রাজ্যের প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারীরই বেতন অল্প, সুতরাং সকলেই সুবিধা মত অল্পাধিক উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রাজ্যের প্রধান প্রধান অপরাধীদিগকে বেত্রদণ্ড, কারাদণ্ড, ফাঁসি, দীপান্তর, ও ক্রুশ যন্ত্রে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা প্রভৃতি দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

মফঃস্বলের জেলখানার সুবন্দোবস্ত নাই। কয়েদীদিগের আহারের কোন ব্যবস্থা নাই। কয়েদীগণের আহার, তাহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের দয়ার উপর নির্ভর করে। যাহাদের আত্মীয় বন্ধু নাই, তাহারা দিবাভাগে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া থাকে এবং রাত্রিকালে তাহাদিগকে জেলখানায় আবদ্ধ করা হইয়া থাকে। অতি দুর্দ্দান্ত কয়েদীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এক খুঁটীর সঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখে। দীপান্তরের কয়েদীদিগকে কাথা জেলা, মোজা-ছুঁাট ও মোগং প্রভৃতি অতি অস্বাস্থ্যকর স্থানে প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

রাজ বংশের কথা।

১৮৭৮ খ্রীঃ রাজা মিন্তন মিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে রাজ-সিংহাসন কে অধিকার করিবে, তাহা নাকি তিনি নির্ব্বাচন করিয়া যাইতে পারেন নাই। অথবা নির্ব্বাচন করিয়া থাকিলেও তাহা প্রকাশিত হয় নাই। রাজপুরীতে এই বিষয় লইয়া ষড়যন্ত্র হয়, ষড়যন্ত্রকারিগণ রাজকুমার থিবকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু রাজসিংহাসনে নাকি থিবর দাবি আদবেই ছিল না। থিব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রধানা রাজমহিলাদিগের কুমার সকল বর্ত্তমান ছিলেন।

থিব সম্বন্ধে এই প্রকার কথা শুনা যায় যে, থিবর মাতার কোন ফুঙ্গির সঙ্গে চরিত্র ভ্রষ্ট হওয়ায় রাজা মিন্তন মিন তাঁহাকে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। থিবর জন্ম সম্বন্ধেও অনেকের সন্দেহ ছিল। কিন্তু উদার-চেতা রাজা মিন্তন মিন সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া থিবকে রাজপুরী হইতে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক বিধায় তাঁহাকে সন্দেহের ফল (Benefit of doubt) প্রদান করিয়া অন্যান্য রাজকুমারদিগের সঙ্গে লালিত পালিত হইতে আদেশ করেন। আলি পান্ত নামক মিন্তন মিনের এক প্রতিপত্তিশালিনী রাণী ছিলেন। তাঁহার কন্যা সুপায়া লাটের সঙ্গে থিবর প্রণয় জন্মে। রাজার

মৃত্যুর পর এই প্রতিপত্তিশালিনী রাজার ষড়যন্ত্র কোন মন্ত্রির সাহায্যে থিবকে রাজসিংহাসনে বসান হয়। এই সুপায়া লাটই থিবর উপর এত কর্ত্তৃত্ব করিতেন যে, রাজ্যের অনেক গুরুতর বিষয় সকল সুপায়া লাট ও তাঁহার মাতার পরামর্শে সম্পন্ন হইত।

তাৎকালীন রাজ দরবারে রাজ সিং নামক একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। তিনি রাজকুমার ও কুমারীদিগের কুষ্ঠী প্রস্তুত করিতেন। তিনি নাকি ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকট মিন্ডন মিনের সন্তান সন্ততির এক তালিকা দেন। তাহাতে প্রায় তিন শত পুত্র কন্যার হিসাব ছিল। বস্তুত আইনসঙ্গত পুত্র ৪৮ এবং কন্যা ৬০, মোট ১১০ এক শত দশটী সন্তান রাজার ছিল। রাজ সিংহ মিন্ডন মিনের পৌত্র ও দৌহিত্রের সংখ্যা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই।

১৮৭৮ খ্রীঃ মিন্ডনমিনের মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র বর্ত্তমান রাজা থিব সিংহাসনে অরোহণ করেন। মিন্ডন মিন যেমন যোগ্য, বহুদর্শী, বিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ নরপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্র তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইনি নিজের ভোগ বিলাস, অপরিণামদর্শিতা ও অত্যাচার দ্বারা রাজ্য মধ্যে অসন্তোষ বিস্তার করিয়াছিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

রাজা থিবর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

রাজপুরীতে ভীষণ হত্যাকাণ্ড।

থিব সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার বৈমাতৃভ্রাতাগণ মধ্যে নানা কারণে অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া পড়ে। রাজকুমার নিয়াংইয়ান ইঁহাদের অগ্রগণ্য ছিলেন। ইনি গোপনে মাণ্ডালে পরিত্যাগ করিয়া রেঙ্গুন গমন করেন এবং তথায় ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক কোন অপরাধের জন্য নির্ব্বাসিত হন। এই রাজকুমার রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা গমন করেন, তথায় গিয়া বড় লাট ও ছোট লাটের সঙ্গে পরিচিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

কিন্তু বড় লাটের নিকট যে তিমি বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। এই সময়ে বাঙ্গালার ছোট লাট ছিলেন, সার এসলি ইডেন। ইনি ইতি-পূর্ব্বে ব্রিটিশ বর্ম্মার চিফ কমিশনার ছিলেন, এবং তখন মাণ্ডালের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ড ছিলেন, সার চার্লস আইচিসন। সার এসলি ইডেন রাজকুমার নিয়ান ইয়ানকে এক সুপারিস পত্র প্রদান করেন যে, এই রাজকুমারকে ব্রিটিশ বর্ম্মার সীমা হইতে আপার বর্ম্মায় প্রবেশ করিবার সাহায্য করা হয়। কর্ণেল ব্রাউনের নিকট এই পত্র লইয়া রাজকুমার উপস্থিত হন। তিনি বড় লাটের কোন হুকুম না পাওয়ায় ইতস্তত করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন, ইডেন সাহেবের এ বিষয় কোন অধিকারই নাই। ব্রিটিশ বর্ম্মা বাঙ্গালার অধীন নহে। কর্ণেল ব্রাউন মাণ্ডালের রেসিডেণ্টকে এই সংবাদ জানান, তাহাতে কর্ণেল ব্রাউনকে রেসিডেণ্ট সাহেব উত্তর দেন যে, "এই রাজ-কুমারকে আমরা সাহায্য করিতেছি, তাহা রাজা জানিতে পারিলে, আমাদের কাহারও প্রাণ বাঁচিবে না। সমস্ত লোককে রাজাদেশে হত্যা করিয়া ফেলিবে।" সেই জন্য তিনি রাজকুমার নিয়ান ইয়ানকে পুনরায় কলিকাতা ফেরত পাঠাইবার জন্য বড়লাটকে টেলিগ্রাম করেন।

ইতি মধ্যে এই সকল ষড়যন্ত্র টের পাইয়া মাণ্ডালের রাজকুমারদিগকে এবং তাঁহাদের সাহায্যকারিদিগকে থিব কারারুদ্ধ করেন, অবশেষে হত্যার আদেশ করেন। অতি নৃশংস ভাবে সকলকে হত্যা করা হয় এবং এমন কি, কোলের দুগ্ধপোষ্যদিগকেও টানিয়া আনিয়া হত্যা করা হয়। ব্রহ্মদেশের রাজবংশীয় কাহাকেও হত্যা করিতে হইলে, তাহাদিগকে সোজা সোজী খড়্গাঘাত বা গুলি করিয়া মারা হয় না। তাহাদিগকে বড় থলির মধ্যে পুরিয়া হাতি দ্বারা মাড়াইয়া মারা হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মাণ্ডলে পরিত্যাগ করিল। পায়ের জুতা খুলিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নিয়ম লইয়া ইংরাজ রেসিডেণ্ট ও মিন্তন মিনের সঙ্গে মতান্তর ঘটে। ব্রহ্মদেশের নিয়ম ছিল যে, রাজদরবারে স্বদেশী বিদেশী যেন কোন উচ্চ কর্ম্মচারীই হউন না কেন, সকলকেই পায়ের জুতা খুলিয়া যাইতে হইত। রাজার সময়ে ইউরোপীয় রাজদূতগণকে সেই নিয়মানুসারে পাদুকা মোচন না করিলে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সাধ্য ছিল না। মিন্তন মিনের সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই পাদুকা মোচন লইয়া কথান্তর ঘটে। তাহারা পাদুকা মোচন করিতে অনিচ্ছুক। এই কারণে

ব্রহ্মরাজার সঙ্গে ইংরাজের মনান্তর ঘটিবার একটী কারণ। আমি যখন মাণ্ডালে যাই, তখন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ছিলেন না। কিন্তু ফরাসী ও ইটালীয় রেসিডেণ্ট ছিলেন।

থিবর পাটরাণী সুপায়া লাট কর্ত্তৃক থিব রাজকার্য্য বিষয়ে চালিত হইতেন এবং এই রমণীর সন্দিগ্ধ চরিত্রে এবং অপর জ্ঞাতিবর্গের প্রতি দুর্ব্যবহারে রাজধানীর ও রাজ্যের অধিকাংশ লোক তাঁহার শত্রুরূপে দাঁড়াইয়াছিল।

মাণ্ডালে আমার দুই বৎসর হইতে চলিল। বর্ম্মা কথা উত্তম রূপে অভ্যাস হইয়াছে। বর্ম্মাদিগের সঙ্গে মিশামিশি, আলাপ পরিচয়, যাতায়াত ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজ্যের নানা তত্ত্ব আমি অনুসন্ধান করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলাম। বর্ম্মার দলে মিশিলে এখন আর আমাকে সহসা কেহ বাহির করিতে পারে না। মাণ্ডালে আমার বহু বন্ধু যুটিল। আমি অশ্বারোহী সৈন্য দলে প্রথম সেপাইতে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, তাহার ছয় মাস পরে মিনুতুজির পদে উন্নীত হইলাম এবং আর ছয় মাস পরে মিনগাউং অর্থাৎ পঞ্চাশ জন সৈন্যের উপরস্থ সর্দ্দার হইলাম। হরিরাম শর্ম্মা ও আমি এক পদে, কিন্তু বিষ্ণুরাম এক শত সৈন্যের উপর। এখন অশ্বরোহণে ও যুদ্ধ-কৌশলে আমি কাহা অপেক্ষাও হীন নহি।

এক দিন কাওয়াৎ করিয়া ফিরিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে, একজন ইংরেজ বণিক কয়েকজন মুটের ঘাড়ে মাল চাপাইয়া দিয়া রাস্তায় ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়া একটু কৌতুহল জন্মিল। লোকটার চেহারা দেখিয়া বোধ হইল যেন খুব উচুদরের লোক। আবার ভাবিলাম, কোন উচুদরের লোক হইলে এইরূপ রাস্তায় মুটে লইয়া ফিরি করিয়া বেড়াইবে কেন? কৌতুহল বশতঃ অলক্ষিত ভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে আরম্ভ করিলাম, ভাবিলাম, লোকটা কি বিক্রয় করে। সে একটা দীর্ঘ রাস্তার শেষে প্রান্তে বসিয়া মুটেদিগকে মোট নামাইয়া বসিয়া পথে চলিবার সময় চারিদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া, যে দিগের যে পথ ও যেখানে যাহা, বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতেছিল। রাস্তার প্রান্তে গিয়া পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া কি কি যেন লিখিতেছে। পরে একটী ক্ষুদ্র কম্পাস বাহির করিয়া, এবং আর একটী ঘড়ির মত একটী ক্ষুদ্র যন্ত্র বাহির করিয়া, এই সকল দেখিয়া নোটবুকে সমস্ত লিখিয়া, পুনরায় অন্যদিকে চলিল। অবশেষে নগর-প্রাচীরের নিকট আসিয়া তথায় অনেকক্ষণ দেখিয়া নিরীক্ষণ

করিয়া কি কি লিখিয়া লইল। সে যখন চলিতে থাকে, তখন যেন পা ছড়াইয়া লম্বা লম্বা পদক্ষেপে চলিতে থাকে। তখন আমার বোধ হইল যে, এই প্রকার এক পদ বিক্ষেপকে একষ্টেপ্ বলে। ইহা দ্বারা রাস্তার দূরত্ব মোটা-মোটি স্থির করিতে পারা যায়। এই মত পণ্য বিক্রয় করিয়া অবশেষে মাণ্ডালের প্রসিদ্ধ জে-জো বাজারের নিকট রাস্তার ধারে এক উচ্চ দ্বিতল কাষ্ঠময় গৃহের উপর চলিয়া গেল। মাল-বাহী কুলিগুলি মালসহ নীচু তলে থাকিল।

আমি কিন্তু পাকে পাকে থাকিয়া সমস্ত লক্ষ্য করিয়া অবশেষে কুলিদিগের কাছে গিয়া বসিলাম। আমাকে বর্ম্মা জানিয়া কেহই তত গ্রাহ্য করিল না, কুলি ভিন্ন সঙ্গে একটী মাদ্রাজী বয় আছে। ইংরাজীতে বেশ কথা বলিতে পারে। এই কুলিগণ বর্ম্ম কথা "খেমিয়া" "দিগ লাগে" প্রভৃতি দুই চারিটী বর্ম্মান কথা মাত্র জানে। এবং তাহাদের একজন সামান্য দুই চার কথা হিন্দি জানে। আমি তাহাদের নিকটে বসিয়া খাস বর্ম্মার মত পান চিবাইতে চিবাইতে এবং চুরট টান্‌তে টান্‌তে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সাহেবের নাম কি? তাহাতে ইহারা আমার কথা বুঝতে না পারিয়া পরস্পর কৌরঙ্গি ভাষায় কি কি "আণ্ডা গুব গুর" শব্দে কথা বলিতে লাগিল। কারণ কুলিগুলি সকলই কৌরঙ্গী। অবশেষে একজন বলিল"হাম লোক নাহি জান্তা।" তখন আমি হাত দ্বারা ইসারা করিয়া সাহেবের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। তখন তাহারা আমার প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিল। কিন্তু বয়টা ত তামেল ভাষায় কি কি বলিয়া, পরে"Do not tell him the master's name" তার পর হেড কুলিটি বলিল "Yes, Colonel Sladen told me not to tell his name to any body." ইহাদের পরস্পর বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে আমি যেন ব্যাকুবটার মত ভ্যাবা চ্যাগা খাইয়া বসিয়া রহিলাম। তখন আর একজন কুলি কহিল, "না মনেবু, তোয়া, তোয়া"। অর্থাৎ তোমার কথা বুঝি না, যাও যাও।

আমি তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেলেম। মনে মনে ভারি সন্দেহ হইল যে, "কর্ণেল স্লেডেন" এই সাহেবটার নাম। কর্ণেল একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী। তিনি কেন মালের ফিরি করিয়া বেড়াইতেছেন? ইহার মধ্যে অবশ্য কোন গুরুতর রহস্য আছে। চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে ধারণা হইল যে, এই লোকটা একজন ছদ্মবেশী সদাগর, ইহার বেচা কেনা সব মিথ্যা, ইহার পথ ঘাটের মাপ, কম্পাস, ও ব্যারোমেটার (বায়ুমান-যন্ত্র)

প্রভৃতি দ্বারা দিঙ্‌ নির্ণয় ও স্থানের উচ্চতা প্রভৃতি লিখিয়া লইবার উদ্দেশ্য কি? ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হইলাম এবং আমার চিন্তাশীল স্বভাব বশতঃ কিছুকালের জন্য মন যেন এই চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

বাড়ীতে গিয়া বিষ্ণুরাম শর্ম্মা ও বিশ্বম্ভর শর্ম্মাদিগকে গোপনে এই কথা বলিলাম, তাঁহারা কেহ গ্রাহ্য করিল না। তাঁহারা বলিলেন যে, ও প্রকার কত সাহেব আসে যায়, কে উহার খবর নেয়। মনে মনে ভাবিলাম যে, এই প্রকার ঔদাসিন্য ও চিন্তাশূন্যতাই আসিয়াবাসীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

পরদিন জে-জো বাজারের রাস্তা দিয়া বাটীতে যাইতেছি, এমন সময় একটী বর্ম্মা ভদ্রলোক সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। লোকটা যেন চেনা চেনা বলিয়া বোধ হইল। নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাকে স্পষ্ট চিনিলাম। সেই ষ্টিমারে আসিবার কালীন যে ইংরেজী জানা একটী বর্ম্মা ভদ্রলোকের কথা বলিয়াছি, ইনি তিনি। আমি তাঁহাকে সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় থাকেন? তিনি আমার মুখের দিকে অল্পক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন,"Hallow Babu chackerbutty,you are here? I see now you have-became a proper Burmon. I believe you have taken a Burmese wife too, therefore you dress like a Burmon. What are you doing here?" আমি বলিলাম যে, I am doing same business here. No fear, I have not taken any wife-yet. আমি যে কি করি, কোথায় থাকি, তাহা তাঁহাকে বলিলাম না। তিনিও কোথায় থাকেন, কি করেন, আমাকে বলিলেন না। পরস্পর নানা বাজে আলাপ করিয়া বিদায় লইলাম।

এই লোকটাকে সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া আবার সন্দেহ হইল। ইহাদের গুপ্ত তথ্য আবিষ্কারের জন্য ব্যস্ত হইলাম। ভাবিলাম, এও একজন গোয়েন্দা হইবে। কি করিয়া এই দুইটা লোকের কার্য্যের রহস্য ভেদ করি, তাহা জানিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিলাম যে কোন স্ত্রীলোক দ্বারা ইহাদের সংবাদটা জানা দরকার। মনে মনে ভাবিলাম, আচ্ছা ধর্ম্ম দেবীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তাহার দ্বারা এ গুপ্ত চরের কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে কি না?

ধর্ম্ম দেবীর সঙ্গে আমি বাহ্যিক যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে

তাহার ধারণা হইয়াছে যে, আমি তাহাকে ভালবাসি এবং তাহার প্রেম-জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমার আসল মনের ভাব সে জানে না। ধর্ম্ম দেবীকে আমার প্রস্তাব জানাইলাম। তাহাতে সে আমার মনস্তুষ্টির জন্য দৌত্য-কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলে, সদাগর সাহেব যে বাড়ীতে থাকেন, তাহার ঠিকানা তাহাকে বলিয়া দিয়া, সাহেবটী এথানে কি করে, বর্ম্মাটী কে, এবং বাড়ী-ওয়ালা ইহাদের মতলব জানে কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য তাহাকে বেশ করিয়া বলিয়া দিলাম। সে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া অনুসন্ধানে চলিল।

পর দিন ধর্ম্মদেবী যাহা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিল, তাহা আমাকে বলিল। নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

"যে বাড়ীতে সাহেব থাকেন, সে বাড়ীর মালিকের নাম ডমে। ডমের স্বামীর নাম ছিল উ-মহু। উ-মহু রাজকুমারদিগের এক জনের কার্য্যকারক ছিলেন। রাজা থিব তাঁহার জ্ঞাতিবর্গকে সমূলে বিনাশ করার পর উ-মহুকে তাঁহার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রকারী মনে করিয়া তাঁহাকেও হত্যা করেন। সে ঘটনা আজ চারি বৎসর হইল। ডমের মাত্র একটী কন্যা আছে, তাহার নাম মা-ছ-মে। সে আমাদের পরিচিত লোক। তাহার বাড়ীতে গিয়া ওকথা সে কথার পর সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা-ছ-মে কহিল,সাহেবের কালা নাম কি, জানিনা, বর্ম্মা নাম মংতাটু। তিনি এথানে বিলাতী বেসমী কাপড় সকল বিক্রয় করিবার জন্য আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে বেচা কেনা করিতে বড় দেখি না। যথন বাড়ীতে থাকেন, তথন সর্ব্বদা লিখিতে দেখি এবং সময় সময়ে নক্সা প্রস্তুত করিতে দেখিয়া থাকি। আমি যথন কালা অক্ষর জানিনা, তথন সে যে কি লেখা, তাহাও বলিতে পারি না। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট যন্ত্র আছে, সে সকল টেবলের উপর দেখি। কোন কোন দিন অনেক রাত্রি জাগিয়াও লিখিতে থাকেন। অবসর মত আমাদের সঙ্গে নানা আলাপ করিয়া থাকেন। বর্ম্মা ভাষা তিনি লিখিতে ও পড়িতে ভালমত পারেন। আমাদিগকে সময় সময় সহরের লোকদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, রাজ বাড়ীর কথা এবং রাজার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কে কে, তাহা আস্তে আস্তে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। আমরাও যাহা জানি, তাহা তাঁহাকে বলিয়া দিয়া থাকি। রাজপুরীর হত্যার কাহিনী এবং আমার পিতার হত্যার বিষয় প্রভৃতি তিনি শুনতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন।"

"সাহেবের যে আসল কি মতলব, তাহা আমি জানিনা, আমার মা বোধ করি জানেন। তিনি আমাকে কোন কথা খুলিয়া বলেন না। কিন্তু আমার অগোচরে কোন কোন সময় সাহেবের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে শুনিয়াছি।"

"বর্ম্মা ভদ্র লোকটীর নাম মংবা-তান। বাড়ী মৌলমেনে। তিনি সাহেবের কেরাণীর কার্য্য করেন, বর্ম্মা ভাষার যত লেখা পড়া এবং তরজমা, তাহা সেই কেরাণী করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন সহরের নানা সংবাদও তিনি সাহেবকে দিয়া থাকেন। সাহেবের সঙ্গে তাঁহার ইংরেজীতে কথা হয়, সুতরাং তাহা আমি বুঝি না।" মা-ছ-মে আরও বলিল যে, সাহেব নাকি ফিন্-উন-মিঞ্জী ও তাগুাট-উল-মিঞ্জীর সঙ্গে কয়েকবার গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।"

ধর্ম্মদেবীর মুখে সাহেবের পূরা পরিচয় না পাইলেও আভাসে অনেক বুঝিলাম এবং আমার অনুমান যে সত্য, ভাবে বুঝিলাম। সাহেব একজন যে ছদ্মবেশী শত্রু, তাহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। তবে সাহেব কি নক্সা আঁকেন এবং কি লেখেন, তাহা জানিবার সাধ্য নাই। তখন মনে মনে এক ফন্দি আঁটিলাম যে, এই বর্ম্মার সঙ্গে সাহেবের কি কি কথা হয়, তাহা শুনার দরকার।

এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে মা-ছ-মের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সে আমাকে অপরিচিত লোক মনে করিয়া প্রথম প্রথম সঙ্কুচিত হইল এবং আমার নাম কি এবং কি চাই, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমি আমার নাম বলিলাম এবং কহিলাম যে, আমি কিছুই চাই না,কেবল বেড়াইতে আসিয়াছি। মা-ছ-মে আমার নাম শুনিয়া আদর করিয়া বসিতে দিল এবং চুরট ও পানের ডিবা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। সে বলিল, আপনার নাম মা-মিয়া দেবীর মুখে শুনিয়াছি, মা-মিয়া (ধর্ম্মদেবী) সহস্র মুখে আপনার প্রশংসা করিয়াছে। আপনার বিদ্যা বুদ্ধি স্বভাব চরিত্রের বিষয়, যখনই দেখা হয়, তখনই বলে। তা আপনি যে দয়া করিয়া আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, সে আমার সৌভাগ্য। মাঝে মাঝে এরূপ বেড়াইতে আসিলে বড় সুখী হইব। আমি মা-ছ-মের নিকট ধর্ম্ম দেবীর মুখে আমার গুণ-গানের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলাম এবং বলিলাম, না আমার প্রশংসার যোগ্য এমন কোন গুণ নাই। এইপ্রকার নানা কথাবার্ত্তার পর তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম এবং বলিলাম, অবসর মত মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসিব, এখন যখন পরিচয় হইল, তখন আর আসিতে বাধা কি?

মা-ছ-মে যুবতী কুমারী। আমিও যুবক কুমার। আমাকে কয়েকবার তাহার বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতে দেখিয়া সে মনে করিল, ইংরাজীতে যাহাকে love বলে, আমি বুঝি তাহাকে সেইরূপ ভালবাসি, এবং তাহার সঙ্গে পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপনের মতলব করিয়াছি। এরূপ মনে করাতেই বুঝি তাহার আকর্ষণটা আমার উপর বৃদ্ধি পাইল। কারণ এটা ব্রহ্মদেশের নিয়ম, যদি কোন যুবতী কোন যুবককে পছন্দ করে, তাহা হইলে সে তাহাকে ডাকিয়া বাসায় নানা খোস গল্প করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যুবকেরও যদি তাহার প্রতি ঝোক হয়, তাহা হইলে হয়ত এই প্রকার কয়েকবার যাওয়া আসা করিলেই পরস্পর ভালবাসা ও প্রণয়ের কথা হয়, পরে উভয়কেই উভয়ে চায়, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া বিবাহের কথা ঠিক হয়। ইহাতে ব্রহ্মদেশী সমাজে কোন দোষ নাই।

দুই তিন বার তাহার বাড়ী যাওয়ার পর আর এক দিন সন্ধ্যার পর তথায় বেড়াইতে গিয়া বসিলাম এবং মা-ছ-মের সঙ্গে নানা গল্প করিতে আরম্ভ করিলাম। মা-ছ মের মা তথা হইতে উঠিয়া কার্য্যান্তরে গেলেন। ইতিমধ্যে সাহেবের সেই বর্ম্মা কেরাণীটী বা গুপ্তচরটী আসিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—Did you see Kin-wan-ming to day ?

বর্ম্মা—Yes sir, I have seen him to-day and I told him what master told me to tell him.

সাহেব—What did he tell you ?

বর্ম্মা—He told me to tell master that he would try his best to help the British.

সাহেব—How are to know that he will keep his words ?

বর্ম্মা—He consented to give a written promise.

সাহেব—All right, I should like to have that soon, because I can't stop any longer here. I have finished my other works.

বর্ম্মা—When it is necessary, Sir, you should both meet in a place.

সাহেব—Yes, quite so. Which is the best place for meeting ?

বর্ম্মা—I cannot say, I will ask Kin-wan-ming, which will suit both.

সাহেব—Very well, settle every-thing as soon as you can. You may go now and come to morrow. ইহার পর মং-বাতান প্রস্থান করিল। আমিও বাড়ী ফিরলাম। মনের কথা প্রকাশ পাইল, সাহেব রাজা থিবর সর্ব্বনাশের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা বেশ বুঝা গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, হায়! সেরাজদ্দৌলা, মিরজাফর ও ক্লাইবের অভিনয় এতকাল পরে এদেশেও হইতে চলিল! রাজবল্লভ ও কৃষ্ণচন্দ্র যে নাই, তাহা কে বলিবে?

আমার মনে আজ হইতে এই আর একটী চিন্তা ঢুকিল। ব্রহ্মদেশে এরূপ অভিনয় আরম্ভ হইল কেন? এই সকল চিন্তা করিতে করিতে কোন কোন দিন রাত্রি কালে নিদ্রা হইত না। স্বাধীন ব্রহ্মের পরিণাম চিন্তা করিয়া আকুল হইলাম। আবার ভাবিতাম, এবিষয়ে এত চিন্তা করি কেন? আমি একজন নগণ্য "কালা" বইত নয়। যাহাদের দেশ, যাহাদের রাজা, তাহারা যেন বোধ হয় নিশ্চিন্ত ভাবে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। অবশ্য ষড়যন্ত্রকারিগণ সর্ব্বদাই দেশের সর্ব্বনাশে ব্যস্ত আছে। যাবৎ তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ না হইবে, তাবৎ তাহারা নিরস্ত হইবে না, কিন্তু যাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, তাহারা কোথায়? তাহারা কি ভাবিতেছে?

কখন কখন মনে বিরক্তি উৎপন্ন হইতে লাগিল, মনে মনে ভাবি, দূর হউক, পরের চিন্তা আমার কেন? এ আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বইত নয়। এই সকল চিন্তা করিয়া আমার পোড়া মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি, কিন্তু মন তাহা মানে না। মনের অন্তস্তল হইতে আবার যেন প্রত্যুত্তর জাগিয়া উঠে। মন আবার বলে, কেন, আমিত ভারতবাসী এবং ইহারাও ব্রহ্মবাসী। ইহারা আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের ধর্ম্মে ইহারা দীক্ষিত, আমাদের শাস্ত্রে ইহারা পণ্ডিত, আমাদের ভাষা লইয়া ইহারা জ্ঞানী, আমাদের শিল্প লইয়া ইহারা শিল্পী এবং আমাদের রক্ত মাংস ইহাদের সঙ্গে জড়িত। কারণ প্রাচীন কালে বহু ক্ষত্রিয় নরপতি যে আসিয়া এখানে রাজ্যাধিকার বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিয়া গিছেন, প্রাচীন নরপতিগণের নাম ও ধর্ম্ম মন্দির প্রভৃতি হইতেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আমি ইহাদের মঙ্গল কামনা করিব না কেন? এই জন্যইত আসিয়া-দেশবাসী জাহান্নামে গেল, একে অন্যের জন্য ভাবে না। সকলই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। যদি পরস্পরের জন্য সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে বুঝি আজ ভারত ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রভৃতি দেশের

এ প্রকার দুর্গতি ঘটিত না। হায়! আমার মত যদি সকলই এই প্রকার চিন্তা করিত, তাহা হইলে বুঝি দেশের এদুর্গতি হইত না। সকলের একতা ও পরস্পরের সহানুভূতি থাকিলে বুঝি এত দুর্গতি হইত না। এই গুণের অভাবেই বুঝি আমরা শেয়াল কুকুরের ন্যায় সম্মান লাভ করিয়া থাকি!

এই সকল কথা পাগলের মত চিন্তা করিতে করিতে কখনও বিশ্বম্ভর শর্ম্মার নিকট, কখন কখনও বা বর্ম্মা বন্ধুগণের নিকট এই সকল রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা করি, কিন্তু বৃথা, কেহ সে সকল কথায় কর্ণপাত করে না।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মাকাশে ঘনঘটাচ্ছন্ন।

সওদাগর সাহেব, ওরফে মংতাটু, মাণ্ডালে পরিত্যাগ করিবার পর আমাদিগের স্থূল দৃষ্টিতে সকলই যেন শান্তিময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী, বিশ্বাস-ঘাতক, রাজদ্রোহিগণের মনের ভাব কি, তাহা আমরা কি করিয়া বুঝিব? সে ধারণা করিবার আমাদের সাধ্য নাই। তবে মোটা-মোটী ইহা বুঝিলাম যে, যত দিন রাজদ্রোহিগণের পাপযজ্ঞে পূর্ণাহুতি না পড়িবে, তত দিন তাহাদের মনে কিছুতেই শান্তি নাই। তাহাদের অশান্তির দুইটী কারণ, প্রথমটী প্রতিহিংসা, দ্বিতীয়টী রাজভীতি। ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইলে সকলেরই শিরচ্ছেদ হইবে, তাহা নিশ্চয়।

এদিকে বর্ম্মার সেরাজউদ্দৌলা থিব বেশ নিশ্চিন্ত মনে রমণীমণ্ডল-পরিবেষ্টিত হইয়া মহানন্দে কালযাপন করিতেছেন, রাজ্যের বাহিরে ও ভিতরে কি কি কাণ্ড হইতেছে, তাহা তাঁহার হয়ত দেখিবার ও শুনিবার অবকাশ নাই, অথবা তাঁহাকে জানাইবার লোক নাই। রাজপুরীর মধ্য হইতে বাহির হইবার তাঁহার সাহস নাই, বাহির হইলেই পাছে গুপ্ত শত্রু কর্ত্তৃক হত হন, এই আশঙ্কা। তিনি রাজপুরীর ভিতরস্থ মানমন্দির হইতে যতটুকু তাঁহার দৃষ্টি যায়, ততটুকমাত্র রাজ্যের সীমা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতেন। বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারী রাজপুরুষগণের মুখে সত্য মিথ্যা যাহা অবগত হইতেন, তাহাই সরল শিশুটীর মত বিশ্বাস করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।

থিবর শত্রুগণ রাজ্য মধ্যে নানা ভাবে অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিল। আপার বর্ম্মায়, আপার কিন্তুইন নামক ডিষ্ট্রীক্টে, মিংগুণ নামক স্থান বোম্বে বর্ম্মা কোম্পানি নামে ইংরেজ কোম্পানির আড্ডা আছে। "বিবাদের মনন থাকিলে সূত্র লাভের অভাব থাকে না"—এই মহা সত্য কথার প্রমাণ আসিয়া আবার উপস্থিত হইল। ইংরেজ জাতীয় কি সওদাগর, কি পাদ্রি, কি কুলিমজুর, কি মুচি, কি দরজী, সকলেরই এক নাড়ি। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, রাজপুরীর হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট হত ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নাকি মাণ্ডালে পরিত্যাগ করেন! যাহা হউক, সেকথা গত কথার মধ্যে গণ্য। আশু বোম্বে বর্ম্মা কোম্পানী বর্ম্মা রাজার নিকট হইতে যে সর্ত্তে কাঠ কাটিবার পাট্টা লইয়াছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক সেই সর্ত্তের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বহু সংখ্যক কাঠ কাটিয়া ফেলেন এবং নিম্ন বর্ম্মায় চালান দেয়। এই বে-আইনি কার্য্য করার রিপোর্ট রাজদরবারে পৌঁছে। এই অপরাধের জন্য অপরিণামদর্শী রাজা উক্ত কোপানিকে তেত্রিশ লক্ষ্য টাকা অর্থ দণ্ড করেন এবং এই জরিমানার টাকা আদায়েব জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। আর যাবে কোথায়? ইংরেজ পক্ষ হইতে মহা তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ হইল। নির্ব্বোধ রাজা বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক ভ্রান্ত পথে নীত হইলেন, তিনি নিজের অনন্ত জ্ঞানে মত্ত হইয়া আপন জেদ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা, আন্তর শত্রু ও বহি শত্রুগণের ষড়যন্ত্রের সংবাদ গুলি তাঁহার নিকট চাপা দিয়া রাখা হইল। তাঁহার রাজ্য যে মহাশক্তিশালী, তাঁহার রাজ্য যে অজেয় এবং কালারা যে নগণ্য, এই কথায় তিনি মত্ত হইয়া রহিলেন।

এদিকে কিন্তু ঝড়ের পূর্ব্বে যেমন বায়ুমণ্ডল নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে, চারি দিক হইতে মেঘ জমিয়া আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ছটা ঝিকমিক্ করিয়া কৃষ্ণ মেঘে বিলুপ্ত হয়, এবং মাঝে মাঝে দূরে গুড় গুড় মেঘধ্বনি শ্রুত হয়, ব্রহ্ম রাজ্যাকাশও সেই ভাব ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধিমান লোকে সাবধান হইয়া নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইতে চেষ্টা করে, কিন্তু মূর্খের চৈতন্য ঝড় আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত আর হয় না।

রাজ্য মধ্যে এবং রাজধানীতে নানা গুজব উঠিল। সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল। একটী সংবাদ, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ঘোষিত হইতে লাগিগ। ইংরেজ আসিয়া রাজ্য দখল

করিবে, এই সকল কথার কাণাকাণি হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা সহরের বাহিরের কথা। রাজপুরীর প্রকৃত কথা আমরা জানিনা।

আমি এক দিকে থিবর বিপদ চিন্তা করিতে লাগিলাম, অপর দিকে ধর্ম্ম দেবীর প্রেম-জালে জড়িত হইবার আশঙ্কা হইল। মা-ছ মের বাড়ী সিই দিন হইতে আর যাই নাই, তবে ধর্ম্ম দেবীর হাত কি করিয়া এড়াই, সেই ভাবনা হইল। কথায় বলে "যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধি হয়"। আমার পক্ষেও তাহাই ঘটিল।

ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ হুকুম হইল যে, একশত অশ্বারোহী সৈন্য ও চারিশত পদাতিক সৈন্যকে মিনহ্লা দুর্গে যাইতে হইবে। ইহা ভিন্ন শোয়াবে ও শ্যাগাহিক হইতে বহু সৈন্য প্রেরণের আদেশ হইয়াছে। আমি মিনহ্লা দুর্গে যাইব কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করায় আমি তথায় যাইতে সম্মত হইলাম। আমি ইহাতে আনন্দিত হইলাম। বিষ্ণু শর্ম্মাও মিনহ্লা যাইবে, কিন্তু হরিরাম শর্ম্মা মাণ্ডালেই থাকিবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে পদাতিক সৈন্যগণ কতকগুলি সামরিক নৌকারোহণে মিনহ্লা যাত্রা করিল। আমরা অশ্বারোহী সৈন্যগণ স্থল পথে চলিলাম। মাণ্ডালে পরিত্যাগ করিবার সময় কেমন সকরুণ ভাবের উদ্রেক হইল। ধর্ম্মদেবী ও তাহার মাতা আমাকে মাণ্ডালে থাকিবার জন্যই পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলাম, আমি তথায় অল্পকালের জন্য যাইতেছি, শীঘ্রই মাণ্ডালে ফিরিয়া আসিব। আমার মিনহ্লা যাইবার কথা শুনিয়া ধর্ম্মদেবীর মুখমণ্ডল মলিন ও হাস্যশূন্য হইল। যাইবার কালীন সে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল, তাহা আমি মাত্র দেখিলাম; তাহার অশ্রুবর্ষণ দৃষ্টে আমারও শুষ্ক চক্ষু আদ্র হইয়া উঠিল। এবং অবশেষে টস্ করিয়া একবিন্দু জল পড়িয়া গেল। লোকে দেখিবে ভয়ে ফিরিয়া রুমাল দ্বারা চক্ষুটী মুছিয়া তাহার দিকে দুই একবার তাকাইয়া, সবেগে বাহির হইলাম।

বিশ্বম্ভর শর্ম্মা ও তাহার পত্নী পুনঃ পুনঃ আমাকে মাণ্ডালে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, আমিও প্রতিশ্রুত হইলাম।

পারে না। যদিই রাজা থিবর নামে এই প্রকার আদেশ বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই তাঁহরে শত্রু পক্ষীয় বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রিগণের কার্য্য, কেননা তাহা হইলে ইংরাজের ক্রোধটা থিবর উপরে আরও অধিক হইবে।

সংবাদ পাইলাম যে, থোয়াট-মিউ দুর্গে নূতন নূতন তোপ বসান হইতেছে, এবং যুদ্ধের আয়োজন তথায় পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, খাস বর্ম্মা যাহার রাজ্য, তাহার রাজ্যে এই গুজব ভিন্ন অন্যত্র কোন যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন দেখা গেল না। কেবল মাত্র আমরা আসিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা যদি পরাস্ত হই, তাহা হইলে রাজ্য রক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই, সকলই বিশৃঙ্খলের মত বোধ হইল।

নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঠিক সংবাদ শুনিতে পাইলাম যে, ইরেজের এক নৌ-বাহিনী রেঙ্গুন হইতে আসিতেছে, এবং স্থল পথে আর এক বাহিনী টংগু হইতে মাণ্ডালে অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এই সংবাদে আমাদের কেল্লায় সাড়া পড়িয়া গেল। কেল্লা হইতে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে স্থানান্তর পাঠান হইল। আত্মরক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল, যুদ্ধকালে কে কোথায় থাকিয়া যুদ্ধ করিবে, রিজার্ভ কোন্ দল থাকিবে, এই সকল দুর্গাধিপতি স্থির করিয়া দিলেন।

দুর্গ হইতে যাহারা তোপ চালাইবে, তাহাদিগকে আপন আপন স্থানে অতি সতর্কতার সহিত হাজির হইতে আদেশ করা হইল, এবং সেনাপতি বোমিয়া আর এক দল পদাতিক সৈন্যকে আদেশ করিলেন যে, শত্রুসৈন্য তীরে অবতরণ করিলে তাহারা নদীর ধারেই আড়ালে থাকিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। আমরা আদিষ্ট হইলাম যে, বিপক্ষের সৈন্য সকল ছত্রভঙ্গ হইবার উপক্রম হইলে, আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিব।

দূর হইতে নৌ-বহরের চুঙ্গির ধূম দৃষ্ট হইল, ক্রমে জাহাজ গুলি অতি ধীরে ধীরে, অতি সতর্কতার সঙ্গে আসিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখা গেল। সকলের কথা জানি না, আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল,, কিন্তু দৃঢ়ভাবে জেদের সহিত আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য উদ্‌গ্রীব ভাবে রহিলাম। আমরা লাইন-বন্দি হইয়া একটী নিম্নস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

ইংরেজের নৌ-বহর কেল্লার তোপের পাল্লার মধ্যে উপস্থিত হইলে মিনহ্লা দুর্গ হইতে.ভীমরবে তোপ-ধ্বনি হইল। তোপের গোলা গিয়া ইরাবতীর জলে পড়িয়া নদীর জলকে উছলিত করিয়া তুলিল, আর তোপের শব্দে চতুপার্শ্ববর্ত্তী

পারে না। যদিই রাজা থিবর নামে এই প্রকার আদেশ বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই তাঁহরে শত্রু পক্ষীয় বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রিগণের কার্য্য, কেননা তাহা হইলে ইংরাজের ক্রোধটা থিবর উপরে আরও অধিক হইবে।

সংবাদ পাইলাম যে, থোয়াট-মিউ দুর্গে নূতন নূতন তোপ বসান হইতেছে, এবং যুদ্ধের আয়োজন তথায় পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, খাস বর্ম্মা যাহার রাজ্য, তাহার রাজ্যে এই গুজব ভিন্ন অন্যত্র কোন যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন দেখা গেল না। কেবল মাত্র আমরা আসিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা যদি পরাস্ত হই, তাহা হইলে রাজ্য রক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই, সকলই বিশৃঙ্খলের মত বোধ হইল।

নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঠিক সংবাদ শুনিতে পাইলাম যে, ইংরেজের এক নৌ-বাহিনী রেঙ্গুন হইতে আসিতেছে, এবং স্থল পথে আর এক বাহিনী টংগু হইতে মাণ্ডালে অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এই সংবাদে আমাদের কেল্লায় সাড়া পড়িয়া গেল। কেল্লা হইতে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে স্থানান্তর পাঠান হইল। আত্মরক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল, যুদ্ধকালে কে কোথায় থাকিয়া যুদ্ধ করিবে, রিজার্ভ কোন্ দল থাকিবে, এই সকল দুর্গাধিপতি স্থির করিয়া দিলেন।

দুর্গ হইতে যাহারা তোপ চালাইবে, তাহাদিগকে আপন আপন স্থানে অতি সতর্কতার সহিত হাজির হইতে আদেশ করা হইল, এবং সেনাপতি বোনিয়া আর এক দল পদাতিক সৈন্যকে আদেশ করিলেন যে, শত্রুসৈন্য তীরে অবতরণ করিলে তাহারা নদীর ধারেই অগ্রভাগে থাকিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। আমরা আদিষ্ট হইলাম যে, বিপক্ষের সৈন্য সকল ছত্রভঙ্গ হইবার উপক্রম হইলে, আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিব।

দূর হইতে নৌ-বহরের চুঙ্গির ধূম দৃষ্ট হইল, ক্রমে জাহাজ গুলি অতি ধীরে ধীরে, অতি সতর্কতার সঙ্গে আসিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখা গেল। সকলের কথা জানি না, আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল, কিন্তু দৃঢ়ভাবে জেদের সহিত আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য উদ্‌গ্রীব ভাবে রহিলাম। আমরা লাইন-বন্দি হইয়া একটা নিম্নস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

ইংরেজের নৌ-বহর কেল্লার তোপের পাল্লার মধ্যে উপস্থিত হইলে মিনহ্লা দুর্গ হইতে ভীমরবে তোপ-ধ্বনি হইল। তোপের গোলা গিয়া ইরাবতীর জলে পড়িয়া নদীর জলকে উছলিত করিয়া তুলিল, আর তোপের শব্দে চতুপার্শ্ববর্ত্তী

পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল। অমনি ইংরেজের গানবোট হইতে ভীষণ বেগে অগ্নিউদ্গীরণ হইতে আরম্ভ হইল। দুই পক্ষের তোপ ধ্বনিতে মেদিনী যেন ক্ষণকালের জন্য কম্পিত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ইংরেজের গানবোট হইতে গোলা পতিত হইয়া মিনহ্লা দুর্গের ঘরের ছাউনি-যুক্ত বারাক সকল ধব ধব করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দুর্গ মধ্যে এক মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। দুর্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। দুর্গ মধ্যে অনেক লোক হত ও আহত হইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু দুর্গের গোলায় ইংরেজ বাহিনীর মাত্র সামান্য ক্ষতি করিতে সমর্থ হইল। পদাতিক সৈন্যগণ আড়ালে থাকিয়া ঝাকে ঝাকে গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিল। কেল্লায় আগুন ধরিলে ভিতরের লোক সকল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইংরেজ-বাহিনী হইতে একদল মান্দ্রাজী সৈন্য তীরে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, আমাদের পদাতিক সৈন্য দল পূর্ব্ব আদেশ মত ঝাকে ঝাকে গুলি বর্ষণ করিয়া শত্রু সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে দেখিয়া গান-বোট হইতে গোলা সকল আমাদিগের উপর আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। আমরা,অশ্বারোহী সৈন্যগণ, মান্দ্রাজী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিব, এমন-আয়োজনে রহিলাম, কিন্তু ইংরেজ বহরের তোপের গোলায় আমাদিগের পদাতিক সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, অনেক হতাহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। গোলা-ঘাতে আমাদের লাইনও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। একটা আগুনের পিণ্ড সম গোলা আমাদের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। অনেকে আপন আপন ঘোড়া সহ ধরাশায়ী হইল। আমিও ঘোড়া সহ ধরাশায়ী হইলাম। আমার ঘোড়াটী পড়িয়া ধড়ফড় করিতে করিতে অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অচিরে লক্ষ্য করিলাম, আমার বাহু হইতে অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে। তখন আমার হুশ হইল যে, আমিও যখম হইয়াছি। মাথা হইতে রুমাল লইয়া বাহুখানা কশিয়া বাঁধিলাম। দূরে চাহিয়া দেখি, বিষ্ণুরাম শর্ম্মাও ভূমিতলে পড়িয়া ছটফট করিতেছে, সেও গোলাঘাতে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার দক্ষিণ হস্ত কণুই হইতে ছিঁড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে। কেল্লা ও বাহিরের সমস্ত লোক দৌড়াদৌড়ি করিয়া পলায়ন করিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া বিষ্ণুরাম শর্ম্মার ছিন্ন হস্তখানা তাহার মাথার রুমাল দ্বারা কশিয়া বাঁধিলাম, কিন্তু তাহার রক্ত কিছুতেই বারণ হইল না। অবশেষে একটু বস্ত্র ছিড়িয়া তাহার দ্বারা বাহুকে খুব কশিয়া বাঁধিলে রক্তের বেগ অনেক কমিল বটে, কিন্তু তবু অল্প অল্প রক্ত চুয়াইয়া পড়িতে লাগিল।

যাহারা এই গোলা বৃষ্টির মধ্যেও প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, দুর্গপতি দুর্গ রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া সে সকলকে দুর্গ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। আমি বিষ্ণুকে পিঠে করিয়া কিছু দূরে এক পাহাড়ের আড়ালে জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেলাম, এবং সেনাপতি বোমিয়া ও অপরাপর সৈন্যগণও হটিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, কতক আরো দূরে কোন নিভৃত স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিল। মান্দ্রাজী সৈন্যের দল দুর্গ দখল করিল, কিন্তু লুট করিয়া কিছুই পাইল না, কেন না ইতিপূর্ব্বেই অগ্নিতে সমস্ত ভস্মময় হইয়া গিয়াছে।

আমাদের আহত ব্যক্তিদিগকে যথাসাধ্য টানিয়া লইয়া স্থানান্তরিত করা হইল, কিন্তু হতদিগকে আর কবর দেওয়ার সুবিধা হইল না। তাহাদের দেহ সকল যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল।

আমাদের সেনাপতি দুইজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী মাণ্ডালে পাঠাইলেন। মিনহ্লা দুর্গের শত্রু হস্তে পতনের সংবাদ এবং বহুসৈন্য হতাহত হইয়াছে, সে সংবাদ পাঠাইলেন এবং আরো লিখিলেন যে, বহু সৈন্য ও ভাল তোপ না হইলে শত্রুর গতিরোধ করা অসম্ভব। লিখিলেন, উপযুক্ত তোপ ও সৈন্য পৌছিলে মিনহ্লা দুর্গ পুনরায় দখল করিতে চেষ্টা করিবেন।

আমরা আরো দূরে সরিয়া গিয়া এক গ্রামের নিকট আড্ডা দিলাম, এবং মাণ্ডালে হইতে আদেশের অপেক্ষায় রহিলাম। চূর্ণীকৃত গোলার যে অংশ পড়িয়া আমার ঘোড়াকে যমালয়ে পাঠাইল, সেই অংশটুক যদি একটু সরিয়া আমার উপর পতিত হইত, তাহা হইলে, আমার জীবনের লক্ষ্য এই স্থানেই শেষ হইত এবং তাহা হইলে পাঠকের নিকট এই স্থানে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত। তাহা হইলে পরবর্ত্তী জীবনের ঘটনা সকল, আর পাঠককে শুনাইতে পারিতাম না। বোধ করি, সেই জন্যই বাঁচিয়া গেলাম। তবে যুদ্ধের গোল মালে একটী বাঙ্গালীর প্রাণ গেলেও গৌরবের বিষয় হইত, কেন না বাঙ্গালীর ভাগ্যে এমন মৃত্যু কখনও ঘটে না।

আমার ক্ষত খুব গভীর বা গুরুতর নহে। সামান্য এক খণ্ড ভগ্ন গোলার দ্বারা আমি আহত হইয়াছি। তবে রক্তপাত হইয়া শরীরটা কিছু দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বিষ্ণুরাম শর্ম্মার অবস্থা গুরুতর। বর্ম্মা-সৈন্য-দলে আহতগণের চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই, সুতরাং অচিকিৎসায় অনেকের মৃত্যু ঘটে। ইংরেজ সৈন্য দল হইলে বিষ্ণুরামের জীবনের কোন আশঙ্কায়

বিশেষ কারণ থাকিত না। যে গ্রামের নিকট আমরা রহিলাম, সেই গ্রাম হইতে একজন বর্ম্মা চিকিৎসক আসিয়া, কতকগুলি গাছ গাছড়া পিষিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিল। বিষ্ণুর জ্বর হইল এবং ক্ষতের যন্ত্রণায় সে অস্থির হইতে লাগিল। আমার শক্তিতে যতদূর সম্ভব, তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত জঙ্গলে যাহা সম্ভব, তাহা করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের সেনাপতির নামে রাজাজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল যে, "তোমরা যুদ্ধ করিও না, ইংরেজ আমার সঙ্গে বন্ধুভাবে সাক্ষাত করিতে আসিতেছে, ইংরেজ-বাহিনীকে বাধা দিও না।" এ সংবাদ কিন্তু সেনাপতি বোমিয়ার প্রেরিত দূত মারফত নহে, কেন না, এই সময় মধ্যে দূতদ্বয়ের মাণ্ডালে পৌঁছা অসম্ভব। এই রাজাদেশ মিনহ্লা যুদ্ধের পূর্ব্বে হইতেই প্রেরিত হইয়াছে।

রাজাদেশ আলোচনা করিবার জন্য এক যুদ্ধ-সমিতি (Council of war) বসিল, সকলে ইহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিল না। কেন না, ইংরেজ বন্ধুভাবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, সঙ্গে নৌ-বহর কেন লইয়া যাইবে। আর সেই বন্ধুইবা মিনহ্লা দুর্গ অধিকার করিয়া বসিবে কেন? এদিকে ইংরেজবাহিনী কিন্তু মহাগর্ব্বে উপর বর্ম্মাভিমুখে ছুটিয়াছে। সকলেরই সন্দেহ হইল, এ রাজার আদেশ নহে, নিশ্চয়ই রাজার শত্রুপক্ষীয় কোন মন্ত্রীর দ্বারা এই জাল আদেশ বাহির হইয়াছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম যে, এখানেও দেখি, পলাশির যুদ্ধের একটী অভিনয় হইয়া গেল।

আমি সেনাপতির আদেশ লইয়া ডুলি করিয়া বিষ্ণুকে লইয়া মাণ্ডালে যাত্রা করিলাম। দশ দিনে মাণ্ডালে পৌঁছিলাম। মাণ্ডালে পৌঁছিয়া দেখি, হায় "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।" সহর গোরা ও কালা সেপাইতে পূর্ণ। শুনিলাম, রাজা থিবকে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে পাঠান হইয়াছে। নগর ও রাজপুরী গৌরাঙ্গগণের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে। হায়! কোথায় সে পাটরাণী, কোথায় মন্ত্রি সভা, কোথায় সে সৈন্যের দল, কোথায় সে পীত-বসনধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল!! ইহার কিছুইত নাই! সর্ব্বাপেক্ষা আরো দুঃখের বিষয় এই যে, মণিপুরীগণের অধিকাংশই সহর পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে। বিশ্বম্ভর শর্ম্মার বাড়ী শূন্য! তিনি সপরিবারে কোথায় গিয়াছেন? আমি এখন বিষ্ণুকে লইয়া কোথায় দাঁড়াই? এই এক মহাভাবনা

হইল। কি প্রকারেইবা ঔষধ ও পথ্য দ্বারা ইহার প্রাণটা বাঁচাইব, এই চিন্তায় মগ্ন হইলাম। আমি নিজেও পথশ্রান্ত, রৌদ্র, বৃষ্টির প্রভাবে এবং ক্ষতের জন্য অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিশ্বাসঘাতকের দলছাড়া সহরস্থ আর সমস্ত বর্ম্মাগণ পলাইয়াছে!

অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী বৃদ্ধার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাহার নিকট বিশ্বম্ভর ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,"তাহারা কোথায় গিয়াছে,ঠিক জানি না, তবে আমার অনুমানে বোধ হয়, তাহারা মাডায়াতে গিয়াছে।" ভারি অনুপায়ের মধ্যে পড়িলাম, বিষ্ণুকে লইয়া নদীর ধারে চলিলাম,তথায় গিয়া এক খানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া মাডায়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় পৌছিয়া বিশ্বম্ভর শর্ম্মার বর্ম্মা নামে তাহাকে খোঁজ করিয়া, তাঁহারা যেথানে থাকেন, তথায় উপস্থিত হইলাম। ধর্ম্মদেবী আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিল "আপনি আসেলেন, বড় দাদা কোথায়?" আমি বলিলাম, তোমার বড় দাদা সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছেন, তাঁহার আর উঠিবার শক্তি নাই, অবস্থা বড় খারাপ। এই সংবাদে ব্যস্ত হইয়া ধর্ম্মদেবী দৌড়িয়া গিয়া তাহার মাকে সংবাদ দিল, তাহার মা, বিষ্ণুর স্ত্রী দৌড়িয়া আসিয়া আমার মুখে বিষ্ণুর কথা শুনিয়া নদার ঘাটের দিকে ছুটিল। তাহারা বিষ্ণুর আসন্নাবস্থা দেখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল, কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশী নারীগণের ন্যায় কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইল না। বিষ্ণুও তাহার মা, ভগ্নী ও স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিল।

আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া বিষ্ণুকে তাহাদের নুতন বাসস্থানে লইলাম, তাহার বাহুর অস্থি মাংস দলিত ও ছিন্নভিন্ন হওয়ায় পচিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। যদি ডাক্তারি মতে চিকিৎসা করা যাইত, তাহা হইলে বুঝি এতটা হইত না। কেবল অচিকিৎসায়ই তাহার ঐ প্রকার অবস্থা হইরাছে। স্থানীয় একজন বর্ম্মা ডাক্তারকে তাহার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হইল। বিষ্ণুর জ্বর সর্ব্বদাই থাকে, চেহারা বদ হইয়া গিয়াছে, সময় সময় জ্বরের চোটে প্রলাপ বকে।

পাঠক বিষ্ণুকে এই ভাবে রাখিয়া, স্বাধীন ব্রহ্মে যে এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, সেই বিষয় একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

আমি অনেকদিন পরে স্নান করিয়া পেট ভরিয়া আহার করিয়া কতকটা সুস্থ হইলাম। তখন ধর্ম্মদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে "জেঠা মহাশয়

(বিশ্বম্ভরকে আমি জেঠা মহাশয় এবং তাহার পত্নীকে জেঠী মা বলিতাম, অবশ্য বর্ম্মা ভাষায়), ও হরিরাম, কানাইরাম কোথায়?" তাহাতে সে বলিল যে, "তাঁহারা পাহাড়ের নীচে কি পরামর্শ করিতেছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসের পরামর্শ, আমি তথায় যাইতে পারি কি?" তাহাতে সে বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, তাঁহারা এখনই আহার করিতে আসিতেছে।"

ইহার কিছুক্ষণ পরই বিশ্বম্ভর শর্ম্মা দুই পুত্রসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে দেখিয়া মহা খুসী হইলেন। কিন্তু আমার মুখে বিষ্ণুর অবস্থার কথা শুনিলে তাহার মুখটা মলিন হইয়া গেল, এবং তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে দেখিতে গেলেন। বিষ্ণুকে দেখিয়া সকলেই অশ্রু বর্ষণ করিলেন। বৃদ্ধ তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমার মুখে যুদ্ধের হাল শুনিলেন এবং আমার নিজ শরীরের ক্ষতও দেখিলেন। বিষ্ণুকে যে আমি সুশ্রূষা করিয়াছি, আপন ভাই অপেক্ষাও তাহাকে অধিক যত্ন করিয়াছি, তাহা জানিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

আরো কহিলেন যে, "নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু বিজয়ী হও, দীর্ঘজীবী হও। তুমি যেভাবে বিষ্ণুকে রক্ষা করিয়া এখানে আনিয়াছ, তোমার সে গুণের প্রতিশোধ এ জীবনে দিতে পারিব না। তুমি ধন্য ছেলে, বাঙ্গালীর ঘরে যে এমন সাহসী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছেলে জন্মিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। কিন্তু তোমার কার্য্য দেখিয়া আমার পূর্ব্বের সন্দেহ দূর হইল। আমার বিষ্ণু যে বাঁচিবে, সে আশা নাই, তবে তোমার জন্য অযত্নে মারা পড়িল না, এই সুখের বিষয়। বিষ্ণু যে যুদ্ধে আহত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, সে গৌরবের বিষয়, বীর পুরুষের উপযুক্ত কার্য্যই বটে। আমাদের বংশে কখনও কেহ কাপুরুষ হয় নাই, প্রায় সকল পুরুষই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে, তবে আমার বোধ করি, স্বাভাবিক মৃত্যু হইবে। আমিও লোয়ার বর্ম্মায় ইংরেজের সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে মৃত্যু হয় নাই। এখন আর যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই, ইচ্ছাও নাই, তাই বুঝি স্ত্রীলোকের মত মরিতে হইবে! নিরুপায়, এই বলিয়া বৃদ্ধ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

তিনি স্নানাহারের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, আমরা সকলে পীড়াপীড়ি

করিয়া তাঁহাকে স্নানাহার করাইলাম। তাহার স্নানাহার সমাপ্ত হইলে, আমি তাঁহাকে মাণ্ডালের বর্ত্তমান সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সে বড় মর্ম্মভেদী কথা। সে বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার কথা মনে পড়িলে, মনে বড় ঘৃণা ও ক্ষোভ উপস্থিত হয়।"

আমি। কাহার কর্ত্তৃক রাজ্যের এরূপ সর্ব্বনাশ হইল?

বিশ্বম্ভর। সেই বেটা বিশ্বাসঘাতক, দুরাশয়, পাপমতি, কৃতঘ্ন ডিউন্-উন্-মিঞ্জ কর্ত্তৃক এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

আমি। শুনিলাম যে, ইংরেজ-সৈন্য মাণ্ডালে উপস্থিত হইল, রাজপুরীতে প্রবেশ করিল, ও অসহায় অবস্থায় রাজাকে সামান্য কয়েদীর ন্যায় বন্দী করিয়া লইয়া গেল, আর রাজ্যের ও রাজধানীর সৈন্যগণ তাহা বসিয়া দেখিল। রাজাইবা এরূপ ভাবে কেন ধরা দিলেন? তিনি যদি যুদ্ধ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে পলাইতেও পারিতেন। একি? একটা স্বাধীন রাজ্যের নৃপতিকে ধরিয়া লইয়া গেল, তাঁহার রক্ষার জন্য একটা সামান্য বন্দুকের আওয়াজও হইল না!!! আমাকে এই রহস্য ভেদ করিয়া বলুন।

বিশ্বম্ভর। বাছা! আমরা পূর্ব্বে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না। মাত্র গুজব শুনিতে পাইতাম যে, ইংরাজ সৈন্য মাণ্ডালের দিকে আসিতেছে। এ প্রকার গুজব আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই। কখনও শুনিতে পাই যে, বিশ হাজার চীন সৈন্য মাণ্ডালে দখল করিবার জন্য আসিবে, কখন শুনিতে পাই যে, বহু সহস্র সান মাণ্ডালে অভিমুখে আসিতেছে, কিন্তু অবশেষে জানিতে পারি যে, এ প্রকার গুজবের মূলে কোন সত্য নাই। সেই কারণ বশতঃ ঐ সকল গুজব আমরা তত গ্রাহ্য করি নাই। তবে রাজা ও রাজমন্ত্রিগণ এই বিষয়ে ঠিক সংবাদ জানিতেন কি না, তাহা জানি না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, রাজার নিকট এমন কোন সংবাদ পৌঁছে নাই, যাহাতে তিনি ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজ তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আসিতেছে। তিনি যদি বুঝিতেন, ইংরেজ তাঁহাকে বন্দী করিতে আসিতেছেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারিতেন। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীগণ ইংরেজের নিকট অর্থ পাইয়া এবং আপন আপন প্রতিহিংসার চরিতার্থ করিবার জন্য গোপনে ইংরেজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শত্রু ডাকিয়া আনি-

য়াছে। এবং এদিকে রাজাকে জানাইয়াছে যে, ইংরাজ রাজদূত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইংরেজের রাজ্য এবং রাজার রাজ্য মধ্যে অনেকগুলি জটিল বিষয়ের মীমাংসা করাই ইংরেজের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা রাজাকে আরো বুঝাইয়াছিল যে, বোম্বে বর্ম্মা কোম্পানিকে যে তিনি তেইশ লক্ষ্য টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন, সেই বিষয় মীমাংসা করাও আর একটা উদ্দেশ্য। ইংরেজ আপনার সহিত শত্রুতা করিতে আসিতেছেন না, বন্ধুভাবে আসিতেছেন।

কোন কোন মন্ত্রী রাজাকে এ কথাও বলিয়াছিল যে, তোমার ভাই নিয়াং-ইয়াং ইংরেজের সঙ্গে আসিতেছেন।

সরলবুদ্ধি নির্ব্বোধ রাজাও তাই বিশ্বাস করিয়া মন্ত্রিগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই আপনার বোকামির পুরস্কার পাইলেন। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, যখন ইংরেজ সেনাপতি তাহাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দস্তখতি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখাইয়া বলিলেন যে, "আপনি আমার হাতে বন্দী হইলেন।" মুহূর্ত্ত মধ্যে ইংরেজ সৈন্যগণ রাজপ্রাসাদ ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি তাঁহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র সময় দিলেন। এই আধা ঘণ্টার মধ্যে তিনি যাহা যাহা সঙ্গে লইতে পারেন, তাহা লইয়া প্রস্তুত হইলেন। হায়! একজন সামান্য খুনি আসামী অপেক্ষাও একজন স্বাধীন রাজার দশা শোচনীয় হইয়া উঠিল! সেই আধ ঘণ্টা সময় টুকুর মধ্যে তিনি কি লইলেন, কি না লইলেন, তাহার নির্ব্বাসন দণ্ডের আজ্ঞা পাইয়াই, তাঁহার চক্ষুস্থির। যে রত্নগর্ভা ব্রহ্মদেশের অধীশ্বর তিনি, যাঁহার রাজ্যে অসংখ্য স্বর্ণ খনি, বহু সংখ্যক মূল্যবান রুবি ও জেড পাথরের খনি, তাঁহার ঘরে কি বহু মূল্যবান ধনরত্নের অভাব! কি ফেলিয়া কি লইলেন, ভাবিয়া অস্থির। পরোয়ানা দেখিয়াই চক্ষুস্থির। ইংরেজের সভ্যতা, সরলতা ও ন্যায় বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই তিনি নির্ব্বাক।

ইংরেজ সেনাপতির অনুগ্রহ-প্রদত্ত আধ ঘণ্টা সময় অতীত হইল। কিন্তু তবু হতভাগ্য রাজা নির্ব্বাসনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিলেন না, তখন সেনাপতি রোশ পরবশ হইয়া বলিলেন স্লেডেন (Sladen) ইহাকে বল যে, আমি ইহাকে আধ ঘণ্টা সময় দিয়াছিলাম, তাহা অতীত হইল, আরো পনর মিনিট সময় দিলাম, ইহার মধ্যে এ প্রস্তুত হইতে না পারিলে, আমি ইহাকে জোর করে গরুর গাড়ীতে চড়াইব। অগত্যা নিরুপায় হইয়া অপরিণামদর্শী নির্ব্বোধ

রাজা আপন রাজ্য ও রাজপুরী হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। কত মূল্যবান প্রস্তর কত জনের হাতে পড়িল, তাহার কি শেষ আছে?"

"ইংরেজ আসিতেছে এই জনরব শুনিয়া তাহার পাটরাণী সুপায়ালাট তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, চলুন আমরা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শৈব গিয়া বাস করি"। কিন্তু বোকা রাজা সে কথা শুনিলেন না। যখন ইংরেজ সৈন্য নগরে প্রবেশ করে, তখনও নাকি ফরাসি দূত তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, আপনি ফরাসি পতাকার নীচে আসিয়া দাঁড়ান, দেখি আপনার অনিষ্ট কে করে? তাহা যদি তিনি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কেশও ইংরেজে স্পর্শ করিতে পারিতেন না।"

"রাজাকে এই ভাবে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে রাজধানীর রাজভক্ত সৈন্যগণ ও প্রজাগণ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিয়া মনের খেদ মিটাইল। রাজার সঙ্গে মাত্র একজন বিশ্বাসী মন্ত্রী বনবাসে গমন করিলেন। হায়! এমন দৃশ্য কেহ কভু দেখে নাই বা শোনে নাই।"

আমি—তারপর কি হইল?

বিশ্বম্ভর—তাহার পর ঘোষণা করা হইল যে, বর্ম্মারাজ্য ইংরেজের দখলে আসিল। ইংরেজ এদেশের রাজা হইলেন। সকলেই, জাতীয় স্বাধীনতা গেল, এবং পরাধীন হইলাম, বলিয়া ভাবিয়া আকুল হইলেন এবং লোয়ার বর্ম্মায় যেমন সকলকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে, শীঘ্রই আমাদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে, এই ভাবনা হইল। সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, আমরা কোন পুরুষেও আপনার অস্ত্র কাহাকেও সমর্পণ করি নাই। এখনও করিব না, ইহাতে আমাদিগের অদৃষ্টে যাহাই হয় হউক। এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আমরা সকলে সপরিবারে পলাইয়া রাত্রিযোগে এখানে আসিয়াছি।

আমি—আচ্ছা আপনি জানেন কি, মিনহ্লাতে আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে বারণ করিল কে?

বিশ্বম্ভর—উহা বিশ্বাস-ঘাতকদিগের জাল পত্র। রাজা তাহার বর্ণ বিসর্গও জানিতেন না। বিশ্বম্ভর শর্ম্মার কথা শুনিয়া অবাক হইলাম।

বৃদ্ধের মুখে শ্লেডেনের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এ কোন শ্লেডেন? একি সেই জাল সদাগর শ্লেডেন? ইনি তখন সদাগর ছিলেন, এখন রাজাকে বন্দীকরণ ব্যাপারে পলিটিক্যাল আফিসর হইয়া আসিয়াছেন। ইনি এখন সেই দোকান পশার দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ

করিয়াছেন। ইনি কি তিনি? সন্দেহ নিবারণের জন্য বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,আপনি ত রাজাকে বন্দী করার সময় উপস্থিত ছিলেন না,বা আপনি ত ইংরেজী জানেন না, তবে প্লেডেনকে সম্বোধন করিয়া যে ইংরাজ সেনাপতি ইংরেজী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কেমন করিয়া বুঝিলেন? বৃদ্ধ কহিলেন যে, রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে, পর সেই দিন রাত্রিকালে রাজভক্ত মন্ত্রীগণের সঙ্গে আমরা গোপনে সাক্ষাৎ করি। তাঁহারা একথা বলিলেন। তাঁহারা রাজপুরীস্থ একজন ইংরেজী জানা দোভাষীর মুখে একথা শুনিয়াছেন। দোভাষী আরো বলিয়াছে যে প্লেডেন একজন সৈনিক বিভাগের কর্ণেল। তিনি পলিটিক্যাল অফিসার হইয়া আসিয়াছেন, তিনি ইহার পূর্ব্বে আরো কয়েকবার মাণ্ডালে আসিয়াছিলেন।

বৃদ্ধের মুখে খাঁটি কথা শুনিয়া আমার পূর্ব্বের যে ধারণা জন্মিয়াছিল এবং যে ধারণা মনে জাগিত, তাহা প্রমাণিত হইল।

ত্রিংশ অধ্যায়।

থিবর নির্ব্বাসন, প্রজার গুপ্ত মন্ত্রণা।

এই সকল বিষয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শেষে বৃদ্ধকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এখন আপনারা কি উপায় স্থির করিয়াছেন? পলায়ন করিবেন কি? তিনি কহিলেন যে, সেই সকল বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য আমাদের মন্ত্রণা হইতেছে। যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত হয়, তাহাই করা হইবে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি তথায় উপস্থিত হইতে পারি কি? তাহাতে তিনি কহিলেন যে, এই গুপ্ত মন্ত্রণা সভায় সকলের যাইবার আদেশ নাই, তবে আমি অনুরোধ করিলে বোধ করি তোমাকে তথায় প্রবেশ করিবার অধিকার দিবেন।

অতঃপর বিষ্ণুকে একবার দেখিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া ঔষধ ও পথ্যের কথা ভাল মত বলিয়া দিয়া আমরা তথায় চলিলাম। জঙ্গলের মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে পাহাড়ের নিম্নে একটী ফুঙ্গিচাঁয়ে উপস্থিত হইলাম। আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ ভিতরে গিয়া দলপতিদিগের নিকট সভায় আমার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার মুখে দল-

পতিগণ আমার বিশ্বস্ততা ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধের অনুরোধে আমাকে ভিতরে যাইতে আদেশ করিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মদেশী প্রথানুযায়ী জানু পাতিয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিলাম।

চাঁওটী একটী প্রকাণ্ড বৌদ্ধাশ্রম। সমস্তই সেগুণ কাঠদ্বারা নির্ম্মিত। তাহার একটী খুঁটি হাতে বেড় পাইবার সাধ্য নাই, এমন এক একটী আদত সেগুণ কাঠের দ্বারা প্রস্তুত খুঁটি সকল। ছাদ রথাকৃতি সপ্ততল বিশিষ্ট, ফরাপাটের ভাবে নির্ম্মিত, শেষপ্রান্ত রথের চূড়ার ন্যায় পরিণত। আশ্রমের প্রাচীর সকলও মোটা সেগুণ কাঠের তক্তাদ্বারা নির্ম্মিত। মেজে ভূমি হইতে পাঁচ ফুট উচ্চে, সেগুণ কাঠের তক্তাদ্বারা নির্ম্মিত। মধ্যে এক প্রশস্ত মুক্ত স্থান। সেই স্থান বসিবার জন্য। তাহার একপ্রান্ত কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে বিভক্ত, তথায় প্রধান ফুঙ্গিগণ বাস করেন। অপর প্রান্তে এককোণ রন্ধন-শালা। তাহার পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে ফুঙ্গিবালকগণের বাসস্থান। পূর্ব্বোক্ত মধ্য কক্ষের এক প্রান্তে এক আসনে একটী শ্বেতপ্রস্তরময় বুদ্ধমূর্ত্তি, তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রায় সোনার পাত্তা দ্বারা মোড়া, সেই আসনের চতুষ্পার্শ্বে ভক্ত বর্ম্মাগণ-প্রদত্ত নানা উপহার যত্নে রক্ষিত। মধ্যকক্ষের সম্মুখে বারান্দায় প্রায় আড়াই হাত উচ্চ একটী ঘণ্টা ঝুলান রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে প্রকাণ্ড এক জয়ঢাকসদৃশ ডঙ্কা দোদুল্যমান রহিয়াছে। তাহার সঙ্গে একখণ্ড হরিণের সিং ঝুলান রহিয়াছে। অতি ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে সেই সিংখণ্ডদ্বারা ঘণ্টা পিটাইয়া সাড়া দেওয়া হয়, বালক ফুঙ্গিগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালীন স্তোত্র পাঠ করিতে থাকে।

কোন কোন নির্দ্দিষ্ট তেহারে বা ভজনার সময় জয়ঢাক পিটান হইয়া থাকে।

ফুঙ্গিচাঁয়ের আঙ্গিনাটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাহাতে নানাবিধ ফল ও ফুলের বৃক্ষ সকল যত্নে রোপিত ও রক্ষিত হইয়াছে।.

মধ্য কক্ষটীর মধ্যে প্রকাণ্ড একখানি গালিচা বিছান। তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে চীনামাটীর ও পিতলের পিকদানি সকল রক্ষিত এবং পানের ডিবা ও ব্রহ্মদেশী চুরট রক্ষিত। কক্ষটীর একপ্রান্তে এক উচ্চাসনে আসীন এক বৃদ্ধ ফুঙ্গি উপবিষ্ট। তাঁহার নিম্নে, পার্শ্বে আর কয়েকটী ফুঙ্গি আসন গ্রহণ করিয়াছেন। গালিচাটীর পার্শ্বে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বর্ম্মা ভদ্রলোক নীরবে

বসিয়া পান চিবাইতেছেন এবং চুরট টানিতেছেন, আমি তথায় গেলে সকলে একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ইহার পর আরো অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া অবনত-জানু হইয়া ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ফুঙ্গিকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে একটী পত্রবাহক আসিয়াছে, সংবাদ আসিল। পত্রবাহকের নিকট হইতে একখানি পত্র আনীত হইয়া বৃদ্ধ ফুঙ্গি উ-নাস্তার (উ-আনন্দ) হস্তে অর্পিত হইল। ফুঙ্গি পত্রখানি খুলিয়া একবার মনে মনে পাঠ করিলেন এবং পরে উহা জোরে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই :—

মহামহোপাধ্যায়, পরমারাধ্য ফুঙ্গি উ-নাস্তা দেব,বুদ্ধের প্রতিনিধি মহোদয়ের শ্রীশ্রীচরণেষু,

"দেব! আপনার প্রেরিত চরহস্তে আপনার লিপি প্রাপ্ত হইয়া শিরোধার্য্য করত পাঠ করণ পূর্ব্বক সমস্ত অবগত হইলাম। হঠাৎ রাজ্যে যে মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া এখানকার আপামর সাধারণ সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং যিনিই এই সংবাদ শুনিতেছেন,তিনিই দুঃখে ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইতেছেন। যিনিই এই সংবাদ শুনিতেছেন, তিনিই একবাক্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, প্রাণ থাকিতে বশ্যতা স্বীকার করিব না। এখানকার প্রধান প্রধান লোক সকলকে লইয়া আমরা এক পরামর্শ-সমিতি আহ্বান করিয়াছিলাম, সকলেই একবাক্যে ধার্য্য করিয়াছি যে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব ও রাজ্যের শত্রুদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে চেষ্টা করিব। আপনাদিগের মতামত বিস্তারিত জানিতে প্রার্থনা করি। আমার ইচ্ছা স্বয়ং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত নিবেদন করিব এবং শুনিব।

দাসাধম

মগা। শিম-গার তুজী, মংহ্লা আউং।

এই পত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বপূজ্য ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ফুঙ্গি গম্ভীর স্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! স্বাধীনতা রক্ষা করা শ্রেয়ঃ, কি পর-পদানত হওয়া শ্রেয়ঃ? আমি পুনর্ব্বার তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কল্য এবং অদ্য প্রাতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা ও মন্ত্রণা করা হইয়াছে, তাহাতে তোমরা সর্ব্ববাদীসম্মত আছ কি না? যাহাদের অন্তঃকরণ দৃঢ় নহে এবং যাহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে এখনও বলি-

তেছি, এখান হইতে সরিয়া যাও, আমরা তাহাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিব না, তাহারাও যেন আমাদের বিরুদ্ধাচরণ না করে। বৌদ্ধধর্ম্ম অতি পবিত্র ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মে কোন জীব-হিংসা করা, মিথ্যা কথা বলা, পরস্বাপহরণ করা, পরদার গমন করা এবং সুরাপান করা মহাপাপ বলিয়া গণ্য। আমার আজ আশি বৎসর বয়স হইতে চলিল, আমি যে আর অধিক দিন এ সংসারে থাকিব, এমন আশা করি না। তবে আমি যে আমার এই শেষকালে তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, ইহা কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে, অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য। আমার মতে এবং শাস্ত্রানুসারে ইহাতে কোন পাপ নাই, রাজ্ঞীর সম্মান রক্ষা, দেশের ধনরত্ন রক্ষা করা, পরম পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা করিবার চেষ্টা না করা মহাপাপ বলিয়া গণ্য। আমি ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময় দেখিতেছি। রত্নগর্ভা ব্রহ্মদেশ হইতে কালারা স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি মাণিক্যাদি খুঁড়িয়া লইয়া দেশকে খোলা করিয়া ছাড়িবে, লোকের মতিগতি কালাদিগের মত হইয়া যাইবে। ব্রহ্মদেশী লোকে কালাদের দেখাদেখি সুরাপান করিতে শিক্ষা করিবে, ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইবে। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম তাহারা ভুলিয়া যাইয়া বংশানুক্রমে তাহারা কালাদিগের দাস হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মদেশের ফুঙ্গি, ফুঙ্গিচাঁও ও মঠ সকলের প্রতি লোকের তাদৃশ বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিবে না।”

ফুঙ্গির বক্তৃতা শেষ হইলে, মংছান নামক একজন তুজি অবনত মস্তকে যোড়করে বিনয় পূর্ব্বক কহিল, “কয়া!* ভাল তোপ নাই, এবং ইংরেজের সৈন্যের মত সুশিক্ষিত সৈন্য নাই, তাদৃশ অর্থবলও আমাদের নাই। অতএব এ প্রকার অসমাবস্থায় ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে পরাভব নিশ্চয়। এমতাবস্থায় ধনে প্রাণে মারা যাওয়া ভিন্ন অন্য ফল হইবে না। যখন রাজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, রাজকোষ যখন লুণ্ঠিত হইয়াছে, রাজ্যের সৈন্য ও সেনাপতি যখন ভগ্নমনোরথ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, অধিকন্তু ফিন্‌নৃ-উন-মিঞ্জি যখন দেশের শত্রু হইয়া কালাদিগকে সহায়তা করিতেছে, তখন আমার বিশ্বাস, আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা পাওয়ার কোন আশা নাই। কয়া! এই আমার মত, আমাকে এজন্য ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক।”

মংছানের কথায় রুষ্ট হইয়া বো-মং নামক একজন সৈনিক পুরুষ অতি

---

* কয়া-অর্থ দেবতা ও ধর্ম্ম মন্দির বুঝায়। ব্রহ্মদেশী লোকে, ফুঙ্গিকে, হাকিমদিগকে ও রাজাকে কয়া শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকে।

তেজের সহিত গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিল যে, "কি কালাদের ভাল বন্দুক আছে, ভাল তোপ আছে বলিয়া ভীত হইয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা করিব? অর্থ! আমাদিগের কি অর্থের অপ্রতুল? যে দেশের ভূ-গর্ভ কেবল মণি মাণিক্য ও স্বর্ণ রৌপ্য পূর্ণ, সেই দেশের লোকের অর্থাভাব! দুই চারি জন স্বদেশীবিশ্বাসঘাতকের ভয়! প্রকৃত বীরজাতি কি যুদ্ধে হারিব বলিয়া বিমুখ হয়? সকলেই জিতিব বলিয়াই মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া জাতীয় আহবে অবতীর্ণ হয়। কোন বীর পুরুষ কি যুদ্ধে সবংশে মরিব বলিয়া পূর্ব্বাহ্নে চিন্তা করিয়া আকুল হয়? সে ভাবনা সে কখনও করে না। তাহার একই ভাবনা, কি করিয়া শত্রু দলন করিব, কি করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিব। যে জাতির বাহুবলে বঙ্গদেশ, আসাম, মণিপুর প্রভৃতি কম্পিত, যে জাতি এক সময়ে স্বীয় বাহুবলে চীন রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত দখল করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, যে জাতি এক সময়ে শ্যামরাজ্য ও শানরাজ্য নিজ পদানত করিয়াছিল, আজ কিনা সেই জাতি কয়েক জন কালার ভয়ে তাহাদের পদতলে মস্তক স্থাপন করিবে, কিছুতেই না। যাবত ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত বহিবে, ততদিন পরপদানত হইব না।

বলা বাহুল্য যে বো-মংর উত্তেজনা-পূর্ণ বাক্যে সমস্ত সভাসগুলি ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল, বৃদ্ধ ফুঙ্গি ও তাঁহাকে সাধুবাদ দিলেন।

এই মন্ত্রণা সভার কক্ষে সেগইন, পোকুকু, কোয়েরে, ইউ, এবং মিকিটিলা প্রভৃতি স্থান সকল হইতে প্রতিনিধি সকল আসিয়াছিলেন। শোয়েরে ও ইউ জেলার লোক গুলি বড় সমর প্রিয়। এই দুই জেলার লোকে যুদ্ধের জন্য বংশানুক্রমে রাজ সরকার হইতে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিয়া থাকে। বো-মংর বাটী ইউজেলায় জেলায়।

বৃদ্ধ ফুঙ্গি উ-নান্তা মাণ্ডালের মহামায়া মুনি নামক মঠের সর্ব্বোচ্চ পুরোহিত। ইঁহার সদৃশ পদমর্য্যাদা আমাদিগের বঙ্গদেশের কোন পণ্ডিত বা পুরোহিতের দৃষ্ট হয় না। ইংরাজীতে ইহাকে আর্কবিশপ বলা যাইতে পারে। ইনি দূর সম্পর্কে রাজ বংশের সহিত জ্ঞাতিত্ব সূত্রে আবদ্ধ। দ্বাদশ বর্ষ কাল হইতে ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আজীবন ধর্ম্ম ও জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া নিষ্কলঙ্ক ভাবে অতি প্রতিভার সহিত আপন ব্রত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করেন নাই।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী চিরকুমার ব্রহ্মদেশী ফুঙ্গিগণ কেমন স্বদেশপ্রেমিক, সাহসী ও তেজস্বী, তাহা বৃদ্ধ উ-নাস্তার দৃষ্টান্তেই পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই মত তির্ব্বতের লামাগণ এত স্বদেশপ্রেমিক ও সাহসী যে, তাঁহারা স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকেন। তাদৃশ মুসলমানের মোল্লাগণ ও খ্রীষ্টানদিগের পাদ্রিগণের কেমন স্বদেশ-প্রেম, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু পোড়া হিন্দুগণের বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুর পুরোহিতগণ কেমন নিস্তেজ, স্বদেশ-প্রেম-শূন্য ও ভীরু, তাহা আর বাঙ্গালী পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। যদি অপর ব্যক্তি কোন সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে ইহারা আসিয়া তাহার বিরোধী হন, যাহাতে সে নিবৃত্ত হয়, তাহার চেষ্টা করেন।

উপস্থিত ব্যক্তি সকলের মধ্যে প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্প অটল ও দৃঢ় থাকে, এই উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ ফুঙ্গির আদেশে ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বীজমন্ত্র স্বরূপ ধর্ম্মকথা সকল এক ফুঙ্গি কর্ত্তৃক কাগজে লিখিত হইল এবং তাহা অগ্নিদ্বারা ভস্ম করিয়া ফেলিয়া সেই ভস্মগুলি একটী ছোট পিতলের গামলার মধ্যে রাখিয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা হইল এবং সভাস্থ সকলকে ক্ষুদ্র একটী একটী বাটীতে করিয়া ঐ পবিত্র জলের একটু পান করিতে দেওয়া হইল। ইহা কঠিন প্রতিজ্ঞার এক অকাট্য প্রমাণ। তাহার পর বৃদ্ধের আদেশে আর এক জন ফুঙ্গি ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে কোন এক অংশ উচ্চরবে পাঠ করিতে লাগিলেন এবং সভাস্থ সকলে পাঠ-শালার ছাত্রগণের নামতা পাঠের ন্যায় উচ্চরবে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল শেষ হইলে বৃদ্ধ ফুঙ্গি আদেশ করিলেন যে, আগামী কল্য কার্য্য বিবরণ অবধারিত হইবে।

পরদিন পুনরায় সভা হইল এবং সেই সভায় নিম্নলিখিত মন্তব্য ধার্য্য হইল।

"প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক জেলার লড়াইয়ের সংবাদ, স্বপক্ষ বিপক্ষের হতাহতের বিবরণ সভাপতি উ-নাস্তার নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ দশজন ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিযুক্ত থাকিয়া শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, এবং গোপনে সেনাপতিকে সংবাদ দিবেন। প্রত্যেক পরিবারের সতর বৎসর বয়স হইতে ষাট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকলেই যুদ্ধার্থ ও আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত থাকিবেন, এবং প্রত্যেক পরিবার হইতে অন্ততঃ একজন যুদ্ধার্থ গমন করিবে। যাহারা এই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বিমুখ হইবে, তাহাদিগকে দেশের শত্রু মনে করিয়া সপরিবারে শিরশ্ছেদন করা হইবে।"

আরও স্থির হইল যে, কালাদিগের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে তোপের সম্মুখে ব্রহ্ম-দেশী সৈন্য টিকিতে পারিবে না। অতএব যথাসম্ভব চোরা যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। এই চোরা যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিতে হইবে। রাত্রিকালে বিপক্ষের কোন থানা বা কেল্লা আক্রমণ করা, রসদের পটিতে আক্রমণ করিয়া রসদ লুট করা, খাজনাখানা লুট করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যের দল যখন বাহির হইবে, তাহা-দিগকে আক্রমণ করিয়া নাস্তানাবুদ করা ইত্যাদি প্রস্তাব ধার্য্য হইল। এই সভার মন্তব্যের নকল প্রত্যেক জেলার অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইবে। উৎসাহিত একদল যুবক ফুঙ্গি মফঃস্বলে গিয়া, লোক সকলকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিবে ইত্যাদি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

স্যাগাইনের লড়াই।

এদিকে বিষ্ণুরাম শর্ম্মার অবস্থা ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল। জ্বরবিকারে সে কখন কখন "মার মার, শত্রুকে বর্শা মার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কখনও বা বলে "আন আমার ঘোড়া আন, আমি শত্রুর মাথা কাটিয়া আনি।" কখনও মা, ভগ্নী, স্ত্রীকে ডাকিয়া বলে "তোমরা ভাবিও না, আমি স্বর্গে চলি-য়াছি, সেখানে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।" কখনও আমাকে সম্বোধন করিয়া বলে, ভাই মং কালা! আমি চলিলাম, তোমার উপর শত্রুনাশের ভার দিয়া চলিলাম, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া যুদ্ধ কর, তুমি আমার নিজের তৈয়ারী লোক, তোমাকে নিজ হাতে অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিয়াছি, আমার নামে কলঙ্ক লেপন করিও না। যুদ্ধে কখনও পিঠ দিও না।" ইত্যাদি।

বিষ্ণু সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় নাই, ডাকিলে উত্তর করে, কোথায় বেদনা তাহাও বলে কিন্তু পূরা জ্ঞানও নাই, সে জ্বরের বিকারে যাহা স্বপ্নবৎ দেখে তাহাই চেঁচাইয়া বলে। আবার জিজ্ঞাসা করিলে বলে, কই কিছুই না।" সে যাহা মনে মনে চিন্তা করিত, বিকারে তাহাই বলিতে লাগিল। সে একজন প্রকৃত বীর ছিল। ক্রমে তাহার নাড়ীর অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে সকলের নিকট বিদায় চাহিল। পিতার নিকট বিদায়

লইয়া, "মা বিদায় দাও, হরিরাম, কানাইরাম বিদায় দাও, ধর্ম্মদেবী বিদায় দাও, ভাই মংকানা বিদায় দাও" এই বলিয়া নীরব হইল, চক্ষু মুদ্রিত করিল, কিন্তু শ্বাস বহিতে লাগিল, আমরা সকলে তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল মধ্যে তাহার শ্বাস টুকু পড়িয়া গেল, বীর পুরুষের আত্মা নশ্বর দেহ ছাড়িয়া অমর ধামে চলিয়া গেল।

আমরা ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে, বর্ত্তমান অবস্থানুসারে যতদূর সম্ভব হয়, সমর সজ্জা করিয়া তাহার দেহকে বেষ্টন করিয়া ইরাবতী নদীর ধারে লইয়া গিয়া অগ্নি সংকার করিয়া জীবনের অভিনয় সাঙ্গ করিলাম।

আমাদের আর শোক প্রকাশ করিবার সময় নাই। সকলেই সশঙ্কিত ও শত্রুতায় চিন্তিত। পরদিন আমি ও হরিরাম দুইজনে সেগদীন (Sagding) যাইতে আদিষ্ট হইলাম। আমরা সেগদীনে উপস্থিত হইলাম। তথাচ ডিগ্‌জল সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন, কেননা সেগদীন মাণ্ডালের অতি নিকট, এই স্থানে শত্রুর সঙ্গে অধিক সংঘর্ষ হওয়ায় সম্ভাবনা। তথাকার সেনাপতি বো-শোয়ে, বো-হ্লাবু, এবং বো-উ, এই তিন জনের নিকট, আমরা উপস্থিত হইয়া, আমাদের আগমন-বার্ত্তা প্রদান করিলাম।

ইতি মধ্যে একদল শত্রু সৈন্য সেগদীন দখল করিয়াছে, একদল শোয়েবো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে,এবং মাণ্ডালে হইতে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যের দল নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। সেইজন্য আমাদের সেনাপতিগণ আপন সৈন্য সকল লইয়া পাহাড়ের আড়ালে জঙ্গলাদির মধ্যে আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন।

রাত্রিকালে আমাদিগের সামরিক মন্ত্রণা-সভা (Council of war) বসিল। মং-হ্লাবু বা বো-হ্লাবু তিন জনের মধ্যে উচ্চ পদস্থ। তাঁহার অধীনে আর সকল। বো-হ্লাবুর অধীনে পাঁচ শত লোক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা ভিন্ন পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য আছে। মন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে একজন গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, আগামী পরশ্ব একদল সৈন্য রসদ লইয়া মাণ্ডালে হইতে শোয়েবো যাইবে। পঞ্চাশ জন পাঞ্জাবী পাহারা তাহার সঙ্গে থাকিবে। গুপ্তচর আসিবার পূর্ব্বে স্থির হইয়াছে যে, আগামী কল্য সেগদীনের কালাদের পোষ্ট আক্রমণ করা হইবে। কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া স্থির হইল,আমাদিগের সৈন্যগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া একদল সেগদীনের কালা সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবে, আর একদল রসদপার্টীকে আক্রমণ করিবে।

পর দিন আমরা চারি পাঁচ জন করিয়া অশ্বারোহী সৈন্য ও পিকেট পার্টীর সৈন্য বাহির হইয়া শত্রুর গতিবিধি ও গ্রামবাসীগণের ব্যবহারে যথাযথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। স্যাগাইনের অন্তঃর্গত মিনমুল নামক স্থান হইতে আর দুই শত যোদ্ধা আসিয়া আমাদিগের সঙ্গে যোগ দিল। মোটে আমাদের সংখ্যা সাড়ে সাত শত হইল।

পর দিন প্রত্যূষে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, বিপক্ষের রসদ-পার্টি ষ্টীমারে স্যাগাইনের ঘাটে অবতরণ করিয়াছে। সেনাপতিদের ইচ্ছা ছিল যে, স্যাগাইনের নিকটই রসদপার্টিকে আক্রমণ করা হয়, আমি তাহাতে, আপত্তি করিয়া বলিলাম,"না,তাহা হইলে স্যাগান হইতে বা মাণ্ডালে হইতে সত্বর তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্য আসিয়া আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। স্যাগাইন হইল প্রায় দশ মাইল দূরে, জঙ্গলের মধ্যে উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া শত্রুকে সহজেই নাস্তা নাবুদ করা যাইতে পারিবে।" আমার কথায় সকলেই বলিল যে এই ভাল পরামর্শ। সেদাপতি বো-হ্লাবু স্বয়ং তিন শত সৈন্য লইয়া স্যাগাইনের পোষ্ট আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে পঁচিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য রহিল। আর বো-উর অধীনে তিন শত বন্দুক ও পঁচিশ জন অশ্বারোহী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, এক শত সৈন্য লইয়া বো-শোয়ে আড্ডা বা ক্যাম্প রক্ষার জন্য রহিলেন। আমি বো-উর সঙ্গে পঁচিশ জন অশ্বারোহী সৈন্যের হাবিলদার রূপে চলিলাম।

আমরা জঙ্গলের মধ্য দিয়া অদৃশ্যভাবে চলিলাম এবং রসদপার্টির সংবাদ নানা গুপ্তচর দ্বারা লইতে লাগিলাম। রসদপার্টীর দল গরুরগাড়ী সহ অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে। বিপক্ষ সৈন্যের কোন অভিযান বা রসদপার্টী সৈন্য সকল বিপদসঙ্কুল স্থান দিয়া যাইবার সময় তিনদলে বিভক্ত হয়। অগ্ররক্ষক, মধ্যরক্ষক এবং পশ্চাদ্‌রক্ষক দল সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চলিতে থাকে। আমাদের সর্দ্দার বো-উর জ্ঞান মাত্রই নাই। আমি তাঁহাকে এবিষয় জানাইলাম এবং বলিলাম যে, "আমাদের সৈন্যদেরও সেইরূপ তিনদলে বিভক্ত হইয়া শত্রুর তিন রক্ষকদলকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সমস্ত সৈন্য শত্রুর একদলকে আক্রমণ করিলে অপর দুই দল আমাদের উপর পড়িয়া আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে।" তিনি আমার কথা সঙ্গত মনে করিয়া তাহাই করিলেন। আমি তাঁহাকে আরও বলিলাম যে,"সর্ব্বপ্রথমে আমরা মধ্যবর্ত্তী দলকে আক্রমণ করিব, কারণ মধ্যবর্ত্তী দলে বিপক্ষের রসদ টাকা কড়ি. গুলি বারুদ প্রভৃতি থাকে।

আমরা মধ্যবর্ত্তী দলকে আক্রমণ করিলে যখন তাহাদের মধ্যে "হাল্লাগোল্লা" পড়িয়া যাইবে এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য অগ্রবর্ত্তী ও পশ্চাদবর্ত্তী দল সকল ছুটিবে, তখন আমাদের অগ্রবর্ত্তী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দল তাহাদিগকে যথাক্রমে আক্রমণ করিলে এক মহা হুলস্থূল ব্যাপার আরম্ভ হইবে, শত্রু বিষম গোলযোগে পতিত হইয়া মধ্যবর্ত্তী দলের সাহায্য করিতে পারিবে না।" আমার কথা সকলের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হওয়ায় সেই অনুসারে কার্য্য করা স্থির হইল।

আমার প্রস্তাবানুযায়ী আমাদের তিনদল সৈন্য, শত্রুর তিন দলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল। পথের যে স্থানটী অতি দুর্গম, তথায় রসদপার্টীর মধ্যবর্ত্তী দল পৌঁছাইলে এক থালের আড়ালে থাকিয়া আমরা গুলি চালাইব, এইরূপ স্থির করিয়া,সৈন্য সকল সমাবেশ করা লইল। আমি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এক মৃত্তিকার স্তুপের বা ক্ষুদ্র হেটলার আড়ালে নিয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অগ্র পশ্চাৎ মধ্যভাগ যেথানেই প্রয়োজন হইবে, সেই-খানেই হাজির হইব।

নির্দ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করিয়া বিপক্ষের অগ্রবর্ত্তী দল চলিয়া গেল, তাহার কিছু পশ্চাদভাগেই ধীরে ধীরে গরুর গাড়ী সকল ক্যাঁ কুঁ, ক্যাঁ-কুঁ করিয়া আসি-তেছে, শব্দশুনা গেল। এক এক থানা গাড়ীর দুই পার্শ্বে দুই জন বন্দুকধারী সেপাই ধীরে ধীরে চলিতেছে। গাড়ী সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। বিপক্ষের সঙ্গে ২৫ খানা গাড়ী আছে, জানা গেল এবং তাহার রক্ষক পঞ্চাশজন সেপাহী, তাহাও জানা গেল। এখন বুঝা গেল যে, শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ জন নহে, একশতেরও উপর হইবে।

সেনাপতি বো-উ একটী ক্ষুদ্র বাঁশী বাজাইয়া শিষ্‌ দিবার মত ইঙ্গিত করিবা মাত্র আমাদের পক্ষ হইতে ব্যাং ব্যাং করিয়া এক যোগে পঞ্চাশটী বন্দুক ফায়ার হইল, যাহারা ফায়ার করিল, তাহারা পশ্চাতে হটিয়া বন্দুক ভরিতে লাগিল, আর পঞ্চাশ জন অগ্রবর্ত্তী হইয়া আবার ফায়ার করিল। ইতিমধ্যে রসদপার্টীর সৈন্যমধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহারা সমস্ত গাড়ীগুলি ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে আন্দাজে এক ওয়ালি করিল। তাহাদের কার্ত্তুজের বন্দুক, গুলির তেজ ও পাল্লা অত্যন্ত বেশী, তাহা ছর ছর করিয়া আমাদের মাথার উপর দিয়া গাছ গাছড়া আঘাত করিয়া পড়িতে লাগিল। বিপক্ষের সঙ্গে কয়েক জন ফিরিঙ্গি ও কয়েকজন ভারতবাসী সিবিল কর্ম্মচারী ছিল,

তাহারা ভয়ে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। বন্দুকের ওয়ালীগুলির বিপদ আশঙ্কা করিয়া বিপক্ষের অগ্রবর্ত্তী রক্ষকদল বিপদাশঙ্কা করিয়া যখন রসদ ও খাজনা রক্ষার জন্য ফিরিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল, তখন আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী দল তাহাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিতে লাগিল। শত্রুগণ আত্মরক্ষার জন্য ফিরিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িয়া আমাদের সৈন্যের প্রতি ওয়ালি করিল, দুই পক্ষ হইতেই অগ্নি বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল। বিপক্ষের রসদবাহী দলও তাদৃশ, যেমন রসদ রক্ষার জন্য দৌড়িতে আরম্ভ করিল, আমাদের সৈন্যও সেইরূপ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে মেইন পার্টিতে যোগ দিতে বাধা দিল। এই সময়ে এক মহাকুরুক্ষেত্র কাণ্ড আরম্ভ হইল। শত্রুগণ মধ্যে আঁতঙ্ক উপস্থিত হইয়া এক মহা গোলযোগ আরম্ভ হইল, শত্রু সৈন্যের অনেকে হতাহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। এদিকে আমাদিগের মধ্যে অনেক আহত হইয়া পড়িয়া গেল এবং কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমাদের সৈন্য সকল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া মাটীতে পড়িয়া গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। আমাদিগের ভাল আড়াল ছিল বলিয়া রক্ষা, নচেৎ অধিকাংশ সৈন্যই শিক্ষিত সৈন্যের কার্ত্তুজের বন্দুকের গুলিতে শমনসদনে প্রেরিত হইত। শত্রুগণ আমাদিগকে অত্যন্ত সাহসিক ও নাছোড় মনে করিয়া এবং আমাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক আশঙ্কা করিয়া প্রায় একঘণ্টা কাল যুদ্ধ করিয়া ক্রমে হটিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যে সময়ের মধ্যে তিনবার ফায়ার করে, সেই সময়ের মধ্যে আমাদের একবার ফায়ার করা সম্ভব হইতে লাগিল। কিন্তু খানা ডোবার আড়াল ও জঙ্গল বলিয়া আমাদের তাদৃশ ক্ষতি করিতে পারিল না।

শত্রুগণ যখন হটিতে আরম্ভ করিল, তখন আমি বাঁশী বাজাইলে আমার অশ্বারোহী সৈন্য সকল পাশ কাটাইয়া পলায়মান সৈন্য ও সিবিল কর্ম্মচারিদিগকে আক্রমণ করিল। বর্শাঘাতে অনেক লোক জখম করিলাম। আমার আদেশ ছিল যে, নিরস্ত্র কোন ব্যক্তিকে অযথা জখম বা হত্যা না করে। আমার অশ্বারোহী সৈন্যগণ তিনজন ভারতবাসী ভদ্রলোককে ধরিয়া বাঁধিল। একজন শ্বেতাঙ্গ এবং একজন ফিরিঙ্গি, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, রিভলবার ছুড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে আমাদের একজন লোক আহত হইল। আমি ও মংবা নামক আরজন অশ্বারোহী দুই জনে বেগে ছুটিয়া এই দুই জন লোককে আক্রমণ করিলাম। ইহারা সম্মুখের শত্রুদিগের উপর রিভলবার চালাইতে

চালাইতে আমরা পশ্চাৎ হইতে দুইজন দুইজনকে আঘাত করিলাম। আমি শ্বেতাঙ্গের উরুতে বর্শাঘাত করামাত্র সে পড়িয়া গেল এবং আমার সঙ্গীও ফিরিঙ্গীর দক্ষিণ বাহুতে বর্শা মারামাত্র তাহার হাতের পিস্তল পড়িয়া গেল। দুইজনের দুইটী পিস্তল আমার হইল, দুইজনকেই বাঁধিয়া ফেলা হইল। তিন জন সোয়ারকে এই পাঁচজন কয়েদীর জিম্বা করিয়া দিয়া, আমি যেখানে গোলযোগ বেশী, সেইস্থলেই ছুটিতে লাগিলাম। এদিকে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিপক্ষের গাড়ী গুলি দখল করিয়া ফেলিল। সেপাইদের হত ও আহত ব্যক্তিবাদে আর সকলেই উৰ্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। মাঝে মাঝে তাহারা পশ্চাদ্ ধাবমান বৰ্ম্মাসৈন্যের উপর গুলি চালাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের একদল সৈন্য গাড়ী গুলি বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, আর অপর কেহ কেহ হত ও আহতগণের অনুসন্ধান ও জীবিতগণের সুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। অশ্বাদি ও পদাতিক সৈন্যগণ শত্রুগণকে তাড়াইয়া বহু দূরে রাখিয়া ফিরিল।

স্বপক্ষ ও বিপক্ষের হতব্যক্তিদিগকে এক খানার মধ্যে ফেলিয়া মাটীর দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইল। আহতদিগের মধ্যে যাহারা গুরুতর আঘাত পাইয়াছ এবং যাহারা চলিতে অশক্ত, তাহাদিগকে গাড়ীতে চড়াইয়া ও অপর সকলকে হাঁটাইয়া ডেরা অভিমুখে চলিলাম। পাঞ্জাবী গাড়োয়ান গুলির অনেকে পলাইয়াছে, কয়েকজন হত হইয়াছে এবং তিন চারিজন অনাহত ছিল, তাহাদিগের দ্বারা এবং বর্ম্মাদিগের দ্বারা গাড়ী হাঁকানের কার্য্য সম্পন্ন হইল। রসদ পার্টীতে আটা, ঘি, ডাইল, কার্ত্তুজ, সেপাইগণের পোষাক ও এক গাড়ী বোঝাই টাকা ছিল। সরদার বো-উ স্বয়ং টাকার গাড়ীর ভার লইলেন।

আমরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহোল্লাসে ক্যাম্প অভিমুখে চলিলাম। ইতিপূর্ব্বেই যুদ্ধের সংবাদ একজন সোয়ার দ্বারা পাঠান হইয়াছিল। আড্ডায় পৌঁছিয়া সরদার বো-হ্লাবুর দুর্গতির কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি সেপাইদিগের আউট পোষ্ট আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন না। তথায় অনুমান অপেক্ষা অধিক সৈন্য ছিল এবং অধিকন্তু দুইটী তোপ থাকায় তোপের গোলায় হটিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার কতকগুলি সৈন্য হত ও আহত হওয়ায় বড় ক্ষতিবোধ হইল। কিন্তু তিনি আমাদের জয়ে নিজের পরাজয়ের কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দিত হইলেন।

পূর্ব্বে মিনহ্লার যুদ্ধের কথায় বলিয়াছি যে, এদেশে রাজকীয় সৈন্যের আহত ব্যক্তিগণের কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই। আজ আমরা ডাকু নামে অভিহিত হইলাম। সুতরাং ডাকুর দলে আহতসৈন্যের চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত থাকা অসম্ভব। তবে নিকটবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে একটী বর্ম্মা চিকিৎসককে আনিয়া আহতদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল। সকলেই ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন, সকলেই অবস্থানুসারে কিছু কিছু জলযোগ করিয়া সুস্থ হইলাম।

যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে একে একে পরীক্ষা করিয়া যথাসম্ভব পথ্যের ও ঔষধের ব্যবস্থা করা হইল। বিপক্ষের মোট আটজন কয়েদী আমরা বন্দী করিয়াছি। কিন্তু এই আটজন ছাড়া আর তিন জন পঞ্জাবী গাড়োয়ান ছিল। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্বেতাঙ্গটীর উরুতে জখম, ফিরিঙ্গিটীর দক্ষিণ বাহুতে জখম, তিনজন সেপাইয়ের কাহারো পায়ে কাহারো বাহুতে জখম। ভারতবাসী তিনটী ভদ্রলোকের মধ্যে একজন মান্দ্রাজী, একজন পঞ্জাবী এবং একজন বাঙ্গালী। ইহারা তিন জনেই কমিসারিয়াট এজেণ্ট এবং ফিরিঙ্গি দুইটী কেরাণী।

আমরা, বর্ম্মারা, সকলেই কিছু না কিছু আহার করিয়া সুস্থ হইলাম, কিন্তু কয়েদীগণের আহারের কোন বন্দোবস্তই কেহ করিল না এবং অধিকন্তু দুর্ব্বৃত্ত বর্ম্মাগণ তাহাদিগকে নানা রূপে অপমান করিতে আরম্ভ করিল। কেহ তাহাদিগকে পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দিতে লাগিল, কেহ তাহাদিগকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইল। এই সকল দেখিয়া আমি মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম। সেনাপতিগণের এ বিষয়ে কোন শাসন করা দূরের কথা, বরং তাঁহারাও ইহাদের প্রতি যথেষ্ট নিগ্রহ-সূচক কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বেচারারা একেত আঘাতে জরজর, ক্ষুধায়, ও মন দুঃখে কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার নিগ্রহ ভোগ করিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে। আমার বোধ হইল যে, সেনাপতিদিগের ইঙ্গিতে ইহাদের হত্যা করার প্রস্তাব হইয়াছে। আমি এই বিষয়ে কোন সংবাদ পাই নাই। অবশেষে স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা এই কালা কয়েদীদিগকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করে না। একটী দুর্ব্বৃত্ত বর্ম্মা সৈন্য সহসা উত্তেজিত হইয়া খড়্গ উত্তোলন করিয়া ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, আমি দৌড়িয়া গিয়া মাঝে পড়িলাম এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া হটাইয়া দিলাম। পরে সেনাপতি বো-হ্লাবুর নিকট কহিলাম যে, মহাশয়!

এ কি প্রকার ব্যবহার ? এ প্রকার অসহায় বন্দীদিগকে হত্যা করা ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত কি ? আধুনিক যুদ্ধের এ বর্ব্বর-রীতি নহে। ইহা প্রাচীন কালে শোভা পাইত। বিপন্ন শত্রুর প্রতি দয়া প্রকাশ করা মহত্বের পরিচায়ক। যদি বাস্তবিকই ইহাদিগকে হত্যা করার সংকল্প করা হইয়া থাকে, তবে আমি অদ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। এরূপ লোকদের সঙ্গে থাকিয়া আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না।

আমার কথায় সেনাপতি হ্লাবু কহিলেন যে "আমাদের যখন বাড়ী ঘরের ঠিক নাই, সর্ব্বদা বন জঙ্গলে বাস করিতে হইবে, তখন এই সকল কয়েদী সঙ্গে সঙ্গে করিয়া নানা স্থানে আমাদের যাইবার সুবিধা হইবে না, আমাদের এমন একটা জেলখানা নাই বা এমন একটা নিরাপদ স্থান নাই যে, ইহাদিগকে যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখি। যদি আমরা ইহাদিগকে এই ভাবে ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে, ইহারা আমাদের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিবে, আমাদের যুদ্ধ প্রণালী, বাসস্থল, সৈন্য সংখ্যা প্রভৃতি সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। দেখুন দেখি, তাহা হইলে কত বিপদ! শত্রুকে তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র মনে করতে নাই। কালে ইহারাই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে।"

আমি বো-হ্লাবুর কথার উত্তরে কহিলাম যে "আপনার কথা সত্য বটে, কিন্তু আজ কালকার সভ্যদেশের এ রীতি নয় যে, আহত শত্রুগণকে হত্যা করা হয়। আমরা সভ্য ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি, আমরা যদি এই সামরিক নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে আমাদের কলঙ্ক রটিত হইবে। আমরা যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ইহা মনে করিবেন না যে, আমরা কোন দিন ইংরেজ সৈন্যের হাতে বন্দী হইব না। আমরা বন্দী হইলে যদি তাহারা আমাদিগকে এই প্রকার হত্যা করে, তাহা হইলে আমাদিগের মন কি বলিবে ? বরং আমরা যদি ইহাদের প্রতি দয়া ও সদ্ব্যবহার প্রকাশ করি, তাহা হইলে ইংরেজ আমাদিগের মহত্ব বুঝিয়া আমাদের বিপদাবস্থায়ও আমাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। ইংরেজ তখন বুঝিবে যে, আমরা ডাকু নহি, আমবা স্বদেশের জন্য স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি। আমরা যদি আজ ইহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করি, তাহা হইলে ইংরেজ-সৈন্য হয়ত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য গ্রামের ছেলে বুড়, মেয়ে মানুষ পর্য্যন্ত হত্যা করিবে, তখন তাহা কি করিয়া নিবারণ করিবেন ?"

বো-হ্লা বু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন যে, আপনার কথাও ঠিক, তবে কি উপায়ে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে ?”

আমি কহিলাম যে “ইহাদিগকে এক ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হইবে যে, ইহারা আমাদিগের গোপনীয় কথা কাহাকেও বলিবে না এবং জীবনে আমাদের শত্রুতাচরণ করিবেক না। ইহারা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর না করে, আহা হইলে আপনাদের যাহা খুসি, তাহাই করিতে পারিবেন, তাহা হইলে আমাদের উপর কোন দোষ থাকিবে না।”

তিনি কহিলেন যে “যদি ইহারা এমন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া সে প্রতিজ্ঞা না রাখে, তাহা হইলে কি হইবে ?” আমি বলিলাম, তাহা হইলে তাহারা ধর্ম্মের নিকট দায়ী হইবে, আমরা ত ধর্ম্মের নিকট খালাস থাকিলাম, ইহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া যদি প্রাণদাতার প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে ধর্ম্মের নিকট ইহারা শাস্তি পাইবে। সে জন্য আপনি এইটুও চিন্তা করিবেন না। আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা করি। “তখন তিনি কহিলেন যে, আচ্ছা আপনি ইহাদের ভাষা জানেন, যাহা ভাল বোঝেন, তাহাই করুন।” আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে, যাহা যাহা করিতে হয়, আমি সমস্ত ঠিক করিয়া আপনাকে জানাইব।”

ইহার পর আমি তথা হইতে চলিয়া আসিয়া ইহাদেরই আটা, ঘি ও ডাইল লইয়া গাড়োয়ানদিগের দ্বারা কতকগুলি রুটী প্রস্তুত করাইলাম এবং কতকটা পাক করাইয়া ইহাদের সকলের আহার করাইলাম। আহার করিয়া ইহারা অনেক সুস্থ হইল।

ইহাদের মধ্যে বর্ম্মা কথা কেহই জানেনা, ইহদের তিন জন আমার পরিচিত। কিন্তু ইহারা আমাকে এখনও ধরিতে পারে নাই।

সাহেব দুইজন ইংরাজিতে আমার সম্বন্ধে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ফিরিঙ্গীটি বলিল যে “This man is very kind to us, had he not been here, all of us would have been murdercd by this time. It is due to his intervention and influence that our lives have been spared so far.” অর্থাৎ “এই ব্যক্তি অতি দয়ালু, এ না থাকিলে আমাদের সকলকেই হত্যা করিয়া ফেলিত।” ইহার জন্যই আমরা প্রাণে বেঁচে আছি।

তখন শ্বেতাঙ্গটী বলিল যে, He does not look like a Burman at

all. He looks like a foreigner. A rough and savage Burman can't have such a large and kind heart ? It is a pity he does not understand neither English nor Hindusthani. How we shall express our gratitude to him ?" অর্থাৎ এই ব্যক্তিকে বর্ম্মার মত বোধ হয় না, ইহাকে বিদেশীর মত দেখায়। অসভ্য বর্ম্মার অন্তঃকরণ এতাদৃশ প্রশস্ত ও দয়ালু হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, এ হিন্দি বা ইংরেজী জানে না। আমরা কেমন করিয়া ইহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব ?

ইহাদের আসনের জন্য জঙ্গল হইতে কাটা শুষ্ক ঘাস বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও নেটিব. বাবু, সেপাই বা গাড়োয়ান সকলেরই একই দশা, একই তৃণ শয্যায় সকলই পাশাপাশি আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সেপাইদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, সাহেব,এ আদমিসে হামলোককে জান বঁাচাইয়া। এবড়া আছরপ আদমি মালুম হোতা হ্যায়। এস্‌মে সয়তান বর্ম্মা কো মাফিক নেহি হ্যায়। এস্‌কো চেহারাছে মালুম হোতাহে এ বর্ম্মা নাহি হ্যায়, এ কালা হোয়েগা, লেখেন এ বাত নাহি জানতা, এসকোসাত বাত করনা মুস্কিল হ্যায়।

আমি ইহাদের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। বাঙ্গালী বাবুটী ভয়ে আকুল হইয়া আস্তে আস্তে মান্দ্রাজী বাবুটীর সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে "আমি কি মাটী খাওয়া কর্ম্মই করিয়াছি। রেঙ্গুনে স্ত্রী পুত্রাদি ফেলিয়া কয়েকটা টাকা বেশী বেতনের লোভে আপার বর্ম্মায় আসিয়া এখন বুঝি প্রাণটা যায়। আজ আমাদিগকে যদি বর্ম্মারা কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাদের কি উপায় হইবে। আগে যদি জানিতাম যে, আপার বর্ম্মায় এত বিপদের আশঙ্কা, তাহা হইলে আমি সহস্র টাকা দিলেও আসিতাম না।" এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মান্দ্রাজি বাবুটী বলিলেন যে, আপনি কেন এত অস্থির হইতেছেন, যদি মরি, সকলেই মরিব। আমরাও পরিবার রেঙ্গুনে রাখিয়া আসিয়াছি। দেখুন দেখি, পাঞ্জাবীগণ, ফিরিঙ্গিগণ আপনার মত কেহই অস্থির হয় নাই। সকলেই অটল সাহসের সহিত বসিয়া আছে। বাঙ্গালীদের বাস্তবিক এ বড় কলঙ্ক। আপনারা যেমন সহজেই ভীত হন, আর কোন জাতীয় লোকে তাদৃশ ভীত হয় না। মরণ সকলেরই হইবে, আপনিই কি চিরকাল বঁাচতে আসিয়াছেন ?

যদি রেঙ্গুন থাকা কালে আপনার কোন রোগে মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আপনার পরিবারবর্গের যে দশা হইত, এখন মরিলে তাহাই হইল"। বাঙ্গালী বাবুটীর কান্না দেখিয়া মনে মনে আবার হাসিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে আমাদিগের গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, "রসদপার্টীর লুটের ও সেগাইন আক্রমণের সংবাদ মাণ্ডালে পৌঁছিলে তথায় মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বহু সৈন্য মাণ্ডালে হইতে আসিতেছে এবং জঙ্গলে আমাদের আড্ডা আছে অনুমান করিয়া এই দিকে যে সৈন্য আসিবে, তাহা ভাবে বুঝিলাম।" এই সংবাদে আমাদের ব্যস্ত হইতে হইল। এখন মান্দ্রাজিগুলিকে কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করাই, সেই মুস্কিল হইল। নিজেও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। প্রকাশ না হইলেও চলে না। তখন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,—"Look here, you know very well that so far I have been able to save your lives; you must give an understanding and sign a solemn pledge that you will not divulge our secrets and you will never be hostile to the Burmans, who are fighting for their country. Otherwise I shall not be able to save your lives. They will kill you one and all."

অর্থাৎ যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর কর যে, আমাদের কোন কথা প্রকাশ করিবে না এবং যে সকল বর্ম্মারা দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগের প্রতি কখনও শত্রুতাচরণ করিবে না, তাহা হইলে তোমাদের জীবন রক্ষা হইবে নচেৎ বর্ম্মারা তোমাদিগকে হত্যা করিবে।

আমার ইংরেজী বোল শুনিয়া সাহেবটীর তাক্ লাগিল, সকলেই আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বাঙ্গালী বাবুটীর মুখ প্রসন্ন হইল, কিন্তু শ্বেতাঙ্গটীর মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। শ্বেতাঙ্গটী আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া কহিল যে, "Are you not Baboo Chakarbuty?" তখন মান্দ্রাজী বাবুটী উল্লসিত হইল "Oh, Ho! He is our old friend Baboo Chackarbuty of Rangoon Commissariat office!" তখন ফিরিঙ্গিটী লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া বলিল 'No doubt he is our old friend. What a set of fool We are, that we could not recognise him earlier?" আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলাম যে "No man, you made a mis-

take, my name is Kala." তখন শ্বেতাঙ্গটী কহিল,"Do not humbug any more, you are caught now" বাঙ্গালা বাবুটী আমার নাম চক্রবর্ত্তী জানিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহার প্রাণটা যেন ধড়ে ফিরিয়া আসিল। এখন তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, তিনি বর্ম্মার খড়্গা হইতে নিস্কৃতি পাইলেন। সাহেবরা ও মান্দ্রাজি বাবুটী আমার পরিচয় সেপাইগণকে দিলেন। পঞ্জাবীগণ আমাকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।

শ্বেতাঙ্গটীর নাম লরিমার, সকলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, আমি কি জন্য এই ডাকুর দলে যোগ দিয়াছি। এক কথার উত্তরে কহিলাম যে, আমি পূর্ব্বে রাজ সরকারের অশ্বারোহী সৈন্য দলে চাকর ছিলাম, এখন রাজকীয় সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছি। "আমার সেই বন্ধু লরিমার এবং ফিরিঙ্গিটীর নাম অর্প ও মান্দ্রাজি বাবুটীর নাম কুপস্বামী ছিল। বাঙ্গালী বাবুটীর নাম পূর্ব্বে জানা ছিল না, তাহার নাম জে, ছি, মল্লিক, বাড়ী কলিকাতা। পাঞ্জাবী বাবুটীর নাম ত্রিলোকনাথ, সেপাইদের কাহারো নাম লাখাসিং, কাহারো নাম লালা খাঁ, কাহারও নাম পঞ্জাব সিং।

লরিমার প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু নানারূপ বুঝাইয়া রাজি করিলাম। সরদার হ্লাবু বর্ম্মা ভাষায় এক মুসাবিধা করিয়া দিলেন,তাহা পরিষ্কার করিয়া লেখা হইল। তাহার মর্ম্ম ইংরাজীতে এবং হিন্দিতে আমি তরজমা করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। লেখাপড়া জানা সকলেই স্বাক্ষর করিল, যাহারা লেখাপড়া জানে না, তাহাদিগকে কলম ছোঁয়াইয়া ফিরিঙ্গিদের দ্বারা নাম লেখাইয়া লইলাম।

সন্ধ্যার পর অন্ধকারের মধ্যে কয়েদীগণকে লইয়া চলিলাম। তাহাদিগকে নদীর তীরে উপস্থিত করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু কয়েদীগণের মধ্যে অনেকেরই অধিক দূর চলিবার শক্তি নাই। আমি লরিমারকে কহিলাম, "Where is Captain Renny now ?"তাহাতে সে বলিল,"He is at present in Mandaly"আমি বলিলাম,"Please tender my best salam to him" আমার এই কথায় লরিমার ও অর্প দুইজনেই লজ্জিত হইল। লরিমার বলিল,"Baboo forget and forgive. We are seriously guilty to you in many respect, I think it is God's punishment that I have got injury in my thigh from your own hand. I did not know that you possess such a noble heart and high character. You

are really a true hero. You could very easily take revenge and vindicate our misbehaviour to you. We are really ashamed for our past treatment to you. You are an honorable exception to your nation and I believe any nation ought to be proud of your courage and character."

আমি বলিলাম যে, না, আমি একজন সামান্য লোক, আমি এত উচ্চ প্রশংসার যোগ্য নহি। এই কথা বলিয়া বিদায় লইলাম এবং পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিলাম যে, খবরদার আমাদের কথা যেন তাঁহারা প্রকাশ না করে। সকলের সঙ্গেই করমর্দ্দন করিলাম। সেপাইগণ আমাকে সসম্মানে সেলাম করিল। আমরা অন্ধকারে সরিয়া পড়িলাম। সকলেই বলিল যে, যদি আপনার উপকারের পরিশোধ দিবার সুযোগ পাই, তখন কৃতজ্ঞতা কাকে বলে, দেখাইব।

আমরা অনেক রাত্রিতে আড্ডায় পৌঁছিলাম এবং সর্দ্দারগণের নিকট কয়েদীগণকে ছাড়িয়া দেওয়ার সংবাদ দিলাম। ইংরেজ-সৈন্য আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য আসিতেছে, এই সংবাদ লইয়া এক কমিটী বসিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি কি করা হইবে, তাহার আলোচনা করা হইল। বর্ম্মারা ভাত খাওয়া জাত, আটার এলেকা বড় রাখে না। তাহারা ঘিয়ের গন্ধও লইতে পারে না। ঘিয়ের গন্ধে তাহারা ন্যাকার করে। তাহাদের দাইল ছোলা, অরহর প্রভৃতিও বর্ম্মারা ভালবাসে না। এই সকল আমার ব্যবহারের জন্য কতক রাখিয়া, নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবার কথা হইল। পোষাকাদি যাহা পাওয়া গিয়াছে,তাহা সৈন্যদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। রসদপার্টীর সঙ্গে এক গাড়ীতে যে টাকা ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাক্স খুলিয়া বিশ হাজার টাকার বিশটী তোড়া পাওয়া গিয়াছিল, এই টাকার অর্দ্ধেক সৈন্যগণের পদপর্য্যাদানুসারে পুরস্কার স্বরূপ বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। অপর অর্দ্ধেক দশ হাজার টাকা স্যাগাইনদিগের উপরস্থ এক প্রাচীন ফুঁঙ্গিচায়ে কোন গুপ্তস্থানে ফুঙ্গির জ্ঞাতসারে প্রোথিত করিয়া রাখা হইল। এই টাকাটা সৈন্যদিগের খোরাকী ও বেতন প্রভৃতি দিতে ভবিষ্যতে ব্যয় হইবে বলিয়া রাখা হইল। ফুঁঙ্গি প্রকৃতপক্ষে এই টাকার জন্য দায়ী রহিলেন।

আমাদিগের এই যুদ্ধ জয় ও কালাদিগের লুটপাটের সংবাদ যেন তারযোগে চতুপার্শ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্যাগাইন, মাওালে (shwebo) শোয়েবো, কাথা

প্রভৃতি স্থানে আমাদের নাম বিখ্যাত হইয়া গেল। এই সঙ্গে সঙ্গে বো-হ্লা প্রভৃতি ও মংফালার নামও খুব জাহির হইল। এই ঘটনার পর দলে দলে বর্ম্মাগণ স্ব-ইচ্ছায় আসিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। কারণ ইহাদের অনেকেই লুটতরাজের লোভে আসিতে আরম্ভ করিল, সকলেই যে স্বদেশহিতৈষী হইয়া আসিয়াছে, এমন নহে। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা দেড়হাজারে পরিণত হইল এবং অশ্বারোহী সৈন্য একশতে পরিণত হইল।

এই যুদ্ধের পর আমার সাহস, যুদ্ধকৌশল, ও রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বো-হ্লাবু আমাকে প্রমোশন দিলেন। আমার নাম হইল, বো-ফালা বা সর্দ্দার ফালা। একশত অশ্বারোহী সৈন্যের কর্ত্তা হইলাম আমি। বো-হ্লাবুর নাম হইতে বো-ফালার নাম আরো বেশী জাহির হইল এবং সকল সৈন্যগণই আমাকে অতি স্নেহের ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিল। সর্দ্দার-গণও আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। আমি সর্দ্দার হ্লাবুকে সতর্ক করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন সৈন্যগণের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। কারণ ইহাদের মধ্যে অনেক বদমাইস ও দাগি আসামী সকল থাকা সম্ভব। তাহারা যেন কোন নিরীহ গ্রামবাসীর দ্রব্যাদি লুট না করে। আমাদিগের এমনই ডাকু নাম ডাকিয়াছে, কিন্তু আমরা যদি সৎপথে থাকিলাম, তাহা হইলে অবশ্য আমাদিগকে ডাকু বলিলে কোন ভয় নাই। মূল কথা, আমরা যেন আমাদের অসচ্চরিত্রের দ্বারা নিজেদের উপর কলঙ্ক না আনি। তিনি আমার কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া এক জেনেরাল অর্ডার জারি করিয়া সকল সৈন্যকে শুনাইয়া দিলেন এবং যে অসদ্ব্যবহার করিবে, তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।

গুপ্তচরের মুখে ইংরেজ সৈন্যের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আমরা বর্ত্তমান আড্ডা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আরো দশ মাইল দূরে, চতুর্দ্দিকে পাহাড় ও জঙ্গল-বেষ্টিত এক সমতলে আড্ডা করিলাম। শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে তিন চারি মাইল বা ততোধিক দূর পর্য্যন্ত অশ্বারোহী সৈন্যের পিকেটপার্টি পালা মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বো-হ্লাবু চতুঃপার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রাম সকলের তুজি বা পঞ্চায়েতগণের উপর আদেশ জারি করিলেন যে, "যখন প্রয়োজন হইবে, তখন পালামত প্রত্যেক গ্রাম হইতে সৈন্যের রসদ যোগাইতে হইবে এবং শত্রুসৈন্যের সংবাদাদি যথাসাধ্য আমাদিগকে অবগত

করাইতে হইবে। যে কালাদিগের সাহায্য করিয়া স্বদেশোদ্রোহিতা করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে, তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইবে এবং সেই গ্রাম ভস্মীভূত করা হইবে।"

"প্রত্যেক পরিবার হইতে অন্ততঃ এক জন লোক যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারণ করিবে।"

শ্যাগাইন ও মাণ্ডালে আমাদিগের গুপ্তচর আছে এবং নিকটবর্ত্তী বড় বড় গ্রামের তুজিদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য এক একজন গুপ্তচর নিযুক্ত থাকিবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শত্রুর গুপ্তচর।

একদিন আমাদের একজন গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, ইওয়া হাঁউ নামক প্রধান এক গ্রামের তুজির বাড়ীতে এক জোরবাদী মুসলমান ফকীর আসা যাওয়া করিতেছে এবং সে তুজির সঙ্গে গোপনে তাহাকে কথা বলিতে দেখিয়াছে। চর-মুখে এই কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল। আমি পঁচিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সেই গ্রামাভিমুখে ছুটিলাম। নিকটবর্ত্তী হইয়া কোন জঙ্গলে আড়ালে অশ্বারোহীদিগকে রাখিয়া, নিজে পা-দলে চলিয়া তুজির বাটী হইতে অল্পদূরে, রাস্তার আড়ালে একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম এবং একজন ছদ্মবেশী চরকে তুজির বাড়ীর নিকট আনাগোনা করিতে বলিলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বসিয়া ক্লান্ত হইলাম, এমন সময়ে চর আসিয়া সংবাদ দিল যে, সেই জোরবাদী মুসলমান এখন তুজির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র রাস্তার উপর সেই ফকীরকে ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া চারিখানি কাগজ পাইলাম, তাহার দুইখানি ইংরাজীতে লেখা এবং দুই খানি বর্ম্মায় লেখা, কাগজের মর্ম্মাবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ ফকীরকে বাঁধিবার আদেশ করিলাম।

১ম, দলিল।

It is hereby declared that any one who can help in arresting dacoits Maung Hla Boo, Maung Kala, Mg Shuv and Mg U will be awarded a reward of Rs 1000 (Rupees one thousand only) for each man.

Whitmore,
General.

২য়, দলিল।

At the special recommendation of Kin-Wan-mingzy, Jafar, alias Mg Hla is appointed as a spy, to help the detective officers on a monthly salary of Rs. 100 with prospect of promotion and reward for good and faithful services.

Whitmore,
General.

৩য় দলিল (বর্ম্মাভাষায়) দলিলের মর্ম্ম।

কিন-উন-মিঙ্গী প্রেরিত পত্র ইওয়া-হাউং তুজী মাং আউংর সমীপে পৌঁছে।

নরহত্যা পাপিষ্ঠ রাজা থিবকে ইংরাজেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে। রাজ্য এখন ন্যায়বলে, শক্তিশালী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে পড়িয়াছে, প্রজাগণে লড়াই করিয়া মহা শক্তিশালী ইংরেজের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ লড়াই করিবে, তাহারা ধনে প্রাণে মারা যাইবে। তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে, তুমি দস্যুদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজের পক্ষাবলম্বন কর। তোমাকে মিউকের পদে নিযুক্ত করা যাইবে এবং নিয়মিত বেতন ছাড়া মাসিক অতিরিক্ত একশত টাকা ভাতা পাইবে। আর যদি মং হ্লাবু, মং কালা প্রভৃতিকে ধরিয়া দিতে পার, তাহা হইলে প্রত্যেকের জন্য এক হাজার করিয়া টাকা পুরস্কার পাইবা। পত্রের উত্তর পত্রবাহক জাফর, ওরপে মংহ্লাফের মারফত পাঠাইবা। পত্রপাঠ করিয়া এই পত্রখানা ফেরত পাঠাইবা।

(অতি গোপনীয়।)

দস্তখত
কিন-উন-মিঙ্গী।

৪র্থ দলিল—মর্ম্ম।

ইওয়া হাঁউ তুজী মাং আউং প্রেরিত পত্র মহামান্য কিন-উন্‌-মিঞ্জী সমীপে পৌছে।

বহুশত প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,

দেব! আপনার পত্র পাইলাম। আপনার অদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মং-হ্লাবু প্রভৃতি বহুশত সৈন্য লইয়া এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। যদি দুই এক দিন মধ্যে কালা সৈন্য আইসে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধরাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে পারি, কিন্তু লড়াইয়ে যে সহজে তাহাদিগকে ধরা হইবে, এমন ভরসা করি না। কারণ তাহাদের লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। যদি তাহারা টের পায় যে, আমি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, তাহা হইলে আমার প্রাণনাশ নিশ্চিত। কালা সৈন্য এখানে পৌছিলে আমি স্পষ্টভাবে কালাদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে পারি। নিবেদন ইতি" সেবকাধম

মং আউং।

এই সকল দলিলের মর্ম্মাবগত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। এই লোকটাকে আমরা আমাদের বিশ্বাসী ও বন্ধু বলিয়া জানি, সে তবে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। বিবাদের সময় কোন লোককেই বিশ্বাস করিয়া নিরস্ত্র থাকা কর্ত্তব্য নয়। আমার ইঙ্গিতে অশ্বারোহী সৈন্যগণ তুজী মং আউরের বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে বাঁধিবার হুকুম দিলাম। তুজী সহসা আমাদের ব্যবহার দেখিয়া যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বলিল, "এ কি, আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন? আমি কি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি?" আমি বলিলাম, সর্দ্দার বো-হ্লাবুর নিকট তোমার ব্যবহারে বিচার হইবে। এই বলিয়া বাঁধিয়া তাহাকে ক্যামপাতি মুখে লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম। ২০ বিশ জন অশ্বারোহী তুজীর বাড়ী ও গ্রাম রক্ষার্থ রহিল। পথিমধ্যে মাং আউং জাফরকেও বন্দী দশায় দেখিয়া তাহার চক্ষুস্থির হইল। তখন আর তাহার বুঝিবার বাকী রহিল না।

আড্ডায় পৌছিয়া সেনাপতির সম্মুখে বন্দীদ্বয়কে হাজির করিয়া সমস্ত কথা বলিলাম। তাহাদের বিচারের জন্য এক কোর্ট-মার্শাংল বসিল। আমি চারিখানি দলিল হাজির করিলাম। ইংরেজী দলিল দুইখানির মর্ম্ম তরজমা করিয়া দিলাম।

তুজী মং আউংকে জবাব জিজ্ঞাসা করা হইল, সে জবাবে আত্ম সমর্থন করিয়া কহিল যে, শত্রুতা করা তাহার উদ্দেশ্য নয়। সে চালাকী করিয়া কালা সৈন্য আনাইয়া জাতীয় সৈন্য দ্বারা তাহাদিগকে হত্যা করাইবে, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সে এ সংবাদ বোহ্লাবুকে অবিলম্বে জানাইতে মানস করিয়াছিল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে মিত্রের কার্য্য করিয়া শত্রুরূপে বন্দী হইল। সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। মং আউংয়ের জবাব বেশ চতুরতা-পূর্ণ বটে,কিন্তু গুপ্তচরের মুখে শুনা গেল, এই ছদ্মবেশী ফকীর ইহার বাড়ী ইহার পূর্ব্বেও দুই একবার আসা যাওয়া করিয়াছে। সে যদি প্রকৃত বন্ধুই হইবে, তাহা হইলে পূর্ব্বে কেন এ সংবাদ দেয় নাই? বিশেষতঃ তাহার নিজের হাতের লেখা পত্র অকাট্য দলিল বলিয়া গণ্য হইল।

বিচারে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। গুপ্ত চরেরও প্রাণদণ্ড করা ধার্য্য হইল। মং-আউংয়ের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। ইহাদিগের দুই হাত গাছের সঙ্গে পিটমোড়া করিয়া বাঁধিয়া গুলি করিয়া হত্যা করা হইল। তুজীর গ্রামের লোকদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল যে, যদি তাহারা আমাদিগের বিপক্ষতাচরণ করে, তাহা হইলে গ্রামের সকল লোককে হত্যা করিব।

অতঃপর আমাদিগের আত্মরক্ষার জন্য এক গুপ্ত মন্ত্রণার বৈঠক বসিল। সেনাপতি ও সহকারী সেনাপতিগণ লইয়া এক নিভৃত স্থানে গমন করা হইল, তথায় সৈন্যদিগের কাহারো প্রবেশাধিকার রহিল না, কেহ মন্ত্রণা জানিতে না পারে, সেজন্য চতুর্দ্দিকে প্রহরী রক্ষিত হইল। কারণ আপন সৈন্যগণের মধ্যে যে শত্রু ও গুপ্তচর নাই,তাহা কে বলিবে? গুপ্তচর না থাকিলেও,সকলে গোপনীয় কথা জানিতে পারিলে পরস্পর কাণাকাণিতেও কথাটা রাষ্ট্র হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

মন্ত্রণায় সাব্যস্ত হইল যে, কালা সৈন্যদিগকে ফোঁশলাইয়া আনিয়া বিধ্বস্ত করিতে হইবে। তুজী মং-আউংর হাতের অনুরূপ আর একখানি পত্র কিন্-উন্-মিঞ্জির নিকট লেখা হইল। তাহাতে যাহা লেখা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে "দেব, আপনার অনুগ্রহ-লিপি পাইয়া শিরোধার্য্য করতঃ প্রেরিত দূত জাফরের মারফত তাহার উত্তর দিয়াছি। কিন্তু শুনিতে পাইলাম যে, ডাকুগণ জাফরকে রাস্তা হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাতে আমার ভয়ঙ্কর আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ আমার পত্র খানা শত্রু হাতে নিশ্চয়ই পড়িয়া

থাকিবে এবং তাহা হইলে ডাকুগণ যে আমাকে ও আমার গ্রামকে ধ্বংস করিবে, তাহা নিশ্চয়। আমি কিন্তু এদিকে তাহাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতেছি। আমার পত্রের ভাব প্রকাশ হইবে, আশঙ্কায়, বোহ্লাবুকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কালা সৈন্যদিগকে কি করিয়া আনিয়া তবে ধ্বংস করিব। এদিকে আমার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, সত্বর সৈন্য পৌছিলে আমি কালাদের পক্ষ হইয়া মং-হ্লাবুদিগকে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিব। আমি দুই জন লোক পাঠাইলাম। তাহার একজনের হাতে আমার পত্রের জবাব দিতে আজ্ঞা হয়। অপর জনকে কালা সৈন্যের পথ দর্শকরূপে রাখিবেন। ডাকুদিগের সংখ্যা ৪০০।৫০০র বেশী হইবে না?" দাস্যাধম—মং-আউং।

আমাদের দুইজন চতুর ও কার্য্যদক্ষ লোককে মংআউংয়ের গুপ্তচর সাজাইয়া এই পত্র দিয়া ছদ্মবেশে তাহাদিগকে মাগুালে পাঠান হইল। তুজীর গ্রামে পাহারা রহিল, বাহির হইতে কোন ব্যক্তি গ্রামে এবং গ্রাম হইতে কোন ব্যক্তি বাহিরে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ হইল। আমি আমাদিগের ক্যাম্প আরো ৮ মাইল দূরে এক দুর্গম পর্ব্বতের নিম্নে জঙ্গলের মধ্যে স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে পাহারা রাখিলাম। সাবেক আড্ডায় প্রায় পাঁচ শত লোক রহিল। আমাদিগের সৈন্য সংখ্যা এখন দুই হাজারে পরিণত হইয়াছে এবং অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা আর একশত বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং মোট আমাদের অশ্বা-রোহী দুইশত হইবে। আমি অন্যান্য সর্দ্দারদিগের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিয়া, কোন্ কোন্ স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিতে হইবে, সেই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া স্থির করিলাম, কোথায় কোন দল আসিয়া লড়াই করিবে, এবং পশ্চাতে রিজার্ভ সৈন্য কোন্ কোন্ দল থাকিবে, তাহাও স্থির হইল। এই সকলই অতি গোপনে, অপর কোন ব্যক্তিই ইহার বিন্দু বিসর্গও জানে না।

বিপক্ষের কত সৈন্য আসিবে, সেই অনুসারে আমাদের সৈন্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা গুপ্তচরের অপেক্ষায় রহিলাম। মং আঁউংয়ের নামে নকল গুপ্তচর পাঠান হইয়াছিল, সে কিন্-উন্-মিঞ্জির পত্র সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন-উন্-মিঞ্জি লিখিয়াছেন যে "তোমার কোন আশঙ্কা নাই, আগামী কল্য এখান হইতে কালা সৈন্য রওয়ানা হইবে, তাহারা পৌছিয়া ডাকাইতদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিবে এবং তোমাকে রক্ষা করিবে। তুমি সাবধান থাকিবে। তোমার কথার ব্রত্যয় হইলে আমি লজ্জিত হইব।"

পরদিন আমাদের আসল গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুই শত কালা সেপাই একজন ইংরেজ কাপ্তানের অধীনে অম্ নদী পার হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া আমরা সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলাম। কালা সৈন্য যে পথ দিয়া আসিবে, তাহা আমরা জানি, কারণ আমাদের লোকই পথ দেখাইয়া আনিবে, তাহাকে যে রাস্তা দিয়া আসিতে বলিয়াছি, সে বিপক্ষকে সেই রাস্তা দিয়াই আনিবে।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় যুদ্ধ।

তুঙ্গী মং-আউংয়ের গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে আমরা শত্রুকে আক্রমণ করিব, সংকল্প করিলাম। তথায় পথের একধারে এক জঙ্গলপূর্ণ গভীর একটী নালা, অপর পার্শ্বে অনুন্নত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী। এই স্থানে পথের দুই ধারেই বেশ আড়াল আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের এখন সৈন্য সংখ্যা মোট দুই হাজার দাঁড়াইয়াছে, এক হাজার সৈন্য প্রধান আড্ডায় থাকিবার কথা হইল, ছয়শত সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। চারিশত সৈন্য পুরাতন আড্ডায় রিজার্ভ স্বরূপ রক্ষিত হইল। এবারও সেই রসদ-পার্টী লুটের ন্যায় সৈন্যসমাবেশ করা হইল। অগ্রবর্ত্তী, মধ্যবর্ত্তী, এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী, এই তিন দলকে স্বতন্ত্রভাবে আক্রমণ করিবার জন্য দুইশত করিয়া সৈন্য এক এক ভাগে বিভক্ত হইয়া নালার ভিতর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। এক মাইল পথ লইয়া এমন ভাবে সৈন্য সকল থাকিল যে, আমাদের এক দলের লোক অপর দলের লোককে না পায়। এই সকল সৈন্য ভিন্নও পাহাড়ের আড়ালে অশ্বারোহী সৈন্য সকল মজুত রহিল। বো-হ্লাবু আমার যুদ্ধ-কৌশল ও সাহসের পরিচয় পাইয়া অদ্যকার যুদ্ধের কমাণ্ড আমাকে দিলেন। তিনি এক্ষণে আড্ডায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং বো-উ রিজার্ভ সৈন্য লইয়া থাকিলেন।

এবার শত্রুর রিয়ার গার্ড বা পশ্চাদ্বর্ত্তী রক্ষক দলকে সর্ব্বপ্রথমে আক্রমণ

করা স্থির হইল, তাহার কারণ, পশ্চাতের লোক হটিতে বা পলাইতে না পারে। আমি অশ্বারোহণে এই এক মাইল পথ ঘুরিয়া সৈন্য সকলকে পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্য উৎসাহ ও উপদেশ দিলাম। ইতি-মধ্যে সংবাদদাতা দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কালা সৈন্য প্রায় পৌঁছিল। আমার লোকগুলি মাটীর সঙ্গে মিশিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ইতিমধ্যে কালা সৈন্য বীর-দাপে মেদিনী কাঁপাইয়া আসিতেছে, তাহা দৃষ্ট হইল। তাহা-দের অগ্রবর্ত্তী দল আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী দল ছাড়াইয়া চলিল। ক্ষণপরেই মধ্যবর্ত্তী বা প্রধান পার্টি পৌঁছিল, তাহাও আমাদের সৈন্য অতিক্রম করিয়া চলিল। পরে পশ্চাদ্বর্ত্তী দল পৌঁছিবা মাত্রই আমি বাঁশী বাজাইয়া শিস্ দিবার মত ইঙ্গিত করিবামাত্র, আমাদের একশত বন্দুক একযোগে ব্যাং ব্যাং করিয়া আওয়াজ হইল। কালা সৈন্যের অনেক হতাহত হইল। এক ভয়ানক গোল-যোগ উপস্থিত হইল। শত্রুসৈন্য ফিরিয়া মাটীতে পড়িয়া আমাদের সৈন্যের উপর গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, মধ্যবর্ত্তী দল ফিরিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী দলকে সাহায্য করিতে চেষ্টা পাওয়ায়, তাহাদের উপর এবং অগ্রবর্ত্তী দলের উপর এক-যোগে শত শত বন্দুকের গুলি পড়িতে আরম্ভ করিল। বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুসৈন্য শিক্ষিত ও সাহসী, তাহারা অধিকতর সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের এমন সুন্দর আড়াল, তাহাদের গুলিতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিল না। তবুও অনেকগুলি হত ও আহত হইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পড়িয়া গেল। শত্রুসৈন্যের অগ্র বা পশ্চাত কোন দিকেই পলাইবার সাধ্য নাই, কারণ দুই দিকেই আমরা এবং তাহাদের দক্ষিণে নালা, এবং বামে পাহাড় ও জঙ্গল। তাহারা এক প্রকার ফাঁদে পড়ার মত হইয়াছে।

কালা সৈন্যের কমাণ্ডিং অফিসর লেপ্টনাণ্ট মিণ্টং বেগতিক দেখিয়া পাহাড়ের দিকে আমাদের যে সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া (By assault) তাড়াইবার আদেশ দিলেন। তাঁহার অশ্বারোহীগণ আমা-দের সৈন্যগণের প্রতি ধাবিত হইল, তাহাদের তরবারী এবং বন্দুক, এবং আমার অশ্বারোহীগণের তরবারী ও বর্শা। আমি শিশ্ দেওয়া মাত্র আমার অশ্বা-রোহী সৈন্য ধাবিত হইল। কালা সৈন্যের সোয়ারগুলি শিখ, তাহারা আর বন্দুক চালাইতে অবকাশ পাইল না, তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের লোক বর্শার লক্ষ্যে আক্রমণ করিল, দুই পক্ষে প্রায় হাতাহাতি কাটাকাটি আরম্ভ হইল। আমাদের সংখ্যাধিক্য বশতঃ শিখ সোয়ারগণের

অর্দ্ধেক ধরাশায়ী হইল, অপরগুলি হটিয়া দূরে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল, আমার ইঙ্গিতে আমাদের পদাতিকগণ কালাদিগকে খড়্গ লইয়া আক্রমণ করিল। কালা সৈন্য সঙ্গীন দ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। বেগতিক দেখিয়া লেপ্টনাণ্ট মিণ্ট পলাইতে আরম্ভ করিলে আমি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলাম। তিনি ফিরিয়া আমার উপর রিভলবার ছুড়িতে লাগিলেন। একটী গুলি আমার বাম পার্শ্বের কাছ হইয়া চলিয়া গেল। আমি পাছে ধরি, তিনি এই আশঙ্কায় দিগবিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া, আমি দূরে থাকিলেই আমাকে ভয় দেখাইয়া ছয়টী নালা একে বারে খালি করিলে ব্যাকুল হইয়া পিস্তলে পুনরায় গুলি ভরিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে সেই লরিমারের রিভলবার দ্বারা ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলাম এবং এক জন মগ-সৈন্য খড়্গাঘাতে তাহার মুণ্ডটি দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল।

অশ্বারোহী সৈন্যের পলায়ন ও সাহেবের পতন ও নিজেদের শতাধিক কালা পদাতিক সৈন্যের পতন দেখিয়া বাকী সৈন্য ভাগিতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া নাস্তা নাবুদ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি একজন হাবিলদারকে আক্রমণ করিলাম, সে ফিরিয়া আমাকে বন্দুক দ্বারা আক্রমণ করিতে করিতে আমি বর্শাঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিলাম এবং কহিলাম যে "এখন কেমন আছ,ভাত-খানেওয়ালা রুটিখানেওয়ালাকা সাৎ কবি পারতো নেহি।" চেনা লোক বলিয়া তাহাকে প্রাণে মারিলাম না। আমার কথায় সে আশ্চার্য্যন্বিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, ক্যা কুড়হণ, আরে তোম ক্যায়ছা বর্ম্মা টাপুমে আকে ডাকুলোককা সাৎ মিল গিয়া? আবি তোম ডাকুবান গিয়া?" আমি বলিলাম—"হাঁ আবি ডাকুবান গিয়া। চল তোমকো ডাকুকো ডেরা মেলগিয়া ডাকুলোককা রুটি আউর নিমক খিলায় গা। লছমন তোম কেতনা রোজ বর্ম্মা মে আয়া?" সে কহিল যে, "আমাদের পল্টন আজ ছয় মাস হইল বর্ম্মায় আসিয়াছে।"

লছমন সিংকে উঠাইয়া তাহাদের হত সোয়ারদিগের একটী ঘোড়ার উপর বসাইলাম। শত্রুর প্রতি আমার এই প্রকার ব্যবহারে বর্ম্মাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার পানে তাকাইয়া রহিল।

আমরা যুদ্ধে জয়ী হইলাম। বিশজন কালা সৈন্যকে বন্দী করিয়াছি। একশত পচিশজন লোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছে। বাকী সকল পাহাড় ও জঙ্গলে যাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে।

শত্রুপক্ষের প্রায় দেড়শত রাইফল, একশত পঁচিশ জনের মিলিটারি ইউনিফরম, কয়েকখানা তরবারি এবং লেপ্টেনেণ্ট মিণ্টের রিভলবার ও ডাক্তারের সঙ্গের দুই বাকস্ অস্ত্রশস্ত্র ও ঔষধ সহ ডাক্তার পলাইয়া যাওয়ার সময় আমাদের হস্তগত হইল। ইহা ভিন্ন কতক আটা, ঘি ও ডাইলের রসদ পাইলাম। যুদ্ধে জয়ী হইলাম বটে, কিন্তু আমার মনে সন্তোষ জন্মিল না। কেন না, যুদ্ধটা অসম যুদ্ধ, তাহাতে বিপক্ষকে ফাকি দিয়া আনিয়া ফাঁদে ফেলিয়া হত্যা করার মত যুদ্ধ। তবে প্রবল শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে আমাদিগের পারিবার সাধ্য নাই এবং এরূপ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায়ও নাই। আর এক কথা বিপক্ষের সৈন্য শিক্ষিত এবং তাহাদের রাইফল উৎকৃষ্ট। আমাদের সৈন্য নূতন ধরণের কৌশলে অপরিচিত। এবং তাহাদের ক্যাপদার বন্দুক। এই প্রভেদ কত?

যুদ্ধে জয়ী হইয়া কয়েদীগণকে লইয়া এবং লুটের দ্রব্যাদি লইয়া পুরাতন ডেরায় উপস্থিত হইলাম। সর্দ্দার হ্লাবুকে যুদ্ধ জয়ের সংবাদ এবং ফুঙ্গিকে যুদ্ধের সংবাদ প্রেরণ করিলাম। বোহ্লাবু আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে শত ধন্যবাদ ও শত প্রকার প্রশংসা করিলেন।

মৃত দেহগুলি, স্বপক্ষ বিপক্ষের সমস্ত সাহেব সহ, এক গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে সমাধি দেওয়া হইল। আমাদের ক্যাম্পে জয়োল্লাস হইল। আমাদের পক্ষের যাহারা যুদ্ধে হত হইয়াছে, তাহাদের পরিবারের জন্য কিছু কিছু সাহায্য পাঠানের বন্দোবস্ত হইল।

আহত কালা সৈন্যদিগকে তাহাদের ঘি, আটা ও ডাইলের দ্বারা আহার করাইলাম। বন্দিগণের সকলে আমার পরিচয় জানে না, তাহারা আমার ব্যবহারে আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া হাবিলদার লছমন সিংকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল যে,এ ব্যক্তি কি বর্ম্মা না কালা? তখন লছমন তাহাদিগকে আমার সমস্ত পরিচয় দিল। এবং কহিল যে ইনি একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তবে আমি কিভাবে বর্ম্মায় আসিয়াছি এবং কিভাবে ডাকুর দলে মিশিয়াছি, তাহা সে জানে না। তাহাকে সংক্ষেপে আমার কথা বলিলাম। সকলে আমার জেদ, তেজ ও সাহসের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বন্দীদিগের মধ্যে একজন জমাদার, দুইজন নায়ক আর সেপাই, দুইজন সুভাদার দিলেন, তাহার একজন মারা পড়িয়াছেন এবং একজন পলাইয়াছেন। সকলে আমাকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিল। আমি জমাদারের সঙ্গে কর মর্দ্দন করিলাম। আহত-

দিগের যথাস্থানে পটি বাঁধিয়া দিলাম। এই সেপাইদিগের এক কোম্পানি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং অপর কোম্পানী হিন্দুস্থানী মুসলমান।

সর্দ্দার হুলাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বন্দিদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াই স্থির হইল। তবে তাহাদের নিকট হইতে পূর্ব্ববৎ প্রতিজ্ঞাপত্র লেখাইয়া লইতে হইবে। আমি বলিলাম যে, ইহাদের মধ্যে একজন আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু আছে, তাহার সঙ্গে আমরা এক স্কুলে পড়িয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া সর্দ্দারগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এবং কহিলেন যে, আপনার বন্ধুর প্রতি যাহাতে যত্ন করা হয়, তাহার ক্রটি করিবেন না।

আমি লছমন সিংকে কহিলাম যে, ভাই, এই বর্ম্মা সৈন্য গুলি প্রায় জঙ্গলি ও অসভ্য, তাহারা বর্ত্তমান যুদ্ধনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহারা যে কালা ধরিয়া আনে, সকলকে শত্রু মনে করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হয়। তোমাদের প্রতি আমি যে এত যত্ন করিতেছি, তাহাতে সম্পূর্ণ নারাজ। তাহাদের ইচ্ছা যে তোমাদিগকে হত্যা করে। কিন্তু কেবল আমার জন্য পারে না। তোমা-দিগকে এক প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে "আমরা আপনাদের কোন কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিব না। এবং বর্ম্মাদিগের বিরুদ্ধে আর কখনও যুদ্ধ করিব না।" আমার কথামত লছমন সিং জমাদার প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সকলেই প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে স্বীকার করিল। পূর্ব্বের অঙ্গিকার পত্রানুযায়ী আর একখানি পত্র বর্ম্মা ভাষায় প্রস্তুত হইল। আমি তাহার মর্ম্ম হিন্দিতে সকলকে বুঝাইয়া দিলাম। যাহারা যাহারা লিখিতে পারে, তাহারা নাম দস্তখত করিল, যাহারা লিখিতে না পারে, তাহাদের কলম ছোয়াইয়া লছমন লিখিয়া দিল। রাত্রিকালে আমরা কয়েদাদিগকে, যাহারা চলিতে পারে, তাহাদিগকে হাটাইয়া, যাহারা চলিতে পারে না, তাহাদিগকে ঘোড়ায় চড়াইয়া রাস্তার উপর ছাড়িয়া দিলাম। তাহাদের কাহারো কাহারো চলিয়া যাইবার শক্তি নাই, সুতরাং সমস্ত রাত্রি তথায় পড়িয়া থাকিতে হইল।

বিদায় কালে লছমন সিং কহিল, ভাই, তুমিত সামান্য লোক নও! তুমি বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে এমন সুন্দর ভাবে অশ্বচালনা শিখিয়াছ, এবং সাহসিকতা ও কৌশলের সঙ্গে যুদ্ধ কার্য্য শিখিয়াছ, তাহা ভাবিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। আমি যাহা চক্ষে দেখিলাম, অপর লোককে বলিলে, তাহা বিশ্বাস করিবে না। মনে করিবে, এ একটা কাল্পনিক গল্প। দিনাজপুরে পাঠ্যাবস্থায় আমি যে তোমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার শোধ তুমি একবার তথায়

লইয়াছিলে,যেটুকু বাকী ছিল,তাহা এখন লইলে। বোধ হয়,আমার সেই পাপে তোমার হাতে এমন গুরুতর আঘাত পাইয়া বন্দী হইলাম। ভাই,মাপ করিও, পূর্ব্বের কথা মনে করিও না, তুমি আমার ও আমার সঙ্গীগণের যে প্রকার সুশ্রুষা করিয়া যে ভাবে আমাদিগেব প্রাণ বাঁচাইলে, তাহাতে সে উপকারের শোধ যে এ জীবনে দিতে পারি, এমন বোধ হয় না। যাহা হউক, কখনও ভুলিব না, যদি এই ক্ষত হইতে বাঁচি, এবং আবার দেখা হয়, তবে মনের কথা বলিব, তোমার উদ্দেশ্য যে মহৎ, তার কোন সন্দেহ নাই। আমরা গোলামগিরি করিয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি।"

আমি বিদায় কালে লছমনকে কৌতুক করিয়া কহিলাম যে "ভাই দেখনা, ডাকুকো নিমক আজ খায়া, নিমক হালালি নেহি করনা"। তাহা যে কৌতুক না বুঝিয়া প্রকৃত কথা মনে করিয়া কহিল "নেহি ভাই, কবি এইছা নেহি হোয়ে গা"। জমাদারের সঙ্গে হাত মিলাইয়া বিদায় হইলাম। সেপাহিগণও আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সেলাম করিল। আমি সঙ্গীগণ সঙ্গে চলিয়া আসিলাম।

এই যুদ্ধ জয়ের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল, আমাদিগের নাম ও যশঃ এত বৃদ্ধি হইল যে, চতুর্দ্দিক হইতে আরো কত লোক আসিয়া আমাদিগের জয়ের পতাকার নীচে আশ্রয় লইল। যে সকল গ্রামবাসীগণ"শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" ভাবিতেছিল, তাহারা আমাদিগের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমাদিগের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল। তুজী মং আউংর গ্রামের লোক সকল তুজীর জীবন নাশ ও কালা সৈন্যের দুর্গতি স্বচক্ষে দেখিয়া আমাদিগের সঙ্গে যোগ দিল।

আমাদিগের সৈন্যদলে তিন শ্রেণীর লোক আসিয়া জমিয়াছে। এক শ্রেণীর লোক রাজকীয় সৈন্য সকল, যাহারা তাহাদের সর্দ্দারগণের অনুগত, তাহারা দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। আর এক শ্রেণীর লোক গ্রামবাসীগণ, যাহারা স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক গুলি রাজ্যের যত চোর ডাইাইত বদমাইস, তাহারা আসিয়া লুটতরাজের লোক আমাদের সৈন্যদল যোগ দিয়াছে।' এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক যখনই সুযোগ পায়, তখনই নিরাশ্রয় পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, বা কোন গ্রামে গিয়া উৎপাত ও লুট তারাজ করিতে থাকে। ইহাদের বিরুদ্ধে অনেক গুলি রিপোর্ট আমাদিগের নিকট পৌছিল। এই সকল লোকের কার্য্য

দ্বারা আমাদের সন্নামের উপর কলঙ্ক পড়িতে লাগিল, এবং ইঁহাদের জন্যই আমাদিগের ডাকাতি নাম আরো জাঁকিল। এতলোকের মধ্য হইতে কে চোর, কে সাধু, তাহাও বাছিয়া বাহির করা সহজ নহে। ইহাদের অনেকে জেল-খালাসী কয়েদী। আমি সেনাপতি হলাবুকে এই সকল কথা বিশেষ করিয়া জানাইলাম। তিনি এই সকল লোকদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করিবার জন্য এক কোর্ট মার্শেল বসাইলেন। অভিযোগকারিদিগকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া অপরাধীদিগকে সেনাক্ত করাইয়া লওয়া হইল। প্রমাণ হইল যে, অনেকের বিরুদ্ধেবই অভিযোগ সত্য। বিচারকগণের মত হইল যে, প্রত্যেক অপরাধীকে ৩০ বেত মারিয়া আমাদিগের লাইন হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। আমি এ রায়ে আপত্তি করিলাম। আমি বলিলাম যে, এই সকল লোকদিগকে যদি এখন বেত মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারাই আমাদের শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া হয়তঃ আমাদিগকে ধরাইয়া দিবে। আমার মতে এই সকল লোককে লাইনবন্দি করিয়া দাঁড়া করাইয়া বিচারকের রায় শুনান হউক, পরে তাহাদিগকে এবার অভয়দান করা হউক। একথাও জানান হউক যে, দ্বিতীয় বার এই প্রকার অপরাধ করিলে অপরাধীদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে। এই কথা শুনাইবার পর সেনাপতি হলাবুর এক অর্ডার পুনরায় শুনান হইবে যে, "আমরা জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছি। নিরীহ গ্রামবাসী বা পথিকগণের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিবার জন্য আমরা আসি নাই। আমরা বরং দুর্ব্বলকে সহায়তা করিব, কালাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভব করিব। আমরা সৎপথে থাকিব, অথচ স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইব। যাহারা দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব লুট করিবে, গ্রামবাসীদিগের উৎপীড়ন করিবে, তাহারা আমাদের শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে, কেননা তাহাদের জন্যই আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যে কলঙ্ক পড়িবে।"

আমার এই কথা অতি দূরদর্শিতার পরিচায়ক মনে করিয়া, কি সর্দ্দার কি সেপাই, সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। আমার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করা হইল। যে সকল গ্রামবাসী বা পথিকের উপর অত্যাচার ও তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে আমরা কতক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ করিব, এই বিচারে অন্যায়কারী ব্যক্তিগণ আমাদিগের মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া মহাসন্তুষ্ট হইয়া হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। অপরাধীগণ মহা সুখী হইয়া আমাদের মহত্ত্বের পরিচয় পাইল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

চাউমিউর কেল্লাধিকার।

যুদ্ধের পর কয়েক দিবস শান্তিতে কাটিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের চর মুখে জানিতে পারিলাম যে, স্যাগাদিনের দিক হইতে বহুসংখ্যক কালা সৈন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। ইহার পাঁচ ছয় ঘণ্টা পর আর একজন সংবাদ দিল যে, চাউমিউর কেল্লা হইতে একদল সৈন্য আমাদিগের বিরুদ্ধে আসিতেছে। রাত্রিকালে সংবাদ পাইলাম যে, মিনবু হইতে একদল সৈন্য আসিতেছে। আমাদিগকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া মারিবার আয়োজন করা হইয়াছে। বিপক্ষ এবার ডাকু মারিবার জন্য দুইটী কামান আনিতেছেন। এই সকল সংবাদে সকলেই উৎকণ্ঠিত হইলাম।

যুদ্ধাচার্য্য উ—না—ওায়ের পত্র পাইয়া জ্ঞাত হইলাম যে, তিনি কাথা, শোয়েবো, মিকটীলা, মিনজাল, পোকুবো প্রভৃতি স্থানে সরদারগণের পত্র পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলে চোরাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে খুব উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছেন যে, "তোমাদের যুদ্ধের যেমন নাম হইয়াছে, তাদৃশ বাহাদুরি অন্যস্থানের সর্দ্দারগণ করিতে পারেন নাই। কোন ভয় নাই, ঈশ্বর আমাদের সহায় হইবেন"।

রাত্রিকালে আমাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা বসিল। মন্ত্রণায় ঠিক হইল যে, আমরাও তিনদলে বিভক্ত হইয়া কালাদিগের তিন স্থানের কেল্লা রাত্রিকালে আক্রমণ করিব। কালারা তিনদিক হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে, আমরা অন্য পথ দিয়া গিয়া তাহাদিগের কেল্লা সকল আক্রমণ করিব। বিপক্ষগণ অনুসন্ধান পাইয়াছে যে, আমরা কোথায় থাকিয়া লড়াই করিতেছি। তাহাদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য এক কৌশল করা হইল। অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য আমাদিগের আড্ডায় মাত্র থাকিবে। কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে ছদ্মবেশী গ্রামবাসী সাজাইয়া কৌশলে শত্রু পক্ষকে সংবাদ দিবার প্রস্তাব হইল যে, ডাকুদিগের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার হইবে এবং ডাকুগণ কোথায় থাকে, তাহা তাহারা ঠিক জানে। আমরা তিনদলে প্রস্তুত হইলাম।

বো-হ্লাবু পুনরায় সেগাদিনের কেল্লা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন,আমি চাউ-মিউর কেল্লা আক্রমণ করিব, স্থির হইল। বো—উ মিনবুর কেল্লা আক্রমণ করিবেন। পূর্ব্বে বো-শোয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার বাড়ী শোয়েবো জেলায় আমাদিগের রসদ পার্টি লুটের পর তিনি শোয়েবো গিয়া তথায় যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।

আমরা পথে ছদ্মবেশী চর রাখিলাম, তাহারা কালা সৈন্য কোন্ কোন্ পথে আসিবে, সেই খোঁজ দিবে। আমাদের সৈন্যগণ তাহাদের নিজের দেশের পথ ঘাট যেমন জানে, বিদেশী লোকের তাহা জানিবার সাধ্য নাই। কালা সৈনাদিগের আসিবার সংবাদ পাইয়া আমরা তিন দল তিন দিকে জঙ্গলের গোপনীয় পথ দ্বারা চলিলাম। কালা সৈন্যগণ প্রকাশ্য পথে আসিতেছে। রাত্রিকালে আমরা যাত্রা করিলাম। যে অল্প সৈন্যগুলি আড্ডায় রাখিয়া গেলাম, তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা যেন আড্ডার চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইয়া লোক দেখান ভাবে বিপক্ষকে জানিতে দেয় যে, ভিতরে বহু লোক আছে। শত্রুগণ নিকটবর্ত্তী হইলে পাহাড়ের গুপ্ত-রাস্তা দিয়া তাহারা যেন সরিয়া পড়ে। আমাদের প্রত্যেক দল যে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছে, তাহা সেনাপতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পূর্ব্বাহ্নে জানিতে দেওয়া হয় নাই।

যাহারা যে যে জেলার স্বাধীনতা ও স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের পরস্পরকে, অর্থাৎ এক জেলার লোককে অন্য জেলার লোকে সঙ্কেত দ্বারা চিনিতে পারে, এমন কতকগুলি সঙ্কেত সকলকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং নিজেদের দলের বহু লোককে পরস্পর অনেকেই চেনে না,তাহাদের আপন আপন দলের লোকদিগকে চিনিবার জন্য আর এক প্রকার সঙ্কেত শিক্ষা দেওয়া হইল। পরামর্শে সাব্যস্ত হইল, ঐ তিন দল তিন কেল্লা আক্রমণ করিবার পর কোথায় আবার মিলিত হইবে, তাহার ঠিক নিশ্চয়তা রহিল না, কেননা যুদ্ধের ফলাফল কি প্রকার দাঁড়ায়, তাহা দেখিয়া তবে মিলনের কথা হইবে। এই তিন দলের মধ্যে পরস্পরের সংবাদ আদান প্রদান করা যাইতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত হইল। আমি আপন সৈন্য লইয়া চাউমিউর দিকে রাতারাতি চলিলাম, সমস্ত রাত্রি চলিয়াও তথায় পেঁছা গেল না। এক নিবিড় বনের মধ্যে প্রভাত কালে আড্ডা ফেলিলাম। সূর্য্যোদয় হইল। সকলে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, কেবল পাহারাগণ পাহারা

দিতে লাগিল। এক ঘুমেই বেলা দুইপ্রহর, সকলে জাগিয়া ক্ষুধার জ্বালায় আপন আপন সঙ্গের খাদ্য সকল আহার করিয়া সুস্থ হইল। সূর্য্যদেব আবার অস্ত গেলেন। অন্ধকারে আমরা গা ঢাকা দিয়া চাউমিউর কেল্লাভিমুখে ছুটিলাম। রাত্রিকালে বন জঙ্গল, খাল নালা পার হইয়া প্রায় দেড় প্রহরের সময় কেল্লার নিকট উপস্থিত হইলাম।

কেল্লা হইতে দূরে অপেক্ষা করিয়া কেল্লার পাহারার অবস্থা জানিবার জন্য লোক পাঠাইলাম, প্রেরিত লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, কোয়াটার গার্ডে শান্ত্রি পাহারা খাড়া আছে এবং কেল্লার ভিতরে দুইজন সেপাহি চোরা পাহারায় নিযুক্ত আছে। কেল্লাটি কাঠের খুঁটী ও মাটীর সাহায্যে প্রস্তুত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দুইদিকে দুইটী দরজা, তাহার পাল্লা মোটা সেগুণ কাঠের দ্বারা নির্ম্মিত।

আমি রাস্তায় দিবা ভাগে,জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান কালে, কতকগুলি সামান্য ধরণের ছোট ছোট মই প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। গোপনে সেই সকল মই কেল্লার চারিদিকে প্রাচীর গাত্রে স্থাপন করা হইল। কেল্লার সৈন্যেরা, বোধ হইল, এক প্রকার নির্ভাবনায় ঘুমাইতেছে, তাহার কারণ এখান হইতে দুইশত সৈন্য প্রধান ডাকুর দল আমাদিগকে জব্দ করার জন্য যখন গিয়াছে, তখন আর এমন কোন বড় ডাকুব দল নাই, যাহারা কেল্লা আক্রমণ করিতে সাহস পাইবে, সেইজন্য বোধ করি, ইহারা খাতিরজমা হইয়া আছে। আমি কতক গুলি সৈন্যকে বন্দুক লইয়া সেই মই সকল আরোহণ করিতে আদেশ করিয়া কহিলাম যে, সর্ব্বপ্রথম তিনজন পাহারাকে তাহারা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে। পরে যখন ভিতরে হাল্লা গোল্লা হইবে, যখন চারিদিক হইতে ওয়ালি করিয়া ভিতরে এক গণ্ডগোল বাধাইয়া দিতে হইবে।

আমার আদেশ ও সঙ্কেত মতে ইহারা মইয়ে চড়িল। তাহাতে সামান্য শব্দের আওয়াজী পাইয়া শান্ত্রি হাঁকিল “Wait, who comes there ?” অর্থাৎ কে আসছ, থামো। এই প্রকার চালেঞ্জ করিতে না করিতেই ব্যাং ব্যাং করিয়া তিনদিকে তিন আওয়াজ হইল। শান্ত্রি যেন ঢলিয়া পড়িয়া গেল, এমন শব্দ শুনা গেল। কোয়াটার গারদের অন্য পাহারাগণ ধচমচ করিয়া জাগিয়া উঠিয়া alarm bugle বা বিপদসূচক বংশীধ্বনি করিল। কেল্লার অন্যান্য সেপাইগণ ডাকু আসিয়াছে বলিয়া কোমর বাঁধিয়া আপন আপন রাইফল লইয়া লাফাইয়া বাহির হইতে লাগিল। ইত্যবসরে কেল্লার চারিদিক

হইতে আমাদের সৈন্যগণ ওয়ালি করিল, তাহাতে যেন অনেক লাফাইয়া হতাহত হইল, এমন বোধ হইল। সেপাইগণ আন্দাজে আমাদের সৈন্যের উপর এক ওয়ালি করিল। আমাদের সৈন্যগণ আর এক ওয়ালি দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর দিল। ভিতরে এক মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। তখন আমি হুকুম দিলাম "ভাঙ্গ কেল্লার দরজা।" আমাদের লোকে কুড়ালী দ্বারা কেল্লার দুইদিকে দুই দরজা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, এ দিকে দুই পক্ষের পরস্পরের দিকে ওয়ালি চলিতে লাগিল। দরজা ভাঙ্গিলে,আমার লোক সকলকে দুইদিক হইতে ভিতরে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের পক্ষ হইতে কতকগুলি মশাল জ্বালিল,কেল্লা দিনের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। প্রাচীরের উপর হইতে আমার লোকসকল লাফাইয়া ভিতরে পড়িতে লাগিল। আমার পাঁচশত লোক, আর কেল্লায় মাত্র দুইশত লোক। ইহারা সকলেই পাঞ্জাবী মুসলমান। দুইপক্ষে হাতাহাতি লড়াই হইতে লাগিল। সেপাইগণের অধিকাংশই চির নিদ্রায় শয়ন করিল। অল্প সংখ্যক লোক পলাইয়া কেল্লার বারাকের এক কোণে আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে বাঁধিবার আদেশ দিলাম। আহতদিগকে একত্র করিয়া হাঁসপাতালের ভিতর জমা করা হইল। দুইশত রাইফল, কার্তুজ, আটা ঘি ডাইল এবং নগদ ৫০০৲ শত টাকা আমাদের নিজ দখলে আসিল। আমার নিজের সৈন্যর দ্বারা কেল্লার পাহারা বসাইলাম। আহতদিগের আর্ত্তনাদে প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। কেল্লায় একজন মান্দ্রাজী ডাক্তার ও একজন কম্পাউণ্ডার ছিলেন, তাঁহাদিগকে আর বন্দী করা হইল না। তাঁহাদিগকে আহত ব্যক্তি সকলকে চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হইল। এই হস্পিট্যালের লোকদিগকে কেল্লার বাহিরে যাইতে নিষেধ করা হইল। তাঁহারা প্রকারান্তরে বন্দী হইলেন, কিন্তু কেল্লার কোন থানার মধ্যে তাহাদিগকে পোরা হইল না। তাহারা ভয়ে ভয়ে আমাদের হুকুম পালন করিতে লাগিল। কেল্লার একজন সুবাদার, একজন জমাদারকে আমরা বন্দী করিলাম। আমার লোকের মধ্যে পনর জন হত হইয়াছে, এবং ২৫ জন আহত হইয়াছে, কিন্তু শত্রুর পক্ষের পঁয়ত্রিশ জন আহত,এবং দশজন অনাহত। এই পঁয়তাল্লিশ জন বাদে আর সকলে নিহত হইয়াছে। মৃত মুসলমান ও বর্ম্মাদিগকে একসঙ্গে কবর দেওয়া হইল।

আমার সৈন্যদিগকে সেপাইদিগের রাইফল দিয়া কেল্লা রক্ষার বন্দোবস্ত করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল। রাত্রিকালের লড়াইয়ের সংবাদে চতুপার্শ্ব-

বর্ত্তী গ্রামের লোকের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামের অনেক লোক ভয়ে পলাইয়াছে। চাউমিউরের তুজি আমাদের পক্ষে জানিতাম, কারণ পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ফুঙ্গিচাঁয়ে যখন গুপ্তমন্ত্রণা হয়, তখন চাউমিউর তুজি সেই সভায় হাজির ছিলেন। কিন্তু তিনি বোধ করি ভয়ে পলাইয়াছেন। কারণ তাহার উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। তিনি কালাদিগের ভয়ে তাহাদের পক্ষ, বোধ করি, অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন আমাদের ভয়ে পালাইয়াছেন।

গ্রামবাসীদিগকে অভয়দান করিয়া কহিলাম "কোন ভয় নাই, আমরা কাহারো অনিষ্ট কবিব না।" আমাদের সৈন্যের দলবল যোগাইবার জন্য প্রতি গ্রামে লোক পাঠাইলাম এবং গুপ্তচরও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছদ্মবেশে লোকের মনের ভাব সকল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। মাণ্ডালের সংবাদ জানিবার জন্য তথায়ও চর প্রেরিত হইল। বোহ্লাবু ও ফুঙ্গি-উ-নাণ্ডার নিকট কেল্লা জয়ের সংবাদ পাঠাইলাম।

আমি অন্ততঃ চাউমিউর অঞ্চলে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলাম। এ স্বাধীনতার পরিণাম আমি জানিলেও, আমার মনের সখ মিটাইবার জন্য নিজকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আমি মনে মনে গর্ব্বিত হইয়া উঠিলাম। গ্রামবাসীগণ কোন হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব করিলে বা আপত্তি করিলে, তাহাদিগকে শাসন করিতে লাগিলাম। তবে অযথা কাহারো প্রতি অন্যায় না হয়, সেজন্য করা হুকুম জারি করা হইল। সৈন্যগণের রসদের উপযুক্ত মূল্য লোক সকলকে দিতে আদেশ করিলাম। লোক শাসন ও বিচারের ধূমধাম করিয়া তুলিলাম।

তিনদিন পরে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, চাউ-মিউ কেল্লার দুরবস্থার কথা মাণ্ডালে পৌছিয়াছে এবং তথা হইতে ৫০জন গোড়া এবং একশত সেপাই এক ষ্টিমারে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে দুইটী তোপও আসিতেছে। আমার সন্দেহ হইল, চাউমিউর তুজি বা গ্রামের লোক মাণ্ডালে এই সংবাদ দিয়া থাকিবে অথবা তথা হইতে নিম্নগামী ষ্টিমারের লোকে বা এই সংবাদ বহন করিয়া থাকিবে।

আজ আমার তিনদিগের স্বাধীন রাজত্বের স্বপ্ন ভাঙ্গিল! অধিকৃত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে সঙ্কল্প করিলাম। তোপের সম্মুখে আমরা অবিলম্বে উড়িয়া যাইব, তাহা নিশ্চয়। ঐপক্ষে তোপ না থাকিলে একবার দুর্গরক্ষার

চেষ্টা করিতাম। শুনিলাম, কয়েক মাইল দূরে সন্ধ্যার সময় একখানি ষ্টিমার আসিয়াছে। সেই ষ্টিমারে সৈন্য আসিয়াছে, মনে করিলাম।

সূর্য্যাস্তের পর সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলাম। রসদ যত লইতে পারা যায়, তাহার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। দুইশত রাইফল ও কয়েক সহস্র কার্তুজ লাভ হইয়াছে, তাহাতে মনের ভয় অনেক লাঘব হইল। অন্ততঃ সমসংখ্যক সেপাইয়ের সঙ্গে সম্মুখ সমর করিতে পারি,এমন ভরসা হইল। রাত্রিকালে নিঃশব্দে কেল্লা পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। যেমন নিঃশব্দে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারে রাজত্বলাভ হইয়াছিল, সেই মত অন্ধকারে নিঃশব্দে চাউমিউর রাজপাট পরিত্যাগ করিয়া আবার বনবাসী হইলাম।

চাউমিউ দুর্গজয়ের সংবাদ যেমন সেনাপতি হ্লাবুর নিকট পাঠান হইয়াছিল, সেই রূপ এই কেল্লা গোপনে পরিত্যাগের সংবাদও তাঁহার নিকট পাঠাইলাম। স্যাগাদিনের কেল্লা আক্রমণের সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক ছিলাম, ইতিমধ্যে চর মারফতে সর্দ্দার হ্লাবুর পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে,"আমরা স্যাগাদিনের কেল্লা আক্রমণ করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট কেল্লাধিকারের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, হটিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, আমাদের স্যাগাদিনের কেল্লা আক্রমণের সংবাদ শত্রুগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া সতর্ক হইয়াছিল। আমাদের হটিবার আর এক বিশেষ কারণ এই যে, নদীর মধ্যে হইতে একখানা ষ্টিমার হইতে আমাদের উপর তোপের গোলা বর্ষণ হওয়ায় আমরা আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তিষ্টিতে পারিলাম না। আমি বো-শোয়ের সঙ্গে মিলিত হইবার শোয়েবো জন্য চলিলাম। আপনিও তথায় আমাদের সঙ্গে মিলিবেন।"

বো-হ্লাবু আরও লিখিয়াছেন যে, "মিনমুর কেল্লা আক্রমণের ফল বড় সাংঘাতিক হইয়াছে। সেই আক্রমণে আমাদিগের বহু সৈন্য নষ্ট হইয়াছে। বো-উ স্বয়ং আহত হইয়া ধৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার সঙ্গে আরও অনেকে ধৃত হইয়াছে, অবশিষ্ট সৈন্য সকল শোয়েবো গিয়াছে।"

এই সংবাদ শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। হরিরাম শর্ম্মা বো-উর সঙ্গে ছিল, তাহার জন্য ভাবনা হইল। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে রাস্তায় চলিলাম। রাত্রিকালে সমস্ত রাস্তায় চলি, দিবাভাগে জঙ্গলে বিশ্রাম করি।

দুই রাত্রি পথ চলিয়া শোয়েবো হইতে ১৬ মাইল দূরে বো-শোয়ের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম এবং তথায় বো-হ্লাবু ও বো-শোয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। চাউমিউর কেল্লা অধিকারের কথায়, আমার কৌশল, সাহস, ও বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। তাঁহাদিগকে রাইফল সকল দেখাইলাম। সমস্ত বর্ম্মা সৈন্যগণ সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। এবং সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে, আমার মত লোক সমস্ত বর্ম্মা সৈন্যের ভিতর একজনও নাই। আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইলাম।

বো-উর দুর্গতির কথা বিশেষ করিয়া তাহার লোকের মুখে জানিতে পারিলাম। তাহার পরাভবের প্রধান কারণ শুনিলাম যে, যে রাত্রে তিনি মিনবুর কেল্লা আক্রমণ করেন, সেইদিন মাণ্ডালে হইতে চারিশত সেপাই মন্দুয়া যাইবার জন্য ষ্টিমার হইতে অবতরণ করিয়া মিনবুর কেল্লায় অবস্থিতি করিতে-ছিল। বো-উ গুপ্তচর দ্বারা এ সংবাদ না জানিয়া এত সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। হরিরাম শর্ম্মাও বন্দী হইয়াছে। শুনিলাম, মিন-বুর কয়েদীদিগকে শোয়েবোর জেলখানায় পাঠান হইয়াছে। তথায় তাহাদের বিচার হইবে।

আমরা প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ নির্জ্জনে বসিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলাম। প্রবল পরাক্রমে শত্রুরা আমাদিগের ধ্বংসের জন্য যে প্রকার বৃহদায়োজন করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে যে জিতিব, সে আশা কাহারও মনে স্থান পাইল না। তবে সকলেরই এক জিদ এবং একপণ যে, যুদ্ধ করিতে করিতে মরিব, বা বন্দী হইয়া শত্রুর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিব, সেও ভাল, তবু স্বাধী-নতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করিব না। যত দিন জীবিত থাকি, সাধ্য মত লড়াই করিব। মনের তেজ ও জিদের কাছে কিছু নয়। বোশোয়ে লোকটা সাহসী, রণকৌশলী ও তেজীয়ান এবং প্রভূত প্রতিপত্তিশালী লোক।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কয়েদ খালাস—পুনর্ম্মিলন।

আমার ভ্রাতাসম হরিরামের জন্য মনটা বড় ব্যগ্র হইল, কি করিয়া তাহাকে এবং বো-উ'কে উদ্ধার করি, সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণার বৈঠক আবার বসিল। মন্ত্রণায় সাব্যস্ত হইল যে, যে কোন প্রকারেই হউক, আমাদিগের কয়েদীদিগকে খালাস করিতে হইবে। এই কার্য্যে অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, তাহাই হইবে।

শোয়েবো জেল আক্রমণ করা স্থির করা হইল,কিন্তু শোয়েবো একটা প্রধান মিলিটারি ষ্টেশন,এখানে বহু সংখ্যক গোরা ও সেপাইয়ের আড্ডা,এখানে তোপখানা আছে। এমন সুদৃঢ় স্থানের জেল আক্রমণ করা সহজ নহে। সদলে নিপাত হইবারই অধিক সম্ভাবনা। তবে মনের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বাধা বিঘ্নই টিকিতে পারে না। একথা পূর্ব্বে কয়েক বার উল্লেখ করিয়াছি। কি প্রকারে শোয়েবো জেল আক্রমণ করা হইবে, তাহা আলোচনা হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, আমাদিগকে এমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে শোয়েবো হইতে অধিকাংশ সৈন্য বাহির হইয়া যায়। আমি আরো বলিলাম, শোয়েবোর কিন্নু (Kinu) নামক স্থানে ইংরেজের এক আউটপোষ্ট আছে। সেই দিকে অনেকগুলি সৈন্য লইয়া কিন্নুর পোষ্ট আক্রমণ করিবার ছলে একটা বৃথা আড়ম্বর দেখান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অনেকগুলি সৈন্য কিন্নুর পোষ্ট রক্ষার জন্য ধাবিত হইবে। আর একদল লোক শোয়েবো সহরের উত্তরাংশ আক্রমণ করিবার ভাণে বৃথা একটা গোলা-গোল্লা উপস্থিত হইবে। সহরের অনেক সৈন্য সেই দিকে যখন ধাবিত হইবে, তখন, এই অবসরে আক্রমণ করা উচিত। অন্য যত কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা হইতে আমার কল্পনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল। আরো শুনিলাম যে, চাউমিউর দুর্গতির কথা শুনিয়া শোয়েবো হইতে একদল সৈন্য সেইদিকে গিয়াছে, কেননা চাউমিউ শোয়েবোর অধীন। এখন কথা হইল যে, কে কোন্ দিকের ভার লইবেন? জেল আক্রমণ করিবার জন্য আমাকেই নির্ব্বাচন করা হইল।

বিশ্বম্ভর শর্ম্মা কহিলেন যে, আজ দুইদিন আমাদের রাজদ্রোহ ও ডাকাইতির জন্য বিচার হইতেছে। সাক্ষী সাবুদ কাল হইয়াছে, আজ হুকুমের দিন ছিল। নিশ্চয়ই আমাদের ফাঁসির হুকুম হইত।

তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহাদিগকে কি উপায়ে এবং কোন্ অপরাধে ধরিল এবং কেই বা তাঁহাদের গুপ্ত সন্ধান বলিয়া দিল।

বিশ্বম্ভর শর্ম্মা নীরবে চক্ষু দিয়া একবিন্দু জল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন যে, "যে বড় দুঃখের কথা। আমরা যে সকল লোককে বিশ্বাস করিয়া নানা গুপ্ত মন্ত্রণা তাহাদের সঙ্গে করিয়াছিলাম, তাহাদেরই কোন ব্যক্তি শত্রুর পক্ষ হইতে অনেক টাকা ঘুষ খাইয়া আমাদের সমস্ত কথা গোপনে বিপক্ষদিগকে বলিয়া দিয়াছে এবং তাহাদেরই কেহ কেহ আমাদিগকে ধরাইয়া দিবার জন্য কালাদের গুপ্তচরের কার্য্য করিতেছিল। আমরা তাহার আভাস পাইয়া, আমি ও বৃদ্ধ ফুঙ্গি রাত্রিকালে পলাইয়া, প্রথম কোন গ্রামে লুকাইয়াছিলাম, তার পরে স্যাগাইন পাহাড়ের উপরস্থ এক ফুঙ্গিচাউয়ে আসিয়া আশ্রয় লই। শত্রুগণ পিছে পিছে থাকিয়া খোঁজ পাইয়া কালাদিগকে সংবাদ দিয়া আনিয়া আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া শোয়েবো জেলে আজ পাঁচ দিন হইল আনিয়াছে। আমাদের বিচারও শেষ হইয়া আসিয়াছিল, আজ তাহার শেষ দিন।

সেই স্যাগাইন ফুঙ্গি-চার নিকট হইতে কিছুদূরে এক পর্ব্বতগুহার নিকট হিন্দু সন্ন্যাসী বসিয়া ঈশ্বরাধানা করিতেছিলেন। কালারা তাহাকে ও তাহার ভৃত্যকেও বাঁধিয়া আমাদের একসঙ্গে আনিয়া জেলে পুরিয়া দিল।"

স্যাগাইনের পাহাড়ের উপর হিন্দু সন্ন্যাসী ও তাঁহাকে তথা হইতে ধরিয়া আনার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এবং বৃদ্ধকে বলিলাম "সেই সন্ন্যাসী কি আমাদের সঙ্গে কাল রাত্রিতে আসিয়াছেন?" তিনি কহিলেন যে, "হাঁ তিনি আসিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া সন্ন্যাসী যথায় শুইয়াছিলেন, তথায় লইয়া গেলেন। তথায় গিয়া দেখি, তাঁহার ও তাঁহার ভৃত্যের পায়ে বেড়ি। সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া আগাগোড়া নিরীক্ষণ করিয়া চেহারাটা যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, এই মূর্ত্তি যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। শেষে হঠাৎ মনে হইল, ইঁহাকে ত ঢাকা ঢাকেশ্বরীর বাড়ীর নিকট বৃক্ষতলে দেখিয়াছি। ইনি সেই সাধনানন্দ স্বামী। এই কথা স্মরণ হইবামাত্র আমি ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে

প্রণাম করিলাম। সাধু একজন বর্ম্মা-সাধু, তাঁহাকে হিন্দুর মত প্রণাম করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত-ভাবাপন্ন হইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, স্বামীজী, আপনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না? আমার নাম কুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সেই যে ঢাকেশ্বরীর বাড়ীর নিকট আপনার সঙ্গে দুই দিন সাক্ষাৎ হয় এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়। তখন তিনি কহিলেন "কি, তুমি কি সেই কুড়ন? তোমার সেই অবস্থা হইতে এখনকার অবস্থার অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার পর আবার বেশ পরিবর্ত্তনে তুমি সম্পূর্ণ এক ভিন্ন লোক হইয়া পড়িয়াছ। সেই জন্য তোমাকে চিনিতে পারি নাই। "কল্য রাত্রিকালে জেলখানা হইতে আমাদিগকে খালাস করিয়াছে কে? সে কি তুমি?" আমি বলিলাম, যে"হাঁ, আজ্ঞে আমি।"

সন্ন্যাসী কহিলেন যে "ধন্য ছেলে তুমি, ধন্য বাঙ্গালীর ছেলে, ধন্য বঙ্গদেশ যে, দেশে তোমার মত সন্তান জন্মাইতে পারে। বাবা! কেমন করিয়া কি ভাবে আসিয়া ডাকাইতের দলে মিশিলে? আমি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণন করিলাম। দেশে সেই সুভদ্রা জেলেনীকে উদ্ধার করিতে গিয়া জেলখানায় আবদ্ধ হওয়া, লরিমারের ঘটনা, কমিশরিয়াট আফিসের ঘটনা, ভলাণ্টিয়াবদলে ভর্ত্তি হওয়া, বিশ্বম্ভর শর্ম্মার আশ্রয়ে যুদ্ধ শিক্ষা, রাস্তাতে ধরিয়া লওয়া এবং আমরা কি ভাবে ডাকুর দলে মিলিলাম, তাহা, মিন্থার যুদ্ধ, স্যাগাইনের যুদ্ধ, রসদ লুট, চাউমিউরের কেল্লা জয়, সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম, তিনি সমস্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাপু! দীর্ঘজীবী হও, দেবতার মুখোজ্জ্বল কর, এই প্রার্থনা ভগবানের নিকট করি।"

আমি কহিলাম যে, মগ-সৈন্যের মধ্যে আমার এখন বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে, আমি একজন জেনেরাল রূপে গণ্য হইয়াছি। বর্ম্মা-সর্দ্দারগণ আমার যুক্তিভিন্ন কোন কার্য্য করিবে না। আমার সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল, একবার উর্দ্ধনেত্র করিয়া স্বর্গপানে চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুকাল রহিলেন।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আপনি কতদিন যাবত ব্রহ্মদেশে আসিয়াছেন এবং এখানে কতদিন আছেন?" সাধনানন্দ স্বামী কহিলেন, "আমি প্রায় ছয় মাস যাবত বর্ম্মায় আসিয়াছি। কিওাট, কালামিউ, মনুওয়া,

মিন্‌জান প্রভৃতি স্থানে কতকদিন বাস করিয়া পরে স্যাগাইনে আসিয়াছিলাম। স্যাগাইনে আমার বেশী দিন হয় নাই, মাত্র দিন দশেক হইবে।”

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “আপনাকে বন্দী করিবার কারণ কি?” তখন তিনি কহিতে লাগিলেন যে, “আমি ভৃত্যসহ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদিগের গুহার নিকট এক বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছিলাম। আমার তথায় যাওয়ার পর এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ (বিশ্বম্ভর শর্ম্মা) এবং এই বৃদ্ধ ফুঙ্গি আসিয়া নিকটস্থ এক ভিক্ষু-আশ্রমে গোপনভাবে বাস করিতে লাগিলেন। দুই দিন পর হঠাৎ একদল সেপাই আসিয়া সেই আশ্রম ঘেরিয়া দাঁড়াইল। পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে একজন বর্ম্মা আসিয়া এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং ফুঙ্গিকে দেখাইয়া ছিল। তখন সেপাইগণ ইহাঁদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। পরে আর দুইজন বর্ম্মা আসিয়া সাহেবের সঙ্গে বর্ম্মা ভাষায় নানা কথা কহিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে মংফালা, মংকালা বলিতে লাগিল। পুনঃপুনঃ তাহারা আমাকে দেখাইয়া দিতে লাগিল। আমি তাহাদের কোন কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। ইহার কতক্ষণ পর সাহেবের হুকুমে আমার ও আমার ভৃত্যের হাতকড়া দিয়া আবদ্ধ করিল। আমার ধর্ম্মগ্রন্থ গুলি, ছোট একটী ফটোগ্রাফের ক্যামেরা, একটী দূরবীণ, একটা ব্যারোমেটার ও কতক গুলি নক্‌সা সমস্তই লইয়া গিয়াছে। আর সকল যে গেছে, তজ্জন্য বড় দুঃখিত নহি, তবে ধর্ম্মগ্রন্থগুলি যে লইয়াছে, তাহার জন্য বড় দুঃখিত হইয়াছি।”

“আমাদিগকে মাণ্ডালে বা স্যাগাইনে রাখিলে পাছে কোন গোলযোগ ঘটে, এই ভয়ে আমাদিগকে শোয়েবো জেলে পাঠাইয়াছে। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী সেপাইগুলি কি অমানুষ! তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। আমার প্রতি তাহারা যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। এই দেখ আমার গায়ে প্রহারের দাগ সকল, দেখ কতস্থানে রক্ত জমিয়া কাল হইয়া আছে।”

আমি। আপনাকে প্রহার করিবার কারণ কি?

সাধনানন্দ স্বামী। “বাপু! কেন প্রহার করিল, জানি না। তবে সেপাই বেটারা কথায় কথায় গালি দিয়া বলিত যে “শালা ডাকু যব্ ফাঁসি গলামে লাগেগা, তব্ মালুম হো যায় গা।” এই কথা বলিয়া কোন সামান্য ছুতায়, পথ হাটাতে একটু ধীর পড়িলে, পিপাসায় ক্লান্ত হইলে, একটু জল পান করিতে চাহিলে, মলমূত্র ত্যাগের কথা বলিলে, কিল চড় বা লাথি ঘুসি মারিতে

থাকিত। আমি ইহাদের কথা শুনিয়া অবাক! ভাল! আমি কবে ডাকা-ইতি করিলাম যে, আমার গলায় ফাঁসি লাগিবে! হায় ভগবান! তোমার একি লীলা! কোন্ পাপে আমার এত লাঞ্ছনা! আমি বেটাদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে "আমি কবে কোথায় ডাকাইতি করিয়াছি? তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিলে বাধিত হইতাম।" তাহাতে তাহাদের হাবিলদার কহিল, "চুপ রহ বদমাইস, তোম আবি সাধু বাত কিয়া, বড়া ভাল মানুষ হুয়া। কবি মংকালা বান যাতা, কবি ডাকু লোক কা সর্দ্দার বান যাতা, তোমরা ভেলকী সব মালুম হো গিয়া।" আমি মনে মনে বলি ভাল, এখন সাধু সাজিয়াছি, কখন মংকালা সাজি, কখনও ডাকাইতের সর্দ্দার সাজি, এ ত মন্দ রহস্য নয়, এ রহস্য আমাকে ভেদ করিয়া দিবে কে? কত চিন্তা করিয়া ইহার একটা কূলকিনারা করিতে পারিলাম না। বৃদ্ধ পৌনাটীকে জিজ্ঞাসা করিব, তাহা আমাদিগকে এক স্থানে রাখে না। কোন ফাঁক মত দুই এক কথা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

"আজ পাঁচ দিন এখানকার জেলখানায় আসিয়াছি, প্রায়ই অনাহারে কাল কাটাইয়াছি। জেলের ভিতর সেপাই বেটাদের যে দৌরাত্ম্য, তাহা অকথ্য! বলি ভগবান! ভারতবাসীর মত কুলাঙ্গার বুঝি দুনিয়াতে নাই। এই ছোট লোকগুলা কয়েক টাকা বেতনে বিদেশীর গোলামীতে ভর্ত্তি হইয়া ধরাকে সরাখানার মত জ্ঞান করে। বিদেশীর মনস্তুষ্টির জন্য স্বদেশী লোককে অনর্থক নানা প্রকার লাঞ্ছনা দেয়। হায় মূর্খগণ! যে বিদেশীর মনস্তুষ্টির জন্য আজ আমাকে এত লাঞ্ছনা দিলে, কাল হয়ত সেই বিদেশী তোমাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিবে! তখন তোমার অবস্থা আমার অবস্থা হইতে কত অধম, তাহা কি একবার মনে ভাবিলে না? হায়! যে জাতীয় লোকের স্বজাতির প্রতি ও স্বদেশীর প্রতি প্রেম জন্মে না, তাহারা চিরকালই পদ-পদানত থাকিবে। তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ কখনও হইবে না। হায়! হায়! স্বদেশী লোকের অধোগতি দেখিয়া দুঃখ ও ক্ষোভে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। না জানি, ইহারা কত মতে নির্দ্দোষী লোকের প্রতি অহরহ কত অকথ্য অত্যাচার করিতেছে!"

আমার আজ বিচারের দিন ছিল। আমার উপর অনেকগুলি মোকদ্দমা চাপিয়াছে। ডাকাইতি, নরহত্যা, পরস্ত্রী-হরণ, রাজদ্রোহ ইত্যাদি চার্জ্জ আমার

উপর হইয়াছে। মূল কথা ইণ্ডিয়ান পিনাল কোর্টের বড় বড় ধারাগুলি প্রায়ই বাদ যায় নাই।

স্বামীজীর কথা শুনিতে প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, এবং অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, সে কি কথা, সে কখন সাধু হয়, কখন মংকালা হয়, কখন বা ডাকাইতের সর্দ্দার হয়, সে কি? শেষে মনে স্থির হইল, ওরে আমাকে ছদ্মবেশী সাধু মনে করিয়া তবে ইহাঁকে ধরিয়াছে এবং আমাকে মনে করিয়া ইহাকে এত প্রহার করিয়াছে, এবং এত লাঞ্ছনা দিয়াছে। হরিবোল হরি, এখন কারণ বুঝিলাম। স্বামীজীকে মনের কথা জানাইলাম না। বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইবার জন্য পুনরায় বিশ্বম্ভর শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন যে, "যখন কালারা এই সাধুকে ধরে, তখন একজন মুসলমান ইহাকে সেনাক্ত করিয়া একজন সাহেবকে দেখাইয়া দেয় যে, এই ব্যক্তি মংকালা, এই ডাকুদিগের প্রধান সর্দ্দার। এই ব্যক্তিই রসদ পার্টির টাকাকড়ি লুট করে, এবং লরিমার সাহেব-দিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, এবং ইওয়া-হাঁট বস্তির নিকট লড়াই করিয়া লেপ্টেনাণ্ট মিণ্টোকে ও আর অনেক লোককে হত্যা করে, হাবিলদার লছমন সিং ও জমাদার হনুমন্ত পাণ্ডে প্রভৃতিকে এ-ই ধরিয়া লইয়া যায়, এবং চাউ-মিউর কেল্লা ও ফুঙ্গির সঙ্গে নানা ছলা পরামর্শ করিবার জন্য ছদ্মবেশে সাধুর সাজে এখানে আছে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে "এই যে মংকালা, তাহার প্রমাণ কি? আর কোন সাক্ষী আছে, যাহারা ইহাকে সেনাক্ত করিয়া দিতে পার? তাহাতে যে ব্যক্তি কহিল যে, ইহাকে যে বর্ম্মারা সকলেই চেনে, কিন্তু কেহ বলিবে না। তবে আমার আরো লোক আছে, তাহারা ইহাকে জানে এবং তাহারা নিশ্চয়ই সেনাক্ত করিয়া দিবে। সেই সকল লোক স্যাগাইন বাজারে থাকে। এই প্রকার বলিবার পর সাহেব আমাদের সকলকে স্যাগাইনের থানায় লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে সেই লোকটা আরো দুইজন জেলবাসী মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া সাহেবের সম্মুখে এই সাধুকে সেনাক্ত করাইয়া দিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা ইহাকে কেমন করিয়া জান? তাহাতে তাহারা বলিল, এই ব্যক্তি পূর্ব্বে মাণ্ডালে পৌনা মংবার (বিশ্বম্ভর শর্ম্মা) বাটীতে থাকিত এবং এ রাজার সোয়ারের দলে ভর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাও জানি।

সাহেব ইহাদের মুখে অকাট্য প্রমাণ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে কহিলেন যে, সরকার যে পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, সে টাকা তুমি পাইবে। আমি বড় সাহেবকে, তোমাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিতে, সুপারিশ করিলাম। সাহেব তাহাদিগকে কোর্টে সাক্ষ্য দিবার জন্ত শোয়েবো উপস্থিত থাকিতে বলিলেন। তাহারা নিয়মমত খোরাকী ও বাসা-খরচ পাইবে।

বৃদ্ধের কথায় সমস্ত ঘটনা ভালমত বুঝিলাম এবং তাহার মর্ম্ম সাধনানন্দ স্বামীকে বাঙ্গালায় বলিলাম। তিনি বর্ম্মা কথা জানিতেন না বলিয়া তাঁহার সেনাঙ্কের বিবরণ বুঝিতে পারেন নাই। আমার কথায় অত্যন্ত কৌতূহল-বিশিষ্ট হইয়া কহিলেন, "তোমার নাম কি মংকালা, তোমাকে ছদ্মবেশী সাধু মনে করিয়া তবে আমাকে ধরিয়াছে? তাহা হইলে আমাকে মুক্ত করিয়া ভাল কর নাই। বিচারে যদি আমার ফাঁসি হয়, এবং তাহা দ্বারা তোমার প্রাণ রক্ষা হয়, তাহা হইলে সে সে আমার শ্লাঘার বিষয়। তবে আমাকে বিদায় দাও এবং পথদর্শক একজন লোক দাও, আমি গিয়া শোয়েবোর কাছারীতে উপস্থিত হই। যদি আমার জীবন দিয়া তোমার মত একজন স্বদেশী বীরপুরুষকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন ধন্য মনে করিব। আমি যখন সংসার-ত্যাগী ফকীর মানুষ, তখন আমার জীবন মরণে বড় প্রভেদ নাই। তোমার দ্বারা হয়ত কালে স্বদেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে। অতএব আমাকে বিদায় দাও, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া স্বামিজী গাত্রোত্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "তাহাও কি হয়, আমি যে আপনাকে দৈবক্রমে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, সেই আমার বহু পুণ্যের ফল। এরূপ দৈব ঘটনা ঈশ্বরের মর্জ্জি ভিন্ন হইতে পারে না। এ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের লীলা, তাহা না হইলে, আপনি যে বর্ম্মায় আসিয়াছেন, আপনি যে বেড়ি পায়ে দিয়া জেলে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা কি আমি পূর্ব্বে জানি? আপনি ধর্ম্মপ্রাণ মহাজ্ঞানী, দেবতুল্য পূজ্য ব্যক্তি। আপনার জীবন বহু মূল্যবান। আমি সাংসারিক লোক, নিত্য কত শত পাপ করিতেছি। তাহাতে আমার প্রাণদণ্ড হইলে বিশেষ আক্ষেপের কারণ নাই। আর এক কথা, আমার পরিবর্ত্তে আপনার প্রাণদণ্ড হইলে, আমার প্রাণ যে বাঁচিবে, তাহার ভরসা কি? শুনেন নাই কি, সেপাই-বিদ্রোহের পর, এক নানা সাহেব বলিয়া ধৃত হইয়া ক্রমে আঠার জন নানার ফাঁসী হইয়াছে। এখন আপনার

ফাঁসি হইল, কালে আমি ধরা পড়িলে, হয়ত আমার ফাঁসি হইবে। অথবা আমার নামে অন্যের ফাঁসি হইবে। এই প্রকার কতবার এক মংকালার ফাঁসি হইবে, কে জানে? পায়ে ধরি, এ খেয়াল পরিত্যাগ করুন। বসুন। এই বলিয়া পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলাম।" তিনি আমার কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

বিশ্বম্ভর ও বৃদ্ধ ফুঙ্গি আমাদের কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসীর কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলে তাঁহারা হাসিয়া উঠিলেন এবং সন্ন্যাসীর মহোদ্দেশ্যের জন্য সাধুবাদ করিলেন।

অতঃপর বো-উ এবং হরিরাম শর্ম্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ইহার পর নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কয়েকজন লোহকার আনাইয়া কয়েদীগণের পায়ের বেড়ী কাটিয়া দিতে আদেশ করিলাম।

বৃদ্ধ ফুঙ্গি, বিশ্বম্ভর ও সাধনানন্দ স্বামীদিগের আহারের আয়োজন ভালমত করাইতে আদেশ দিলাম।

বোশোয়েও শোয়েবো হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমার হাতখানা ধরিয়া আমার শৌর্য্য ও রণকৌশলের জন্য কতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং খালাসী কয়েদীদিগের সঙ্গে একে একে আলাপ করিয়া জেলখানার হাল অবগত হইলেন। বিশ্বম্ভর ও উ-নাওাউর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নতজানু হইয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিলেন।

অতঃপর বোহ্লাবুও ক্যাম্পে ফিরিলেন। বোশোয়ের কতকগুলি লোক জখম হইয়াছে, কিন্তু কেহ মারা যায় নাই। বোহ্লাবু কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই, সুতরাং তাঁহার সৈন্য যেমন, তেমনই আছে। তিনিও আসিয়া কয়েদ-খালাসের জন্য মহানন্দ প্রকাশ করিলেন। বোহ্লাবুকে এবং বোশোয়েকে সন্ন্যাসী সাধনানন্দ স্বামীর নিকট লইয়া গিয়া পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, ইনি একজন হিন্দু-যোগী। তাহাতে বোশোয়ে ও বোহ্লাবু নত-জানু হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন, হিন্দু-যোগীকে কালারা কেন ধরিল? বর্ম্মারা যোগীকে যোজী বলে। আমি তাঁহার কয়েদের আমূল বৃত্তান্ত কহিলে, সকলে হাসিয়া উঠিলেন যে, কালাদের কি মতিভ্রম হইয়াছে?

সকলের পায়ের বেড়ী মুক্ত হইল এবং আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতঃপর বিশ্বম্ভর শর্ম্মা, ফুঙ্গি, বোশোয়ে, বো-হ্লাবু, বো-উ প্রভৃতি প্রধান প্রধান

ব্যক্তি সকল সহ ক্যাম্প হইতে দূরে এক নিভৃত স্থানে, এক গুপ্ত মন্ত্রণার বৈঠক বসিল। তাহাতে শত্রুর সৈন্যবল, অর্থবল, অস্ত্রবল এবং স্বদেশী লোকের শত্রুতার বিষয়ে আলোচনা হইল। আমাদিগের যুদ্ধে যে শেষে জয়ের কোন আশা নাই, তাহাও আলোচনা হইল। সকলেই গভীর চিন্তাকুল হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। বৃদ্ধ ফুঙ্গি কহিলেন, "বৎসগণ! তোমরা বীরের জাত, বীর পুরুষ সকল, প্রকৃত স্বদেশভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোক, তোমাদিগকে আমি অধিক কি বলিব? জেলার লোক যে প্রাণপণে কালাদের সঙ্গে লড়াই করিতেছে, তাহাদের আদর্শ তোমরা। কালাদিগের দৃষ্টান্ত ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া সেই সকল জেলার লোক সকল অত্যন্ত উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়াছে। আমি সকল স্থানের সংবাদ পাইয়া থাকি। তোমরা যদি হতাশ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা কর, কালাদিগের শক্তির ভয়ে ভীত হও, তাহা হইলে তোমাদের দেখাদেখি অন্য জেলার লোকও নিরস্ত হইবে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশ ও বর্ম্মাজাতির কলঙ্ক হইবে। সকলেই কিছু জিতেতে পারে না। লড়াই করিয়া হারিলেও পুরুষত্ব প্রকাশ পায়। আমাদের জাতীয় সৈন্যগণ শেষকালে হারিলেও কালাদিগকে হয়রাণ করিয়া হারিবে, তাহাদিগের বহু লোকের প্রাণ যাইবে এবং বহু অর্থ ব্যয় হইবে এবং সেইজন্য তাহারা তোমাদের বীরত্ব ও স্বদেশ-প্রেমের কথাটাব ফল স্মরণ করিয়া এ জাতির প্রতি সম্মান করিতে শিখিবে। আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া যদি কালাদের পদানত হও, তাহা হইলে পদে পদে তাহাদের পদাঘাত খাইতে হইবে। আমার এ কথা গুলি স্মরণ রাখিও, আমার এই অনুরোধ।"

আমরা যদিও নিরাশ হইয়া সংকল্প পরিত্যাগ করি নাই, তবুও অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ ফুঙ্গির মুখে এতাদৃশ তেজ ও উৎসাহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সকলের প্রাণই সজীব হইল। সকলেই এক বাক্যে দৃঢ় সংকল্প করিলাম যে, যতদিন সাধ্য থাকিবে, ততদিন লড়িতে থাকিব, লড়াই করিতে করিতে প্রাণ যায় সেও ভাল, শত্রুর ফাঁসিকাঠে ঝুলিলেও মঙ্গল, তবু আত্ম-সমর্পণ করিয়া স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিব না।

অতঃপর কথা হইল যে, ফুঙ্গি উ-নাওং মংবা (বিশ্বম্ভর) এবং এই সাধুকে লইয়া কি করা হইবে? আমি কহিলাম, এই বৃদ্ধকে মণিপুরে পাঠান কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহার পাছে যখন শত্রু লাগিয়াছে, এবার যেন ভাগ্যক্রমে ফাঁসি হইতে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু এদেশে থাকিলে তিনি পুনরায় ধৃত হইয়া লাঞ্ছিত হইবেন,

তাহা নিশ্চয়। কিন্তু বিশ্বম্ভর শর্ম্মা ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া যাইতে রাজি হইলেন না। তিনি আরও কহিলেন যে, পরিবারবর্গ ফেলিয়া তিনি একাকী কিছুতেই মণিপুর যাইবেন না। শেষে কথা হইল যে, আপাততঃ ইহাকে উন্মু সুভার এলাকায় গোপনে রাখা হউক, পরে পরিবারবর্গকে যখন মাণ্ডালে ফোর্ট হইতে উদ্ধার করিতে পারা যায়, তখন একসঙ্গে সকলে মণিপুর যাইবেন। তাঁহার পরিবারবর্গকে মাণ্ডালের দুর্গে আবদ্ধ করার সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলেন। বিশ্বম্ভর ঠাকুর এই প্রস্তাবে রাজি হইলেন। উন্মু সুভার নিকট এক পত্র লেখা হইল যে, কিছুদিনের জন্য এই বৃদ্ধ পোনাকে তিনি দয়া করিয়া আশ্রয় দেন। সেই পত্র বৃদ্ধ ফুঙ্গি, উনাণ্ডা, বোশোয়ে এবং বোহ্লাবু স্বাক্ষর করিলেন। রাত্রিকাল লোকসহ বৃদ্ধকে তথায় পাঠাইবার কথা স্থির হইল।

ইহার পর উ-নাণ্ডাকে পাগানের কোন ফুঙ্গিচাঁয় পাঠানের প্রস্তাব হইল। কারণ পাগানে অসংখ্য ফুঙ্গি ও ফুঙ্গিচাঁ, তথায় গেলে সহসা এ বৃদ্ধকে খুজিয়া বাহির করা সহজ নহে। ফুঙ্গিও তাহাতে সম্মত হইলেন। রাত্রিকালে গরুর গাড়ীতে তাঁহাকে পাঠানের কথা হইল।

অবশেষে সাধনানন্দ স্বামীর কথা উঠিল। তিনিও মন্ত্রণার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি রেঙ্গুনের দিকে যাইতে ইচ্ছা করেন। আমি বলিলাম যে, তাহা কথাই হইতে পারে না। তিনি এখান হইতে বাহির হইবা মাত্রই শত্রুর গুপ্ত চর কর্ত্তৃক ধৃত হইবেন। শোয়েবোর জেল ভাঙ্গিয়া যত কয়েদী পলাইয়াছে, তাহাদের সকলের জন্যই হয়ত জেলায় জেলায় টেলিগ্রাম গিয়াছে এবং তাহাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। এবার ধরা পড়িলে নিশ্চয়ই তাঁহার ফাঁসি হইবে। তাঁহাকেও আমি কিছুদিন উন্মু থাকিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি অনির্দ্দিষ্ট ভাবে গোপনে পলাইয়া থাকিতে রাজি হইলেন না। তিনি পুনরায় মণিপুর হইতে যেপথ দিয়া আসিয়াছেন, সেই পথে মণিপুরাভিমুখে যাইতে স্বীকার করিলেন। আমি তাহাতে নানা আপত্তি তুলিলাম। বলিলাম যে, নিশ্চয়ই পথে তিনি পুনরায় ধৃত হইবেন। তিনি কহিলেন যে, "বাপু। আমি ফকির মানুষ, এত সাংসারিক ভয় করিলে কি চলে? আমি যখন সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারিয়াছি এবং এক প্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি, তখন চোরের মত লুকাইয়া থাকা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না। ভগবানের ইচ্ছা যদি হয়, তবে ধৃত হইলে না হয় ফাঁসি হইবে।

মরিতে ত একদিন হইবেই। চিরকাল এসংসারে থাকিতে কেহই আসে নাই। আমাকে যে অন্যায় পূর্ব্বক ফাঁসি দিবে, ভগবান তাহার বিচার করিবেন। তুমি একজন লোক আমাকে দাও, মনুয়ার পথটা আমাকে ধরাইয়া দিবে। আমি একাকাই চলিয়া যাইতে পারিব।

স্বাধনানন্দ স্বামী যখন কিছুতেই থাকিলেন না, তখন তাঁহাকে পথ দেখাইবার জন্য দুইজন লোক দিলাম। তিনি প্রস্তুত হইলেন। আমি তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া কহিলাম যে, আশীর্ব্বাদ করুন সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যেন নিরাপদ হইতে পারি, শত্রুকে পরাস্ত করিয়া নাস্তানাবুদ করিতে পারি। জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই।

তিনি কহিলেন "আমি ঐকান্তিক মনে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমার কায়িক মঙ্গল হউক, শত্রুগণ যেন তোমার কেশও স্পর্শ করিতে না পারে। তুমি বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল কর। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তুমি স্বদেশের জন্য কিছুই করিতে পারিবে না। স্বদেশী লোকে তোমার মত লোককে চিনিল না। তুমি যেমন ক্ষোভে মগের মুল্লুকে আসিয়া মগের সঙ্গে মিশিয়া মগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছ, ইহার অৰ্দ্ধেকও যদি স্বদেশের জন্য করিতে পারিতে, তবে স্বদেশ কত গৌরবান্বিত হইত। বঙ্গদেশের চিরকলঙ্ক ঘুচিত। যে সকল বাঙ্গালী মোটা মোটা বাক্যবীর বাবুর বক্তৃতায় মোহিত হইয়া তাহাদের গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখায়, তাঁহারা কি তোমার নিকট মানুষ? তাঁহাদের কেবল মুখ-জোর ও কলমের জোর আছে। তাঁহারা কেবল বকিয়া বকিয়া মুখে ফেনা তোলেন এবং লিখিয়া লিখিয়া হাতে ব্যথা করেন। তাঁহাদের সেই বক্তৃতা ও লেখার ফলে সেই জাতীয় শত শত বাবুর দল সৃষ্টি হইতেছে। এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ভবিষ্যদ্বংশ এখন গলা বাজাইয়া উঠিবে যে, তাহাদের সোর গোলে দেশে বাস করা ভার হইবে। বাক্যবীর শত শত জাগিতেছে, কিন্তু তোমার মত কর্ম্মবীর এখন পর্য্যন্ত একটীও জন্মায় নাই।

আমি বলিলাম যে, আমি কর্ম্মবীর নহি, তবে অন্যায় অবিচার, অত্যাচার ও জাতি-দ্বেষ আমার সহ্য হয় না। যেখানেই যাই, নেটিব ও বাঙ্গালীর প্রতি অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না। সেই জন্য, আপনি যাহা বলিয়াছেন, মনের ক্ষোভে মগের মুল্লুকে মগের দেশের জন্য

লড়াই করিয়া মনের ঝালটা মিটাইয়াছি। জীবনশূন্য বঙ্গদেশে আর থাকিতে ইচ্ছা হয় না। আমার ইচ্ছা করে যে, একবার স্বদেশী লোককে আপন মন্ত্রে দীক্ষিত করি, তাহারা আত্ম সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হউক, তেজীয়ান ও সাহসী হউক, সকলে এক-মিল হউক, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করুক। এ সকল প্রস্তাব বাঙ্গালীদিগের নিকট প্রলাপ বাক্যের মত বোধ হয়। যাহাদের স্ত্রী কন্যা মা ভগ্নীদিগকে দুর্বৃত্তগণ অপহরণ করিলে পরদিনই তাহা ভুলিয়া যায়, যাহাদের দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে দুই দিনেই সেকথা বিস্মৃত হয়,সে সকল লোকের মধ্যে কি পদার্থ আছে ? আমি দেশে থাকিতে যখন অনেকবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কাহারো প্রাণে একটু সজীবতার ভাব জাগাইতে পারি নাই, তখন আমি সে বিষয় একেবারে হতাশ হইয়াছি। আমার মনে হয় যে, পাথর কাটিলে যদি রক্ত বাহির হয়, মেষ শাবকও যদি সিংহ বিক্রমশালী হইতে পারে, তবু বাঙ্গালীর শরীরে আঘাত করিয়া একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করা অসম্ভব।

স্বামীজী কহিলেন "বৎস কুড়ন! হতাশ হইও না। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। জগতে যাহা কেহ কখনও হইবে বলিয়া স্বপ্নেও ভাবে নাই, দুদিন পরে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছে। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব লাভের আশায় আমি এখনও নৈরাশ হই নাই। আমি চিন্তা করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি. তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, বাঙ্গালী বিদ্যা বুদ্ধি ও বক্তৃতায় ভারতে যেমন শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, কালে একতা, সাহস, তেজ ও বাহুবলেও বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ হইবে। কেবল সময় সাপেক্ষ। আমার ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাঙ্গালী কালে ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। আমি যেখানেই গিয়াছি, সেইখানেই তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, আমারত কোন আশা ভরসা নাই, তবে আপনি প্রবীণ, মহাবিজ্ঞ, ও বহুদর্শী ব্যক্তি, আপনি যদি বুঝিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালী কালে মানুষ বলিয়া জগতে সম্মান লাভ করিবে, তবে সেকথা আমার শিরোধার্য্য। আপনার বাক্য স্মরণ করিয়া সময় সময় নিরাশ প্রাণে শান্তি পাইব।

স্বামীজী কহিলেন যে "তোমারা যে যুদ্ধ করিতেছ, সে অসম যুদ্ধ, এযুদ্ধে তোমাদের শেষ জয়ের আশা নাই। একটী অতি বড় দৈত্যের সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র বামন কি লড়াই করিয়া জিতিতে পারে ? অথবা একটা মুষিক একটা হাতিকে পরাস্ত করিতে পারে ? দস্যুবৃত্তি কাজটা মোটেই ভাল নয়।"

আমি কহিলাম যে, তাহা পারে না সত্য, কিন্তু তেজ থাকিলে সে দৈত্যটার গায়ে পায়ে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মারিয়া তাহার গায়ে বেদনা জন্মাইয়া দিতে পারে, এবং মুষিকটীও হাতিটার পাছে লাগিয়া তাহার চক্ষু কামড়াইয়া অন্ধ করিয়া দিতে পারে। সেইরূপ, যাহার ক্রোধ, জেদ ও তেজ আছে, সে অদ্ভুত কিছু করিতে পারে। যাহার শরীরে ক্রোধ আছে, সে কখনও অপমানিত হইয়া নিরস্ত থাকিতে পারে না। একদিন না একদিন সে তাহার অপমানের শোধ তুলিবেই তুলিবে। এরূপ অসম যুদ্ধের কথা আমরা যে না জানি, তাহা নহে; দস্যুতাও যে ভাল নয়, তাহাও বুঝি। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে গুলিতে, বর্শায় বা খড়্গাঘাতে পতন হয়, সেও শ্লাঘার বিষয়। তবে ধৃত হইয়া ফাঁসিকাঠে ঝোলাটা তাদৃশ পৌরুষের কার্য্য মনে করি না।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তুমি যুদ্ধে মারা না যাও এবং জীবিত থাক এবং তোমাদের দলবল যদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে কি করিবে?" আমি কহিলাম,তাহা হইলে হয়ত চীনদেশে,না হয়ত মণিপুরে গিয়া বাস করিব। তখন তিনি কহিলেন "সাবাস ছেলের কাজ! বেশ! বেশ! আমি তোমার মন বুঝিবার জন্যই এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার শেষ অনুরোধ, যদি জীবিত থাক, তবে একবার সকলকে জাগাইতে চেষ্টা করিও।

আমি কহিলাম, "হাঁ, তাহা আমার প্রাণের কথা। আপনার আদেশে তাহার অবশ্যই চেষ্টা করিব।"

ঐ সকল কথার পর তিনি আমাকে ডাকিয়া গোপনে দুইটী গাছড়া দেখাইয়া দিলেন এবং কহিলেন যে, ইহা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিও। প্রথমটী কেহ খাইলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইবে। যদি কখনও শত্রু হস্তে পড় এবং নানা যন্ত্রণা লাঞ্ছনা পাইয়া মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে ইহা অধিক মাত্রায় খাইলে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হইবে। অপর গাছড়াটীর গুণ, প্রথমোক্তটী অপেক্ষা বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট। আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রক্তস্রাব বশতঃ শরীর দুর্ব্বল হইলে ইহা প্রতিনিয়ত শুঁকিলে শরীরে বল সঞ্চার হয়। প্রথম গাছড়াটা কোন শত্রুর লোকের নিকট কায়দা মত ধরিতে পারিলে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে, মল্ল যুদ্ধের সময় ইহা বিশেষ উপযোগী।

তিনি যাইবার কালীন কহিলেন যে তোমার আর দুইটী বিপদ সম্মুখে

আছে, কিন্তু তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে, তোমাকে কেহ কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

স্বামীজী প্রস্থান করিলেন। রাত্রিকালে ফুঙ্গি ও বিশ্বম্বর শর্ম্মা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এস্থলে পাঠকগণের অবগতির জন্য তন্মুর সুভা সম্বন্ধে চারি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। উন্মু বর্ত্তমানে কাথা জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মরাজের আমলে এই রাজ্য এক স্বাধীন সুভার অধীন ছিল। বর্ম্মার শেষ রাজা থিবর আমলে উন্মুর সুভা স্বাধীন ভাবে আপন এলাকা শাসন করিতেন। তখন উন্মু-সুভার অসীম ক্ষমতা ছিল, তিনি নিজে নিজের প্রজার শাস্তি বিধান করিতে পারিতেন এবং তাঁহার নিজের জেলখানা ছিল। নিজের সৈন্য সামন্ত ছিল। পরে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়িত হইয়া চীনদেশে আশ্রয় লন।

সুভার নিকট বিশ্বম্ভর শর্ম্মা উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু ফুঙ্গির আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে সাহস না পাইয়া গোপনে তাহাকে আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন তথায় থাকিতে পারিবেন না, তাহাও লিখিয়া পাঠাইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

ভাগুাউ বস্তির ভীষণ যুদ্ধ।

এ দিকে শোয়েবো হইতে সংবাদ আসিল, গত রাত্রি জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদী খালাসের ও শোয়েবো আক্রমণের সংবাদে শোয়েবো সহরে মহাতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। ডাকুর ভয়েতে বর্ম্মারা অনেকে সহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। মাণ্ডালে, শ্যাগাদিন, মনুওয়া প্রভৃতি স্থানে সাহায্যের জন্য টেলিগ্রাম গিয়াছে এবং টেলিগ্রাম আফিসে দিন রাত্রি কেবল সরকারী টেলিগ্রাম আসা যাওয়া করিতেছে। মনুওয়া, শ্যাগাদিন, মাণ্ডালে, মিনজান, প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সৈন্য আসিয়াছে। তবে এ সংবাদে কিছু আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই।

ইহা যে হইবে, তাহা নিশ্চয়। আমরা কালাদের জেল ভাঙ্গিব, আর তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে? এ কথা যে বিশ্বাস করে, সে মূর্খ।

ঐ জাতীয় আহবে অপর পক্ষের প্রধান সহায়কারী বো-বিন। বো বিন বর্ম্মারাজার আমলে এ অঞ্চলের গবর্ণর বা চিফ্ কমিশনারের মত ছিলেন। বিরোধী সৈন্য শোয়েবো দখল করিলে, তিনি জেলখানার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সেই হইতে স্বদেশীয় শত্রুতাচরণ এবং বিদেশীয় সাহায্য করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছিল। তাঁহার তিন পুত্র, একজন মংটুং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মিউক বা ডিপুটি কালেকটরের পদে নিযুক্ত হইলেন, আর একজন পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর হইলেন, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি থিবর অধীনে একজন কর্ণেল ছিলেন। তিনি দুঃখে ও ঘৃণায় ইংরেজের চাকরী গ্রহণ করিলেন না।

এবার বো-বিনের পুত্র মংটুং অপর পক্ষের সৈন্যের পথ দর্শকরূপে এবং যুদ্ধের সাহায্যের জন্য আসিতেছেন। সহরে ও অন্যত্র রাষ্ট্র হইয়াছে যে, বো-কালা একজন দৈব ক্ষমতাশালী ডাকু, তাহার অসাধ্য কার্য্য নাই. সে ভেলকী জানে এবং তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, তাহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই ইত্যাদি। আবার রাষ্ট্র হইয়াছে যে, প্রায় দশ হাজার ডাকু জমা হইয়াছে এবং তাহারা শীঘ্রই শোয়েবো দখল করিবে। যখন সামান্য একটু ঘটনা হইতে পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোক তিলকে তালে পরিণত করিয়া তোলে, তখন আমাদের সম্বন্ধেও তাহাই হইবে। কত জনে কত ভাবে, কত খয়ের খাঁ কত আজগুবি সংবাদ সকল লইয়া সরকার বাহাদুরের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আমরা কখনও যাহা করি না, বা মনেও ভাবি নাই, তাহাও সকলে কল্পনা করিয়া রাষ্ট্র করিতে আরম্ভ করিল।

এখন আমাদিগের প্রধান ভাবনা হইল যে, যে সকল গ্রামবাসীগণ আমাদিগকে প্রাণপণে সহায়তা করিতেছে, তাহাদের ধন প্রাণ রক্ষা কি করিয়া করিব? আমরা, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহাদের জন্য কোন ভাবনা মনে স্থান দেই না। গ্রামবাসীগণের, গরিব লোকদিগের বাড়ী ঘর লুটপাট হইবে এবং তাহা অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইবে, সেই চিন্তায় আমরা চঞ্চল হইলাম। গ্রামের প্রধান প্রধান তুজীদিগকে আমরা ডাকাইলাম, এবং তাহাদের লইয়া এক মন্ত্রণা বৈঠক বসাইয়া বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। ভবিষ্যৎ

এবং বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা হইল। আমরা তুঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের কি মত? তাঁহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত কি শত্রুর নিকট অস্ত্রসমর্পণ করিয়া ধন প্রাণ রক্ষা করিবেন। বোশোয়ে প্রভৃতি দুই চারিজন ছাড়া আর সকলেই যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন? তাঁহারা কহিলেন যে, "কখনও আমরা কালার অধীন হই নাই এবং ভবিষ্যতে হইতে ইচ্ছা করি না। তবে লড়াই করিয়া যদি হারি, ধন প্রাণ যায় যাইবে, কিন্তু ইহা ত কেহ বলিতে পারিবে না যে, আমরা কালার ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় কালার পদানত হইলাম। আমরা যদি যুদ্ধ করিয়া নাও পারি, তবুও আমাদের নাম চিরকাল দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিবে। শক্তি থাকিতে কেন অশক্ততার পরিচয় দিব? আমাদের শক্তির অতীত হইলে কেহ আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না।" অতএব সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে যুদ্ধ করাই স্থির হইল। আমাদিগেরও মনটা হালকা হইল, কেন না গ্রামবাসীগণ আর সমস্ত দোষ আমাদিগের উপর দিতে পারিবে না যে, আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, তাহারা নিজেরাই যখন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, তখন অপরকে তাহারা দোষ দিতে পারিবে না। তুঙ্গীদের প্রত্যেক গ্রাম হইতে, প্রত্যেক বাড়ী হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া যোদ্ধা পাঠানের কথা হইল।

তুঙ্গীগণ চলিয়া গেলে আমরা সর্দ্দার কয়েক জন একত্র হইয়া যুদ্ধের প্লান অর্থাৎ কি ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহার আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমাদের এখন চারি হাজার ঝাড়া বলবান যোদ্ধা মজুত হইয়াছে। ইহা বাদে তিন চারি শত শোয়ার মজুত। বো-হ্লাবু, বোশোয়ে, বো-উ এবং মংকালা চারি জনে চারি হাজার পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ক হওয়া স্থির হইল এবং ইহা ভিন্ন সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্যের কমাণ্ড আমার পূর্ব্ব হইতেই আছে। প্রত্যেক কমাণ্ডারই যুদ্ধ কালে আপন সৈন্যের কতকটা রিজার্ভ রাখিবেন, কথা হইল। বোশোয়ের বাড়ী শোয়েবো জেলায়। অতএব তাঁহাকেই নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি রক্ষার ভার দেওয়া হইল। বো-হ্লাবু সাগাইন হইতে আগন্তুক সৈন্যের গতিরোধ করিবেন, কথা হইল এবং মন্দুয়া হইতে যে সৈন্য আসিতেছে, তাহার গতিরোধ করিবার জন্য বোউকে নিযুক্ত করা হইল। আমার ভাগ্যে, শোয়েবো হইতে যে সৈন্য আসিতেছে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার ভার পড়িল।

এদিকে কালা গবর্ণমেণ্ট বোশোয়ের শোয়েবো জেলায় লোকের উপর

প্রভূত প্রতিপত্তি জানিয়া এবং মংকালাকে বড় শক্ত লোক মনে করিয়া বো-বিনের মারফত হইয়া একটী ছদ্মবেশী চর প্রেরণ করিল। চর বো-বিনের একখানি পত্র আনিয়া দিল। তাহাতে মংকালাব নাম ও বোশোয়ের নাম লেখা। তাহাতে বো-বিন লিখিয়াছেন যে, "আপনারা দুইজনেই খুব ক্ষমতা-শালী যোদ্ধা। আপনাদের শৌর্য্য বীর্য্যে গভর্ণমেণ্টের মনাকর্ষণ করিয়াছে। আপনারা যে অনর্থক ডাকুর দলে মিলিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, সে আপনাদের মত বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী লোকের পক্ষে ভাল দেখায় না। আপনারা যুদ্ধে কখনও গবর্ণমেণ্টকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। তাই বন্ধু-ভাবে আপনাদিগকে লিখি যে, আপনারা ডাকুর দল পরিত্যাগ করিয়া যদি আত্মসমর্পণ করেন, তাহা হইলে, যাহাতে আপনাদিগকে ক্ষমা করেন, আমি সেজন্য দায়ী রহিলাম এবং আপনারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজের পক্ষাব-লম্বন করিলে, আপনাদিগকে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং সরকারে উচ্চপদস্থ চাকরীতে নিযুক্ত করা হইবে।" পত্রের উত্তর লোক মারফত দিবেন।

বোশোয়ে পত্র খানা পাঠ করিয়া আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কহিলাম যে, "আমি জীবন থাকিতে কখনও কাহারও অধীন হইব না এবং কাহারও চাকরী করিব না। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। তাহাতে অর্থ ও পদলাভ, দুই হইবে এবং জীবনও রক্ষা হইবে। তাহাতে তিনি কহিলেন যে, "আপনি কি আমাকে এত নীচ মনে করিয়াছেন যে, স্বদেশ-দ্রোহী হইয়া, অর্থ ও পদ লাভের জন্য কালার পদানত হইব? তাহা করিলে, পূর্ব্বেই করিতাম।" আমি কহিলাম যে, "তা আমি আপনাকে জানি, তবে মনটা বুঝিবার জন্য এই প্রকার কহিলাম।"

বোশোয়ে বো-বিনের পত্র পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং অতি ঘৃণার সহিত পত্রের জবাব দিলেন। তিনি পত্র লিখিলেন যে, "আপনার চর মারফত পত্র পাইয়া জ্ঞাত হইলাম। বো-কালাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন যে, জীবনে কখনও কাহারও অধীন হইতে বা চাকরী বা অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। আমার কথা এই যে, আপনার গভর্ণমেণ্টকে বলিবেন যে, তাঁহাদের সমস্ত অর্থ ব্যয় করিলেও আমার স্বাধীনতা তাঁহারা ক্রয় করিতে পারিবেন না। আমাকে আপনারা "ডাকু" আখ্যায়ই দিন, বা অন্য কোন জঘন্য নামেই অভিহিত করুন, তজ্জন্য আমি দুঃখিত নহি। মনের যে সংকল্প লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়াছি, হয় সেই সংকল্প সিদ্ধ হইবে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে এ জীবনের শেষ হইবে। এই দু'য়ের যাহা হয়, সেই ভাল। মূল কথা আপনারা কালাদের পদানত হইয়া যে স্বদেশ-দ্রোহিতা করিতেছেন, আমার জীবনকে তাদৃশ কলঙ্কিত করিতে চাহি না। অর্থ ও পদ-লালসা থাকিলে স্বদেশের স্বাধীনতা-ব্রতে ব্রতী হইতাম না।"

পত্র লইয়া বো-বিনের চর প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, বহুসংখ্যক কালাসৈন্য শোয়েবো হইতে আসিয়া ছয় মাইল দূরে আড্ডা পাতিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া বোশোয়ে আপন সৈন্য লইয়া গ্রামগুলি রক্ষার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিলেন। বোহ্লাবু ও বো-উ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট দিকে গমন করিলেন, আমিও অগ্রসর হইয়া শত্রু-সৈন্যের তিন মাইল দূরে ক্যাম্প পাতিলাম। আমরা চারিদলে পরস্পর ছয় মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। রাত্রিকালেই আমাদের সৈন্যের গতিবিধি প্রায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরস্পরের মধ্যে সংবাদ চলাচলের জন্য Line of communicationর বন্দোবস্ত হইল।

কালা-সৈন্যগণের এখানে আসিয়া ডেরা ফেলিয়া অপেক্ষা করিবার কারণ কি? তাহারা কি বো-বিনের পত্রের জবাবের অপেক্ষায় রহিয়াছে? না অন্য স্থানের সৈন্যদিগের অপেক্ষা করিতেছে?

ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলাম যে, মনুওয়া ও স্যাগাইন হইতে সৈন্য আসিয়া পৌঁছিতে আরো দুই তিন দিন দেরী হইবে। আমি এই তিন দিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করিব না, মনে করিয়া, কালাসৈন্যকে যাহাতে শোয়েবোর দিকে ফিরাইতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে পাশ কাটাইয়া শোয়েবোর দিকে চলিলাম। এ আমার একটা আড়ম্বর মাত্র (Demonstration), কেবল শোয়েবো সহর আক্রমণের ভাণ। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়া শোয়েবোর দিকে মার্চ্চ করিতে লাগিলাম, আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কালাসৈন্য পরদিন জানিতে পারিয়া, তাওাউ বস্তি অভিমুখে মার্চ্চ করিল। আমার বোধ হইল, কালাসৈন্যের কমাণ্ডাণ্ট বো-বিনের পত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল যে, মংকালা ও বোশোয়ে আত্মসমর্পণ করে কিনা। তাহাতে নিরাশা হইয়া ডাকুর প্রধান আড্ডা বোশোয়ের আবাসস্থল তাওাউ গ্রাম আক্রমণ করিয়া ডাকুদিগকে ধ্বংস করাই কালাসৈন্যের কমাণ্ডাণ্টের উদ্দেশ্য। কালাসৈন্য রাত্রিকালে গোপনে মার্চ্চ করিয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বে টের পাই নাই। বেলা

এক প্রহরের সময় বোশোয়ের পত্র পাইলাম যে, কালারা তাঁহাকে বহু সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিয়াছে। ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে, কিন্তু সাহায্য না পাইলে আত্মরক্ষা করা দায় হইবে। সত্বর সাহায্যের জন্য যাইতে লিখিয়াছেন। আরো লিখিয়াছেন যে, চারিজন ইংরেজের অধীনে ইহারা যুদ্ধ করিতেছে। আমি এই সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মার্চ্চ করিয়া কালাসৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিলাম এবং অপর দুই দিক্ হইতেও বোহ্লাবু ও বো-উ সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুতরাং আমরা চারিদিক্ হইতে কালাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিলাম। কালাসৈন্যগণ ভাবিয়াছিল যে, শীঘ্রই তাহারা গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়া পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবে। এখন তাহাদের সে ভ্রম ঘুচিল।

কালাসৈন্যে মোট আটশত পদাতিক এবং একশত অশ্বারোহী। তাহারা চতুর্দ্দিকে ডাকুগণ-বেষ্টিত হইয়াছে দেখিয়া তাহারাও চারিজন ইংরেজ অধিনায়কের অধীনে চারিদলে ভাগ হইয়া আমাদিগের চারিদলকে আক্রমণ করিল। এই সৈন্যের দুই কোম্পানি গুর্খা, দুই কোম্পানী শিখ, এক কোম্পানী পাঞ্জাবী মুসলমান এবং এক কোম্পানী পাঠান এবং দুই কোম্পানী হিন্দুস্থানী ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।

আমার ভাগ্যে দুর্দ্ধর্ষ দুই কোম্পানি গুর্খা সৈন্য আসিয়া পড়িল। আমার সঙ্গে একশত রাইফল। আর বাঁকী ক্যাপ-ঘ'র বন্দুক। চাউমিউর যুদ্ধে দুইশত এবং তুজো মং আউং গ্রামের নিকট যুদ্ধে দেড়শত রাইফল এবং রসদপার্টি লুঠে যে কয়েকটা রাইফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া সর্ব্ব শুদ্ধ যত রাইফল আমাদিগের হস্তগত হয়, তাহা চারিভাগ করিয়া চারিজন সর্দ্দারের অধীনস্থ সৈন্যদিগকে দেওয়া হয়। তিনটী পিস্তল পাওয়া গিয়াছিল। একটী আমি রাখিয়াছি, একটী বোহ্লাবুকে দিলাম, অপরটী বোশোয়েকে উপহার দিলাম।

গুর্খারা ফিরিয়া আমাদিগের প্রতি দূর হইতে এক ওয়ালি করিল। প্রত্যুত্তরে আমার একশত রাইফলের গুলির ঝাঁক গিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িয়া কয়েক জনকে ধরাশায়ী করিল। আমাদেরও যে রাইফল আছে, তাহা তাহারা জানিত না। সুতরাং ক্যাপঘার বারুদের গুলি ততদূর গিয়া তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারিবেনা মনে করিয়া তুচ্ছজ্ঞানে তাহারা আমাদিগকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রথম ওয়ালি করিয়াছিল। তাহাদের এখন সে ভ্রম

ঘুচিল, মনে করিল যে এ-ত সামান্য ডাকু নয়। আমাদিগের ওয়ালীর পরই তাহাদের কমাণ্ডারের আদেশে তাহারা এক উচ্চ ধানের ক্ষেতের আইলের আড়ালে বসিয়া পড়িল। আমার সৈন্য এক উচ্চ টিলার আড়ালে থাকিয়া ফায়ার করিতে লাগিল। আমার পাঁচদল সৈন্য কিছু দূরে রিজার্ভ ভাবে রক্ষিত রহিল এবং অশ্বারোহীগণও শত্রুর গুলির পাল্লার দূরে। অশ্ব হইতে অবতরণ করত অপেক্ষা করিতেছিল। আমি অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া দুই তিন লাইনে আমার সৈন্য সকল ফাঁক ফাঁক করিয়া সমাবেশ করিয়াছিলাম। এবং কোন্‌ সৈন্যদল প্রথম বাঁশী বাজাইয়া ফায়ার করিবে, কোন্ দল শেষে ফায়ার করিবে, কোন্ দল আদেশ পালিতে শত্রুর প্রতি ধাবিত হইবে, সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সাজাইয়া রাখিয়া দিলাম। দুই পক্ষ হইতে কিছু কালের জন্য ভয়ানক অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। আমাদিগের রাইফলের গুলিতে যেমন গুর্খা সৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল, সেইমত তাহাদের গুলিতেও আমাদের সৈন্যে এখানে সেখানে দুই চারিজন করিয়া হতাহত হইয়া পড়িতে লাগিল। আমাদিগের জখম সকল পশ্চাতে টানিয়া নিপাপদ স্থানে রাখা হইতে লাগিল। বিপক্ষেরও ডুলি বেহারা সঙ্গে ছিল, তাহাদের আহতগণও দূরে নিরাপদ স্থান লইয়া যাইয়া ডাক্তারের জিম্মা করিতে লাগিল। এই প্রকার প্রায় দুই ঘণ্টাকাল লড়াই চলিল, তবু গুর্খারা হটিল না, কিন্তু তাহাদের লাইন ক্রমে পাতলা হইতে আরম্ভ করিল এবং ফায়ার সংখ্যা ক্রমে কমিতে লাগিল। তখন আমি বিরক্ত হইয়া আদেশ দিলাম, take the posion by assault—গুর্খাদিগের স্থান অধিকার কর। আমার সঙ্কেত পাওয়া মাত্র প্রায় তিনশত লোক সঙ্গীন ও খড়্গা লইয়া আক্রমণ করিল। তাহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহীগণ বর্শা লইয়া লাফাইয়া পড়িল। তখন হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গুর্খারাও সঙ্গীন দ্বারা আমাদের সৈন্যকে আক্রমণ করিল, তাহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাহারা সুশিক্ষিত ও সাহসী সৈন্য, তবে সাহসে মগ সৈন্য ও গুর্খা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গুর্খারা প্রায়ই রণক্ষেত্রে পড়িয়া গেল। যাহারা জখম হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখনও তাহারা সুযোগ পাইলে খুকরি দ্বারা অনেক মগ সৈন্যকে ক্ষতবিক্ষত করিল। মগেরা রাগিয়া সেই সকলকে একেবারে হত্যা করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল।

আমি অশ্বারোহণে বর্শা হস্তে গুর্খা সৈন্যের অধিনায়ক লেপ্টেনাণ্ট কেলিকে আক্রমণ করিলাম। কেলি আশঙ্কায় দূর হইতে ব্যাং ব্যাং করিয়া আমাদের প্রতি

রিভলবার ছুড়িতে আরম্ভ করিল, আমিও তখন আমার রিভলবার ছুড়িতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কাহারো গুলিতেই কেহ আহত হইলাম না। তাহার পিস্তলের ছয়টী কামরা খালি হইল, তিনি পুনরায় পিস্তলে গুলি ভরিতে আদেশ করিলেন, আমি লাফাইয়া বর্শা হাতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলাম। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া আমাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি তরবারি দ্বারা আমাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং আমি তাঁহাকে বর্শাঘাতে জর জর করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার রক্ষার্থে তাহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ ছুটিল, তখন আমার অশ্বারোহীগণ লাফাইয়া গিয়া তাহাদের সম্মুখে পড়িল। ইতিমধ্যে পশ্চাৎদিক হইতে আমার এক সোয়ার আসিয়া খড়্গাঘাতে তাঁহার মুণ্ডটী ভূমিতলে ফেলিয়া দিল। ধড়াশ করিয়া তাহার দেহটী ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল।

লেপ্টেনাণ্ট কেলি ধরাশায়ী হইলে বাকী গুর্খা ও সোয়ারগণ ছুটিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল, তাহাদিগকে কিছুদূর তাড়া করিয়া আমার সৈন্যগণ চলিল। মগ সৈন্যগণের একই রোক হইয়াছে যে হয় যুদ্ধে মরিব, না হয় মারিব। কারণ যুদ্ধে হারিলে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া নানা ক্লেশ পাওয়া অপেক্ষা যুদ্ধে মরিলে তাহারা পৌরুষ মনে করে।

যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ত-নদী হইয়া গেল। আমি লড়াই ফতে করিলাম, কিন্তু আমার সহযোগীগণ কি করিলেন, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম। ইতিমধ্যে একজন সোয়ার আসিয়া সংবাদ দিল যে, বো-উ শত্রুর গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছে, তাঁহার অনেক সৈন্য হতাহত হইয়াছে। তাঁহার সৈন্যগণ হটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কালারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র লাফ দিয়া ঘোড়ায় চড়িলাম এবং আমার রিজার্ভ যে পাঁচশত সৈন্য আছে, তাহাদিগকে সত্বর আহ্বান করিলাম। যাহারা গুর্খাদিগের সঙ্গে লড়াই করিল, তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলাম। কিন্তু তাহাদের রাইফল গুলি রিজার্ভ সৈন্যের হাতে দিয়া বেগে ছুটিলাম। বো-উকে যাহারা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমান। আমি সসৈন্যে পাঠানদিগের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমেই একশত রাইফলের এক ওয়ালী করিলাম। আমার সাহায্য পাইয়া বো-উর মগ সৈন্যগণ দ্বিগুণ সাহসের সহিত ফিরিয়া দাড়াইল এবং পূর্ণ তেজে পুনরায় পাঠানদিগকে আক্রমণ করিল। দুই দিক হইতে পাঠানদিগকে

ঘেরিয়া ফেলিলাম, তাহাদের দক্ষিণদিকে দুর্গম পথ, সুতরাং তথা দিয়া সহসা পালাইবার সাধ্য নাই, বাম দিকে বো-শোয়ের সৈন্য অনেক দূরে, তাহারা ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অবকাশ পায় নাই। যেমন বেড় জালের মধ্যে পদ্মা নদীতে বড় বড় রুই কাতলা সকল আটকাইয়া ফেলে, পাঠানদিগকে, সেইরূপ, এমন ভাবে ঘেরিয়া ফেলিলাম, আর পালাইবার সাধ্য নাই। আমার ও বো-উর সোয়ার সকল চারিদিক হইতে বেগে বর্শা লইয়া ধাবিত হইল। হাতাহাতি যুদ্ধ আবার আরম্ভ হইল। আমি কেবল উৎসাহ দিয়া আমার লোকদিগকে রণমদে মত্ত করিয়া তুলিলাম। শক্তিশালী, বীর পাঠানগণও অকুতোভয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। এও অসম যুদ্ধ। আমার সৈন্যের সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত, পাঠানগণ হত আহত বা ধৃত হইতে লাগিল। তাহাদের অধিনায়ক কাপ্তান নরিও ধৃত হইয়া বন্দী হইলেন।

পাঠানগণের অর্দ্ধেকের অধিক সংখ্যক মগ সৈন্যের গুলিতে, খড়্গাঘাতে ও বর্শাঘাতে ধরাশায়ী হইল। অবশিষ্ট প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য আহত হইয়া যুদ্ধাক্ষম হইয়া পড়িল, বক্রিগুলি বন্দী হইল।

বো-উর কোন দিনই যুদ্ধ-কৌশল টের পাই নাই। তিনি সাহসী বীর পুরুষ হইয়াও সেই সাবেক ধরণে লড়াই করিতেন। তাঁহার সৈন্য সমাবেশের দোষে, এবং সৈন্য পরিচালনার ভ্রম বশতঃ নিজে প্রাণ হারাইলেন এবং আপন সাহসী সৈন্যগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

আমরা চারিদলে যে স্থান ব্যাপিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে যুদ্ধক্ষেত্র প্রায় তিন মাইল ব্যাপিয়া। স্বপক্ষ বিপক্ষ আহত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া আমি কয়েকজন লোকের সহ বো-শোয়ের রণস্থলে উপস্থিত হইলাম। তিনিও যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। শিখগণের অনেকে যুদ্ধে হতাহত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের চালক লেপ্টেনাণ্ট বোন গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অবশিষ্ট শিখ সৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পালাইয়াছে। তিনি মাত্র শত্রুপক্ষের জখমদিগকে ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর সকলকে ধরিতে পারেন নাই।

তাঁহাকে আমার যুদ্ধ জয়ের কথা জানাইলে বড় খুসী হইয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। বো-উর যুদ্ধে পতনের সংবাদ পূর্ব্বেই তিনি পাইয়াছিলেন। আমা দ্বারা পাঠান সৈন্যের দুর্গতির কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। বো-হ্লাবুর রণস্থলে অবশেষে যাইয়া জানিলেন যে, তিনি সামান্য আঘাত পাইয়া-

ছেন। ঘণ্টা খানেক লড়াইয়ের পর হিন্দুস্থানী সৈন্য সহ লেপ্টেনাণ্ট ডেসন্ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বো-হ্লাবু কাহাকেও ধরিতে পারেন নাই, হিন্দুস্থানী সৈন্যেরও অনেকে হত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে।

অবশেষে আমরা তিনজনে অশ্বারোহণে সমস্ত রণক্ষেত্রের অবস্থা পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। সে বীভৎস দৃশ্য!! যুদ্ধের পূর্ব্বে রণমদে মত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, কিন্তু যুদ্ধান্তে হতাহত সকলকে দেখিয়া প্রাণে বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে। কেহ চীৎকার করিতেছে, "হায়, মর গিয়া", কেহ বলিতেছে, "হা আল্লাতালা বাঁচাও", কেহ বলিতেছে "আমে লে লে।" কেহ একটু জল চাহিতেছে, কেহ চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আরে ভাই হামরা গোর খোড়া," কাহারও বা ছিন্ন ধমনী হইতে অজস্র রক্তপাত হইতেছে, কাহারও স্থির চক্ষু হইয়াছে, ঊর্দ্ধশ্বাস উঠিয়াছে। কাহারও প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে, কাহারও বা নিস্পন্দ শরীর, মাত্র হৃদপিণ্ড একটু ধুক ধুক করিতেছে। কেহ কাটা পাঠার ন্যায় দাপাইতেছে। এ কি দৃশ্য! এ দৃশ্য যে দেখে নাই, আমার বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহার সম্যক ধারণা হওয়া কঠিন।

যুদ্ধের ফল এতাদৃশ অপ্রীতিকর হইলেও, উপায় নাই। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, আপন প্রাধান্য রক্ষার জন্য এবং শত্রুর উপদ্রব হইতে ধন, মান, প্রাণ, ও রমনীগণের রক্ষার জন্য, সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশেই যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। তাহাতে কত লক্ষ লক্ষ লোক রণভূমে শয়ন করিতেছে, কত মাতা পুত্র-হারা হইয়া, কত রমণী স্বামী হারা হইয়া হাহাকার করিতেছে, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া প্রাণ অস্থির। পৃথিবীতে যুদ্ধ অনিবার্য্য। ইহা নিবার্য্য কোথায়? যেখানকার লোকের আত্ম সম্মান-জ্ঞান নাই, যাহাদের তেজ ও সাহস নাই, যাহারা আপন মা ও ভগ্নিদিগকে অপমানিত হইতে দেখিয়া নীরবে সে অপমান হজম করিতে পারে, যাহাদের ধর্ম্মমন্দির পাষণ্ডগণ কর্তৃক কলুষিত হইলে অম্লান বদনে যাহারা ভুলিয়া যাইতে পারে, পায়ের লাথি খাইয়া যাহারা সেই লাথি-মারা পা খানা ভয়ে জড়াইয়া ধরিতে পারে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে মনে হয়, হায়! বাঙ্গালা দেশ ভারতের কলঙ্ক! এ দেশ পৃথিবীর গাত্র হইতে লোপ পাইলে, বাঙ্গালী ধরা হইতে নির্ম্মূল হইলে বুঝি এসকল কথা বলিবার আর কাহারও প্রয়োজন হইবে না। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে ক্রোধে ও ঘৃণায় শরীর

যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল, আবার তন্মুহূর্ত্তে মনে চেতন হইল, আমি কি ভাবিতেছি, এই সকল কথা কি ভাবিবার এই সময়! এখন আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে হইবে। আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে হইবে।

হত ব্যক্তিগণের মধ্যে বর্ম্মাদিগের আত্মীয়গণ কাহারো কাহারো দেহ লইয়া গেল। অপর মৃতদেহগুলির পূর্ব্ববৎ কবর দেওয়া হইল, দুই গোরাকেও সেইখানে পুতিয়া ফেলা হইল।

কালাদিগের মধ্যে যত আহত, তাহাদিগকে এক জিয়াটে (ফুঙ্গিচা-সংলগ্ন পথিকাশ্রম) বর্ম্মাদিগের এক জিয়াটে এবং কয়েদীগণকে এক জিয়াটে লইয়া যাওয়া হইল। সকলের আহারের বন্দোবস্ত অবস্থানুসারে যতদূর সম্ভব, ততদূর করা হইল।

এই যুদ্ধেও আমাদের লাভ মন্দ হইল না। শত্রুসৈন্যের নয়শত সৈন্যের মধ্যে সাড়ে চারিশত রণক্ষেত্রে পড়িয়া গেল, আহত ও অনাহত ব্যক্তির সংখ্যা দেড়শত। অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করিয়াছে। এই ছয়শত লোকের রাইফল ও পোষাক, দুইজন গোরা কর্ম্মচারীর দুইটী পোষাক ও তরবারী এবং কয়েকটী ঘোড়া আমাদের লাভ হইল। ইহা ভিন্ন রসদও অনেক পাওয়া গেল।

আমাদিগের সকলের আহারান্তে, একটু বিশ্রাম করিয়া, বো-উর দেহটীকে কবর দিবার জন্য সমর সজ্জা করিয়া জাতীয় কবর খানায় হইয়া গিয়া সামরিক সম্মানে তাঁহার দেহটী সমাধি দেওয়া হইল এবং তাহার উপর এই যুদ্ধের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ এক প্রস্তর-ফলক খোদিত হইয়া রক্ষিত হইল। তাঁহার জন্য সকলেই দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন, সে তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয়। জীবিত থাকিলে অদৃষ্টে কি হইত, কে বলিবে?

রাত্রিকালে আমাদের আবার মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। কেহ কেহ এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহা উল্লাসিত হইলেন। কিন্তু আমার প্রাণে উল্লাস স্থান পাইল না। আমি মনে মনে বুঝিলাম, এই আমাদের চরমজয় এবং উন্নতির পরাকাষ্ঠা। আমি কহিলাম, আর যে আমরা জিতিব, এমন আশা করি না। এ যাবত যে জিতিয়াছি, সে কেবল আমাদিগের প্রতি বিপক্ষের তাচ্ছিল্য বশতঃ। কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, বর্ম্মারা জঙ্গলি পাড়াগেঁয়ে ডাকাইত, তাহারা আর কি যুদ্ধ করিবে? তাহাদের শিক্ষাই বা কি, অস্ত্রই বা কোথায়? তাহাদের সে ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। এবার আর তাঁহারা কাঁচা কাজ

করিবে না। এবার আমাদিগের সংহারের জন্য নিশ্চয়ই বহু সৈন্য ও তোপ আসিবে। বর্ম্মাদের মধ্যে যাহারা তাহাদের শক্তির পরিচয় পায় নাই, তাহারা আমাদিগের জয়ে উল্লাসিত হইয়া কালাসৈন্য যে যুদ্ধে বর্ম্মাদের কাছে কিছুই নয়, এমন সকল কথা বলিতে লাগিল। এ সকল এশিয়াবাসীর অজ্ঞতার ফল।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

শেষ যুদ্ধ।

এবারকার বিপক্ষের সৈন্যের দুর্গতির কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া একদিকে যেমন আমাদের নাম ও যশঃ চতুর্গুণ প্রকাশিত হইল, অপরদিকে বিপক্ষের ক্রোধ ও কোপ তাদৃশ বৃদ্ধি পাইল। শোয়েবো বিপক্ষ-মহলে ডাকুর এতাদৃশ সাহস ও রণকৌশল দৃষ্টে মহাতঙ্ক উপস্থিত হইল। মন্‌ওয়া, স্যাগাইন ও ইউ-উ হইতে সৈন্য সকল আসিয়া পৌছিল, মাণ্ডালে হইতেও অনেক সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের চরমুখে প্রত্যহ নানা নূতন সংবাদ পাইতে লাগিলাম। গুপ্ত চরমুখে শুনিলাম যে, বহুসংখ্যক সেপাই, দুই কোম্পানী গোরা এবং চারিটী তোপ আসিতেছে। আবার প্রধান তুঙ্গীদিগের ডাকিয়া মন্ত্রণা আরম্ভ করিলাম। আমি শত্রুসৈন্যের বল ও তোপের কথা সকলকে বুঝাইয়া দিলাম, আরো বলিলাম যে, আমাদের যখন তোপ নাই, তখন শত্রুর তোপের মুখে আমাদিগের তিষ্ঠান ভার হইবে। ফলতঃ এবারকার যুদ্ধে আমাদিগের জয়ের আশাত নাই, আত্মরক্ষা যে করিতে পারিব, এমন আশাও করি না। কিন্তু বোশোয়ে ও তাঁহার তুঙ্গীগণের একই কথা, "যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহা হইবে। আমরা পালাইব না, অথবা আত্ম সমর্পণ করিব না।"

আমি বলিলাম যে, আমরা সমস্ত সৈন্য লইয়া দূরে এক জঙ্গলে বা পাহাড়ে আশ্রয় লই। গ্রামবাসীর মধ্যে প্রধান প্রধান লোক সকল গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাউক। যুবতী রমণীগণ ও বালক বালিকাদিগকে এবং মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর করা হউক। শত্রুপক্ষ যখন আসিয়া ডাকু না দেখিতে পাইবে, তখন হয়ত ঘর দরজা গুলি জ্বালাইয়া দিয়া যাইবে এবং

গ্রামে হয়তঃ একদল সৈন্য রাখিয়া যাইবে। আমরা জঙ্গলে ও আড়ালে থাকিয়া চোরাযুদ্ধ করিব। কিন্তু তোপের সম্মুখে, সম্মুখসমর করিতে গেলে, আমাদের দলবল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু বোশোয়ে, বোহ্লাবু এবং তুজীগণের নিকট আমার প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। বোধ করি, তাহাদের মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইল। তাঁহারা বলিলেন যে, "আমাদের এখন এক হাজার রাইফল আছে, এবং শত্রুসৈন্য অপেক্ষা আমাদিগের সৈন্যবল বেশী। এমতাবস্থায় গ্রামগুলি শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দেওয়াটা ভাল মনে করি না। তাহা হইলে আমাদের কলঙ্ক হইবে এবং অপর কোন স্থানের গ্রামবাসীগণ আমাদিগকে আশ্রয় দিবে না। যদি মরিতে হয়, তবে লড়াই করিয়াই মরা ভাল।" এমন কথার উপর আমার আর কোন কথা বলা বৃথা! বিদ্রোহীর দলে যোগ দেওয়া অবধি আমি যত পরামর্শ দিয়াছি, সকলেই সেই মত কাজ করিয়াছেন এবং তাহাতে ফলও পাইয়াছেন। আজ আমার কথা কেহ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সুতরাং আমি বলিলাম, তবে আপনাদের মতেই চলি। এখন কি ভাবে কোথায় কোথায় সৈন্য সমাবেশ করিবেন, তাহার আলোচনা হউক।

আমাদিগের আড্ডা হইতে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দূরে শত্রুসৈন্যে প্রায় চারি দিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। গোপনে সংবাদ পাইলাম যে, শেষ রাত্রিতে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।

বোশোয়ের গ্রামটী খুব বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, লোকবল ও অর্থবলের জন্য এই গ্রাম প্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শোয়েবো ও ই-উ জেলার লোক বড় সমরপ্রিয়। তাহাদের সমরপ্রিয়তার জন্য অন্যান্য জেলার লোক সকল হইতে সহজে চিনিবার জন্য প্রত্যেকের পৃষ্ঠে লাল টাটু বা গোদানির চিহ্ন আছে।

ব্রহ্মদেশের অপার বর্ম্মায় প্রায় সমস্ত পল্লিগুলি যেন ক্ষুদ্র একটী কেল্লাবিশেষ। গ্রামটীর চতুর্দ্দিক ঘেরা এবং অগ্র পশ্চাৎ দুইটী দরজা। সন্ধ্যাকালে সেই সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিলে বাহির হইতে চোর দস্যুগণ সহসা গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদিগের দেশের বস্তিগুলির যেমন একপ্রান্ত হইতে দৌড়িয়া অন্যপ্রান্তে বাহির হইয়া যাওয়া যায়, এদেশের গ্রামগুলি তাদৃশ নহে। তবে ইহা সুশিক্ষিত সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধের উপযুক্ত নহে।

বোশোয়ে পূর্ব্ব হইতেই গ্রামখানি একটী দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন।

গ্রাম বেষ্টন করিয়া মোটা মোটা কাঠের খুঁটি দ্বারা বেড়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পার্শ্বে মৃত্তিকা দ্বারা অনুন্নত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন ইংরেজের তোপের কথা শুনিয়া সেই প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া পরিখা কাটাইয়াছিলেন। অন্যান্য বড় বড় গ্রামগুলির রক্ষার জন্য এতাদৃশ আয়োজন করা হইয়াছিল। বর্ম্মাদিগের গৃহগুলি কাঠের দ্বারা নির্ম্মিত, অর্থশালী লোকের গৃহের ছাদ বা উপরাংশও কাঠদ্বারা মণ্ডিত, গরীব লোকদের ঘর খড়ের এবং কোন কোন স্থানে বাঁশের কাঁচার ছাউনি। গ্রামবাসীর পাকা ঘর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

আমার কথানুযায়ী স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে রাত্রিকালে স্থানান্তরিত করা হইল। রাতারাতি সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ হইল। প্রত্যেক গ্রামের পরিখায় রাইফল ও বন্দুকধারী সৈন্য স্থাপিত হইল। বোশোয়ে ও বোহ্লাবু অর্দ্ধেকের অধিক সৈন্য লইয়া গ্রামগুলি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি শত্রুর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং মংহ্নর (বোউর সৈন্যদলের পরিচালক) বাম পার্শ্বে, জঙ্গলের আড়ালে প্রায় দুইতিন মাইল ব্যাপিয়া রহিলাম।

শত্রু সৈন্যের প্রধান আক্রোশ বোশোয়া গ্রামের উপর। বোশোয়ের গ্রামকে ডাকুর প্রধান আড্ডা মনে করিয়া অধিকাংশ সৈন্য সেইদিগের আক্রমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদিগের সমস্ত রাত্রি আর নিদ্রা যাওয়ার অবকাশ হইল না। কেবল শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। শত্রু সৈন্য সংখ্যায় প্রকৃতপক্ষে কত, তাহা জানিতে পারিলাম না।

প্রভাতে চারিটার সময় শুনিতে পাইলাম, গুরুম করিয়া তোপের আওয়াজ হইল। সেই আওয়াজ বোশোয়ের বস্তির দিকে অনুভব হইল। ক্রমে ঘন ঘন তোপধ্বনি শুনিতে পাইলাম। একজন অশ্বারোহী পাঠাইয়া সংবাদ জানিলাম। মধ্য হইতে তোপ দাগিতেছে, এবং তাহার দুই পার্শ্ব দিয়া কালা সৈন্য ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে চলিয়াছে। সেপাইরা প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে পৌছিলে গ্রাম হইতে অনেক গুলি রাইফলের গুলি ছর ছর করিয়া সেপাইদিগের মধ্যে পড়িয়া একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেপাইগণ মাটীতে পড়িয়া ওয়ালি করিতে লাগিল। গ্রাম হইতেও সেই ওয়ালির জবাব দিতে লাগিল। ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তোপের গোলা গ্রামের মধ্যে খড়ের চালের উপর পড়িয়া ধব ধব করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে মগ সৈন্যের শত্রুর প্রতি ওয়ালি থামিল না।

এদিকে এক তোপ ও বহুশত সৈন্য আমাকে আক্রমণ করিল। তোপের গোলা আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। অপরদিকে মংত্রার সৈন্যকেও এই ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে, সংবাদ আসিল। আমিও আড়ালে থাকিয়া ওয়ালি করিতে হুকুম দিলাম। এই তিন চারি মাইল স্থান ব্যাপিয়া যেন মহা প্রলয়ের কার্য্য উপস্থিত হইল। তোপের ও বন্দুকের ধূমে রণক্ষেত্র কুজ্ঝটিকার মত হইয়া উঠিল। প্রায় চারি ঘণ্টা কাল লড়াই চলিল, কালা সৈন্যগণ ক্রমে ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এখন পর্য্যন্তও মগসৈন্য-গুলি গ্রাম রক্ষার্থ অটল ভাবে যুদ্ধ যুদ্ধ করিতেছে, কতজন তাহাদের আশে-পাশে হতাহত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অটল ভাবে আছে। শত্রুপক্ষ ডাকুদিগের এতাদৃশ সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়া চিন্তিত হই-য়াছে। এপর্য্যন্তও জয় পরাজয় স্থির নাই।

আমি শত্রু সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণের জন্য অধীনস্থ এক কাপ্তানের অধীনে কতকগুলি সৈন্য পাঠাইলাম। তাহারা প্রায় চারি মাইল ঘুরিয়া গিয়া শত্রু সৈন্যের পশ্চাত আক্রমণ করিল। বিপক্ষ তাহাদের পশ্চাতের ডাকু সৈন্যের আক্রমণে চঞ্চলিত হইল। পূর্ব্ব কথিত মতে মংত্রাও সেই প্রকার একদল সৈন্য তাহার দিক হইতে শত্রুর পশ্চাদভাগ আক্রমণ করিল। আমা-দের এই আক্রমণ দ্বারা গ্রাম গুলির উপর শত্রুর আক্রমণ কতকটা শিথিল হইল। পশ্চাতের দিকে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষিত হইল, শত্রুর আক্র-মণের শিথিলতা লক্ষ্য করিয়া বোশোয়ে ও বোহ্লাবু মনে করিলেন যে, শত্রুরা দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে, এই মনে করিয়া তাঁহারা পরিখা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তক্ষেত্রে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। এবং তাঁহাদের অশ্বারোহীগণও পশ্চাৎ ছুটিল। যেই তাঁহাদের সৈন্য মুক্ত ধান্য-ক্ষেত্রে ও ময়দানে অবতীর্ণ হইল, অমনি তোপ সকল অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া তাঁহাদের সৈন্যর মধ্যে অগ্নি-বৃষ্টি করিতে লাগিল। তাঁহাদের সৈন্যগুলি তোপের গোলায় হতাহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন গোরা ও সেপাই সোয়ারগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া কচুগাছের মত কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। সৈন্য যত সাহসীই হউক না কেন, একবার ছত্রভঙ্গ হইল, হতবুদ্ধি (demoralized) হইয়া যায়। শুনিলাম, বোহ্লাবু গোলেমালে রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছেন এবং বোশোয়ে শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছেন, কালা সৈন্য অবিলম্বে গ্রামগুলি দখল করিল। আমা-দিগকে ধরিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে ধাবিত হইল।

আমি ইতি মধ্যে এই চালাকী খাটাইয়া রাখিয়া দিলাম। পূর্ব্বের যুদ্ধের সেপাইগণের যে সকল পোষাক ছিল, তাহা আমার কতকগুলি সৈন্যকে পরাইয়া রাখিয়া দিলাম। আমি নিজেও অশ্বারোহী সৈন্যের সুবাদার সাজিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। বিপক্ষের দুইটী পতাকা আমাদের হাতে পড়ে।

দুইদিক দিয়া গোরা ও সোয়ারগণ প্রায় দুইমাইল ব্যাপিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিবার যোগাড় করিল। তখন আমি আমার বর্ম্মা পোষাক পরা সোয়ার ও পদাতিক সৈন্যদিগকে আগে আগে ভাগিতে বলিলাম, এবং আমি ও আমার কালা পোষাক-পরা সৈন্যগণ বিপক্ষের নিশান উড়াইয়া দিয়া, মগ ডাকুগণকে যেন ধরিবার ছলে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলাম। এই কারণ বশতই বোধ হয় তোপের গোলা আমাদিগের উপর পড়িতে পারে নাই। যে সকল অশ্বারোহী সৈন্য বর্ম্মাদিগকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তাহারাও আমাদিগকে কালা মনে করিয়া দুই ধার দিয়া পলায়মান অপর মগদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল, মধ্য হইতে আমি মগ সৈন্য তাড়াইবার ছলে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করিয়া দূরে আসিয়া পড়িলাম। এই ভাবে নিজেও রক্ষা পাইলাম এবং আপন সৈন্যের অনেকগুলি লোককে রক্ষা করিলাম। আমরা যে শত্রু সৈন্যের চক্ষে ধুলা দিয়া পলাইয়াছি, তাহা আর তাহাদের জানিতে অধিক সময় বাকী রহিল না"।

আমি সঙ্গিগণ সহ দশ মাইল দূরে দুই পাহাড়ের মধ্যে এক জঙ্গলময় স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। চারিদিকে পাহারা রাখিয়া শত্রুর গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এখানে আমাদের উপবাসী থাকিতে হইল, কারণ সঙ্গের সমস্ত রসদ শত্রু হস্তে ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। এ জঙ্গলের মধ্যে আহারাদি পাইবার সম্ভাবনা নাই। গতরাত্রে কেহ নিদ্রা যাইতে পারে নাই। সুতরাং সকলে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু পেটের জ্বালায় কেহ নিদ্রা যাইতে পারিল না। অল্পক্ষণ নিদ্রার পর এখান হইতে দুই মাইল দূরে এক গ্রামে গিয়া আহারাদি করা স্থির হইল।

আমরা যত লোক তাহার অর্দ্ধেকের উপর লোকের সেপাইয়ের পোষাক পরা, অপরগুলি বর্ম্মা পোষাক পরা। গ্রামের তুজি প্রথমত কালা সেপাই দেখিয়া ত্রাসিত হইয়া বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আমরা কালা সেপাইগণ সহজেই ধরা পড়িলাম, কারণ তাহার একজনেও যে

কালা কথা জানে না। সকলই খাটি বর্ম্মা কথা বলিল শুনিয়া তুজীর মনে সন্দেহ হইল। সে কিছুকাল পরেই কোন একটা ছুতায় দরকারী কার্য্যের ভাণ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইল। বোধ করি, তুজীর ইঙ্গিতেই গ্রামবাসীগণের ভাব বিপরীত বলিয়া অনুভব হইল। আমরা, নিজের সঙ্গে যে পয়সা কড়ি ছিল, তাহা দ্বারা তণ্ডুলাদি খরিদ করিয়া পাক করিয়া কোন মতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম।

তুজীর অনুপস্থিতে ও গ্রামের লোকের বিরুদ্ধভাবে বোধ হইল যে তাহারা আমাদের স্বপক্ষে নাই। এবং আমরা তাহাদের গ্রামে আশ্রয় লওয়ায় পাছে তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট দোষী হয়, অনেকের কথায় তাহার আভাস পাইলাম। সুতরাং সন্ধ্যার পর আমরা সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলাম, এখন কি করা এবং কোথায় যাওয়া ? অনেকেরই মত, আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করা নহে। অনেকেই বলিল যে, আপনি যথায় যাইবেন, আমরা তথায় যাইব, এবং আপনার যে দশা হইবে, আমাদেরও তাহাই হইবে। আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম যে,"বো-হ্লাবু ও বো-উ মারা গিয়াছেন,এবং বোশোয়ে ধৃত হইয়াছেন। আমি একজন বিদেশী লোক মাত্র। কোন গ্রামবাসীর উপর আমার কোন প্রতিপত্তি নাই ; তবে এদেশী লোকের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া অনেকে আমার নাম মাত্র জ্ঞাত হইয়াছেন। এই গ্রামের লোকের যে ভাব, তাহাতে বোধ হইতেছে যে এদিকে যত যাইব, কোন গ্রামের লোকই আমাদের আশ্রয় দিবে না এবং আর যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিব, এমন আশাও নাই। আমার মত, তোমরা নিতান্তই যদি যুদ্ধ কর, তবে অন্য জেলায় যাইয়া সর্দ্দারদিগের সঙ্গে গিয়া মিল। আমার একবার ইচ্ছা, কাথায় মংজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। শুনিয়াছি,তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপনে যুদ্ধ করিতেছেন। আমার নিজের প্রস্তুত করা সৈন্য সকল যখন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, তখন অন্য জেলায় অপরিচিত ভাবে আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয় না। কারণ বো-হ্লাবু ও বো-শোয়ের সঙ্গে একত্র এতকাল যুদ্ধ করিয়া মনের সুখ ও সম্মান লাভ করিয়াছি, তাহা অন্যত্র হইবে না বলিয়া বিশ্বাস। অতএব আমাকে মাপ কর। তোমাদিগকে ছাড়িয়াও যাইতে মনে কষ্ট হয়, কিন্তু এখন একত্র থাকাও আর সঙ্গত নহে। তবে আমার শেষ কথা এই যে, যাহার উদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমাদের পক্ষে তাহা পরিত্যাগ করা সঙ্গত মনে করি না। আমার কথা স্বতন্ত্র, কারণ আমি বিদেশী

লোক। আশা করি, স্থায় পথে থাকিয়া স্থায়মত যুদ্ধ করিবা। দস্যুবৃত্তি করিয়া কলঙ্কিত হইবা না এবং যাঁহারা স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের নামেও কলঙ্ক লেপন করিবা না।

আমার কথায় সকলেই দুঃখিত হইলেন। কেহ কেহ মিনজান, কেহ কেহ পোকুকো প্রভৃতি স্থানে সর্দ্দারদিগের সঙ্গে যোগ দিতে চলিলেন। আমি ফুঙ্গি উ-নাওাকে একখানি পত্র লিখিয়া আমার মনের ভাব তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইলাম। যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ তাহাকে জানাইতে পারিলাম না।

সকলেই আপন আপন গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। মোট পাঁচশ জন লোক আমার ছিল। তাঁহারা কিছুতেই আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। আমরা রাত্রিকালে গোপনে গ্রামখানি পরিত্যাগ করিয়া ইউর দিকে চলিলাম। ইচ্ছা উম্নু গিয়া একবার বিশ্বম্বর শর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিব, উম্নুর এলাকাটার অবস্থা দেখিব ও সুভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

বন্দী-মোচন।

ইউ সহর দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া উম্নু অভিমুখে চলিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল। হরিরাম শর্ম্মা বরাবরই আমার সঙ্গে আছে। আমাদের সকলেরই সেপাহী পোষাক, সঙ্গের লোক সকল পায়-দলে চলিয়াছিলেন। বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় দূর হইতে দৃষ্ট হইল যে, কয়েকজন সেপাই একজন কয়েদী লইয়া ইউর দিকে আসিতেছে। নয়জন সেপাই একজন নায়কের অধীনে। কয়েদী একজন বাঙ্গালী। এ কয়েদী আমাদের চেনা লোক। ইনি সেই সাধনানন্দ স্বামী, কিন্তু এবার একাকী, ভৃত্য সঙ্গে নাই। আমি অগ্রগামী হইয়া সেপাইদিগের সম্মুখীন হইলাম। তাহারা আমাকে ইংরেজ সৈন্যের কোন নেটিব অফিসার মনে করিয়া মিলিটারি কায়দানুসারে স্যালুট করিল। আমি প্রতি-স্যালুট করিলাম। ইহারা মনে করিয়াছিল যে, আমি ইউর মিলিটারি লাইন হইতে ডাকাইতির খোজ করিবার জন্য বুঝি বাহির হইয়াছি। আমি

ছাড়িয়া দিলে আমাদের জেল হবে, প্রাণ থাকিতে কয়েদীকে ছাড়িতে পারিব না।" অপর একজন কহিল যে, "জেল হয় সেও ভাল, তবু জান ত বাঁচিবে। এইখানে ডাকুর হাতে মারা পড়িলে নিজের বালবাচ্চা সকলের কি উপায় হবে।" এই পরামর্শ অধিকাংশের মত হইল যে, কয়েদী ছাড়িয়া দিয়া ইউতে গিয়া রিপোর্ট করে যে রাস্তায় ডাকুরা কয়েদী ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তাহারা সাধনানন্দ স্বামীর হাত কড়া খুলিয়া দিল। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, এখন তোমরা ভাগো।

আমি সেপাইগণের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক সাধনানন্দ স্বামীকে প্রণাম করিলাম। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেপাইগণ দৌড়িয়া পলাইল। স্বামীজীকে কহিলাম যে, "দেখুন দেখি, আমার কথা শুনলেন না,আবার অনর্থক কত লাঞ্ছনা পাইলেন। দৈবাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাই উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম, কিন্তু এখন যদি সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার ফাঁসি হইত।"

সাধনানন্দ স্বামী তাহাতে হাসিয়া কহিলেন যে, "কার সাধ্য আমাকে ফাঁসি দেয়? এ ভগবানের লীলা-খেলা। আম জানি যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। এমন নির্দ্দোষী লোককে ফাঁসি দিবে, আর ভগবান এত বড় একটা অন্যায় কাজ স্বচক্ষে দেখিবেন! আমাকে যখন মনুওয়া হইতে ধরিয়া আনে, তখনই মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, এবং আমার মনের একটা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রাস্তায় তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হইবে। শোয়েবো জেলে যে পুনরায় আর প্রবেশ করিব না, তাহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ইহা যেন আমার স্পষ্ট জানা কথা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যাহা মনে মনে পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম এবং বুঝিয়াছিলাম, তাহা দেখ এখন প্রত্যক্ষ ফলিল। তাহা না হইলে তুমি কোথা আসিয়া সম্মুখে পড়িলে? আবার বলি, এ ভগবানের খেলা। ইহা যদি ভগবানের খেলা না হইত, তাহা হইলে কোথায় তুমি ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালীর ছেলে, তুমি কি করিয়া আজ মহা শৌর্য্যশালী বীরের ন্যায় মগের মুলুকে, মগের দেশের জন্য, পরাক্রমশালী ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করিতেছ? তোমাকে যে লোক অপমান করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ তুলিবার জন্য তুমি এত জেদ করিয়া সে শোধ তুলিলে। অতি ক্ষুদ্রকেও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা না হইলে বিপক্ষ কি কখনও মনে ভাবিয়াছিল যে, একটা নগণ্য বাঙ্গালী, তাহাদের শত্রু রূপে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে এত বেগ দিবে? তোমার যারা কাপ্তান যুদ্ধে হত হইবে,

ছাড়িয়া দিলে আমাদের জেল হবে, প্রাণ থাকিতে কয়েদীকে ছাড়িতে পারিব না।" অপর একজন কহিল যে, "জেল হয় সেও ভাল, তবু জান ত বাঁচিবে। এইখানে ডাকুর হাতে মারা পড়িলে নিজের বালবাচ্চা সকলের কি উপায় হবে।" এই পরামর্শ অধিকাংশের মত হইল যে, কয়েদী ছাড়িয়া দিয়া ইউতে গিয়া রিপোর্ট করে যে রাস্তায় ডাকুরা কয়েদী ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তাহারা সাধনানন্দ স্বামীর হাত কড়া খুলিয়া দিল। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, এখন তোমরা ভাগো।

আমি সেপাইগণের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক সাধনানন্দ স্বামীকে প্রণাম করিলাম। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেপাইগণ দৌড়িয়া পলাইল। স্বামীজীকে কহিলাম যে, "দেখুন দেখি, আমার কথা শুনলেন না, আবার অনর্থক কত লাঞ্ছনা পাইলেন। দৈবাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাই উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম, কিন্তু এখন যদি সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার ফাঁসি হইত।"

সাধনানন্দ স্বামী তাহাতে হাসিয়া কহিলেন যে, "কার সাধ্য আমাকে ফাঁসি দেয়? এ ভগবানের লীলা খেলা। আমি জানি যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। এমন নির্দ্দোষী লোককে ফাঁসি দিবে, আর ভগবান এত বড় একটা অন্যায় কাজ স্বচক্ষে দেখিবেন! আমাকে যখন মঙ্গুওয়া হইতে ধরিয়া আনে, তখনই মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, এবং আমার মনের একটা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রাস্তায় তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হইবে। শোয়েবো জেলে যে পুনরায় আর প্রবেশ করিব না, তাহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ইহা যেন আমার স্পষ্ট জানা কথা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যাহা মনে মনে পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম এবং বুঝিয়াছিলাম, তাহা দেখ এখন প্রত্যক্ষ ফলিল। তাহা না হইলে তুমি কোথা আসিয়া সম্মুখে পড়িলে? আবার বলি, এ ভগবানের খেলা। ইহা যদি ভগবানের খেলা না হইত, তাহা হইলে কোথায় তুমি ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালীর ছেলে, তুমি কি করিয়া আজ মহা শৌর্য্যশালী বীরের ন্যায় মগের মুলুকে, মগের দেশের জন্য, পরাক্রমশালী ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করিতেছ? তোমাকে যে লোক অপমান করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ তুলিবার জন্য তুমি এত জেদ করিয়া সে শোধ তুলিলে। অতি ক্ষুদ্রকেও জব্দ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা না হইলে বিপক্ষ কি কখনও মনে ভাবিয়াছিল যে, একটা নগণ্য বাঙ্গালী, তাহাদের শত্রু রূপে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে এত বেগ দিবে? তোমার দ্বারা কাপ্তান যুদ্ধে হত হইবে,

বন্দী হইবে, তুমি যুদ্ধে পাঠান, গুর্খা, শিখদিগকে বিধ্বস্ত করিবে, তুমি শত্রুর কেল্লা অধিকার করিবে, এসকলত স্বপ্নের মত বোধ হয়। এসকল কথা দেশে বলিলে কি কেহ বিশ্বাস করিবে? এ উপন্যাসের কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। তাহা না হইলে তুমি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বনজঙ্গলে আসিয়া এত কষ্ট পাইয়া মগের জন্য কেন লড়াই করিবে?"

আমি—আপনি ধর্ম্মপ্রাণ ও ভক্তিমান ব্যক্তি। আপনি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য যতদূর হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন, আমরা সাংসারিক লোক, পাষণ্ড বিশেষ, আমাদিগের তাদৃশ ধারণা না হইলেও, সে কথাটা সত্য বটে। সে যাহা হউক, এখন আপনার কি করা কর্ত্তব্য?

সাধনানন্দ স্বামী—আমাকে আর ধরিতে পারিবে না। বোধ হয়, তোমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবার জন্যই পুনরায় ধরা পড়িয়াছি। এখন আমার ইচ্ছা যে তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমার আশু দেশে যাওয়া হইতেছে না। তোমার শোয়েবোর প্রথম যুদ্ধে আশাতিরিক্ত ফল লাভ এবং পরের যুদ্ধে ভয়ানক পরাভাবের কথা মনে মনে বুঝিতে পারিতেছি। তোমার দলবল ছিন্ন হইয়াছে। দুইজন প্রধান সর্দ্দার হত হইয়াছেন এবং একজন শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছেন। এখন তোমাকে ধরার জন্য শত্রুগণ চতুর্দ্দিকে জাল বিস্তার করিয়াছে। তোমাকে মনে করিয়া আমাকে দুইবার ধরিয়াছে। ব্রহ্মদেশে তোমার অভিনয় প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আর দুইটী বিপদ তোমার সম্মুখে, এই দুইটী ঘটনায় তোমার এ দেশের অভিনয় শেষ হইবে। ঈশ্বরের মহিমায় ও তোমার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে। তাহার পর আর তোমার কোন দলবল বা সঙ্গী থাকিবে না।

ইংরেজের অর্থবল, অস্ত্র-বল ও উৎকোচের মোহে পড়িয়া এদেশের লোক ক্রমে ইংরেজের পক্ষে গড়িতেছে। যুদ্ধ করিয়া বহুলোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া, কারাগারে পড়িয়া এবং ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়া দেশ বীরশূন্য হইতে চলিল। এখন আর যুদ্ধে জয়লাভের আশা নাই। তবে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নিজ দেশে না হইলেও ব্রহ্মদেশে আসিয়াও সিদ্ধি করিলে। একথার আভাস আমি তোমাকে ঢাকা থাকিতে দিয়াছিলাম। বোধ করি, তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে।

আমি—আজ্ঞে সে কথা আমার স্মরণ আছে, তবে তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই

যে, ব্রহ্মদেশ আমার ক্রীড়া-ক্ষেত্র হইবে। আপনি বলিতেছেন যে, আমার আরো দুইটী বিপদ সম্মুখে আছে, তাহা অসম্ভব নয়। যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, তাহাতে পদে পদেই বিপদ, তবে সেজন্য ভাবনা করি না, যখন যাহা হইবে, তাহাই মঙ্গল বলিয়া মনে করিব। এখন আপনাকে কোথায় রাখি?

সাধনানন্দ স্বামী—আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না। তাহা না হইলে আমার জন্য তোমার কোন কষ্ট হইত না। আমি আমার নিজ চেষ্টা করিতাম। আমার একান্ত ইচ্ছা যে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, হতভাগ্য বঙ্গদেশটাকে জাগাইতে পারি কিনা।

আমি—তবে সংপ্রতি আপনাকে উন্মু রাখিয়া আসি চলুন। তথায় আমার পিতৃতুল্য বিশ্বম্ভর শর্ম্মা আছেন। উন্মু সুভাও সাধু সন্ন্যাসীদিগকে বড় ভক্তি করেন, এমন শুনিয়াছি।

সাধু তাহাতেই সম্মত হইলেন। তাঁহাকে অশ্বারোহণ করিতে বলিলাম, কিন্তু তাহাতে রাজি হইলেন না, সুতরাং আমারও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়া চলিতে হইল। ব্রহ্মদেশী বন জঙ্গলময় পথ দিয়া উন্মু অভিমুখে চলিলাম। পরদিন উন্মুতে পৌঁছিলাম। উন্মু প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সেপাইদিগের পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া কেহ কেহ বর্ম্মা ভদ্রলোকদিগের মত পোষাক পরিলাম। কেহ কেহ কুলি সাজিয়া রহিলাম, তরবারী ও বর্শা বোঝা বাঁধিয়া, উপরে খড় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সঙ্গিগণের মাথায় দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া উন্মুতে প্রবেশ করিলাম। তথায় গিয়া অনুসন্ধানে বিশ্বম্বর শর্ম্মার খোঁজ করিয়া, আমি ও সাধনানন্দ স্বামী এবং হরিরাম শর্ম্মা তিনজনে তথায় গেলাম। আমার সঙ্গীগণেরা তিন চারি দলে বিভক্ত হইয়া বাজারে বা অনার্য্য স্থানে ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিল।

আমরা উন্মুতে প্রবেশ করিবা মাত্রই নগর কোতোয়াল আসিয়া আমাদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার নামধাম, ব্যবসা ও গন্তব্য স্থান সকলের বিবরণ লিখিয়া লইল। কোতোয়ালের নিকট আমার নাম গোপন করিলাম না। সকলই বলিলাম। আরো বলিলাম যে, আমরা দুই এক দিনের মধ্যে উন্মু হইতে চলিয়া যাইব। সে আমার নাম শুনিয়াছিল,এখন আমাকে দেখিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া কোতো-

য়াল কহিল যে, সংপ্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে কড়া হুকুম আসিয়াছে যে, সুভার এলাকায় কোন বিদ্রোহী ও ডাকুর দল আসিয়া আশ্রয় লইতে না পারে। বিদ্রোহী ও ডাকুদিগকে আশ্রয় দিলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সুভাকে শত্রু মনে করিবেন। এবং কোন ডাকুকে তাঁহার রাজ্যে পাইলে ধরিয়া পাঠাইতে লিখিয়াছেন। কোতোয়াল সুভাকে গোপনে সংবাদ দিলে সুভার নিকট আমাদিগের তলব হইল।

বিশ্বম্ভর শর্ম্মা আমাকে সঙ্গে করিয়া সুভার নিকট লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর অভিবাদন ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের পর, আসন গ্রহণ করিলাম। এবং বৃদ্ধ পোনা ব্রাহ্মণ সুভাকে কহিলেন যে, ইনি কালা। তিনি আমার সমস্ত ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত সুভার নিকট কহিলেন। এবং যে স্থানে যত যুদ্ধ করিয়াছি, তাহা যে আমার বাহুবলেই হইয়াছে, বিশ্বম্বর শর্ম্মা তাহা একটু অতিরঞ্জিত করিয়া মনে মনে গর্ব্বিত হইলেন।

সুভা কহিলেন, "ইনিই কি সেই মংকালা, ইহারই নাম আজ দুই তিন বৎসর যাবত শুনিতেছি, ইনিই কি চাউমিউর কেল্লা জয় করেন, ইনিই কি শোয়েবোর ও স্যাগাইনের যুদ্ধে এত কৃতীত্ব দেখান? ইহাঁর এত বীরত্ব! কিন্তু চেহারা দেখিয়াত সেরূপ মনে করা যায় না যে, ইঁহার পেটে এত গুণ! বাস্তবিকই কাহার পেটে কি গুণ, তাহা চেহারা দেখিয়া স্থির করা যায় না। আমি ইঁহাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। আমি শুনিয়াছি, ইনি বর্ম্মা নহে, ইনিও একজন বাঙ্গালী কালা। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ইঁহাকে আমি আমার এলাকায় বেশী দিন থাকিতে দিতে পারি না। ইংরেজের পত্র ঘন ঘন আসিতেছে। তাহাদের গুপ্ত-চরও যে না আছে, এমন নয়। যদি তাহারা টের পায়, তাহা হইলে অনর্থ ঘটাইবে। কালে বোধ হইতেছে, আমারও বা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধে। সর্ব্বদা ইংরেজের এত চোখ-রাঙ্গানী আর সয় না। কালাদিগের এত অধীনতা স্বীকার করিয়া আর থাকা যায় না। আমাদের রাজার আমলে নামে মাত্র রাজার অধীন ছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল বিষয়েই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছি। এখন সহজেই কি শেষটা স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া কালাদের দাসত্ব করিব, তাহা হইবে না। তবে সহজে বিবাদে প্রবৃত্তও হইব না।" এই বলিয়া সুভা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধ সুভার তেজপূর্ণ স্বদেশ-হিতৈষণার কথা শুনিয়া প্রাণটা শান্ত হইল।

দেখিলাম যে, আমাদিগের দেশের রাজরাজড়াদের যেমন অধোগতি হইতেছে, তাঁহারা পরপদ-লেহনে সিদ্ধহস্ত, এ সুভাব মেজাজ তাহার বিপরীত। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি এখানে থাকিয়া আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই কাথা যাইয়া দেখিব, মংত্রী তথায় কিপ্রকার যুদ্ধ করিতেছেন।

ইহার পর নানা আলাপের পর আমি তাঁহাকে কহিলাম, আমার একজন গুরু, একটী সন্ন্যাসী এখানে আসিয়াছেন। আমি যতদিন কাথা হইতে না ফিরি, ততদিন তাঁহাকে আপনার এলাকায় থাকিতে অনুমতি করুন। আমাকে মনে করিয়া দুইবার তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে আমি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দি। তাহাতে সুভা সেই সন্ন্যাসীকে দেখিতে চাহিলেন এবং সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার চেহারা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বম্ভর শর্ম্মার নিকট গোপনে তাহাকে থাকিতে আদেশ করিলেন। বৃদ্ধ সুভা কহিলেন যে, ইঁহারা যখন যুদ্ধ করেন না, তখন ইঁহাদিগকে এখানে থাকিতে দিতে আপত্তি নাই, কিন্তু তবুও ইঁহাদিগকে গোপনে থাকিতে হইবে।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শত্রুহস্তে বন্দী।

আমরা বৃদ্ধ সুভাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলাম। বিশ্বম্ভর শর্ম্মা যে বর্ম্মার বাটীতে গোপনে থাকেন, আমি সাধনানন্দ স্বামীকে লইয়া তথায়ই গোপনে রহিলাম। আহারাদি সম্পন্ন হইলে বিশ্বম্ভর শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ধর্ম্মদেবী প্রভৃতি এখন কোথায়? এবং কানাইরাম শর্ম্মাই বা কোথায়? তিনি কহিলেন যে, তাহাদের কোন সংবাদই তিনি পান নাই। এখান হইতে একজন লোক তিনি তাহাদের সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়াছেন।

আমার অপর সঙ্গিগণকে রাত্রিকালে গোপনে ডাকিলাম এবং তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তাহারা সকলেই আমার সঙ্গে কাথা যাইতে ইচ্ছা

প্রকাশ করিল। আমি কহিলাম, উম্মুব চারিদিকে ইংরেজের গুপ্তচর ফিরিতেছে। এত লোক একত্র যাইতে দেখিয়া তাহারা আমাদিগকে ডাকু মনে করিয়া বিপদে ফেলিবে। সুতরাং কেহ কেহ গোপনে এখানে থাক। যাহার অন্যত্র যাইয়া থাকিতে সুবিধা হয়, সে তথায় যাইতে পারে। আমি কাথা হইতে ফিরিলে পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া যাহা হয়, করা যাইবে। আমি হরিরামকেও কহিলাম "যে তুমি আমার সঙ্গে যাওয়া ক্ষান্ত দাও এবং ধর্ম্মদেবীদিগকে একবার অনুসন্ধান কর।" তাহাতে সে কহিল যে, "কানাইরামই তাহাদের রক্ষার জন্য আছে। আমি আপনার সঙ্গে কাথা যাইব।" কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। বাস্তবিক হরিরাম আমার এমন ভক্ত হইয়াছে যে, সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার মত থাকিতে ইচ্ছা করে। বর্ম্মাদের মধ্যে কয়েক জনও আমার সঙ্গ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে রাজি হইল না। কাজে কাজেই আমরা দশজন মাত্র প্রস্তুত হইলাম। অপর সকলে কেহ গোপনে উম্মুতে রহিল, কেহ কেহ অন্যত্র গেল।

এখন কথা হইল যে, আমরা কি বেশে উম্মু হইতে বাহির হইব? বর্ম্মাবেশে বাহির হইলেও নিরাপদ নহে। শেষে স্থির করিলাম যে, সেপাইদিগের বেশে যাওয়াই ঠিক, কারণ তাহা হইতে সহসা কোন বর্ম্মার সন্দেহ হইবে না এবং দূর হইতে বিদেশী লোকও মনে করিবে যে, ইহারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সেপাই। আমি নেটিভ অফিসারের ইউনিফরম পরিধান করিলাম, মাথায় ফুন্নাযুক্ত পাগড়ি, পায়ে এমুনিশন বুট ও পট্টি বাঁধিলাম, আমার কোমরে কিরিচ ঝুলাইয়া অশ্বারোহণ করিলাম। হরিরামকে হাবিল্‌দারের পোষাক পরাইলাম। অপর কয়েক জনের এক জনের নায়কের পোষাক, আর সকলের সেপাইয়ের পোষাক পরাইলাম। একজন কুলি সঙ্গে লইলাম। তাহার মাথায় বর্ম্মা দা বা খড়্গগুলি এক বোঝা বাঁধিয়া দিলাম। হাবিল্‌দার হইতে সেপাই পর্য্যন্ত রাইফল দিলাম। বর্শা সঙ্গে লওয়া হইল না। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আমরা বিশ্বম্ভর ও সাধনানন্দ স্বামীকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম। সেই কুলিটা পথদর্শকরূপে কার্য্য করিতে লাগিল। আমি আমার লোকদিগকে কহিলাম যে, কালা-সেপাইয়ের মত কায়দা ও পদবিক্ষেপে তাহাদের পথ চলিতে হইবে। অন্ততঃ যখন বস্তিগুলি অতিক্রম করিবে বা যেস্থান দিয়া লোক সকল যাতায়াত করে, সেই সেই স্থানে চলিতে একটু সাবধান হইতে হইবে। কয়েকবার কায়দা সকল্‌ হরিরামকে দেখাইয়া

দিলাম। কিন্তু অশিক্ষিত ও অনভ্যস্ত লোকের কি দুই একবার দেখাইলে শিক্ষা হয়? এইভাবে উম্মু সহর পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইলাম। বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় উম্মুর এলাকা ছাড়িলাম।

উম্মুর এলাকা ছাড়িয়া প্রায় দুই তিন মাইল পথ গিয়াছি, এমন সময় পথের দু'ধারে জঙ্গলের মধ্যে যেন অনেক লোক লুকাইয়া আছে, এমন বোধ হইল। আরো নিকটবর্ত্তী হইলে একজন বর্ম্মা দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল যে, "ঐ কালা, ডাকু মংকালা এই ব্যক্তি।" বর্ম্মার চীৎকারে চারিদিক হইতে সেপাই সকল বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া আমাদিগকে যেন সন্ধ্যাজালে ঘেরিয়া ফেলিল। ইহারা প্রথম একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, আমাদিগকে কোন সিপাইয়ের পার্টি মনে করিয়া এবং আমাকে নেটিভ অফিসার বিবেচনা করিয়া, সেপাইদিগের জমাদার আমাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল যে, "আপ লোক কোন্ হ্যায়, কেধার যাতা হ্যায়?"

আমি। হাম লোক কোন হ্যায়, দেখিয়ে, আপত সর্দ্দার হ্যায়। (এই বলিয়া আমার কাঁধের উপরকার পল্টনের চিহ্ন দেখাইয়া দিলাম।)

জমাদার। আপকো বর্দ্দিমে ত ৫নং বাঙ্গাল ইনফানট্রী মালুম হ্যায়। লেকেন ৫নং বাঙ্গালা ইনফানট্রী তো মাণ্ডালে মে বদলি হোকে গিয়া। আপ লোক এধার ক্যায়ছা আয়া, কাঁহা যাতেহো?

আমি। হাম লোক ডাকু পাকড়নে কো উম্মুমে গিয়াথা।

মনে মনে বলিতে লাগিলাম যে ৫নং বাঙ্গাল ইনফানট্রী মাণ্ডালে যে বদলি হইয়াছে, তাহাত জানি না, আপন কথায় আপনি ধরা পড়িলাম।

জমাদার। আপকা হাবিলদার কা বর্দ্দি (ইউনিফরম) তো সোয়ার কা বর্দ্দি, আউর সেপাই লোককা কইকা গুর্খা পল্টনকা বর্দ্দি, কইকা পাঞ্জাবী পল্টনকা বর্দ্দি, এ ক্যায়ছা বাত হ্যায়?

জমাদারের কথায় আমি বাস্তবিকই বেকুব হইলাম। এ আমারই দোষ, আমি যদি এই পোষাক গ্রহণের সময় সতর্ক হইতাম, তাহা হইলে এমনভাবে হাতে হাতে ধরা পড়িতাম না। বর্ম্মাদিগের কোন ইউনিফরম কোন্ পল্টনের, তাহা জানা নাই। যাহার যাহা খুসী পরিয়াছে। কে জানে যে এরূপ জমাদারের সম্মুখে পড়িয়া পোষাকে ধরা পড়িব। বর্ম্মাদিগের ভুলাবার জন্য এই প্রকার পোষাক পরা হইয়াছিল। এখন দেখিলাম, ছদ্মবেশ করিলেই হয় না, বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার।

আমি আর মিথ্যা কথাদ্বারা মিথ্যা কার্য্য ঢাকিবার প্রয়াস পাইলাম না। কহিলাম, আপকো ক্যা মরজী ?

জমাদার। হামারা আউর ক্যা মরজী, আপ লোক ডাকু হ্যায়। হামারা বেশক মালুম হুয়া আপ মংকালা হ্যায়। আপ আবি কয়েদ হ্যায়। হাতিয়ার ছোড় দেও। শিবুকা লড়াই মে এই সব ড্রেশ আপ লোক লুট লিয়াথা।

আমরা এখন ফাঁদে পড়িয়াছি। আর উপায় নাই। আমি আস্তে আস্তে বর্ম্মা কথায় সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করা। অস্ত্র ত্যাগ করা, কি লড়াই করা ? তাহাদিগকে আমি বলিলাম যে "আমাদিগকে সাপে খেলেও মরন, বাঘে খেলেও মরণ। শত্রুর হাতে ধরা পড়িলেও নিশ্চয়ই আমাদিগের ফাঁসি হইবে, তাহা অপেক্ষা লড়াই করিয়া মরাই ভাল। বীরপুরুষের মত স্বাধীনতা লইয়া এ সংসার হইতে যাওয়াই ভাল। বিপদে অধীর হওয়া বা ভয়েতে কাঁপা আমার স্বভাব নহে। বিপদকালে যেন আমার সাহস আরো বৃদ্ধি হয়, তাহার কারণ এই যে, মরণ অপেক্ষা আর ভয় কি ? সেই মরণের জন্য যে প্রস্তুত থাকে, তাহার আর বিপদে ভয় কি ? যাহারা প্রাণের ভয় করে, তাহারাই বিপদে পড়িয়া মরিবার ভয়ে কাঁপে। বলা বাহুল্য, হরিরাম, আমার যে মত, সে মতের বিরুদ্ধে কখনও চলে না। বর্ম্মাদিগের মধ্যে অনেকের মত হইল যে, এ অবস্থায় লড়াই করা বৃথা। নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া কে লড়াই করে ? শত্রুহস্তে ধরা পড়িলে অন্ততঃ কিছু দিনত জীবিত থাকিব। আমি দেখিলাম যে, লোকগুলির তেজ অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। মাত্র দশ জন লোক, তাহার মধ্যে সকলে যখন অনিচ্ছুক, তখন আমাদের দুই একজনের লড়াই করা বৃথা। জমাদারকে কহিলাম যে, "আমাদের হাতেও রাইফল আছে, আমরা যদি লড়াই করি, তাহা হইলে আপনাদিগের অনেকের প্রাণ-নাশ হইতে পারে এবং অনেকে গুরুতর জখমও হইতে পারে। অবশ্য আমা-দিগের যাহা হয়, সেই ভাল। আপনি যদি অঙ্গীকার করেন যে, আপনার সেপাইগণ আমাদিগের উপর কোন অত্যাচার করিবে না, তাহা হইলে আমরা আপনার সম্মানের জন্য অস্ত্রত্যাগ করি, নচেৎ যুদ্ধ করিব। বিচারে আমাদের যাহা হয়, সেই ভাল, সেজন্য আপত্তি নাই, তবে সেপাই বেটারা অনর্থ জঘন্যভাষায় গালি দিবে এবং অযথা প্রহার করিবে, তাহা সহ্য হইবে না।" জমাদার আমার কথা সঙ্গত মনে করিয়া, সেই অঙ্গীকারই করিল এবং সকল সেপাইদিগকে সে কথা শুনাইয়া দিল। তখন আমরা অস্ত্রত্যাগ

কাঁদিলাম। দুঃখে ও ক্ষোভে যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় আমাদিগের মনের গতি হইল।

অস্ত্র ত্যাগ করার পর সেপাইগণ আমাদিগের হাতকড়া লাগাইল। যে বর্ম্মাটী আমাকে সেনাক্ত করিয়া দিয়াছিল, সে লোকটা সেই গ্রামের তুজী, যে গ্রামে আমরা শৈবোর লড়াই করিয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম এবং সেখানকার তুজী ও লোকের উপর আমাদিগকে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। শত্রুর গুপ্তচর কি ভয়ঙ্কর জীব, তাহা এখন মালুম হইল।

আমাদিগকে ফলিন আউট পোষ্টে লইয়া গেল। ডাকাইতের প্রধান সর্দ্দার মংকালাকে ধরিয়াছে বলিয়া শব্দ পড়িয়া গেল, মংকালা লোকটা কেমন, তাহা দেখিবার জন্য কতলোক আসিয়া উঁকী মারিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ বলিল, লোকটা বাহাদুর বটে, কেহ কহিল, যেমন কাজ করিয়াছে, এখন তেমন ফল পাইবে। একরাত্রি ফলিন পোষ্টের গারদে থাকার পর আমাদিগকে ইউর জেলে পাঠাইল। তুজী ও সেপাইগণ দুর্ব্বৃত্ত ডাকু মংকালাকে ধরিয়া পুরস্কার পাইবে বলিয়া আহ্লাদিত হইল।

আজ প্রায় দুই বৎসরের অধিককাল যাবত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া বনে জঙ্গলে বাস, অনাহার ও অল্পাহার ও মনের নানা উদ্বেগে দিন কাটাইয়াছি। আজ জেলখানায় বন্দী হইয়া একটু আরাম মিলিল, বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ আরাম, মন্দ আরাম নয়। স্বাধীনতা হারাইয়া আরাম! শত্রুরও এমন আরাম মেলে না; আরাম! বনে জঙ্গলে যে অনাহারে বা অল্পাহারে মনের উদ্বেগে কাটাইয়াছি, সে কষ্ট কষ্ট বলিয়া বোধ হয় নাই, কেবল এক কথা মনে করিয়া যে আমরা স্বাধীন। বনের পশু বা পক্ষীগণ যে এত কষ্টে বনে জঙ্গলে থাকে, সময় সময় তাহারা অনাহারে থাকে, শত্রু ব্যাধ কর্ত্তৃক তাড়িত হয়, অপর প্রবল পশুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়, তবু কিন্তু তাহারা ভাবে পরাধীন হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনভাবে থাকিলে অনেক সুখে থাকে। আমার মনের ভাব তাদৃশ হইল। জেলখানার বন্দী হইলাম বটে, তবে ব্রহ্মদেশের জেলখানার অভিজ্ঞতা লাভের এক সুযোগ ঘটিল।

বন্দী হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়া স্বাধীন জীবনের কথা মনে পড়িতে লাগিল। বিপদে না পড়িলে সম্পদের কথা মনে পড়ে না, দুঃখে না পড়িলে সুখের তুলনা হয় না, এ সকল সত্য কথা।

জেলখানাটী এখনও পাকা হয় নাই। পাকা জেল নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত

হইতেছে। জেলের যত কয়েদী তাহার প্রায় সকলই নাকি ডাকু, ডাকুর দলে জেলখানা পূর্ণ হইয়াছে। এই তথাকথিত ডাকুদের মধ্যে আমার পরিচিত অনেক লোক দেখিতে পাইলাম। তাহাদের অনেকে আমার সঙ্গে থাকিয়া অনেক স্থানে যুদ্ধ করিয়াছে। পোমেলোর শেষ যুদ্ধের পরও অনেকে ধৃত হইয়াছে। তাহারা আমাকে জেলখানায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। জেলখানার কয়েদীগণের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিবার নিয়ম নাই। সুতরাং কে কি ভাবে কয়েদ হইল, জানিতে পারিলাম না। সকলে অবনতমস্তকে আমাকে নমস্কার করিল, আমিও প্রতি-নমস্কার জানাইলাম।

জেলখানায় ভর্ত্তি হইবার কালে সদরদরজার মধ্যে আমাদিগকে উলঙ্গ করা হইল এবং পেয়াদাগণ একে একে সকলের মুখগহ্বর, কর্ণকুহর ও গুহ্যদ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, আমরা কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য লুকাইয়া আনিয়াছি কি না? পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে পুনরায় বস্ত্র পরিধানের আদেশ পাইলাম। আমাদিগের নাম ধাম, বয়স, শরীরের চিহ্ন, অপরাধ সমস্ত জেলখানার খাতায় লেখা হইল। পরে আমাদিগকে লৌহকারের কারখানায় লইয়া গেল এবং তথায় আমাদিগের চরণে শৃঙ্খল পড়িল।

জেলারটী বর্ম্মা ফিরিঙ্গি, বর্ম্মা ফিরিঙ্গিগুলি প্রায়ই নীচবংশীয় ও জঘন্ত প্রকৃতির। তাহার সুমধুর অশ্রাব্য বাণীতে কর্ণকুহর ঝালাপালা করিতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে মা উচ্চারণ করিয়া গালি, পরে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তখন এমন ঘৃণা ও ক্রোধ হইল যে, নিকটে কোন অস্ত্র পাইলে তখনই তাহার মুণ্ডপাত করিয়া ছাড়িতাম।

জেলরক্ষার্থ তখন মিলিটারি পুলিসের সেপাই সকল নিযুক্ত হইয়াছিল। জেলার মস্টে ওরপে নংতাটু, হাবিলদারকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ হাবিলদার, ফুঙ্গী কালা বড় ভারি ডাকু হ্যায়, এস্‌কো খুব হুঁসিয়ার মত রাখনা।" হাবিলদার কহিল যে, "বহুতাচ্ছা হুজুর" এই বলিয়া আমাদিগকে ডর্মিটরিতে লইয়া গেল। হাজতের কয়েদী যে সকল স্থানে থাকে, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

কিছুকাল পরেই সায়ংকালীন আহারের জন্য আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। হাজতের যত কয়েদী স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইল এবং শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীগণ আমাদিগের অপেক্ষা দূরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পংক্তিতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। জেলের পেয়াদা শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদিগকে বলিল, "ঠাইং" বা বস, কয়েদীগণ সকলে একযোগে বসিল, আবার চেঁচাইয়া বলিল,

"মা-টাঠা" অর্থাৎ দাঁড়া, সকলে একযোগে দাঁড়াইল। এই প্রকার কয়েকবার উঠাবসা করিতে করিতে যাহার একটু ত্রুটী হইতে লাগিল, তখন পেয়াদা বাবু অশ্রাব্য ভাষায় সম্বোধন করিয়া তাহাকে দুই একটা রুলের গুতা দিয়া ঠিক করিয়া দিতে লাগিল। শেষবার বসিবার পর পেয়াদা হুকুম দিল "ছা" আমাং থা। তখন সকলে ভাত খাইতে আরম্ভ করিল।

আমাদিগের আহারের জন্য বাজরামিশ্রিত ধানযুক্ত আকাঁড়া চাউলের ভাত, নৌকার জল ছেঁচা ছাঁওচের মত একখানি কাঠের পাত্রে এবং টিনের একটী বাটীতে পাকা বেগুন সিদ্ধ কতকটা তরকারি আনিয়া হাজির করিল। তাহা ব্রহ্মদেশের সুপ্রসিদ্ধ নাপ্পি মসলার দ্বারা পাক করা। এত বৎসর ব্রহ্মদেশে আছি, কিন্তু বর্ম্মার খাদ্য কখনও খাই নাই। বনে জঙ্গলে থাকিলেও নিজে পাক করিয়া খাইতাম। নাপ্পি কখনও খাই নাই, তাহার গন্ধে পেটের অন্ন-প্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। সুতরাং শুধু শুখনা ভাত কয়েক মুঠা মুখে দিয়া প্রাণ ভরিয়া জল পান করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। হরিরামও তাহাই করিল।

আমরা হাজতের কয়েদী, আমাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ। আহার করিয়া তথায় গেলে প্রত্যেকের জন্য একখানি চট বিছানা এবং গাত্রাবরণের জন্য একখানি কম্বল পাইলাম। সেদিন আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫ জন হাজতের কয়েদী ছিলাম, বিনা বালিশে চট বিছানায় শুইয়া মহাসুখে নিদ্রিত হইয়া শারীরিক শ্রান্তি কতকটা দূর করিলাম। ক্ষুধা ও নিদ্রা দুইটী জিনিষ। প্রবল ক্ষুধায় মন্দাহার পরিত্যাগ করিয়া ভাল আহারের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ প্রবল নিদ্রায় মন্দ বিছানা উপেক্ষা করিয়া ভাল বিছানার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে না।

সচরাচর জেলখানার ভিতর দুই প্রকার ওয়ার্ডার বা পেয়াদা থাকে। এক প্রকার কন্‌ভিক্ট ওয়ারডার এবং আর এক প্রকার ফ্রি-ওয়ারডার, কিন্তু আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আপার বর্ম্মায় কয়েদী ও ওয়ার্ডার প্রথা সৃষ্টি হয় নাই, কারণ তখন সমস্ত আপার বর্ম্মাকে একটী বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। তখন জেলরক্ষার জন্য মিলিটারী পুলিশের একদল সেপাই নিযুক্ত থাকিত এবং ভিতরের কার্য্যের জন্য একদল কালা পেয়াদা ছিল।

এক ঘুমে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতের কাকের ডাকের সঙ্গে জেল-

খানার ঘণ্টা বাজিল। সদর দরজা মুক্ত হইল। ভিতরের পাহারা পেয়াদাগণ প্রস্থান করিল, নূতন একদল পেয়াদা ভিতরে প্রবেশ করিল। হাবিলদার আসিয়া প্রত্যেক কয়েদ খানার তালা খুলিয়া দিল। কয়েদীগণকে জোড়ায় জোড়ায় প্যারেডের ধরণে বাহির করিয়া পায়খানার সম্মুখে লইয়া বসাইল। পায়খানার ভিতর আটটী আসন। সুতরাং আটজন করিয়া কয়েদীকে এক একবার করিয়া মলত্যাগের জন্য ভিতরে লইয়া যাইতে লাগিল। মল-মূত্র ত্যাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। যাহাদের বাহ্য অতি বিলম্বে হয়, তাহাদের এখন বড় বিপদ। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন না হইলে প্রায়ই পেয়াদা সকলের হাতের থাপড়ের সঙ্গে গালি খাইতে হয়। বর্ম্মাগণ মল ত্যাগ করিয়া জল ব্যবহার করে না, সাহেবগণ, চীনা বা জাপানিগণ মল ত্যাগ করিয়া কাগজ দ্বারা শৌচ কার্য্য সম্পন্ন করে, বর্ম্মারা একখানি কাঠি দ্বারা মল দ্বারটী মুছিয়া ফেলে। এই জন্য পায়খানায় মোটায় মোটায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠি সকল মজুত থাকে। আমি এখানে আসিয়া মহাবিপদে পড়িলাম। কাঠি দ্বারা শৌচ কার্য্য করিয়া সমস্ত দিন যেন গা পিচ পিচ করিতে লাগিল। যে জাতির যে অভ্যাস, সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে না পারিলে মন কখনই শুদ্ধ হয় না। আবার আমরা যে হাত দ্বারা মলগুলি প্রত্যহ ঘাটি, তাহাও বিদেশীর চক্ষে ভাল দেখায় না। আমাদের হাতের গন্ধও সহসা দূর হয় না। দোষ গুণ উভয় ব্যবস্থাতেই আছে, তবে যে জাতির যে অভ্যাস।

সমস্ত কয়েদীগণের মল ত্যাগ কার্য্য সম্পন্ন হইলে আবার জোড়ায় জোড়ায় কূপের নিকট সকলকে লইয়া গেল। তথায় কূপের জল দ্বারা হাত মুখ ধুইয়া সকলে পরিষ্কার হইল। শেষে শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদিগকে কাঠের এক পাত্রে করিয়া ভাতের মাড় খাইতে দেওয়া হইল। ইহা কয়েদীদিগের ছোট হাজিরা। মাড় খাওয়া সারা হইলে কাহাকেও বাগিচার কাজ করিবার জন্য, কাহাকেও মিস্ত্রিখানায়, কাহাকেও লৌহকারের কার্য্যে, কাহাকে ঝাড়ুদার কার্য্যে, কাহাকে মলের জালা বাহিরে লইয়া যাইতে নিযুক্ত করা হইল।

সাড়ে নয়টার সময় ব্রেক-ফাষ্টের ঘণ্টা পড়িল। সমস্ত কয়েদীদিগকে আনিয়া একত্র জমা করা হইল,প্যারেডের ন্যায় পুনরায় তাহাদিগকে শ্রেণীধরণে বদ্ধ করিয়া উঠা বসা করাইয়া পেয়াদা সাহেব তাহাদিগকে আহারের আদেশ করিলেন। সমস্ত কয়েদীর এক ওজন মত ভাত। দুর্ব্বল, সবল সকলই এক

খাপ। কাহারো ভাল পেট ভরিল না, আবার কচিত কেহ হয়ত অসুখ বশতই হউক বা অল্পাহার বশতই হউক, ঠিক নিজের সমস্ত ভাত খাইয়া সারিতে পারিল না। যাহার পাত্রে ভাত রহিল, হয়ত তাহার পার্শ্বের এক ব্যক্তি সেই ভাতগুলি লইয়া উদরস্থ করিয়া ফেলিল।

সকলের আহার সম্পন্ন হইলে আপন আপন পাত্র লইয়া সকলকে কূপের ধারে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় জলপান ও মুখ ধোয়া এবং ভোজপাত্র ধোয়ার কার্য্য শেষ হইলে, সমস্ত কয়েদীকে একঘণ্টা বিশ্রামের জন্য ডরমিটরির ভিতর পুরিল। এগারটা বাজিলে কয়েদীদিগকে আপন আপন কার্য্যে পাঠাইল।

ইতিমধ্যে কতজনের নামে কত মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। কাহারো নামে নালিশ হইল যে, ঝাড়ুদার বাবুর্চ্চিখানা হইতে একটা লঙ্কা চুরি করিয়া লইয়াছে, বাবুরচির নামে নালিশ হইল যে, সে একটু তেতুল চুরি করিয়া খাইয়াছে। কেহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গোম ভাঙ্গিতে পারে নাই, কারণ তাহার হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, কোন ব্যক্তি বাগিচা হইতে আসিবার কালীন অন্যের মুখের পরিত্যক্ত একটু চুরট আপন গুহ্য দ্বারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ইত্যাদি। জেইলার এই সকল অভিযোগ কয়েদীগণের টিকিটে লিখিল। এবং সমস্ত অভিযোগের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইল। পরদিন ডাক্তার সাহেব যখন জেলখানা পরিদর্শন করিতে আসিবেন, তখন কয়েদীগণের গলায় লোহার হাঁসুলির সঙ্গে ঝুলান একখণ্ড কাঠের তক্তিতে তাহার অপরাধের নম্বরানুসারে একে একে ডাকিয়া সাহেবের নিকট হাজির করিতে লাগিল। সাহেব সাক্ষীর মুখে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কাহারো তিনদিন ভাতের মাড় খাইতে শাস্তি দিলেন, কাহারো সাতদিন যাবত রৌদ্রে দাঁড়াইয়া বড় একটা পাথর উঠান নামান রূপ ড্রিল করিতে আদেশ হইল, কাহারো সচ্চরিত্র জন্য যে অনুগ্রহসূচক নম্বর দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে খালাস পাইতে পারে, তাহার দশবিশ নম্বর কর্ত্তন করা হইল। কাহাকেও সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। কাহাকেও তিনদিন হস্তে কড়া লাগাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। যে ব্যক্তি গুহ্য দ্বারের মধ্যে চুরট লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার অপরাধ ভারি, তাহাকে ত্রিশ বেত মারিবার আদেশ হইল।

অপরাধীকে বেত মারিবার জন্য ডেকেটে আনিয়া হাজির করা হইল।

কয়েদীর হাত পা তাহাতে কসিয়া বাঁধা হইল। ডাক্তার সাহেব ও ডাক্তার বাবু হাজির হইলেন। কয়েদীর দুই পায়ের মধ্যস্থলে একটী গামলা রাখা হইল এবং আর এক গামলায় কতকটা জল রাখা হইল। আর এক টুকরা কাপড় রাখা হইল। জেলের যে পেয়াদা বেত মারিবে, সে বস্তার মধ্যে মাটি পূরিয়া সেই বস্তার উপর বেত মারিয়া হাত এমন পাকাইয়াছে যে, তাহার এক ঘা অপরের দুই তিন ঘায়ের সমান। পেয়াদা দুই তিনখানি পাকা বেত হাতে করিয়া হাজির হইল। সাহেব মারিতে হুকুম দিলেন। পেয়াদা বেত মারিতে আরম্ভ করিল। এক একটী বাড়ী মারিয়া বেতখানি যখন টানিয়া আনিতে লাগিল, বেতের সঙ্গে কয়েদীর নিতম্বের চামড়া উঠিয়া আসিতে লাগিল। জেইলার চেঁচাইয়া বেতের সংখ্যা গণিতে আরম্ভ করিল। প্রথম চারি পাঁচ ঘায়ে কয়েদী "আনে লে লে (ওগো মারে) বলিয়া চীৎকার করিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সে ভয়েতে বাহ্য করিয়া ফেলিল। মল গিয়া নিম্নের গামলায় পড়িল। যখন পনর ঘা বেত পড়িল, তখন সে নীরব হইল, তাহার পর হাত পা ছাড়িয়া দিয়া যেন মূর্চ্ছা গেল। কয়েদী আর নড়ে না, দেখিয়া সাহেব গিয়া দেখিলেন, কয়েদী অজ্ঞান হইয়াছে, তাহার নাড়ীর গতি মন্দ। এখন তিনি বেত মারা বারণ করিলেন। তাহার মাথায় গামলা হইতে ঠাণ্ডা জল দেওয়া হইল, ডাক্তার বাবু দৌড়িয়া গিয়া এমোনিয়ার বোতল আনিয়া তাহাকে সোঁকাইতে চেষ্টা করিলেন, তাহার বন্ধন খুলিয়া দিয়া ধরাধরি করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। এমোনিয়ায় চৈতন্য হইল না। ডাক্তার সাহেব বড় ব্যস্ত হইলেন, কয়েদী মারা গেলে জবাবদেহী করিতে হইবে। তাহার হৃদপিণ্ডের উপর ব্যাটারী দেওয়া হইল। বৈদ্যুতিক স্রোত Electric current গাত্রে প্রয়োগ করা হইল। দুইবার পিচকারির দ্বারা তাহার বাহুর চর্ম্মে প্রবেশ করা হইল, তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের চেষ্টা করা হইল, অবশেষে ধাক্কার চোটে সে হাঁ করিয়া উঠিল। সকলের ভরসা হইল। ক্রমে তাহার হৃদপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হইল, সে চৈতন্য লাভ করিল। কিন্তু তাহার ক্ষত আরাম হইতে প্রায় একমাস লাগিল।

জেলার যদি অমানুষ হয়, তাহা হইলে জেলের কয়েদীদিগের বিড়ম্বনার সীমা থাকে না। এই জেলার যে বদলোক, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে যখন কামজারীর মার মারে, তখন কাহারো বুকে, কাহারো পিঠে, সবুট

লাথি মারে, কাহাকে হস্তস্থিত লাঠিদ্বারা নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। কয়েদী বেচারীর অপরাধ কি? হয়ত জাঁতা ঠেলিতে ঠেলিতে তাহার হাতে ফোস্‌কা পড়িয়াছে, সেইজন্য অন্যপ্রকার কার্য্যে বদলির প্রার্থনা করিয়াছে, কাহারো বা জ্বর হওয়ায় কাজ করিতে পারে নাই, তাই একটু বিশ্রাম প্রার্থনা করিয়াছে, কাহারো হয়ত পাছায় একটা ব্রণ হইয়াছে, সোজাভাবে দাঁড়াইতে পারে না। এই সকল অপরাধের জন্য নিষ্ঠুর ভাবে অকারণে কয়েদীদিগকে প্রহার করে এবং অসংযত মুখের জঘন্য ভাষায় কয়েদীদিগকে সর্ব্বদা গালি দিতে থাকে।

এই সকল পীড়িত কয়েদীগণের মা বাপ ডাক্তার; যদি সেই ডাক্তারও আবার ভাল মানুষ হয়। জেলখানায় নেটীব ডাক্তার ও জেইলারে প্রায়ই মিল থাকে না। কারণ জেইলার যাহাকে উৎপীড়ন করিয়া ঘুস আদায় করিতে চাহে, ডাক্তার তাহাকে পীড়িত দেখিলে যদি হাসপাতালে লইয়া যায়,তাহা হইলে ডাক্তারের উপর সে নারাজ হয়। যাহাকে ডাক্তার বলে পীড়িত, জেইলার তাহাকে বলে সুস্থ। বাহির হইতে ঘুসের বন্দোবস্ত হইত। যে কয়েদীকে জেইলার প্রত্যহ প্রহার করিয়া উৎপীড়ন করিত, ঘুসের পর তাহাকে হয়তঃ কোন আরামদায়ক কার্য্য দিয়া তাহার কষ্টের অবসান করিত। প্রত্যহ এই প্রকার পৈশাচিক কাজ দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এই নরক হইতে বাহির হইতে না পারিলে চলিবে না।

দিনের বেলায় কয়েদীগণের সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ নাই, রাত্রিকালেও প্রায় তাহাই। সন্ধ্যা হইলেই আর একদল পেয়াদা ভিতরে আসিয়া ডাণ্ডা হাতে করিয়া পাহারা দিতে থাকে। সমস্ত কয়েদখানাই সারারাত্রি বাতি থাকে। পাহারওয়ালারা দুই দুই ঘণ্টা অন্তর বদলি হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় উপর হইতে শাস্ত্রী চিৎকার করিয়া উঠে এবং জেলখানার ভিতরের পেয়াদাগণ চিৎকার করিয়া তাহার সাড়া দেয়। কয়েদীগণ পরস্পর কোন কথা বলিলে পেয়াদা সাহেব কয়েদীগণের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতে থাকে। এমন অবস্থায় পরস্পর পরামর্শ করাও দায়। তবে আমরা হাজতের আসামী, আমাদের প্রতি শাসন কতক শিথিল।

চত্তারিংশ অধ্যায়।

জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন।

আমাকে শৈবো জেলে পাঠানের কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু শৈবো জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদখালাসীর পর উক্ত জেল পাকা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবং আমাকে তথায় পাঠান নিরাপদ নহে, মনে করিয়া, ইউকেই আমার বিচার হইবে,ধার্য্য হইল। এক ফিরিঙ্গি সবডিবিসনাল মাজিষ্ট্রেটের নিকট আমার মোকদ্দমা উপস্থিত করিল। আমাকে ও আমার সঙ্গিদিগকে প্রত্যহ কাছারিতে লইয়া যাইতে লাগিল। শৈবো, মাণ্ডালে ও স্যাগাদিন হইতে সাক্ষী সকল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কয়েকজন বর্ম্মা ও কালা সেপাইয়ের সাক্ষী হওয়ার পর দেখি, বন্ধু লরিমার আসিয়া সাক্ষী দিতে দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে দেখিয়া মনে মনে কৌতুক জন্মিল। লোকটা ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়া কোন্ মুখে আবার আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আসিল? লরিমার আমাকে মংকালা বলিয়া সেনাক্ত করিল। আরো প্রমাণ করিল যে, আমি বাঙ্গালী, রেঙ্গুনে কেরাণীগিরি চাকরি করিতাম। আমার পরিচয় পাইয়া স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য ভারতবাসীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমার পক্ষে কোন উকীল বারিষ্টার নাই, সুতরাং আমি তাহাকে জেরা করিলাম, জেরায় সে স্বীকার করিল যে আমার জন্য তাহার ও তাহার সঙ্গীগণের প্রাণ বাঁচিয়াছিল, নচেৎ বর্ম্মারা তাহাদিগকে হত্যা করিত। লরিমারের এই উক্তিতে সকলেই আমার মহত্বের জন্য ধন্যবাদ দিল এবং মাজিষ্ট্রেটের মন যেন একটু নরম হইল। সাক্ষীগণের সকলেই,কেহ চাউমিউর কেল্লার ঘটনা, কেহ রসদ লুঠের ঘটনা, কেহ শৈবোর লড়াইয়ের ঘটনা যে আমা কর্ত্তৃক হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিল। মাজিষ্ট্রেট আমাকে অনেকগুলি ধারামতে চার্জ করিয়া আমার জবাব চাহিলেন। আমি বলিলাম যে, "এ আদালতে আমি কোন জবাব দিব না। সেসনাদালতে যে জবাব দিতে হয় দিব।" অতঃপর আমাদিগের সেসনে সোপর্দ্দ করা হইল। আমাদিগকে পুনরায় জলখানায় লইয়া গেল।

জেলখানায় আসিয়া আস্তে আস্তে হাজতের আসামীদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তাহাদের অনেকেই আমারই দলের লোক, তাহারা আমার কর্তৃত্ব কখনও অমান্য করে নাই; তাহারা সকলে রাজি হইবে। তাহাদের পরিচিত শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদিগের মধ্যে ফাকমত ও সুযোগানুসারে কথা চালাইতে আরম্ভ করিলাম। তাহাদের অনেকেই জেলের অত্যাচারে অত্যন্ত কষ্টে আছে, সকলেই মত প্রকাশ করিল যে "আর সহ্য হয় না। হয় মরণ, না হয় জেল হইতে বহির্গমন, ইহার দুইটীর একটী যাহা হয়, সেই ভাল।" যে দিন যে সময়ে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা মনে মনে ধার্য্য করিতে লাগিলাম।

ডিসেম্বর মাসের বড়দিনের বন্ধের দিন জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইব, মনে মনে স্থির করিলাম। এবং সকল কয়েদীদিগকে পরস্পরের দ্বারা তাহা জানাইলাম। এবং আরো কহিলাম যে, আমার ইঙ্গিত মত সকলে একযোগে বাহির হইতে চেষ্টা করিবে।

বড়দিনের সময় ডাক্তার সাহেব জেলখানায় আসেন নাই। জেইলারও আপন বন্ধু-বান্ধব লইয়া হুইস্কি ব্রাণ্ডির শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছে, এবং নানা আমোদ আহ্লাদ চলিতেছে। তিনি সুরায় মত্ত হইয়া ভিতরে একবার দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেইদিন প্রাতঃকালে সকলকেই সংবাদ দিয়া রাখিয়াছি। সেদিন ভিতরের কয়েদীগণকে অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই খাওয়াইয়াছে। কয়েদীগণের খাওয়া শেষ হওয়ার পর তাহারা জোড়ায় জোড়ায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসিয়াছে, এমন সময় বাগিচা হইতে কয়েদী সকল সদর দরজার ভিতর প্রবেশ করিল। দরজা-রক্ষক নায়ক তাহাদিগকে উলঙ্গ করিয়া সমস্ত তালাশ করিতে লাগিল। তাহারা বাগিচা হইতে কোদালি, কুড়ালি, গাঁতি, দা সকল আনিয়া সদর দরজার মাঝে পূর্ব্বেই জমা করিয়া রাখিয়াছিল। কয়েদীগণের তালাশী সমাপ্ত হইলে জেলের ভিতরকার ছোট দরজা খুলিয়া নায়ক একে একে কয়েদী সকলকে ভিতরে ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দিতে লাগিল। কয়েকজন ভিতরে গেলেই তাহাদের পাছের জনকে দরজারক্ষক নায়ক ধারণ করিল। সে তাহার সঙ্গে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিতেই আমি অমনি হুকুম দিলাম "ঠোয়ে" অর্থাৎ বাহির হও। তখন জেলখানার আঙ্গিনায় সমস্ত কয়েদী দরজা অভিমুখে ছুটিল, নায়ক দরজা বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু কয়েদীগণ ধাক্কা মারিয়া ক্রমে সদর দরজার মধ্যে ঢুকিল। আমিও সেই সঙ্গে ঢুকিয়াছে।

দুই তিন জন কয়েদী নায়ককে ঠাসিয়া ধরিয়া গাঁতি দ্বারা আঘাত করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। এদিকে ভিতরের পেয়াদা সাহেবদিগকে উন্মত্ত কয়েদীগণ পিটাইয়া সমস্ত যন্ত্রণার প্রতিশোধ তুলিল। এই সময় জেইলারকে পাইয়া খুব উত্তম মধ্যম প্রহার করিল। আমি একখানি গাঁতি লইয়া সজোরে বাহিরের দরজার তালায় আঘাত করিতে লাগিলাম। কয়েক ঘা মারিবামাত্রই তালা খুলিয়া পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন যে মজবুত তালা, তাহা কয়েক ঘা গাঁতির আঘাতে খুলিয়া পড়িয়া গেল। এই তালাগুলি কলিকাতা বি, দাসের প্রসিদ্ধ তালা, এক একটী তালার দাম ১২।১৪৲ টাকা। গাঁতির আঘাতে তালাটী খুলিবার দরকার ছিল না, কেন না নায়কের নিকটই চাবি ছিল, সে যখন পড়িয়া গিয়াছিল, তখন সেই চাবি দ্বারাই দরজা খোলা যাইত। কিন্তু তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ির মধ্যে সেটা আদবেই হুঁস ছিল না। কয়েদীগণ মার মার করিয়া কোদালি, কুড়ালি, খন্তা, গাঁতি,যে যাহা পাইল, সে তাহা লইয়াই বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকে আমরা হাল্লা করিয়া সদর দরজার ভিড়ে পড়িলে, উপর হইতে বিপদসূচক ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিল। জেলের পেয়াদাগণ, যাহারা স্নানাহার করিতে গিয়াছিল, তাহারা যে যেভাবে ছিল, লাঠি. লকড়ি, যে যাহা পাইল, তাহা হাতে করিয়াই জেল-অভিমুখে ছুটিল। নিকটবর্ত্তী মিলিটারি পুলিসের কেল্লা হইতে সেপাইগণ বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া দলে দলে জেলখানাভিমুখে ছুটিল। ডাক্তার সাহেব, ডেপুটী কমিশনার, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি সংবাদ পাইয়া আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া জেল-অভিমুখে ছুটিল। সেপাইগণ জেলখানার বাগিচার ও চতুপার্শ্বস্থ স্থান সকল ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

আমি হরিরাম শর্ম্মা প্রভৃতি কয়েক জন বর্ম্মা সর্ব্বাগ্রে বাহির হইয়া জেলখানার বাগিচার পার্শ্বের জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। সেপাইগণ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জঙ্গলের মধ্যস্থ এক নালা দিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া অনেক দূরে পৌঁছিলাম, তাহার ক্ষণেক পরেই সেপাইগণ আসিয়া সেই সকল জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিতে আরম্ভ করিল। এক মিনিট অগ্র পশ্চাতের জন্য আমরা বাঁচিয়া গেলাম। কয়েদীগণ চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। আমার বোধ হয়, সকলে সারিতে পারিয়াছিল না। অনেকে সম্ভবত পুনর্ব্বার ধৃত হইয়াছিল। বিশেষ বিবরণ আমাদিগের জানিবার সুযোগ ঘটিল না।

আমরা জঙ্গলের মধ্য দিয়া দ্রুত এক পাহাড়ের দিকে চলিলাম। অবশেষে এক নালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জঙ্গলের আড়ে আড়ে চলিতে চলিতে কয়েক মাইল চলিলাম। ক্রমে সাধ্য মত দৌড়িতে লাগিলাম। পায়ে বেড়ী, দ্রুত দৌড়িবার সাধ্য নাই। জেলার উপর যে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়াছে, তাহা অনেক দূর হইতে শুনা যাইতে লাগিল। অবশেষে জঙ্গলময় এক ক্ষুদ্র পাহাড়ে চড়িলাম, তাহা অতিক্রম করিয়া আবার নিম্নে নামিয়া আর এক নালার ধারে উপস্থিত হইলাম। তথায় পাথরের উপর বেড়ী রাখিয়া পাথরের দ্বারা আঘাত করিতে বেড়ীর জোড় খুলিয়া গেল। এইমত সকলের পায়ের বেড়ী খুলিয়া নালার জলে নিক্ষেপ করিয়া তাড়াতাড়ি বিজন বন দিয়া চলিলাম।

জেল ভাঙ্গিয়া আসিলাম বটে এবং বনমধ্য দিয়া চলিলাম সত্য, কিন্তু যাই কোথায়, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। গন্তব্য স্থানের ঠিক নাই, পথ ঘাটও জানা নাই, এখন যাই কোথায়? আমি যে দশজন সহ ধৃত হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে জেল হইতে বাহির হইয়া আমার সঙ্গে হরিরাম ও মংমহু নামক একজন আসিতে পারিয়াছে, আর সকলের দশা কি হইল, জানিতে পারিলাম না। আমরা মোট পাঁচজন লোক একসঙ্গে, অপর দুই জন অপরিচিত। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোথায় যাওয়া স্থির করিয়াছে? তাহারা বলিল "আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন", এই বলিয়া তাহারা অগ্রে অগ্রে পথ দর্শকরূপে চলিল এবং আমরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আমরা আবার এক জঙ্গলময় পাহাড়ে চড়িলাম এবং ক্রমে তাহা অতিক্রম করিয়া নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিলাম। পাহাড়ে চলিতে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, কারণ আমি সমতলের লোক, পাহাড়ে চড়া অভ্যাস নাই। বর্ম্মারা বেশ তাড়াতাড়ি পাহাড়ে চড়িতে পারে, আমি যেমন হাঁপাইয়া অস্থির হই, তাহারা তাদৃশ হয় না।

এই পাহাড় হইতে নামিয়া আর একটী পাহাড়ী নদী পার হইলাম। সেই নদীর জলের ডাক প্রায় তিন মাইল দূর হইতে শোনা গিয়াছিল। জলরাশি যেন পর্ব্বতগহ্বর হইতে বাহির হইয়া লাফাইয়া সক্রোধে নিম্নে পড়িয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ডের সঙ্গে তাল ঠুকে সগর্ব্বে গর্জ্জন করিতে করিতে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এ নদীতে জল অল্প হইলেও স্রোতের বেগ এত খরতর যে, তাহা পার হইবার কালীন প্রতিমুহূর্ত্তেও শঙ্কা হয়, পাছে বুঝি ঠেলিয়া ফেলিয়া ভাসাইয়া নিম্নে লইয়া গেল। অতিকষ্টে ও সাবধানে নদী পার হইয়া

আবার এক পাহাড়ে চড়িলাম। তাহার অপরপ্রান্তে নিম্নে একটী অসম উপত্যকা। সেই সমতল-ক্ষেত্রটী জঙ্গলপূর্ণ। এত ঘন বনজঙ্গল যে, তাহার মধ্য দিয়া বন্যজন্তুগণও সহজে চলিতে পারে না। সেই উপত্যকা অতিক্রম করিলাম, কিন্তু মনে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, যাই কোথায়? এই দুইটা অজানিত লোকের সঙ্গে এই গভীর বনমধ্যে চলিলাম. ইহাদের অভিপ্রায় কি? ইহারা শত্রু কি মিত্র?

উপত্যকাস্থ বন অতিক্রম করিতে দূর হইতে বোধ হইল পর্ব্বতগাত্র হইতে প্রকাণ্ড এক শৈল খণ্ড নিম্নগামী ও কতকটা অগ্রবর্ত্তী হইয়া যেন বন্য জন্তুগণের আশ্রয় দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেই প্রস্তর খণ্ড অনুমানে বোধ হইল যেন ত্রিশ হস্ত উচ্চ এবং পাঁচশত গজ দীর্ঘ হইবে। সেই পাথর খানার প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিতে করিতে তাহার নিম্নে ছায়ার মত বোধ হইল, যেন কয়েকটী বালক বালিকা দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেছে। তাহারা যেন দূরে আমাদিগকে দেখিয়া দৌড়িয়া ভিতরে পলাইল। আমি হরিরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কিছু দেখিয়াছে কিনা? সে বলিল যে "কই, আমিত কিছুই দেখতে পাই নাই"। আমি এই বিজন বন মধ্যে প্রস্তর খণ্ডের নিম্নে বালক বালিকা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তবে কি ধাঁধাঁ দেখিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি? মনে মনে নানা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মংমহুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল "ওসব দিকে খেয়াল করিবেন না, এই সকল পাহাড়ে অনেক ভূত প্রেত থাকে, এ ভূতের খেলা"—এই বলিয়া সে মনে মনে "কয়া কয়া" বলিতে লাগিল, যেমন আমাদের দেশে ভয়ে ভয়ে "রাম রাম" বলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অপর দুইজন লোক আমাদের কথায় কোন খেয়াল না করিয়া সেইদিকে চলিতে লাগিল।

আমরা ক্রমে সেই প্রকাণ্ড শৈলখণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইলাম। নিকটে গিয়া দেখি, তথায় জন মানবের চিহ্নও নাই। পাথরের নিম্নে একটা সুরঙ্গ। আমাদের সঙ্গের অপর বর্ম্মাদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম মংলে। অপরের নাম মংডিন। মংলে অগ্রগামী হইয়া সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিল এবং তাহার সঙ্গে মংডিনও নামিল। আমাদিগকেও তাহারা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে কহিল। আমরা সংকোচ চিত্তে তাহাদেব অনুবর্ত্তী হইলাম। নামিতে নামিতে কিছু দূর বক্র গতিতে যাইয়া নিম্নে এক সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত

হইলাম। সমতলটী অন্ধকারময়, তবে খুব গাঢ় আঁধার-যুক্ত নয়। মনে মনে শঙ্কা হইল, কোথায় চলিলাম, এ কি মহীরাবণের পাতালপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম? এই অন্ধকারময় আঙ্গিনা ছাড়িয়া আর এক প্রশস্ত ময়দানের এক ঢালু স্থানে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানে উপস্থিত হইলে মংলে "ঘামিয়া ঘামিয়া" বলিয়া দুইবার ডাক দিল। কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। অতঃপর তৃতীয়বার ডাকিলে ভিতর হইতে "ট" বলিয়া উত্তর করিল। বর্ম্মিনীদিগকে ডাকিলে সমকক্ষ বা সম্পর্কে নীচ ব্যক্তিকে 'ট' বলিয়া সম্বোধন করে, আর সম্মাননীয় ও পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে "শেন" বলিয়া সম্বোধন করে। তখন মংলে কহিল "দিগ লাবাও"। (অর্থাৎ এখানে এস) "মংচাউ বলে" (ভীত হইও না), তখন মধ্যম বয়সী একটী বর্ম্মিনী বাহির হইয়া আসিল। আমি এই পাতালপুরে বর্ম্মিনী দেখিয়া আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ঘামিয়াও মংলেকে দেখিয়া আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কারণ তাহার পাঁচ বৎসরের জেল হইয়াছিল, এত অল্পকালের মধ্যে সে কি করিয়া খালাশ হইয়া আসিল, সেই তাহার তাজ্জব। ঘামিয়া তাহার হঠাৎ পালানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সমস্ত ঘটনা বলিল এবং আমাকে তাহার স্ত্রীর নিকট ইণ্ট্রডিউস করিয়া দিয়া কহিল যে, ইনি বো-কালা, ইহার নাম তোমরা শুনিয়াছ যে ইনি স্তাগাদিন এবং শোয়েবোতে কত লড়াই করিয়া কালাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই প্রকার আমার প্রশংসা শত মুখে আপন গৃহিণীর নিকট প্রকাশ করিল, এবং আরো কহিল যে, ইহারই সাহস ও বুদ্ধি-কৌশলে আমি আজ জেল হইতে পলাইতে পারিয়াছি। ঘামিয়া তখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল।

আমাদিগকে এস্থান হইতে অপর এক স্থানে লইয়া গিয়া বসিবার জন্য একখানি ছেঁড়া মাদুর দিল। আমরা এত ক্লান্ত হইয়াছি যে, অমনি বসিয়া পড়িলাম। তখন আমাদিগকে দেখিবার জন্য ক্রমে লোক আসিয়া জমিল। তিন চারিটী যুবতী স্ত্রীলোক, চারি পাঁচটী বৃদ্ধা, দুই তিনটী যুবতী কুমারী এবং দশ বারটী ছেলে মেয়ে আসিয়া আমাদিগকে ঘেড়িয়া দাঁড়াইল। আমাকে দেখাইয়া নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল। অবশেষে একটী বৃদ্ধ ফুঙ্গি লাঠি ভর দিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। বর্ম্মারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ ফুঙ্গি "তাডু তাডু" "সাধু সাধু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মংলের সঙ্গে সকলের পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। আমি এই পাতাল-পুরীতে এত লোক দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আমরা সকলেই অনাহারে ও পথশ্রান্তিতে কাতর হইয়াছি, তাই আসিয়া তাড়াতাড়ি অবস্থানুসারে আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিল। আহারাদি সম্যক সম্পন্ন হইলে আমি মংলেকে এই পাতাল-পুরীর রহস্য ভেদ করিতে কহিলাম।

মংলে বলিতে লাগিল যে "আমাদের বাড়ী এখান হইতে ১২ মাইল দূরে, উওয়াদে নামক গ্রামে। কালারা রাজা থিবকে ধরিয়া লইয়া যাওয়ার পর ফুঙ্গি উ-নাওার এক পত্র আমাদিগের তুজীর নিকট আসিল। সেই পত্রের মর্ম্মানুযায়ী গ্রামবাসীগণ যুদ্ধ করা ও আত্ম রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে প্রস্তুত হইলাম। এবং আমরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া যেখানেই কালা সৈন্য দেখিতে পাইয়াছি, সেইখানেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়াছি।

কিছুদিন পরে কোন স্বদেশী শত্রু কালাদিগের পক্ষে ঘুঁস খাইয়া গুপ্তচরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমাদিগের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। এবং তাহা দ্বারাই আমাদিগের সর্ব্বনাশ হয়। আমরা আভাসে এই বিষয়ের একটু সংবাদ পাইয়া গ্রামের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিতে বাধ্য হই। কালাসৈন্য আসিয়া আমাদিগের গ্রাম অক্রামণ করিলে, আমরা যথাসাধ্য আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করি। শত্রু সৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ এবং তাহাদের বন্দুক অতি উৎকৃষ্ট থাকা বশতঃ আমরা আর অধিক কাল আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম না। আমাদিগের লোক লড়াইতে প্রাণ হারাইল, গ্রামের তুজী ও আর কতকগুলি লোক শত্রু হস্তে ধরা পড়িয়া জেলখানায় আবদ্ধ হইয়া গেলেন। আমরা কেহ কেহ পলাইয়া জঙ্গলে সরিয়া পড়িলাম। তথা হইতে আমার ও অপর পাঁচ জনের পরিবারদিগকে আনিয়া এখানে রাখি। কিন্তু অল্প দিন পরেই গুপ্তচরের গুপ্ত সংবাদে খোজ পাইয়া আমাকে পথিমধ্য হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। বিচারে আমার পাঁচ বৎসর জেল হয়। কালারা আমাদের গ্রামখানি লুটিয়া শেষে জ্বালাইয়া দিয়া যায়।"

"গ্রামের চাঁয়ের (বৌদ্ধ-ভিক্ষু আশ্রমের) ফুঙ্গিও আমাদের সঙ্গে পলাইয়া কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। আমার এক ভাই অপর পরিবারের চারিটী ছোকরাও রাত্রিকালে এখানে থাকে। তাহারা অতি প্রত্যুষে দূরের গ্রাম

সকলে গিয়া মজুরী করিয়া, কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহা দ্বারা চাউল ইত্যাদি খরিদ করিয়া আনিয়া সকলকে ভাত খাওয়ায়। ইহা ভিন্ন যাহার ঘরে যে সোণা রূপা বা রুবি পাথরাদি মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল, তাহাও মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত বিক্রয় করিয়া খাদ্যাদির কার্য্য চালায়।"

"এই স্থানের গুহ্য কথা পূর্ব্বে আমরা জানিতাম না। রাজার আমলে ডাকাইতগণ গোপনে আসিয়া এখানে বাস করিত। তাহাদের কোন ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া লড়াই করে। সেই ব্যক্তি গোপনে আমাদিগকে এই স্থানের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা ডাকাইতি করিত, তাহারা ও এখন কালাদিগের সঙ্গে লড়াই করিতেছে, সুতরাং আমাদের উপর তাহাদের সহানুভূতি থাকায়, উঁহারা আর আমাদের পরিবারবর্গের প্রতি কোন উৎপীড়ন করে না।"

"আমাদিগের গ্রামের আরো কয়েক জন লোক এই জেলে ছিল, এবং এখানে যাহাদের পরিবার আছে, তাহারাও জেলখানায় ছিল। তাহাদের কি দশা হইল, জানিতে পারিলাম না। আমাদিগের তুজিকে প্রধান ডাকু মনে করিয়া তাহাকে অন্য জেলে পাঠাইয়াছে।"

মংলের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, লোকটা যে একজন তেজিয়ান বীর পুরুষ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

যে সকল লোকের পরিবার এখানে আছে, তাহাদের কোন সংবাদ না জানিতে পারিয়া তাহাদের পরিবারবর্গ অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণ হইল।

আমাদের সঙ্গের অপর ভদ্রলোকটার নাম মংভিন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার বাড়ী কাথা জেলায় মৌলুর নিকট। তিনি মৌলু হইতে উল্লু যাইবার পথে ধৃত হন এবং তাহাকে ডাকু সন্দেহ করিয়া জেলে দিয়াছিল।

এই পাতালপুরীর সেই বৃদ্ধ ফুঙ্গিটীর সঙ্গে শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত ছোট একটী বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। তাহা তিনি পর্ব্বতগাত্রস্থ এক প্রস্তর খণ্ডের উপর এক-আসনে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তাহার সম্মুখে এক বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ সেই মূর্ত্তির সম্মুখে পূজা, মন্ত্র পাঠ ও ধ্যান ধারণাদি করিয়া থাকেন। এবং তাঁহার ভজনার সময় পাতালপুরীস্থ স্ত্রীলোকগুলি ভক্তি ভাবে আসিয়া প্রণাম করিয়া ফুঙ্গিকে অবস্থানুযায়ী অন্ন ব্যঞ্জনাদি

উপহার দিয়া থাকে। অতি প্রত্যূষে ও বেলা ১২ টার পূর্ব্বে, ফুঙ্গিদিগের দিনে এই দুইবার আহার করার নিয়ম। বারটার পর হইতে সমস্ত রাত্রি তাঁহারা মাত্র জল ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য আহার করিতে পারেন না।

ব্রহ্মদেশের ফুঙ্গিগুলি বড় আদুরে ছেলের মত, বর্ম্মারা যখনকার যে ভাল দ্রব্য, তাহা অগ্রে ফুঙ্গিদিগকে দিয়া পরে নিজেরা আহার করে। কিন্তু আমাদিগের এই ফুঙ্গি এই পাতালপুরে থাকিয়া আহারাদিতে কষ্ট পাইতেছেন। কিন্তু ধন্য তাঁহার স্বদেশভক্তি ও স্বদেশপ্রেম। তিনি এই বৃদ্ধকালেও এত কষ্টসহিষ্ণু হইয়া, আত্মবিসর্জ্জন দিয়া প্রজা সাধারণের দুঃখ ও কষ্টের ভাগী হইয়াও অটলভাবে আছেন। তিনি অনায়াসেই গোপনে কোন রাজভক্ত গ্রামের ফুঙ্গিচাঁয়ে গিয়া সুখে থাকিতে পারেন।

এই পাতালপুরীর ছাদ সেই প্রকাণ্ডশীলা খণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। সেই শীলা খণ্ডের শেষ অংশ যে স্থানে পর্ব্বতের গাত্রে সংলগ্ন হইয়াছে, তাহার পার্শ্ব দিয়া মাঝে মাঝে ছিদ্র দৃষ্ট হয়, এবং সেই ছিদ্র দিয়া পর্ব্বত গাত্র হইতে আলোক রশ্মি ভিতরে প্রবেশ করিয়া কতক স্থানের অন্ধকার দূর করে। বৃষ্টি হইলে সেই ছিদ্র সকল হইতে জল গড়াইয়া ভিতরের কোন কোন স্থানে পড়ে বটে, কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ থাকে না। গহ্বরের মেজে বালু ও কঙ্করময়, তাই তাহার মধ্যে বাসের সুবিধা। কর্দ্দমময় হইলে তাহা বাসের অনুপযুক্ত হইত।

এখানে একরাত্রি বাস করিয়া, গৃহস্বামিনীদিগের অতিথি সৎকারের জন্য ধন্যবাদ দিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলাম। মংলে ও তাহার পত্নী স্বামিয়া আমাকে কয়েক দিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল, আমি বলিলাম, এখানে থাকা নিরাপদ নহে। হঠাৎ ধরা পড়িতে পারি। তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া মংভিসের সঙ্গে সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম।

একচত্তারিংশ অধ্যায়।

মৌলুর যুদ্ধ—পুনর্ব্বার শত্রুহস্তে বন্দী।

পর্ব্বতগহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া মংমহু ও হরিরামকে পুনরায় উম্মু যাইতে আদেশ করিলাম। হরিরাম আপত্তি করিল, কিন্তু তাহার এ আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া জেদ করিয়া তাহাকে উম্মু পাঠাইলাম এবং কহিলাম, যাহাতে তোমাদের মা ও ভগ্নী সত্বর উম্মু পৌছে, তাহার চেষ্টা দেখ। আমি মউলু হইতে ফিরিয়া আসিয়া উম্মুতে তোমাদিগের সঙ্গে মিলিব। হরিরাম ও মংমহু আমার আদেশানুযায়ী উম্মুর দিকে যাত্রা করিল। আমি ও মংডিস মউলুর দিকে চলিতাম।

দিনের বেলায় শত্রুর ভয়ে চলিবার সাধ্য নাই, তাই দিনের বেলায় কোন পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া থাকিয়া, রাত্রিকালে চলিতে লাগিলাম। রাত্রিকাল ব্রহ্ম-দেশের জঙ্গলে বাঘ, ভালুক ও সাপের অত্যন্ত আশঙ্কা। আমরা অস্ত্রহীন। গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আত্মরক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করিতাম।

দিনের বেলায় বিশ্রামকালে মংডিসের নিকট কাথা জেলার হাল ও মউলুর অবস্থা ও মংজীর বিবরণ বিস্তারিতরূপে শুনিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন যে, "কালারা রাজাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার পর রাজ্যের নানা স্থানের লোক বিদ্রোহী হইয়া কালাদিগের সঙ্গে লড়াই করিতে লাগিল।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, মউলুর নিউক বা কালেক্টর মংজীকে বিদ্রোহীগণের পক্ষাবলম্বন না করিয়া, তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিতে পত্র লেখেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা হারাইয়া এবং স্বদেশের শত্রুতাচরণ করিয়া কালাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি পত্রে জবাব দিলেন যে, তিনি কখনও স্বদেশের শত্রুতা করিবেন না। স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন।

মংজীর অধীনে প্রায় এক হাজার বন্দুকধারী সৈন্য জমা হইয়াছিল। পরে ক্রমে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া জমিতে আরম্ভ করিল। কালা-সেপাইদিগের সঙ্গে কয়েকবার লড়াই করিয়া তাহাদিগকে পরাভব করিয়াছেন।

ইংরেজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অনেক টাকা ঘুষ দিতে প্রস্তাব করে এবং তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে অঙ্গীকার করে, কিন্তু তিনি তাহা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছেন।" এইরূপে নানা প্রকার গল্প মংডিসের মুখে শুনিলাম।

এইভাবে রাস্তায় গল্প শুনিতে শুনিতে তিন রাত্রি চলিয়া আমরা মউলুতে উপস্থিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া একদিন বিশ্রামের পর মংজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলাম। আমাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাবিয়া এবং আমাকে ইংরেজের গুপ্তচর মনে করিয়া,আমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিলেন। আমার বিশেষ পরিচয় দিয়া, মংডিসকে দৌত্য-কার্য্যে পাঠাইলাম। মংডিসের মুখে ইউজেলের কাণ্ডের কথা শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনিও আমার নাম শুনিয়াছেন, এখন আমাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মনে ঔৎসুক্য জন্মিল। তাঁহার প্রেরিত লোক আমাকে দুর্গমধ্যে লইয়া গেল। তথায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে সম্ভাষণ করার পর, উভয়েই আসন গ্রহণ করিলাম।

মংজী। আপনার নাম বহুদিন হইতে নানা লোকের মুখে শুনিতেছি। আপনার বুদ্ধি, যুদ্ধ-কৌশল ও সাহসের প্রশংসা সকলই করে। আমার সৌভাগ্যক্রমে দয়া করিয়া আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

আমি। না মহাশয়! আমার এমন কোন বিশেষ গুণ নাই যে, যাহা উল্লেখ-যোগ্য। তবে লোকে যে দয়া করিয়া আমার স্বপক্ষে নানা কথা বলে, সে তাহাদেরই মহত্ত্ব। আমিও বহুদিন হইতে আপনার প্রসিদ্ধ নাম শুনিয়া আসিতেছি, তাই আপনাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছি; আমার সৌভাগ্য যে, আজ আপনার মত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

মংজী। আপনার যে প্রকার অসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনি, তাহার কাছে আমার নাম উল্লেখযোগ্য নয়। আমি একজন সামান্য লোক, আর আপনি একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি। আমি শুনিয়াছি যে, আপনি ব্রহ্মদেশবাসী নহেন। আপনি একজন বিদেশীয় ভারতবাসী। আপনি ভারতবাসী হইয়া ব্রহ্মদেশবাসীগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে প্রকার প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, সে আপনার মহত্ত্ব। আমরা যে যুদ্ধ করিতেছি, সে নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। কালারা ফাঁকি দিয়া রাজাকে ধরিয়া লইয়া

আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। আমাদের জন্য আপনার এতটা করা আপনার বিশেষ মহত্ব। বর্ম্মারা ভারতবাসীকে কালা বলিয়া কত ঘৃণা করে।

আমি—হাঁ, তাহা সত্যবটে। ভারতবাসীতে ও ব্রহ্মবাসীতে আজকাল-কার ধর্ম্মে, আচার ব্যবহারে,পরণ-পরিচ্ছদে ও খাদ্যাদিতে এমন একটা পার্থক্য হইয়াছে যে, একে অন্যকে বিদেশী মনে করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যাঁহারা অতীত ইতিহাস জানেন, তাঁহারা দুই দেশী লোকে বড় পার্থক্য মনে করেন না। কারণ আমাদিগের সাহিত্য, আমাদিগের ধর্ম্ম, আমাদিগের ভাষা, আমাদিগের স্থাপত্যই আপনাদের দেশময়। এমন কি, আমাদিগের রক্তও আপনাদিগের রক্তের সঙ্গে বহু পরিমাণে মিশ্রিত রহিয়াছে। প্রাচীনকালে অনেক ক্ষত্রীয় রাজা ও ব্রাহ্মণগণ হয়তঃ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, না হয় শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আসিয়া এদেশে বাস করিয়াছিল। তাহার অনেক নিদর্শন ধর্ম্মমন্দিরের হিন্দু-স্থাপত্যের চিহ্ন, রাজা ও রাজকুমারদিগের হিন্দু নামের পরিচয়েই পাওয়া যায়। কেবল শিক্ষার অভাব, মূর্খতা, অলসতা ও ঔদাস্যতা বশতই একে অন্যকে চিনিতে পারিতেছে না। এই কারণই আসিয়াবাসী জীবগণ জাহান্নামে চলিল! কবেই বা আসিয়াবাসী জাগিবে, কবেই বা তাহাদের দুর্গতি দূর হইবে! হায়, কবে এই অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইবে! আপনার স্বদেশপ্রেম, স্বার্থত্যাগ, সাহস, ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা অতি প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। যদি যুদ্ধে পরাস্ত হন, তাহা হইলে কি করিবেন?

মংজী—যতদূর সাধ্য একবার লড়িয়া দেখিব। যদি যুদ্ধে হত হই, আর দলবল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে চীনদেশে গিয়া বাস করিব, তবুও কালাদিগের অধীনতা স্বীকার করিব না, বা আত্মসমর্পণ করিব না।

আমি—সাধু! ঠিক বলেছেন, একথাটা যেন আমারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি জানি, এরূপ দৃঢ় মন না হইলে কি এই প্রকার কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত হইতে পারে? আপনার মনটা বুঝিবার জন্যই এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমিও আজ প্রায় দুই বৎসরের অধিক কাল বহু সৈন্য ও সহযোগীগণ সহ অতিরিক্ত লড়াই করিয়াছি। আমার সুযোগ্য স্বদেশপ্রাণ সহযোগীগণের কেহ কেহ রণ-ক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছেন, কেহ শত্রু-হস্তে ধৃত হইয়াছেন। দলবল সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন মাত্র কয়েকজন

সহচর মাত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমিও আপনার যুদ্ধের ফলটা দেখিয়া এদেশ ছাড়িয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করি।

মংজী—আপনি যদি দয়া করিয়া আমার সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে বড়ই কৃতার্থ মনে করি। আপনার মহত্ত্বে আপ্যায়িত হইলাম, আপনার কথা শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল। আপনি যে কেবল একজন যোদ্ধা, তাহা নহে। আপনি একজন অতি সুপণ্ডিত লোক, আপনার কথাগুলি হৃদয়ে গাথা রহিল। যদি বাঁচি ও সুযোগ ঘটে, তবে আপনার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রাচীন ধরণের অশিক্ষিত লোক, আমাদের যে স্বাধীনতা রক্ষার জ্ঞান স্বাভাবিক। এইক্ষণ আপনার নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা যে, আমার এই বিপদকাল আমাকে সদুপদেশ দানে বাধিত করুন। আমি আজ প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াইয়ে যদিও জিতিয়াছি, কিন্তু শুনিতেছি, বহু কালা সৈন্য আমার বিরুদ্ধে আসিতেছে। এখন আত্মরক্ষার উপায় বলুন।

আমি—যাহা করিয়াছেন, তাহা ভালই করিয়াছেন। বরং না করিলেই অন্যায় হইত। ভাবনা কি, হয় জয়, না হয় পরাজয়, এরূপ যুদ্ধে মৃত্যু হইলেই পুণ্য আছে। লড়িতে থাকুন, যতদিন সাধ্য থাকে। আমার পরামর্শ ও নেতৃত্বে আপনার যে বিশেষ কোন ফল হইবে, তাহা বুঝি না। কারণ আপনি নিজে একজন বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ব্যক্তি, আপনি স্থানীয় লোক। লোকের হাল ও স্থানের অবস্থা আপনি যেমন জানেন, আমার পক্ষে ততদূর জানা সম্ভব নয়। আমি স্বয়ং আর লড়াই করিতে ইচ্ছা করি না, তবে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আপনার লড়াইয়ের প্রণালী ও তাহার ফলাফল দেখিবার ইচ্ছা। আমি যে সৈন্য লইয়া লড়াই করিয়াছি, সে সকল আমার তৈয়ারী লোক, তাহারা আমার কায়দা কৌশল জানিত এবং আমিও তাহাদিগেব গতিবিধি বুঝিতাম। আপনার সৈন্য সকল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহাদিগের যুদ্ধ প্রণালীও আমি জ্ঞাত নহি। তাহারাও আমাকে জানে না। এমতাবস্থায় আমার ইচ্ছা নাই যে এই স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।

মংজী। আমি একথায় নাচার, তবে আপনি দয়া করিয়া এখানে আসুন, আপনি সঙ্গে থাকিলেও অনেক বল পাইব।

আমি স্বীকার করিলাম।

মংজী তাঁহার ক্ষুদ্র মউলু সহরটী একটী কেল্লায় পরিণত করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে সেগুণ কাঠের খুঁটি পুতিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া মৃত্তিকার প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটী সুদৃঢ় করিয়াছেন। সেই কেল্লার দুইটী দরজা, তাহা অতি পুরু সেগুণ কাষ্ঠের তক্তা দ্বারা নির্ম্মিত। কুঠারাঘাতেও সহসা ঐ দরজা ভাঙ্গিবার সাধ্য নাই। মাঝে মাঝে শান্ত্রী পাহারাদিগের জন্য প্রাচীর-গাত্রে উচ্চ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীর-গাত্র হইতে বন্দুক চালাইবার জন্য ফুকর রাখিয়া বেশ ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুর্গ প্রাচীর পনর হাত উচ্চ এবং প্রায় দশহাত প্রশস্ত।

গ্রামবাসী স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধগণের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ সকলের ব্যবস্থা আছে। সহরের ও চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র পল্লী সকলের লোক, যাহারা মংজীর পক্ষ-সমর্থন করিতেছে, তাহাদের পরিবার সকল এই দুর্গমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে।

যুদ্ধকালে শত্রুর গোলা গুলিতে এই সকল লোকের সহসা কোন অনিষ্ট না হইতে পারে, সেইজন্য, উন্নতস্থানের নিম্নে গহ্বর ও পরিখা সকল খোদিত হইয়াছে। সেই গহ্বর হইতে একটী প্রশস্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়া দুর্গের বাহিরে, দূরে জঙ্গলের মধ্যস্থ গর্ত্তময় একস্থানে বাহির হইয়াছে। তাহার মুখে ডাল-পালা দিয়া এমনভাবে ঢাকা যে, সহজে তাহার ছিদ্র কাহারো চক্ষে পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

যুদ্ধে আহত হইলে আহতদিগের রাখিবার জন্য একটী সুন্দর গৃহ রাখিয়াছেন এবং দুইজন বর্ম্মা-চিকিৎসকও তাঁহার সৈন্যদলে দেখিতে পাইলাম। মংজী আমাকে লইয়া দুর্গস্থ সমস্ত স্থান দেখাইলেন। লোকের মূল্যবান দ্রব্যাদি, টাকাকড়ি, সোণা, রূপা, রুবি ইত্যাদি সমস্ত মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মংজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "আমার সমস্ত আপনাকে দেখাইলাম, আমি দুর্গ রক্ষা করিতে সমর্থ হইব কি না? এবং আমার দুর্গ রক্ষা-প্রণালীর কোন দোষ থাকিলে তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিলে বাধিত হইব।"

আমি বলিলাম যে "শত্রু-সৈন্যের বন্দুক আপনার সৈন্যের বন্দুক অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, আপনার সৈন্যাপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিলে, আপনার দুর্গ শত্রুগণ দখল করিতে পারিবে না। শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা অধিক

হইলে এবং শত্রু যদি তোপ লইয়া আপনার দুর্গ আক্রমণ করে, তাহা হইলে দুর্গ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না।”

আমার কথায় তাঁহার মুখটী কিছু মলিন হইল, কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে,তাঁহার দুর্গ অজেয়। ব্রহ্মদেশী লোকের,বিশেষত পাড়াগাঁয়ের লোকের, বর্ত্তমান কালে যে নূতন ধরণে অস্ত্র সকল আবিষ্কৃত হইতেছে এবং নূতন প্রণালীতে যুদ্ধশিক্ষা করিতেছে, সে জ্ঞান মাত্রই নাই। শত্রু পক্ষের সৈন্য-বল ও যুদ্ধ করিবার শক্তি ইহারা জানিতেও চেষ্টা করে না।

আমি তাঁহাকে কহিলাম যে, আপনি অগ্রে দুইজন গুপ্তচর পাঠাইয়া শত্রু সৈন্যের সংখ্যা, তাহারা তোপ লইয়া আসিবে কিনা, এবং কবে কোন্‌দিন তাহারা আপনাকে আক্রমণ করিতে সংকল্প করিয়াছে, তাহা জানুন। পরে যে প্রণালীতে সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা আমি বলিব। তিনি আমার কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া কহিলেন, বেশ কথা। এই বলিয়া দুইজন যুবককে অশ্বারোহণে এই সংবাদ জানিবার জন্য পাঠাইলেন।

পরদিন একজন ফুঙ্গী ও দুইটী ফুঙ্গি-শিষ্য কেল্লার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফুঙ্গির বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। শির মুণ্ডিত, পরিধানে গৈরিক বসন, হাতে একখানি বড় তালবৃন্ত। ফুঙ্গিগণ ছাতা ব্যবহার করে না। ছাতার পরিবর্ত্তে এই তালবৃন্ত দ্বারা রৌদ্র হইতে দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন। পায়ে ফানা, বড় একখানি গৈরিক বসনের আবরণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। বালক দুইটীর স্বাভাবিক বর্ম্মাদিগের ছেলেপিলেব মত পোষাক পরা। তাহাকে এক জনের হাতে একটী মৃণ্ময় ভিক্ষা পাত্র ও কাপড়ের বোস্কা, অপরের হাতে একটী গ্রন্থের বস্থানি এবং ভোজন ও জলপানের পাত্র।

ফুঙ্গি কেল্লার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বাররক্ষককে দুর্গাধিপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অভিলাস জানাইল। দ্বাররক্ষক মংজী মহাশয়কে ফুঙ্গির সংবাদ দিল। মংজী ফুঙ্গিকে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন।

ফুঙ্গি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মদেশী প্রথানুসারে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এবং ফুঙ্গিও “তাডু তাডু” বলিয়া তাঁহাকে আশার্ব্বাদ করিল। মংজী জিজ্ঞাসা করিলেন্ যে, আপনার কোথা হইতে আগমন হইল? কোন আশ্রমে থাকা হয় এবং এখানে এই বিপদ-সঙ্কুল স্থানে আসিবার কারণ কি?

ফুঙ্গি কহিল যে,বৎস চিরজীবী হও,বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হও। আমি

কাথার নিকট মঙ্গালা-চাউয়ে থাকি। সম্প্রতি কালারা আসিয়া বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। আমাদিগের সমস্ত চাঁউ ও জিরাট (পথিকাশ্রম) কালা-সৈন্যগণ জোর করিয়া দখল করিয়াছে এবং ফুঙ্গিদিগের প্রতি নানা প্রকার অপমান-সূচক ব্যবহার করিতেছে। প্রত্যহ আমাদিগের চাঁয়ের ভিতর কত মুরগী, ছাগল ও গরু হত্যা করিতেছে। এই সকল অত্যাচার সহ্য করা ও প্রত্যহ জীবহত্যা স্বচক্ষে দর্শন করা বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই বৎস! তোমার নাম শুনিয়া, তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি। তুমি যদি আশ্রয় দেও, তবে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, তাহা না হইলে এ অঞ্চলে আর ধর্ম্ম থাকিবে না।" ফুঙ্গির হাতে মালা, তাহা টপ্ টপ্ করিয়া জপ করিতেছে এবং এই সকল কথা বলিতেছে এবং অবসরমত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নজর করিতেছে।

মংজী। কয়া (দেব)! আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থায় বাস করিতেছি, তাহা আপনার অজানা নাই। প্রতিদিন শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষায় আমরা অতি সশঙ্কভাবে দিন যাপন করিতেছি। আমাদের এখানে থাকিলে প্রভুর অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। তা যদি সেই কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদিগের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যুদ্ধে যদি জিতিতে পারি, তাহা হইলে কালাদিগকে তাড়াইয়া আপনার চাঁওকে পুনরায় আপনার হস্তে সমর্পণ করিব। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয় হইলে আপনাকে আমরা রক্ষা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ।

ফুঙ্গি। তাড়ু! তাড়ু! তা তোমার অসাধ্য হইলে আর কি? তখন তোমাদিগেরও যে দশা হইবে, আমারও সেই দশা হইবে। তবে এখানেই থাকি।

এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর মংজী ফুঙ্গির বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। তখন আমি ফুঙ্গির মুখের কোণে ঈষৎ হাসির চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম। সেই হাসিটুকুর ভাব যেন সরলতাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল না। তাহা আমার নিকট দুষ্ট হাসি বলিয়া বোধ হইল। আর ফুঙ্গির সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সৈন্যগণের উপর, দুর্গের চতুর্দ্দিকে, তাহাতে আমার বোধ হইল যেন সে এক এক করিয়া কেল্লার সমস্ত বিষয়গুলি যেন মনে মনে অধ্যয়ন করিতেছে। ফুঙ্গির উপর আমার সন্দেহ জন্মিল। আমি দুর্গপতি মংজীকে গোপনে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া আমার মনের সন্দেহের কথা বলিলাম। তাহাতে

তিনি কহিলেন যে "না, আমার এ ফুঙ্গির উপর কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই কাথার নিকট চাঁউ ও জিরাটগুলি কালারা অধিকার করিয়া ফুঙ্গিদের বড়কষ্টে ফেলিয়াছে। এ কথা আমি পূর্ব্বেও শুনিয়াছি, আমি বলিলাম যে, ইহার চক্ষের ভাব দুষ্ট চেহারা-ব্যঞ্জক, টপ টপ করিয়া যে মালা জপিতেছে, সে বাহ্যিক, কিন্তু ইহার চক্ষু কেল্লার কোন্ স্থানে কি আছে, তাহা ঠিক করা। আপনি ইহাকে বিশ্বাস করিয়া কেল্লার কোন গোপনীয় স্থান দেখাইবেন না, কিম্বা আত্মরক্ষার বন্দোবস্তের বিষয় কিছুই জানাইবেন না। পুনঃপুনঃ জেদ করায় তাঁহার অন্তঃকরণ যেন একটু নরম হইল, তিনিও কিছু সন্দিহান হইলেন। যদি তাঁহার সন্দেহ অমূলক হয়, তাহা হইলে লজ্জা পাইবেন, ইহা মনে করিয়া, অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারিকে প্রকারান্তরে ফুঙ্গির আসবাব-পত্র দেখিতে করিলেন।

কর্ম্মচারীটী ফুঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গে কি কি গ্রন্থ আছে, কোন নূতন গ্রন্থ আছে কি ?" তাহাতে ফুঙ্গি কহিল যে "না না বাবা, প্রাচীন কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে মাত্র।" কর্ম্মচারিটী দেখি দেখি বলিয়া বস্তানি খুলিবার চেষ্টা পাইলে, ফুঙ্গি তাহাতে আপত্তি করিল, কিন্তু বড় বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। কর্ম্মচারিটী বস্তানি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে তালপাতার লেখা কয়েকখানি গ্রন্থ এবং তুলট কাগজে লেখা লম্বা উপর নীচে কাটের মলাট দ্বারা বাঁধা, দুই তিনখানি গ্রন্থ বাহির করিল। এই গ্রন্থগুলিও আমাদের দেশের সাবেকী ধরণের ধর্ম্মগ্রন্থ গুলির মত। সেই গ্রন্থগুলি খুলিয়া দেখিয়া মংজী যেন অমূলক সন্দেহ করিয়াছেন বলিয়া কিছু লজ্জিত হইলেন।

সেই গ্রন্থগুলির একখানির ভিতর একখানি বিদেশী কাগজের লেপাফা আমার নজরে পড়িল। আমি কৌতুহল-বিশিষ্ট হইয়া, লেপাফাখানা টান দিয়া লওয়ায় ফুঙ্গি আমার হস্ত চাপিয়া ধরিল এবং তাহা লইতে আপত্তি করিল। আমি ফুঙ্গির হাত হইতে জোরে লেপাফাখানা টান দিয়া লইয়া তাহার ভিতরের কাগজখানা বাহির করিলাম। তাহা ইংরেজী ভাষায় লেখা। আমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িলাম। সেই দলিলের নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

To Alla Bakash alias Mg. Goya Interpreter.

You are hereby appointed as a Sub-Inspector in the detective department on a salary of Rs 100/ per mensem with

prospect of promotion and reward for good service. You are directed to report yourself to the Battalion command and to the Katha Battalion for duty.

Mandaly. W. G. Cumming

Inspector-General of Police.

কাগজখানি পড়িয়া আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা দৃঢ় হইল। মংজীকে গোপনে সেই কাগজের মর্ম্ম অবগত করাইলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, "এই লোকটার বাড়ী খুব সম্ভব লোয়ার বর্ম্মায়, এ জাতিতে মুসলমান, জোরবাদী, দোভাষীর কার্য্য করিত, এখন গুপ্তচরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। এ কখনই বর্ম্মা নহে। এ মাত্র ছদ্মবেশী ফুঙ্গি।"

ফুঙ্গি মনে করিয়াছিল যে, এই পাড়াগায়ে জঙ্গলি বর্ম্মাদিগের মধ্যে ইংরাজী কেহই জানে না যে, তাহার গুহ্যকথাও প্রকাশ পাইবে না। আমাকে কাগজখানা মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতে দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, কিন্তু লোকটা ভারি সয়তান, বাহ্যিক এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যে, সে কিছুই যেন জানে না। মংজী যখন ফুঙ্গির কাগজের মর্ম্ম সকলকে অবগত করাইলেন, তখন ফুঙ্গি যেন নির্দ্দোষী গো বেচারা কিছুই জানে না, বর্ম্মাদিগের নানারূপ শপথ করিয়া মংজীর সাক্ষী যে অমূলক, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তুমি এই কাগজ কোথায় পাইলে? তাহাতে সে উত্তর করিল যে "আমার চাঁওয়ে কালারা থাকে, সেই চাঁয়ের ভিতর এই লেপাফাখানা পড়িয়াছিল, দেখিতে পাইয়া কুড়াইয়া তুলিয়া রাখিয়াছি। আমি ইংরেজী জানিনা, ইহার মর্ম্ম কি, তাহাও বুঝি না।"

তাহার প্রতি অযথা সন্দেহ করায় সে দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল, তাহার এই জবাবটী যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া কেহ কেহ তাহার কথা বিশ্বাস করিল,কেহ অবিশ্বাস করিল। আবার সকলে সন্দেহে পতিত হইল। তখন আমি মংজীকে গোপনে কহিলাম যে,"এ জোরবাদী মুসলমান কি বর্ম্মা, তাহার প্রমাণ অনায়াসেই করা যাইতে পারে। আপনি শূকরের মাংসযুক্ত কিছু খাদ্য আনাইয়া ফুঙ্গিকে খাইতে দিন, সে যদি শূকরের মাংস খায়, তাহা হইলে আমার সকল সন্দেহ অমূলক বলিয়া গণ্য করিবেন। কিন্তু তাহা যদি না খায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মুসলমান।

মংজী আমার কথা ঠিক শুনিয়া ফুঙ্গির খাদ্যের আয়োজন করিলেন। তাহাকে আহার করিয়া সুস্থ হইতে অনুরোধ করা হইল। ফুঙ্গি কহিল যে, আজ কয়েকদিন হইল তাহার পেটে অজীর্ণ রোগ হইয়াছে, সে আহার করিতে পারে না। আহারে তাহার অরুচি। এখন সে কিছুই খাইবে না। যখন প্রয়োজন হইবে, তখন চাহিয়া খাইল। তাহাকে মংজী কহিলেন যে, আচ্ছা অন্যান্য খাদ্য না খাইলে,মাত্র এক টুকরা মাংস খাও,সে কিছুই খাইবে না বলিয়া আপত্তি করিতে লাগিল। তখন একজন লোক এক টুকরা মাংস তাহার মুখের মধ্যে জোর করিয়া খুসিয়া দেওয়া মাত্র সে ঘৃণায় বমি করিয়া ফেলিল, এবং অনবরত থুথু ফেলিতে আরম্ভ করিল। তাহার ব্যবহারে মংজীর মনের ধোকা দূর হইল। জাল ফুঙ্গি ধরা পড়িল।

মংজী ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বাঁধিবার আদেশ দিলেন এবং কহিলেন যে, সে যদি এখনও সত্যকথা বলে, তাহা হইলে তাহার প্রাণ নাশ করিবেন না, কিন্তু সে কিছুতেই সত্যকথা বলিতে রাজি হইল না। তখন তাহাকে নানা যন্ত্রণা দিতে আদেশ করিলেন। ব্রহ্মদেশীয় রীতি অনুসারে নানা নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিল। বালক দুইটি নির্দ্দোষী, তাহাদিগকে বেতন দিয়া আনিয়াছে, তাহাদিগকেও আপাততঃ কয়েদ রাখা হইল। আল্লাবক্স্ যন্ত্রণায়, ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে স্বীকার করিল যে, সে ফুঙ্গি নহে, মুসলমান, তাহার বাড়ী হেনজাদা জেলায়। সে দোভাষীর কার্য্য করে। ইত্যাদি। তাহার বর্ম্মা নাম মংগয়া।

অতঃপর মংজী তাহাকে আর যন্ত্রণা দিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু শৃঙ্খলা-বদ্ধ করিয়া তাহাকে দুর্গের কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল।

দুইদিন পরে আমাদিগের গুপ্তচর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া কহিল যে "আটশত সেপাইকে মউলু আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করা হইয়াছে। কিন্তু কবে কোন্ সময়ে তাহারা যাত্রা করিবে, তাহা এখনও প্রকাশ নাই। কোন তোপ আসিবে কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। দুইজন ইংরেজ কাপ্তানের অধীনে সেপাইগণ আসিবে, একথা তাহারা শুনিয়াছে।

চরদ্বয়কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমরা কেমন করিয়া কি ভাবে এই সংবাদ জানিতে পারিলে? কালাদিগের কথা যে সত্য, তাহা কি করিয়া বিশ্বাস করিব? যুবক দুইটীর একজনের নাম মংলুগলে, আর একজনের

নাম মং মং। মং মং কহিল যে, কালাদিগের কেল্লার ভিতর কোন অপরিচিত বর্ম্মার যাইবার সাধ্য নাই। আমরা ছদ্মবেশে কালাদিগের সঙ্গে মিশিব, তাহাও সহসা সম্ভব হয় না। কারণ আমাদিগের চেহারায় ও কালাদিগের চেহারায় অনেক পার্থক্য। বিশেষত আমাদিগের গাত্রে টাটুমার্ক থাকার দরুণ সহজেই আমরা ধরা পরিতে পারি। সেইজন্য কাথার চারি মাইল দূরে কোন পরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হই, তথায় মংলুগলেকে ঘোড়া সহ রাখিয়া আমি স্ত্রীলোক বেশ ধারণ করিয়া এক তরকারির দোকান সাজাইয়া, মুখে তালাথা লেপিয়া, গলায় রুমাল ঝুলাইয়া, তরকারির ঝাড় মাথায় করিয়া কাথার বাজারে গিয়া দোকান খুলিয়া বসিলাম। আমার আশে পাশে কয়েকটী সুন্দরী যুবতীর দোকান। সেপাই কালা ও বাবু কালারা বাজারে আসিয়া সুন্দরী ছুকরিদিগের দোকানে জিনিষ খরিদ কারবার ভান করিয়া তাহাদের সঙ্গে নানা ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। কোন কোন কথা প্রসঙ্গে সেপাই কালারা মউলুর ডাকু ধরিবার জন্য যাইবে, কতলোক যাইবে, এই সকল আলাপ করিতে লাগিল। আমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলাম। তাহারা আরো বলিল যে, মাণ্ডালে হইতে আরো অনেক সেপাহ কাথায় শীঘ্রই আসিবে। দুই এক দিনের মধ্যেই যে তাহারা মউলুর দিকে আসিবে, তাহাও কহিল।

যদিও ইহা বাজারের গল্প,তবুও ইহাদের কথায় অনেক আভাস পাওয়া গেল। মাণ্ডালে হইতে যে আরো অনেক সৈন্য কাথায় পৌঁছিবে, তাহাও জানা গেল।

আমি যে জাল ফুঙ্গির রহস্য ভেদ করিয়াছিলাম, তাহাতে মংজী আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন যে, ধন্য আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আপনি না থাকিলে না জানি এই কালা সয়তান আমাকে কি বিপদে ফেলিত! আমি বলিলাম, আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা তাক্ষ্ণ দৃষ্টি কিছুই নাই, তবে আমি অনেক স্থলে ঠেকিয়া এই সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

গুপ্ত চরের সংবাদে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। আমি মংজীকে কহিলাম যে, আপনি দুর্গ হইতে প্রত্যহ ক্ষুদ্র কয়েকদল অশ্বারোহী সৈন্য বাহিরে যাইতে আদেশ করুন, কারণ তাহারা জঙ্গল পথ পর্য্যটন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া শত্রুর গতিবিধি এবং গ্রামবাসীদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকুক।

শত্রু সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইলে তাহারা সর্ব্বাগ্রে আসিয়া এখানে সংবাদ দিবে। তাহা না হইলে হঠাৎ শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইবে। তিনি সেই অনুসারে অশ্বারোহী সৈন্য বাহিরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

কাথা হইতে মউলু যাইতে বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া প্রধান একটী পথ মাত্র। অপর এক পথ মউলু হইতে উন্মুর দিকে। দুর্গস্বামীর প্রধান লক্ষ্য কাথার পথের দিকে। তাঁহার প্রধান ধারণা যে, সেই পথ ভিন্ন শত্রু অপর পথে আসিবে না। আমি তাঁহাকে সে ভ্রম দর্শাইয়া কহিলাম যে, "উন্মুর পথের দিকেও তাঁহার লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য, কেন না এক দল শত্রু সৈন্য অনেক ঘুরিয়া সেই পথ দিয়া আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। তাঁহাকে আরো কহিলাম যে, আপনার দুর্গের পশ্চাৎদিকেও নজর রাখা কর্ত্তব্য।" তাহাতে তিনি কহিলেন যে, পশ্চাৎদিক দিয়া কালা সৈন্য আসিতে পারিবে না, কারণ পশ্চাতে খাল, নালা, পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ। কালা সৈন্য বুট পায়ে দিয়া সে সকল পাহাড়ে সহজে চড়িতে এবং তাহাদের পোষাক পরিয়া খাল নালা পার হইতে পারিবে না।"

আমি তাঁহাকে কহিলাম যে, "সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের অসাধ্য কার্য্য নাই। তাহাদের সঙ্গে যদি গুর্খা সৈন্য থাকে, তাহা হইলে, তাহারা বাঁদরের মত লাফাইয়া পাহাড়ে চড়িবে। বিশেষত তাহাদের সঙ্গে স্যাপার নামক এক দল সৈন্য থাকে। দুরারোহ স্থানে সকল সৈন্য যাইবার অগ্রেই তাহারা যায়, তাহারা পথ পরিষ্কার করিয়া খাল নালার উপর বাঁশ ও কাঠ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতু বাঁধিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকে। আমার এ সকল দেখা শুনা আছে, তাই বলিতেছি।" তিনি কহিলেন যে, "বর্ম্মা সৈন্য বন জঙ্গল দিয়া আসিতে পারে, কালা সৈন্য কখনই এ পথে আসিবে না। এ পথ এক প্রকার নিরাপদ। তবে উন্মুর পথের দিকে দৃষ্টি রাখিব।" মংজীর এই অদূরদর্শীতায় আমি দুঃখিত হইলাম, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আসিয়াবাসীগণ সাহসী ও যোদ্ধা হইলেও যুদ্ধকৌশল আদবেই জানে না। তাই ইউরোপীয় জাতি সকলের সঙ্গে যত লড়াই হয়, তাহার প্রায় কোন যুদ্ধেই তাহারা জিতিতে পারে না। একজন ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন যে—কোন যুদ্ধেই আসিয়াবাসী পশ্চাৎদিক রক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করে না। তাহার ফলে ইউরোপীয় সৈন্য পশ্চাৎ দিক দিয়াই আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করে। গত শতাব্দীতে চীনদেশে ও ইণ্ড-চ্যায়নায় ফরাসী ও চীনা-

দিগের সঙ্গে যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে এই কথার সত্যতাই প্রমাণ করিতেছে।

শত্রু কর্ত্তৃক দুর্গ আক্রমণ।

তৃতীয় দিবস অতি প্রত্যুষে মউলুর দুর্গ হইতে কয়েক মাইল দূরে ২০।২৫ ব্যাং ব্যাং করিয়া বহুতর শব্দ হইল। ক্ষণকাল পরেই একজন শোয়ার দ্রুত আসিয়া সংবাদ দিল যে, শত্রু সৈন্য আসিতেছে, এবং তাহারা আমাদের লোকের উপর গুলি ছাড়িয়াছে। তখন দুর্গপতি মংজী বিপদসূচক ঘণ্টা বাজাইলেন। সৈন্যগণ যে যেখানে যে ভাবে ছিল, দৌড়িয়া আসিয়া আপন আপন স্থানে হাজির হইল। সকলে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। আমি মংজীকে কহিলাম যে,আপনার সৈন্যদিগকে আদেশ করুন যে,"শত্রু সৈন্য দূরে থাকিতে যেন তাহারা অনর্থক এলোমেলো ভাবে বন্দুক ফায়ার না করে। আপনাদের বন্দুকের পাল্লার ভিতর যখন শত্রু সৈন্য পৌঁছিবে,তখন এককালে আড়াই শত করিয়া বন্দুকের ওয়ালি করিতে আদেশ করুন, যে দল ওয়ালি করিবে, তাহারা হটিয়া বন্দুক পূরিতে থাকিবে, অপর এক দল তৎক্ষণাৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া ওয়ালী করিবে। এইমত পাঁচশত বন্দুক প্রস্তুত থাকিবে এবং পালামত অগ্রসর হইয়া ফায়ার করিবে। তাহা হইলে শত্রুর গুলিতেও এপক্ষের ক্ষতি অনেক কম হওয়া সম্ভব। অপর সৈন্য দুর্গের অপর দিক রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে।" আমার কথামতই কার্য্যের আদেশ হইল।

শত্রু-সৈন্য মেদিনী কাঁপাইয়া সগর্ব্বে কেল্লাভিমুখে আসিতে লাগিল। আমাদিগের দুর্গের সমস্ত সৈন্য নিস্তব্ধভাবে মৃতের মত পড়িয়া রহিল। শত্রু-সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী দল যুদ্ধের ধরণে সাবধান হইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাই তাহারা পাল্লার মধ্যে পৌঁছিল, এমন বোধ হইল, অমনি মংজী শীশ দিবার মত বাঁশী বাজাইয়া ইঙ্গিত করিলেন এবং একদমে আড়াই শত গুলির ঝাঁক শত্রুর মাঝে পড়িয়া অনেক লোককে হতাহত করিল। শত্রুপক্ষ হইতে এক ওয়ালীর গুলি আসিয়া দুর্গের কাঠের খুঁটিতে লাগিয়া ফট্ ফট্ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। দুর্গস্থ কাহারো কোন ক্ষতি এই গুলিদ্বারা হইল না। ডুলি বেহারাগণ আসিয়া, হতাহতদিগকে কুড়াইয়া লইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আর এক ঝাঁক গুলি গিয়া শত্রুমাঝে পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দুর্গোপরি শত্রুর গুলি পড়িয়া এবার কয়েকজন লোককে সামান্য আহত

করিল। শক্র-সৈন্য মুক্তস্থানে, কেল্লার গুলিতে তাহাদের অনেক ক্ষতি হইল দেখিয়া তাহাদের হটিবার জন্য বিগল বাজিল। সেপাইগণ হটিল। দুর্গস্থ মগ-সৈন্যগণ উল্লাসে জয়োধ্বনি করিয়া উঠিল।

শক্র পক্ষ হটিয়া অনেক দূরে গেল বোধ হইল। তাহাদের আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। দুর্গপতি মংজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলন যে, "শক্র যখন হটিল, তখন তাহাদিগকে তাড়াইয়া আরও কিছু দূরে লইয়া যাওয়া কি মন্দ নয়?" তখন আমি কহিলাম যে, "সে খুব ভাল কথা বটে, তাহা করাও যুদ্ধের নিয়ম, কিন্তু সম্প্রতি নির্ণয় করা উচিত, বিপক্ষের সৈন্যগণ কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছে? তাহা না হইলে, ইংরেজ সৈন্য যদি পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করে, এবং সেই সময়ে আপনি যদি সৈন্য লইয়া বাহিরে থাকেন, তাহা হইলে দুর্গের অবস্থাও আপনার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবে। সেইজন্য বলি,আগে দুই জন অশ্বারোহী সৈন্যকে বাহিরে পাঠাইয়া শক্র সৈন্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করুন।" মংজী তাহাতেই সম্মত হইলেন, বলিলেন যে, বেশ কথা।

দুইজন অশ্বারোহী কেল্লার বাহিরে গমন করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা বাদ তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, বিপক্ষের সৈন্য এখান হইতে প্রায় পাচ মাইল দূরে তাম্বু ফেলিয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহাকে, শক্রকে আক্রমণ করিয়া একটু ব্যতিব্যস্ত করিবার পরামর্শ দিলাম। তিনি পাঁচশত বন্দুক ও কিছু অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া, স্বয়ং দুর্গ হইতে বাহির হইলেন। দুর্গরক্ষার ভার তাঁহার অধীনস্থ একজন সুদক্ষ কর্ম্ম-চারীর প্রতি অর্পিত হইল। আমিও অশ্বারোহণে তাঁহার যুদ্ধ দেখিবার জন্য গমন করিলাম।

বিপক্ষ সৈন্য এক পাহাড়ের নীচে একটী নালার ধারে অবস্থিতি করি-তেছে। মংজী আপন সৈন্য সকল জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের আড়ালে সমাবেশ করিয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ জঙ্গল হইতে ওয়ালি হওয়ায় বিপক্ষ সৈন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাম্বু সকল ভাঙ্গিতে লাগিল, এবং মগ সৈন্যের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গুলিতে মংজীর সৈন্যের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিল না। বরং মংজীর সৈন্যের গুলিতে তাহাদের লোক সকল হটিতে লাগিল। কালা সৈন্য ডাকুর সংখ্যাধিক্য মনে করিয়া ক্রমে বন্দুক ফায়ার করিতে করিতে হটিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে বোধ হইল যেন তাহারা অনিচ্ছার সঙ্গে মংজীর ফায়ারের

প্রত্যুত্তর দিতেছে। তাহারা মনোযোগ দিয়া যুদ্ধ করিতেছে, এমন বোধ হইল না। এইরূপে কালাসৈন্যকে চারি পাঁচ মাইল হটাইয়া, মংজীর সৈন্যগণ যুদ্ধ জয় করিয়াছে মনে করিয়া, আনন্দে অধীর হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে দুর্গাভিমুখে ফিরিতে লাগিল।

দুর্গে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল। কালাদিগের যুদ্ধে অকর্ম্মণ্যতা ও নিজেদের বীরত্ব মনে করিয়া মগসৈন্য-মহলে কত বৃথা আস্ফালন আরম্ভ হইল। মংজী নিজেও গর্ব্বে স্ফীত হইলেন। তাঁহাকে আমি কহিলাম যে, "আপনার দুর্গমধ্যে যে এত জয়োল্লাস হইতেছে, তাহাতে কিন্তু আমার চিত্তে বিন্দুমাত্রও হর্ষ উপস্থিত হইতেছে না। তাহার কারণ, কালাসৈন্য দুর্গের প্রকৃত অবস্থা অজ্ঞাতবিধায়, তাহারা অল্প সৈন্য লইয়া আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের গুপ্তচর ধরা পড়ায়, তাহারা এ কেল্লার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, একটা বস্তির লোকে আর কি যুদ্ধ করিবে? ইংরেজ-সৈন্য কাথা হইতে আরো সৈন্য এবং আমার খুব বোধ হইতেছে যে, তোপের অপেক্ষায় আছে। আরো সৈন্য ও তোপ আসিয়া পৌঁছিলে, তাহারা যে আক্রমণ করিবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য আপনার হইবে না। ইংরেজ-সৈন্য বাছা বাছা সুশিক্ষিত লোক, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র অতি উৎকৃষ্ট এবং তাহাদের অর্থবল ও জনবল অধিক থাকায় শেষে যে তাহাদের জয় হইবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।" আমার কথায় মংজীর হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডলে যেন একটু বিষাদের ছায়া পড়িল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা যেন আপনার জানা কথা বলিয়া বোধ হইল। আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, এই প্রকার ঘটনা হইবে।" আমি কহিলাম যে, আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছি, দেখিয়া শিখিয়াছি এবং সংবাদ-পত্রাদি, অন্যস্থানের বিবরণ পাঠ করিয়াও অনেকটা ধারণা জন্মিয়াছে।

অতঃপর দুর্গমধ্যে তিন দিন জয়োল্লাসে অতীত হইল। চতুর্থ দিবস রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকার সময় হঠাৎ গুড়ুম করিয়া কামান গর্জ্জিয়া উঠিয়া, মউলুর শান্তি ভঙ্গ করিল! দুর্গমধ্যে বিপদসূচক ঘণ্টা বাজিল, সৈন্যগণ দুর্গরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল এবং আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির হইল। তোপের গোলা আসিয়া দুর্গস্থ সেগুনকাঠের খুঁটিতে আঘাত করিয়া চূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। গোলার ভগ্নাংশ সকল সৈন্যগণকে আঘাত

করিয়া হতাহত করিতে আরম্ভ করিল। দুর্গস্থ সৈন্য সকল নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল, কারণ তোপের গোলা প্রায় এক মাইল দূর হইতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। শত্রুসৈন্য নিকটবর্ত্তী নয় যে, বন্দুকের ওয়ালী দ্বারা তাহাদের ক্ষতি করিতে পারা যাইবে। মুহুর্মুহু দুর্জ্জয় কামানের গোলাঘাতে দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন হইতে আরম্ভ করিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এমন সময়ে দুর্গের পশ্চাৎ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে রাইফলের গুলি আসিয়া কেল্লার উপর পতিত হইতে আরম্ভ করিল। দুর্গস্বামী মংজীর তখন চৈতন্য হইল। তিনি শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইবার ভয়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ব্বে আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, দুঃখিত ও পরিতপ্ত হইলেন। আজকার সময়ে জয়লাভের কোন আশা নাই,আত্মরক্ষা করাও সঙ্কট হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু আজকার প্রভাতের কাক, কুক্কুট বা ঘুঘুর ডাক আর শোনা গেল না। পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইল, পূর্ব্বাকাশে রাঙ্গা রবি রক্তবর্ণ থালাখানার ন্যায় দেখা দিলেন। চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ যেন মউলুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুঃখে ম্লান হইয়া নীলাকাশে লুকাইলেন।

গোলাঘাতে দুর্গের সম্মুখ-দ্বার ভগ্ন হইয়া গেল, একদল সেপাই দুর্গ অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। মংজী অমিত তেজে তাঁহার লোক সকলকে উৎসাহিত করিয়া আগন্তুক-সৈন্যের উপর গুলি চালাইতে আদেশ করিল। দুর্গের অগ্র ও পশ্চাৎ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি শত্রুর মাঝে পড়িয়া শত্রুগণকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কামানের ও বন্দুকের ধুঁয়ায় রণ-ক্ষেত্র কুজ্ঝটিকায় পরিণত হইল। কালাসৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোক, বালক বালিকা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগকে সুড়ঙ্গের পথে লইয়া যাইবার জন্য একজন বিশ্বস্তকর্ম্মচারীকে আদেশ করা হইল; কেন না, এক গোলা আসিয়া স্ত্রী-মহলে পতিত হওয়ায় তাহার তিন স্ত্রীর এক স্ত্রী হত হইল, আরো কয়েকজন লোক আহত হইল। দুর্গমধ্যে বহুসৈন্য হতাহত হইয়া পড়িল। আহতদিগের চিকিৎসালয়ে তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। দুর্গস্থ খড়ের ঘর গোলার আগুনে জ্বলিয়া উঠিল! এইরূপ আশাহীনাবস্থায় আমার তথায় থাকা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই, তখন অনর্থক হয় মৃত্যু, না হয় শত্রুহস্তে বন্দী হওয়া, ইহার কোনটাই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক, স্বাধীনতা-প্রিয় ও তেজীয়ান বীর মংজীকে এরূপাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যেন আমার

মনে কষ্ট বোধ হইল। আমি মংজীর যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য রহিলাম।

দুর্গ-প্রাচীর ও সম্মুখের দরজা ভগ্ন হইল, দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যগণের আড়াল সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহারা আর পূর্ব্ববৎ বন্দুক ফায়ার করিতে পারিল না, তাহাদের ফায়ারের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে লাগিল। দুর্গের অবস্থা শোচনীয় মনে করিয়া অগ্র ও পশ্চাৎ হইতে দুইদল শত্রুসৈন্য একযোগে, বেগে দুর্গাধিকার করিবার জন্য ধাবিত হইল। যখন কালাসৈন্য ঝটিকাবেগে দুই দিক দিয়া ধাবিত হইল, তখন মংজীও আপন সৈন্যকে দুই ভাগ করিয়া দুই দলের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ধাবিত করিলেন। তখন দুইদলে হাতাহাতি কাটাকাটী আরম্ভ হইল। মংজী-সৈন্য খড়্গ ও বর্শা লইয়া, কালা-সৈন্য সঙ্গীন লইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। লড়াইয়ের এই মুহূর্ত্তে যে কাণ্ড চক্ষে দেখিলাম, তাহা যথাযথ বর্ণন করিবার সাধ্য নাই। বর্ম্মা-সৈন্যের এরূপ নির্ভীকতা, আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তা আমরা পূর্ব্ব যুদ্ধেও লক্ষ্য করি নাই। যেমন প্রবল ঝটিকা সৃষ্টিসংহার বেগে ধাবিত হইয়া, সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই উড়াইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া লইয়া যায়, এই দুই পক্ষের সৈন্যেরও সেইরূপ লক্ষ্য হইল। যেমন সেনাপতি তেমনি সৈন্য! ধন্য মংজী, ধন্য স্বদেশ-প্রেম! রণক্ষেত্র বীভৎস দৃশ্যে পরিণত হইল, মগসৈন্য সংখ্যায় অল্পতা বিধায় কালাদের সঙ্গীনের আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইয়া ক্রমে পাতলা হইতে লাগিল। কালা-সৈন্য কেল্লা ভরিয়া পড়িল, দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইল, তখন মংজী ও আমি আত্মরক্ষার্থ সুড়ঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইলাম। আমরা কালাসৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ধৃত হইলাম। কিন্তু আমি মংজীর অবস্থা কি হইল, জানিতে পারিলাম না, তিনি হত হইলেন কি শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন, জানিতে পারিলাম না। আমি ধৃত হইবামাত্র একটা গুর্খা সেপাই আসিয়া "শালা বর্ম্মা ডাকু" বলিয়া গালি দিয়া আমার উরুতে অনর্থক দুই তিন সঙ্গীনের খোঁচা মারিয়া আমাকে জখম করিয়া ফেলিল, আর এক বেটা আসিয়া খুকরি দিয়া আমার হাতে ও পিঠে কোপ মারিল। এ সকল অনর্থক বাহাদুরি লইবার জন্য। আমি যখন নিরস্ত্র, তখন আমাকে এরূপ বন্দী অবস্থায় অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা পশুত্বের পরিচয়। বাস্তবিক গুর্খাদিগকে পশু আখ্যা দিলেও অত্যধিক হয় না। আমার মত আরো যাহাদিগকে অক্ষতাবস্থায় ধরিতে লাগিল, তাহাদিগকেও আঘাত করিয়া জর্জ্জরিত করিল। যুদ্ধে যাহারা আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের

অনেকের জীবন এই পশুগুলি শেষ করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। মগ সৈন্যের যাহারা অনাহত ও অধৃত ছিল, তাহারা কেহ কেহ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল।

অতঃপর ডাক্তার বাবু আসিয়া আহত সেপাইগণের পটি বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন, কাহারো প্রবল বেগে রক্তস্রাব হইতেছে, সেই রক্তরোধের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেপাই জখমগণকে এক স্থানে সংগ্রহ করা হইল, মগ জখমগণের, যাহাদের প্রাণনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাদিগকেও এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া অবস্থানুসারে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। আমারও গায়ে ও হাতে পটি বাঁধা হইল। কালা ও মগ সৈন্যের যত জখম সমস্তকে গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া কাথায় প্রেরণ করা হইল। সেপাইগণ নিজেদের হাঁসপাতালে গেল, আমরা, মগেরা, ডাকু বলিয়া জেলখানায় প্রেরিত হইলাম।

কাথা পৌঁছিয়া জেলখানার হাঁসপাতালে নীত হইলাম। হাঁসপাতালে এত আহত লোকের স্থান সঙ্কুলন হওয়া কঠিন। তাই কতক কাষ্ঠাসনে, কতক মৃত্তিকাসনে গায়ে গায়ে পড়িয়া রহিলাম। আঘাতের যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পর দিন বেদনায় জ্বর হইল। ডাক্তার বাবু প্রত্যহ দুইবার আসিয়া আমাদিগকে মোটামোটী দেখিয়া কয়েদী কম্পাউণ্ডারকে ঘায়ে মলম ইত্যাদির পটি দিতে আদেশ করিয়া যাইতেন। গোরা ডাক্তার প্রত্যহ একবার আসিয়া সকলের প্রতি একটু নজর করিয়া, বাবুকে দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিয়া যাইতেন। তিনি নিজে কাহারো ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন না। উপযুক্ত চিকিৎসা, পথ্য ও যত্নের অভাবে, যাহারা গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, যাহাদের পেটে বা বুকে সঙ্গীনের খোঁচায় আভ্যন্তরিক যন্ত্র আহত হইয়াছিল, সেই সকল হতভাগ্য ব্যক্তিরা ক্রমে মরিতে আরম্ভ করিল। জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়গণও তাহাই চান, বর্ম্মা ডাকু মরিয়া যত শেষ হয়, ততই ভাল। যেমন মরিতে লাগিল, তেমন জেলার অন্যান্য স্থান হইতে আহত ডাকুগণ আসিয়া জেল হস্পিট্যালে নূতন ভর্ত্তি হইতে লাগিল!

বন্ধুদ্বয়।

কাথার জেলখানায় ভর্ত্তি হইবার তিন দিন পরে, জেলরক্ষক সেপাইদিগের হাবিলদার জেলখানার হাঁসপাতালের রোগীদিগকে দেখিবার জন্য আসিল। হাবিলদারের দিকে তাকাইয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে মন অভিভূত হইল। আমি কহিলাম, "ভাই হাবিলদার! রাম রাম।"

হাবিলদার, মগ-ডাকুর মধ্য হইতে তাহাকে "ভাই" সম্বোধন করে এবং 'রাম রাম' বলিয়া অভিবাদন করে, শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও কতকটা ক্রোধান্বিত হইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ক্রোধান্বিত হইল, কেন না, সেই সময়ে কালারা বর্ম্মাদিগকে এমনভাবে নির্যাতন ও পদদলিত করিত যে, তাহার আর বিচার ছিল না। কালারা বর্ম্মাদিগকে, কি সম্ভ্রান্ত লোক, কি অপর লোক, কি স্ত্রীলোক, কাহারও মান রক্ষা করিত না। সুতরাং এমন নিগৃহীত মগদিগের মধ্য হইতে, যে জেল-রক্ষক হাবিলদার, তাহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করে, ডাকু-কয়েদীর এত আস্পর্দ্ধা! কয়েদীগণ ভয়ে, সামান্য একজন জেলের পেয়াদার নিকট কথা বলিতে হইলে, যোড়হাতে কথা বলে, নচেৎ থাপড় খাইতে হয়।

হাবিলদার স্বক্রোধে আমার দিকে কতক্ষণ তাকাইয়া পরে হর্ষচিত্তে কহিল "হারে কুড়হন! তোম্ আকে ক্যায়ছা জেল মে গিয়া? ক্যা তাজ্জব হ্যায়!"

আমি। তাজ্জব ত হ্যায়ই, লছমন! তোম্ ক্যায়ছা হামারা হাত মে গিয়াথা, ভুল গিয়া? হাম বি ঐছা গিয়া হ্যায়!

আমার কথায় লছমন সিং কিছু লজ্জিত হইল। আমি তাহাকে কহিলাম যে, "এ ক্যায়ছা বাত হ্যায়, তোম্ এমানছে কছম কিয়াথা যো আউর হাম লোগকা দুস্‌মনি নেহি করেগা। আবি এমার্গ ছোড়কে কছম উল্টাইয়া দিয়া?"

লছমন। আরে ভাই! হাম লোগ, তোমারা মেহেরবানি, আউর হাম লোগকা কছম কভি ভুলেগা নেহি। লেকেন ক্যা করনা, সাহেব ছোড়তা নেই। হাম নাম কাটানে কো আরজী দিয়াথা, সাহেব আরজি মঞ্জুর করথা নেহি। হামকো পাঁচ রূপেয়া যাস্তি করকে দেকে প্রমোশন দিয়া হ্যায়, আউর বলা হ্যায় যো তোমকো লড়াইমে নেহি ভেজেগা। এছি্‌এয়াস্তে জেহেলকো খবরদারি কোওয়াস্তে হিঁয়া ভেজে হ্যায়। জোর করকে নেহি যানে সেকৃথা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, হাবিলদারের মুখের দিকে তাকাইয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে মন অভিভূত হইল। হর্ষ হইবার কারণ এই যে, এমন বিপদসঙ্কুল স্থানে একটী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু বিষাদের কারণ এই যে, এই লোকটা ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিল। এখন তাহার কৈফিয়ৎ শুনিয়া মনের সে ভাবটা কতক দূর হইল।

সে আমাকে মউলুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি আমূল সমস্ত কথা, শৈবোর দুই লড়াই, ইউ জেলে বন্দী ও জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন, এবং মউলু আসিয়া কিভাবে আহত ও বন্দী হইলাম, তাহা সমস্ত বলিলাম। সে শুনিয়া অবাক হইল এবং আমার দৃঢ়তা ও সাহসের অনেক প্রশংসা করিল। আমি তাহাকে কহিলাম যে, "ভাই কোন গতিকে" আমাকে এই নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার কর। সে কহিল যে "ভাই সে বড় শক্ত কথা, তাহাতে নিজের জেল হইবার আশঙ্কা আছে। আচ্ছা থাকত, ডাক্তার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেখি।" আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ডাক্তার বাবুর নাম কি?" সে কহিল, "ডাক্তার বাবুও বাঙ্গালী, বাড়ী ঢাকায়। নাম পি, সি, ঘোষ।" আমি কহিলাম পি, সি, ঘোষকেত আমি জানি, ঢাকাতে তাহার সঙ্গে আমার জানা শুনা ছিল।

ইহার পর হাবিলদার চলিয়া গেল। হাবিলদারের মুখে শুনিয়া ডাক্তার বাবু বাঙ্গালী ডাকু দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া তাড়াতাড়ি হাঁসপাতালে আসিলেন। তিনি আসিয়া কে বর্ম্মা, কে বাঙ্গালী, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পরে একে একে সকলের প্রতি নজর করিয়া আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাকাইয়া থাকিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম কুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী?" আমি কহিলাম "আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম কুড়ন।"

ডাক্তার বাবু। আপনি ঢাকায় কখনও ছিলেন?

আমি। হাঁ, আমি ঢাকা স্কুলে পড়িতাম।

ডাঃ বাবু। তবেত আপনাকে যেন চিনি, চিনি, বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি ঢাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতালের নিকট নলগোলা দেবীদাস বাবুর বাসায় কিছুদিন ছিলেন, না?

আমি। আজ্ঞা হাঁ, আমি তথায় কিছুছিন ছিলাম।

ডাঃ বাবু। তবেত আপনি একজন পরিচিত বন্ধু! সেই পাঠ্যাবস্থার চেহারা ও বর্ত্তমান চেহারার অনেক পার্থক্য হইয়াছে। বিশেষতঃ বর্ম্মাবেশে মগ-ডাকুর মধ্যে যে স্বদেশী কোন বন্ধুর সাক্ষাৎ হইবে, তাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, সেইজন্য আজ কয়েকদিন ততটা লক্ষ্য করি নাই।

আমি। আমিও আপনাকে প্রথম চিনিয়া উঠিতে পারি নাই। আপনার সেই পাঠ্যাবস্থায় গোঁপ দাড়ি কিছুই ছিল না, এখনও গোঁপ-দাড়ি না থাকিলেও চেহারায় অনেকটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। আপনি কয়েকদিন

হাঁসপাতালে আসিয়া আমাদিগের প্রথম দেখিয়া গিয়াছেন, তখন আপনাকে চিনিতে পারি নাই।

ডাঃ বাবু। হাবিলদারের নিকট আপনার ইতিহাস সমস্ত শুনিয়াছি, লরিমারের কাহিনী, কমিশারিয়াটের চাকরী, ব্রহ্মদেশী সৈন্যদলে প্রবেশ এবং বিদ্রোহী দলে মিলিত হইয়া কত যুদ্ধে, কত সেপাইকে হতাহত করিয়াছেন, কয়েকজন গোরা কাপ্তানকে হত করিয়াছেন, ইউর জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে মউলুর লড়াইতে ধরা পড়িলেন, এ সমস্ত ঘটনা আমার নিকট উপন্যাসের মত বোধ হয়। যাহা স্বপ্নেও কখনও মনে স্থান পায় না, তাহা আজ স্বচক্ষে দেখিলাম এবং স্বকর্ণে শুনিলাম। এ কথা দেশে গিয়া বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। বাঙ্গালীর ঘরেও এমন ছেলে জন্মিতে পারে, তাহা আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। আপনার মত লোককে স্বচক্ষে দেখিয়া জীবন সার্থক হইল।

আমি। না মহাশয়! অত বড় বড় কথা আমার নামের সঙ্গে যোগ করিবেন না। আমি একজন সামান্য লোক, তবে মনের ক্ষোভে, মনের ঝাল মিটাইবার জন্য মগের দলে মিশিয়া আমাদিগের জাতীয় শত্রুদিগকে দেখাইলাম যে শিক্ষা, সংসর্গ ও অভ্যাসে বাঙ্গালী না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। সামান্য ক্ষুদ্র একজন শত্রুও যে প্রবলকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারে, তাহাও প্রমাণ করিয়া দিলাম। আমার জীবনের যাহা লক্ষ্য ছিল, তাহা প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিল।

ইউর জেল হইতে যখন পলায়ন করিয়াছিলাম, তখন শক্তি ছিল, এখন আহত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং আপনাদের জেল ভাঙ্গিয়া পলাইবার সাধ্য নাই। এখন আপনারা কোন মতে আমাকে এখান হইতে বাহির করিয়া দেন।

ডাঃ বাবু। সে বড় শক্ত কথা। এখান হইতে কোন কয়েদী পালাইলে জেল হইবার সম্ভাবনা।

আমি। চেষ্টা ও কৌশলের অসাধ্য কার্য্য নাই।

ডাঃ বাবু। আচ্ছা থাকুন, হাবিলদারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেখি।

এই বলিয়া ঘোষ বাবু আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিচত্তারিংশ অধ্যায়।

শবাধারে পলায়ন।

জেলার হাঁসপাতালে বিশেষ আসে না, কখন কখন আসিয়া মোটামোটি দেখিয়া যায়। পরদিন ডাক্তার বাবু আসিয়া আমার রোগের অর্থাৎ ক্ষতের ইতিবৃত্ত সাবধানে বিস্তারিত রূপে আমার টিকিটে লিখিলেন। এজেলে আমি নাম বদলাইয়াছি। কেন না, আমি মংকালা জানিতে পারিলে হয়ত আমার উপর রাত্রে পাহারা স্থাপিত হইবে। আমাকে বলিয়া দুইবার সাধনানন্দ স্বামীকে ধরিয়া দিয়া সেনাক্ত করিয়া পাপিষ্ঠগণ সরকার হইতে পুবস্কার লইয়াছে। আবার ইউর জেলে বন্দী হওয়ার জন্যও তুজি প্রভৃতি পুরষ্কার পাইয়াছে। সেইজন্য এ জেলে আমার নাম বলিলাম মংতা। জেলের খাতায় আমার ঐ নাম লেখা হইল। ডাক্তার বাবুর টিকিটেও তাহাই লেখা হইল। আমার জখম যাহাতে গুরুতর বলিয়া বোধ হয়, সেইজন্য তাহার গভীরতা,দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,তাহা বড় ধমনীর অতি নিকটবর্ত্তী প্রভৃতি লিখিয়া, ডাক্তার পরদিন হইতেই আমার জ্বরের মাত্রা বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্লাড-পয়জনিংয়ের লক্ষণ সকল ক্রমান্বয়ে লিখিলেন। দৈনিক বিবরণে প্রাতঃকাল ও সায়ংকালীয় টেম্‌পারাচার কোন দিন ১০৩.৪, ১০৪.২, ১০২.৮ ইত্যাদি রূপে লিখিত হইল। কখন কখন কোষ্টবদ্ধ, কখন বা উদরাময়ের লক্ষণ, জ্বরের সময় প্রলাপের কথাও কোন কোন দিন লিখিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে তিনি দুইখানি রিপোর্ট দুই মত করিলেন। একখানি স্বাভাবিক ধরণের ক্ষতের চিকিৎসা, আর একখানিতে গুরুতর ব্লাড-পয়জনিংয়ের লক্ষণ সকল লিখা হইল। তাহার কারণ, কি জানি যদি বড় ডাক্তার গুরুতর লক্ষণ দেখিয়া হঠাৎ রোগী পরীক্ষা করিয়া বসেন, তাহা হইলে জাল ধরা পড়িবে। জাল টিকেট খানা আমার বিছানার নীচে রাখিলাম। ডাক্তার বাবু আমাকে প্রত্যহ দুই পাইণ্ট দুধ, সুপ ও চারি আউন্স রমের ব্যবস্থা করিলেন। আমি কখনও সুরাপান করি না, সুতরাং রমের দরকার আমার নাই, কেবল লোক দেখাইবার জন্য এ ব্যবস্থা।

তাহার টিকিট পড়িয়া মনে মনে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যখন জেইলার বা ডাক্তার সাহেব আইসে, তখন আমি কম্বল মুড়ি দিয়া, জ্বরে ও বেদনায় যেমন লোকে কোঁ কোঁ করে, সেইরূপ ক্যাঁকাইতে থাকি। তাহারা চলিয়া গেলে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করি। হাবিলদার ও ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে কালাভাষায় নানা কথাবার্ত্তা বলায় এবং আমার প্রতি যত্ন ও পথ্যের পক্ষ-পাতিত্ব করায়, যে সকল বর্ম্মারা আমাকে চেনে না, তাহারা ঈর্ষান্বিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, চিকিৎসার অবহেলায় ও পথ্যের অভাবে জেল-খানায় প্রত্যহই দুই একটী ডাকু মরিতে লাগিল।

একদিন ডাক্তার বাবু ও হাবিলদার আসিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, কি উপায়ে আমাকে বাহিরে পাঠাইবেন। তাঁহারা ভাবিয়া কোন উপায়ই দেখেন না।

আমি কহিলাম যে, "শিবাজী, আরাঙ্গেবের কারাগার হইতে সন্দেশের ঝুড়ির মধ্যে বসিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, আমি এখানে জেলখানায় আর সন্দেশের ঝুড়ি কোথায় পাইব? তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যহ তিন চারিটী মল-মূত্রের জালা বাহিরে যায়, তাহার মধ্যে বসিয়া পলায়ন অপেক্ষা এখানে মরণ ভাল।" আমার কথায় দুই জনেই উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিলেন। অতঃপর আমি কহিলাম যে, "আমি এক উপায় বলিয়া দিতে পারি, যদি আপনাদের বন্ধুর জীবন রক্ষা করার ইচ্ছা থাকে এবং সাহস পান, তাহা হইলে প্রত্যহ দুই একটী, কোনদিন দুই তিনটী মড়া আপনারা বাহিরে পাঠাইয়া থাকেন, তাহাদের সঙ্গে একদিন আমাকেও বাঁধিয়া বাহির করিয়া দিন না কেন?"

হাবিলদার। এ বুদ্ধিটী মন্দ আঁটে নাই, বেশ ফিকিরের কথা বলিয়াছ।

ডাঃ বাবু। তাহা হইলে আমার বিশেষ দায়িত্ব, জীবিত লোককে মড়া বলিয়া বাহিরে পাঠাইলে যদি ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমি জাহান্নামে যাইব। আর যদিও জেলের মধ্যে বাহিরে ধরা না পড়ি, কয়েদী ও পেয়াদাগণ শবের বাঁধ খুলিয়া যখন গর্ত্তে পূরিতে যাইবে, তখন মড়া কি জ্যান্ত, তাহা প্রকাশ পাইবে, আর তাহাও যদি প্রকাশ না পায়, যদি তাহারা বাঁধশুদ্ধ গর্ত্তের মধ্যে তোমাকে ফেলিয়া জীবন্ত কবর দেয়, তাহা হইলে কি উপায়?

হাবিলদার। সে ভার আমার, আপনি তার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা

করিয়া অন্যান্য মড়ার সঙ্গে বাহিরে পাঠাইতে পারিলে বাহিরের যে বন্দোবস্ত হয়, তজ্জন্য আমি দায়ী। কিন্তু ভাই কুড়হণ, তোমাকে এক প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, জেল হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিবে।

আমি হাবিলদারের কথামত প্রতিশ্রুত হইলাম যে,ব্রহ্মদেশে আর থাকিব না।

অতএব এই প্রকার বাহির হওয়াই তিন জনের মত হইল। আমার ক্ষতের অবস্থা দিন দিন ভাল হইতে লাগিল, কিন্তু টিকেটের অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল।

ইহার তিন দিন পরে ডাক্তার বাবু কহিল যে, ডাক্তার সাহেব দুই দিনের জন্য দাওয়ারায় যাইবেন। আমি অমনি কহিলাম, তবে এই সুযোগে আমার মরা উচিত। তিনি একটু হাসিলেন এবং কহিলেন যে, আর এক বিপদ, অপর জখম গুলি পাছে জেইলারকে বলিয়া দেয়। তিনি সেইজন্য আমাকে স্বতন্ত্র এক কক্ষে রাখার হুকুম দিলেন। আমি আর এখন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে বসিতে পারি না, ক্রমেই যেন শক্তিহীন হইয়া যাইতেছি। আপাদ-মস্তক কেবল কম্বলদ্বারা ঢাকিয়া রাখি, সময় সময় মুখখানা বাহির করিয়া ডাক্তারের কথার দুই একটা উত্তর কঁ্যাকাইতে কঁ্যাকাইতে দিই।

ডাক্তারের আদেশে কয়েদীগণ আমাকে ধরাধরি করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেল।

ডাক্তার সাহেব যেদিন দাওয়ারায় গেলেন, তাহার পর দিনই আমার মৃত্যু হইল, অবশ্য কাগজে কলমে। সেইদিন আরো তিনটী হতভাগ্য ডাকুর মৃত্যু হইল। আমাকেও হাবিলদারের জানিত পেয়াদার তত্ত্বাবধানে কম্বল দিয়া জড়াইয়া মড়া কাটার ঘরে লইয়া গেল। কয়েদীগণ আমার আগা পাছা ধরিয়া তুলিবার সময় আমি আড়ষ্টভাবে সটান হইয়া রহিলাম এবং অতি মৃদু বেগে শ্বাস ছাড়িয়া কোন মতে প্রাণটা রক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সহযোগী অপর তিনটী শবের পার্শ্বে আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পেয়াদা চলিয়া গেল। তখন প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, এবং এপাশ ওপাশ ও প্রয়োজন মতে খাতিরজমায় নড়া চড়া করিতে লাগিলাম।

জেলখানার নিয়ম এই যে, যত কয়েদী মরিবে, তাহাদের সকলেরই দেহ কাটিয়া পরীক্ষা করিয়া আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া মাসিক রিটার্ণে তাহা দেখাইতে হইবে। সেইজন্য আমাদের পোষ্ট মার্টম পরীক্ষার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বেলা তিনটার সময় ডাক্তার বাবু মড়া কাটা অস্ত্রের বাক্স লইয়া মড়াকাটার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সকলেরই পেট চিরিলেন, মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া ঘিলু বাহির করিয়া দেখিলেন, অবশ্য আমি বাদে। আমার গায়ে অস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে কোন ছুতায় যে কয়েদীটা তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত ছিল, তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া আমার কম্বলের আশে পাশে ছুরিদ্বারা কয়েকটা খোঁচা দিয়া কম্বলে রক্ত মাখাইয়া দিয়া, অপর মড়াগুলি সেলাই করিয়া দিয়া, শবগুলি তাহার সম্মুখে বাঁধিতে আদেশ করিলেন। কয়েদীগণ চাটাই ও কম্বল সহযোগে আমাদিগকে জড়াইয়া কসিয়া রাখিল। বেলা চারিটার সময় সময় আমরা মগ-কয়েদীর কাঁধে চড়িয়া জেলখানার বাহির হইলাম।

কয়েদীর সঙ্গে হাবিলদারের কয়েকজন সেপাই। কবরখানা জেল হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে। সুতরাং তথায় যাইতে বেলা গেল। কবর আগেই খোদিয়া রাখিয়াছিল।

এদিকে বেটারা আমাকে এত কসিয়া বাঁধিয়াছে যে, নড়াচড়ার সাধ্য নাই, দুইখানা হাত যেন অবশ হইয়া যাইতেছে, আর সহ্য হয় না। কবরক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইলে আমি আমার দক্ষিণ হস্ত খানা একটু টানিয়া সোজা করিবার চেষ্টা করিবামাত্র, আমার নড়ার ভাঁজ পাইয়া কয়েদীদ্বয় "আমে, লে লে! তাছেই!" (ওগো ভূত!) বলিয়া ধড়াস করিয়া আমাকে মাটীতে ফেলিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহাতে বড় ব্যথা পাইলাম। সেপাইগণ কয়েদীদ্বয়ের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিয়া হাতের ডাণ্ডাদ্বারা কয়েক ঘা কসিয়া মারিবামাত্র তাহারা ভয়তে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া আমাকে পুনরায় কাঁধে তুলিল।

কবর-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আগাছার জঙ্গলে পূর্ণ। আমাদিগের তথায় নামাইয়া তাড়াতাড়ি অপর তিন জনের গোর দেওয়া হইবা মাত্র, নায়ক রামশরণ সিং অপর দুইজন সেপাইকে বলিল যে, "তোমরা শীঘ্র কয়েদীদিগকে লইয়া জেলখানায় যাও, জেইলার সাহেব বলিয়াছেন এবং ছয়টা বাজে, জেল বন্ধ হইবে। আমি এই লাশটা গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া আসিতেছি।"

সেপাই দুই জন কয়েদীদিগকে লইয়া জেলাভিমুখে গমন করিল। তাহারা অদৃশ্য হইল, এদিকও ঘোর হইয়া আসিতে লাগিল। রামশরণ সিং পকেট হইতে একখানা ছুরি বাহির করিয়া আমার বাঁধ কাটিয়া দিল। এবং বলিল

যে, "বাবু মংকালা আবি ভাগো। জলদ্দী ভাগো।" সে এই কথা বলায় আমি গা ঝাড়া দিয়া উঠিলাম। তখন সে বলিল যে, "স্যাগাইন কো লড়াই মে হাম লোক আপকা হাত মে কয়েদ হুয়া থা, আপনে হাম লোককা জান বঁাচাইয়া থা। আজ হাম লোগ বি আপকো জান বঁাচাইয়া দিয়া। খুব হুঁসিয়ার মে জঙ্গল সে ভাগো, লেখেন ফের পাকড়া জানেছে হাবিলদারকা, ডাক্তার আউর হাম লোককা জেহেল হো জায়গা। আবি আপকো বর্ম্মা টাপ্পুনে রহেনে কো কুছ ফায়দা নেহি, মুলুক মে জানা আচ্ছা হ্যায়।" আমি রামশরণ সিংহের হাত ধরিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইলাম, হাবিলদার ও ডাক্তারকে নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া জঙ্গলে মাথা দিলাম। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চলিলাম। ক্ষতগুলি এখনও ভাল করিয়া আরাম হয় নাই। সুতরাং দ্রুত চলিতে কষ্ট বোধ হইল।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

পরিচিতে পরিচিতে।

আমি রাত্রিকালে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম, তবে চলি কোন্ দিকে, তাহা ঠিক নাই। পথ চিনি না, তাহাতে অন্ধকার, রাত্রি, শরীর কাতর। শেষে মনে মনে ধারণা করিলাম যে, নদীর তীর অবলম্বন ভিন্ন আমার অন্য পথে যাইবার সুযোগ হইবে না। ইরাবতী নদীর ধারে কাথা সহর। কিন্তু ইরাবতী নদী অপার বর্ম্মার পাহাড় ও জঙ্গল ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে, সুতরাং নদীর ধারে বিজন জঙ্গল ও স্থানে স্থানে দুরারোহ পাহাড়। এমতাবস্থায় বঙ্গদেশী নদীর ধারের মত সুগম পথে চলা অসম্ভব। তবুও যতদূর সম্ভব, নিম্নগামী নদীর স্রোতই আমার পথদর্শক হইল। এবার আমি আহত বলিয়া আমার পায়ে বেড়ি পড়িয়াছিল না। তাই চলিবার সুযোগ হইয়াছিল। একটী পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম এবং নিদ্রার বেগে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল। তখন জঙ্গলের বাহিরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বলিয়া বোধ হইল। তথায় শয়ন করিবার ইচ্ছায় তলাশ করিতে

করিতে একটী ক্ষুদ্র জিয়াট্ নামক পথিকাশ্রম পাইয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

এক ঘুমে রাত্রি প্রভাত হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, আর ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলাম। খাব কি, সঙ্গে কোন সম্বল নাই, কোন গ্রামে খাদ্য ভিক্ষা করিতে গেলে পাছে কেহ সন্দেহ করিয়া ধরিয়া ফেলে, সেইজন্য কোন জনপদে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম না। দিনের বেলায় পথে চলিতে, বর্ম্মাদিগের ক্ষেতের ধার হইতে হস্ত তিনেক লম্বা একখানা বাঁস কুড়াইয়া লইয়া, কতকগুলি শাক পাতা কুড়াইয়া কলার পাতার সাহায্যে দুইটী পুঁটলি প্রস্তুত করিয়া বাঁশখানার দুই প্রান্তে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া বর্ম্মা পথিকগণের মত তাহা কাঁধে করিয়া চলিলাম। উদ্দেশ্য, সাধারণ লোকের চক্ষে ধুলা দেওয়া, আর কেহ আক্রমণ করিলে সেই বংশদণ্ড দ্বারা আত্ম রক্ষা করা। জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে একখানি ভুট্টার ক্ষেত্র দেখতে পাইয়া তাহা হইতে কয়েকটী কাঁচা ভুট্টা অপহরণ করিয়া তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পথে চলিলাম। এবং এক নালা হইতে কিছু জল-পান করিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা করিলাম। অতঃপর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় মাইল চারি পাঁচ যাওয়ার পর এক গরুর গাড়ীর পথ দৃষ্ট হইল। আমি সেই পথের কোন্ দিকে যাইব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। পথ ভুলে অন্যদিকে দূরে গিয়া না পড়ি, সেই আশঙ্কা হইল। তেমাথা পথের ধারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, এমন অভিপ্রায়ে রহিলাম। কিছুকাল পরে একখানা গরুর গাড়ী আসিতেছে, দেখিতে পাইলাম। গাড়াখানা ক্রমে নিকটে আসিল। তাহার আরোহী তিন জন যুবক এবং একজন বৃদ্ধা মাতিলা। পাঠক হয় ত জানেন না যে, মাতিলা কাহাকে বলে? ব্রহ্মদেশে পুরুষগণ যেমন চির কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলে, তাহাদিগকে ফুঙ্গি বলে, সেইরূপ স্ত্রীলোকগণও চিরকুমারী থাকিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করিলে, তাহা-দিগকে সন্ন্যাসিনী মাতিলা বলে। ইহারাও ফুঙ্গিদিগের মত শির মুণ্ডন ও গৈরিক বসন পরিধান করিয়া থাকে। ইহাদিগকে আমাদিগের ভাষায় যোগিনী ও ইংরাজী ভাষায় Nun বলা যাইতে পারে।

গাড়ীর কিছু পশ্চাতে একজন যুবক ফুঙ্গি গৈরিক বসন পরা, হাতে বড় একখানি তালবৃন্ত, পায়ে কানা।

গাড়ীস্থ তিনটী যুবকের একজন গো-চালন কার্য্যে নিযুক্ত, অপর দুইজন গাড়ীর মাঝে বসা। যুবকত্রয়ের চেহারা যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল, গলার আওয়াজ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বলিয়া কাণে লাগিল। আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "তোমরা কোথায় যাইবে ?" হয়ত আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াই হউক, না হয়,গন্তব্য স্থানের কথা কাহাকে বলিতে আপত্তি বশতই হউক, সে আমার কথার উত্তর দিল না। তখন নিরুপায় হইয়া পশ্চাতের ফুঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ফুঙ্গি বলিল যে, "আমরা ফলিন যাইতেছি।" ফলিন যাওয়ার কথা শুনিয়া আমার ভরসা হইল, তবে এই গাড়ীর সঙ্গে গেলে উন্মুর সুভার এলাকার সীমানায় ইংরাজাধিকৃত আউট পোষ্টে যাইতে হইবে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, উন্মু হইতে বাহির হইয়া ধরা পড়িয়া এই ফলিন পোষ্টের গারদে আমরা এক রাত্রি বাস করিয়াছিলাম।

ফুঙ্গি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তুমি কোথায় যাইবে ?" আমি কহিলাম যে, "আমিও ফলিনের নিকটই যাইব।" উন্মুর কথাটা তাহাকে ভাঙ্গিয়া বলিলাম না। সঙ্গী পাইলাম বলিয়া আমি হর্ষ প্রকাশ করিলে, ফুঙ্গি আমাকে তাহাদের সঙ্গী মনে করিয়া যেন কিছু বিরক্ত হইল। আমাকে বলিল যে, "তোমার মনে তুমি যাও, আমাদের রাস্তায় নানা স্থানে বিলম্ব হইবে, আমরা কয়দিনে পৌছি, তাহা ঠিক নাই।"

এরূপ নিষ্ঠুর কথায় মনে আমার লাগিল, মনে করিলাম যে, ফুঙ্গি কি মনে করিয়াছে যে, আমি তাহাদের গলগ্রহ হইব ? এত নিগ্রহ ! এই কি ফুঙ্গির যোগ্য কথা ? আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিলাম। অবশ্য তাহাদের গাড়ী হইতে পাছে রহিলাম। এই ফুঙ্গিটাকে যেন কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

চলিতে চলিতে বেলা অবসান হইয়া আসিল। আমার শরীর একেই কাতর, তাহাতে পথশ্রান্তি ও অনাহারে আরো কাতর হইলাম। এক কাঁচা ভুট্টা চর্ব্বণ করা, তাহাও শেষ হইয়াছে, আর নাই। রাত্রিকালে আর কোন আহারের সম্বল নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাড়ীখানা এক গ্রামের নিকটে এক জিয়াটের নিকট থামিল। তাহারা গাড়ীর গরু ছাড়িয়া দিল, নিজেরা জিয়াটের উপরে উঠিয়া নিজেদের বিছানাদি বিছাইল। আমিও এত ক্লান্ত হইয়াছি আর চলিতে সাধ্য নাই, আমিও তথায় রাত্রিটী বাস করিব মনে করিয়া সেই জিয়াটে

উঠিলাম, অমনি বর্ম্মা যুবকগণ আমার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল যে, তুমি আমাদের এখানে থাকিতে পারিবেনা।

আমি। কেন, আমি থাকিতে পারিবনা? জিয়াট সর্ব্বসাধারণ পথিকদিগের আশ্রম, ইহা তোমাদের নিজেদের সম্পত্তি নহে। ইহাতে তোমাদেরও যেমন অধিকার, আমারও তেমনি অধিকার!

গো-চালক যুবা। না, আমরা তোমাকে এখানে থাকিতে দিবনা, তুমি অন্যত্র যাও।

সকলেরই এক কথা, ফুঙ্গি, বৃদ্ধা মাতিলা সকলেই আমাকে সেই আশ্রমে থাকিতে দিতে নারাজ। আমি ইহাদের ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত ও ক্ষোভিত হইলাম। ইহাদের সঙ্গে লড়াই করা পোষাইবে না মনে করিয়া আমি অগত্যা আশ্রমের নীচে গিয়া বসিলাম। আশ্রমগুলি সেগুন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, চাল, বেড়া ও মেজে সকলই কাষ্ঠময়। ভূমি হইতে উহার মেজে প্রায় চারি হস্ত উচ্চ।

অতঃপর ইহারা নিম্নে আসিয়া পাক করিল এবং পাক করিয়া উপরে লইয়া গিয়া সকলে আহার করিল। ফুঙ্গি ও মাতিলাকে রাত্রিকালে অন্নাহার করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ফুঙ্গি যে রাত্রিকালে ভাত খায়, এ কেমন? ফুঙ্গিরাত দিবসে বারটার পর আর কোন খাদ্য খায়না। মনে মনে সন্দেহ হইল, ইহারা আহার করিয়া আস্তে আস্তে যে সকল কথা বলিতে লাগিল, সে কিন্তু বর্ম্মা কথা নহে, তাহা মণিপুরী কথা বলিয়া বোধ হইল। এবং যে গাড়ীতে বসিয়া গরু চালাইতেছিল, তাহার কথাও যেন পরিচিত লোকের কথার আওয়াজের মত বোধ হইল। আমি এই ফুঙ্গি গাড়োয়ান এবং মাতিলার রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টায় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ডের সময় দুইজন কালা আসিয়া হণ হণ করিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়াই সরাসর জিয়াটের উপর উঠিলেই ফুঙ্গি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিল এবং কহিল যে "তোমরা এখানে থাকতে পারবে না, অন্যত্র যাও।" সেই সঙ্গে সঙ্গে যুবকত্রয় ও মাতিলা আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

কালা দুইটী পাঠান, তাহারা যে সরকারী চাকরি করে, তাহা বোধ হইল না। পাঠানদিগের একজনের চেহারা দেখিয়া বোধ হইল যে তাহারা পল্টনের নাম-কাটা সেপাই হইবে। লোকটার যেমন প্রকাণ্ড চেহারা, তেমনি উদ্ধত স্বভাব। সে অল্প দুই চারি কথা বর্ম্মা জানে। সে হিন্দি ও বর্ম্মা কথা

মিলাইয়া বর্ম্মাদিগের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। পাঠান বলিতে লাগিল যে "হামলোক ইহাঁ রহেগা, খেমিয়া তোয়া" অর্থাৎ আমরা এখানে থাকিব, তোমরা এখান হইতে চলে যাও। বর্ম্মাদিগের মধ্যে সেই গাড়োয়ান যুবক বর্ম্মা দুই একটা হিন্দি কথা জানে, সেও বর্ম্মা হিন্দি কথা মিলাইয়া বলিতে লাগিল যে "টুম হিয়াঁ নেহি, তাছা জিয়াটমা তোয়া" অর্থাৎ তোমরা এখানে থাকতে পাবেনা, অন্য জিয়াটে যাও।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় ভারতবর্ষীয় কালাদের বর্ম্মাদের উপর বড় আধিপত্য ও জুলুম ছিল। সামান্য বা বিনা কারণে সেপাইগণ, ঠিকাদারগণ বা অন্য কেহ বর্ম্মাদিগকে প্রহার করিত, জিনিষ পত্র জোর করিয়া ব্যবহার করিত, রমণীগণের প্রতি অত্যাচার করিত। বর্ম্মারা বাধা দিলে, তাহাদের নামে নালিশ যেমন করিত, অমনি কোর্টে বর্ম্মাদিগের সরাসরি বিচার করিয়া কাহাকেও জেলে দিত, কাহাকেও বেত মারিত, কাহাকেও অর্থদণ্ড করিত। সেপাইগণ হয়ত ডাকু বলিয়া হাতকড়া দিয়া আনিয়া হাজতে ফেলিয়া অনেক নির্দ্দোষী লোককে অনর্থক পচাইয়া মারিত। কোন ডাকুর গ্রাম আক্রমণ কালে সেপাইগণ, স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণকেও সময় সময় গুলি করিয়া মারিত। সরকারের হুকুম ছিল যে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে তাহারা মারিতে বা অত্যাচার করিতে পারিবে না, কিন্তু পশু সেপাইগুলি ও গোরাগুলি কি আদেশ গ্রাহ্য করিত? ইহাদের অত্যাচারের বিষয়ক অনেক রিপোর্ট আমাদের নিকট পৌঁছিত। কেহ আসিয়া বলিত যে, অমুক গ্রামের কালারা আক্রমণ করিয়া সমস্ত দ্রব্য লুটিয়া লইয়াছে, ঘরগুলি আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে, এবং স্ত্রীলোকগুলিকে পর্য্যন্ত গুলি করিয়া মারিয়াছে, অনেক স্ত্রীলোক আপন আপন জীবন রক্ষার জন্য উলঙ্গ হইয়া শরীর দেখাইয়া তবে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এস্থলে সেপাইগণের স্বপক্ষে এক কথা ছিল। ব্রহ্মদেশের স্ত্রী পুরুষদিগকে প্রভেদ করিতে সময় সময় বড় ভ্রম হয়, কিছু দূরে যদি কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ যাইতে থাকে, তাহা হইলে পশ্চাৎ হইতে কে স্ত্রী, কে পুরুষ, তাহা ঠিক করা দায়। কারণ প্রায় সকলেই লুঙ্গি পরা, একই প্রকার এঙ্গি ও ফানা সকলেরই প্রায় একরূপ, সকলেরই কাছা শূন্য। সকলেরই মাথায় লম্বা চুল, সকলের মাথার বা গলায় রেশমী রুমাল, এবং স্ত্রী পুরুষ সকলই গোঁপ দাড়ী শূন্য, এমতাবস্থায় পুরুষ ভ্রমে স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময় গুলি করিয়া মারিত, সেইজন্য

তৎস্থানেস্ত্রীলোকগণ উলঙ্গ হইয়া সেপাইদিগের ভ্রম দর্শন করাইয়া আপন প্রাণ বাঁচাইত।

উপরোক্তাবস্থায় পাঠানগণ বর্ম্মদিগের প্রতি যে নিগ্রহ প্রকাশ করিবে, তাহার বিচিত্রতা কি। পাঠানগণ ক্রমে তেজপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের বর্ম্মাভাষায় আর কুলাইল না, হিন্দিতে বলিতে আরম্ভ করিল যে, যদি এখান হইতে অন্যত্রে না যাস্, তাহা হইলে তোদের মারিয়া তাড়াইব। সেইমত বর্ম্মারাও জেদ করিতে লাগিল, কিছুতেই তাহারা পাঠান কালাদিগকে স্থান দিবে না। আমি নীচে বসিয়া তামাসা দেখিতেছি। বর্ম্মারা আমার প্রতি যে ব্যবস্থা করিয়াছে, এই পাঠানরাজ তাহাদের উপযুক্ত ঔষধ মনে করিলাম, কিন্তু কালাদের প্রতি অর্থাৎ সেপাই ও সেপাই জাতীয় কালাদের প্রতি আমার এত ঘৃণা হইয়াছে যে, তাহাদের এ আধিপত্য আমার সহ্য হইল না। আমার সহানুভূতি সেই বর্ম্মাদিগের উপর গিয়া পড়িল।

উভয়পক্ষে বচসার সঙ্গে সঙ্গে পাঠানদ্বয় হস্তস্থিত লাঠি উত্তোলন করিয়া বর্ম্মাদিগকে প্রহার করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। তখন বর্ম্মা-যুবকত্রয় ও ফুঙ্গি দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের বর্ম্মা দা বা খড়্গ আনিয়া আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াইল, একদিকে চারিখানি খড়্গ, অপরদিকে দুইখানি লাঠি। পাঠানের বাচ্ছা কখনও হটিবে না বলিয়া বোধ হইল, বিবাদ যখন ঘনীভূত হইয়া মারামারির আকারে পরিণত হইল, তখন আমি আর নীচে থাকিতে পারিলাম না। আমার ভারের বাঁশখানা লইয়া দৌড়িয়া উপরে গিয়া বর্ম্মাদের সঙ্গে যোগ দিলাম এবং যুবকদিগের একজনের হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া তাহার হাতে বাঁশখানা দিয়া আমি সকলের আগে গিয়া যুবকদিগকে পাছে ফেলিয়া খড়্গ চালনা করিতে লাগিলাম। আমার খড়্গ চালনার কায়দা ও বিক্রম দেখিয়া বর্ম্মাদিগের খুব জোর হইল, পাঠানদ্বয় যেন স্তম্ভিত হইল। আমি তাহাদিগকে হিন্দিতে বলিলাম যে "সরকার বাহাদুর ফুঙ্গিকে মান্য করে এবং স্ত্রীলোককে মান্য করে। এখানে ফুঙ্গি ও মাতিলা যখন আছে, তখন তাহাদের প্রতি যদি অত্যাচার কর, তাহা হইলে তোমাদিগের ভাল হইবে না, তোমাদিগের শাস্তি হইবে। ভাল চাওত এখান হইতে অন্য জিয়াটে যাও। আর তাহা যদি না যাও, তবে এস আমি তোমাদিগকে একটু সোমজাইয়া দিই।"

আমার এই প্রকার খড়্গচালনা, এই প্রকার যুক্তিযুক্ত কথা ও আস্পর্দ্ধা ও সাহসের পরিচয় পাইয়া পাঠানেরা মনে করিল যে, এ লোকটা তুচ্ছ

লোক নয়। তাহারা ক্ষণকাল থামিল এবং মনে মনে ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্থান হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও বর্ম্মাদের খড়্গখানা ফিরাইয়া দিয়া নীরবে অন্ধের যষ্টি সেই বাঁশখানা লইয়া নীচে গিয়া বসিলাম, তাহাদের সঙ্গে আর কোন আলাপ করিলাম না।

পাঠানদ্বয় চলিয়া গেলে বৃদ্ধা মাতিলা বলিতে লাগিল যে, এই লোকটা না থাকিলে আজ আমাদের না জানি কত অপমান সহ্য করিতে হইত। ইহার অন্তঃকরণ কেমন মহৎ, ইহাকে আমরা উপর হইতে তাড়াইয়া দিয়া ভাল করি নাই, এ যে সামান্য লোক নয়। সকলেই বৃদ্ধার কথায় ও আমার ব্যবহারে, তাহাদের নিজেদের ব্যবহারের প্রতি লজ্জিত হইল। অতঃপর বৃদ্ধ মাতিলা আমাকে উপরে যাইতে ডাকিলে, আমি অভিমানে গেলেম না। তখন সে একটী বাতি হাতে করিয়া নীচে আসিল এবং সেই সঙ্গে ফুঙ্গিও আসিল। বৃদ্ধা আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বাবা! তোমার প্রতি ছেলেপিলেরা যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তজ্জন্য আমরা সকলেই দুঃখিত হইলাম। তোমার অন্তঃকরণ যে এমন মহৎ এবং তুমি যে এমন বীরপুরুষ, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তোমার গলার আওয়াজ ও চেহারায় বোধ হইতেছে যে তুমি যেন পরিচিত লোক, কিন্তু কিছু ঠাওর করিতে পারিতেছি না।"

আমি। না মা, আমার হাত ছাড়িয়া দিন, আমি একজন সামান্য লোক। আমার প্রতি আপনাদের ব্যবহার অন্যায় হয় নাই। কারণ এ জগতে সকলেই নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, সেটা স্বাভাবিক। আমি উপরে থাক্‌লে হয়ত আপনাদের অসুবিধা হইবে, তাই থাকৃতে দেন নাই, সেজন্য দুঃখিত হইবেন না।

বৃদ্ধা মাতিলা। না বাবা, তুমি কে, কোথায় যাইতেছ, তাহা আমাকে বল। তুমি যে সামান্য লোক নও, তাহা এক মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছি, তুমি নিশ্চয়ই কোন্ বড়লোক হইবে। তোমার কথার আওয়াজ, মুখের চেহারায় ঠিক আমার মংকালার কথা মনে পড়িতেছে। হায়! আজ তিন বৎসর ধরিয়া বাছা আমার বনে জঙ্গলে কত কষ্টই পাইতেছে, সেই সঙ্গে আমার মংপো-মিয়াও আছে। একবার, তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে প্রাণটা ঠাণ্ডা হইত।

বৃদ্ধার কথায় আমার মনের ধোঁকা ভাঙ্গিল। মনে মনে যে অনুমান

করিয়াছিলাম, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু স্পষ্ট বলিতে সাহস করিলাম না।

বৃদ্ধা আবার কহিল "তোমাকে যেন আমার মংকালা বলিয়া বোধ হইতেছে। তবে সে ছিল হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছেলে, আর তুমি দুর্ব্বল ও ফ্যাকাসে বর্ণের হইয়া গিয়াছ।" বৃদ্ধা মাতিলা কহিল "বল বাবা, তুমি কে?" ফুঙ্গিটীও আমার বাম হাতখানা ধরিয়া বলিল "বল ভাই তুমি কে, কোথায় যাইতেছ?" মংকালার কথা শুনিয়া গাড়ী-চালক যুবক গাড়োয়ানটী উৎকর্ণ হইয়া ব্যগ্রচিত্তে আমাদিগের কথা শুনিতে লাগিল।

আমার ইচ্ছা নয় যে আমি ইহাদের নিকট আত্ম-প্রকাশ করি। ইহাদিগকে আমার চিনিতে বাকী রহিল না। আমি পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলাম যে "আমাকে মাপ করিবেন, আমি নিজপরিচয় দিতে অনিচ্ছুক।" ইহারাও নাছোড়। বৃদ্ধা কহিল যে "বাছা তুমি যেমন মহদন্তকরণের লোক, তাহাতে তোমার নিকট আমাদের পরিচয় দিতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বুঝিয়াছি, তুমি আমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী ভিন্ন শত্রু নহ, তাহা হইলে কি আমরা তোমার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি, তাহা সত্ত্বেও তুমি দা লইয়া কালাদের সম্মুখে পড়িয়া আমাদিগকে রক্ষার চেষ্টা করিতে পারিতে? বাছা, আমরা বর্ম্মা নহি, আমরা পৌনা। আমার নাম উতে, এই আমার ছোট ছেলে মংডিন, আমার স্বামী উতাম কালাদিগ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শৈবো জেলে গিয়াছিলেন; শুনিতে পাইতেছি যে, শৈবো জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীগণ পলায়নের সময় তিনি পালাইয়া উন্মুতে আছেন। আমরা সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তথায় যাইতেছি।" বৃদ্ধ হয়ত একটু চালাকী করিয়া পৌনা নাম বলিলেন না, না হয় আমাকে বর্ম্মা মনে করিয়া পৌনা নামে পরিচয় পাইবে না বলিয়াই বর্ম্মা নামে আত্মপরিচয় দিলেন।

আমি এখন স্পষ্ট চিনিলাম। আমি কহিলাম, আমিও উতামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য উন্মু যাইতেছি। উতামকে আমিই জেল ভাঙ্গিয়া উদ্ধার করিয়া উন্মুতে রাখিয়া আসিয়াছি। মংপোমিয়াকেও তথায়ই আমি থাকিতে বলিয়াছি। আমার কথায় উভয়েই সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, এবং সেই বিস্ময়ের সঙ্গে যেন তাঁহাদের মুখমণ্ডলে আশার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ইতিমধ্যে সেই গাড়োয়ানটী উপর হইতে দৌড়িয়া নামিয়া আসিয়া আমার পা দুখানি ধরিয়া মাপ চাহিল, কালা দাদা, আমাদের

সমস্ত দোষ মাপ করুন, আমরা আপনাকে চিনিতে না পারিয়া বড়ই অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, এখন আত্মাবস্থা খুলিয়া বলুন। উপরে চলুন।

গাড়োয়ান যুবক আমার অঙ্গ স্পর্শ করায় আমার শরীর কণ্টকিত হইল। হর্ষে মন প্রাণ পূর্ণ হইল। আমার ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও পীড়িত দেহে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চালন হইল। মুহূর্ত্তে শরীরে দ্বিগুণ বল সঞ্চয় হইল। আহ্লাদে গদ গদ শরীরে কথা বলিতে যেন স্বর বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তবু কথা কহিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কহিলাম যে, "না কালা দাদাকে যখন হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন সে উপরে আর যাইবে না।" তখন মামিয়া দুঃখে অশ্রু বর্ষণ করিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল,সে টানের প্রতিরোধ করিবার শক্তি আমার রহিল না। যে শক্তি লইয়া অল্পক্ষণ পূর্ব্বে খড়গ হস্তে দুর্ব্বৃত্ত দ্বয়ের সম্মুখে পড়িয়াছিলাম, সেই শক্তি যেন গাড়োয়ান মামিয়ার হস্ত স্পর্শে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। সে আমাকে টানিয়া উপরে লইয়া গেল।

পাঠকগণ হয়ত এই সকল নামের পরিচয় না পাইয়া গণ্ডগোলে পড়িয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আপনারা এনামগুলি ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনাদের স্মরণার্থ অনুরোধ করি যে, আমি মাণ্ডালে পৌঁছিলে বিশ্বম্ভর শর্ম্মার পারিবারিক পরিচয় বিংশ অধ্যায়ে দিয়াছিলাম। তাহা দেখিবেন। উতের নাম মায়াদেবী, বিশ্বম্ভর শর্ম্মার ন্যায় উ তাম, মংডিনের নাম কানাইরাম শর্ম্মা, এবং মামিয়ার নাম ধর্ম্মদেবী। অপর দুইটী বর্ম্মা যুবকের এক জনের নাম, মাতোয়ে বা ইন্দিরা দেবী, অপরের নাম, মাকোয় বা কমলা দেবী। ইহারা সকলেই ছদ্মবেশে মাণ্ডালে হইতে উন্মু যাইতেছে। এই সময়ে যুবতী রমণীগণের পথ ঘাটে চলা সর্ব্বদা আশঙ্কার কারণ ছিল, কারণ দুর্ব্বৃত্ত ও গোরাগণ বা সেপাইগণ যুবতীদিগকে দেখিলেই জোর পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের নানা দুর্গতি করিত। সেই ভয়ে ইহারা তিনজন পুরুষের পোষাক পরিয়া চলিয়াছি। হঠাৎ কাহাকেও ধরিবার সাধ্য নাই। তাহার কারণ, যুবতী কুমারীগণ ও যুবতী রমণীগণ, যাহাদের সন্তান হয় নাই, জামার নিম্নে এমন আঁটিল এক একটী হাফকোট বা কাঁচলি পরিয়া থাকে যে, তাহার চাপে তাহাদের বক্ষঃস্থল পুরুষের বক্ষঃস্থলের মত সমতল দেখায়। এই কারণেও স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সাদৃশ্যের যে পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাতে রমণীবেশী পুরুষ বা পুরুষবেশী রমণীকে হঠাৎ কেহ চিনিতে পারে না।

কারণ তাঁহাদের উন্নত বক্ষের সঙ্গে আমাদিগের দেশের যুবতীগণের

বক্ষের তুলনা হয় না। কারণ বর্ম্মিণীগণ আঁটা কাঁচলি পরায় তাহাদের বক্ষ প্রায় পুরুষের ন্যায় হয়। আমাদিগের দেশের যুবতীগণ পুরুষের পোষাক পরিধান করিলে সহসাই বাছিয়া বাহির করা যায়, এদেশের যায় না। কারণ কামিনীগণ আটাকাঁচলি ব্যবহার করে।

মাণ্ডালে হইতে ইহারা পলাইয়া যাইতেছেন, তাই কানাইরাম ফুঙ্গির পোষাক পরা এবং মায়াদেবী মাতিলার পোষাক পরা। এইরূপ ভাবে না চলিলে পথে নানা বিপদের আশঙ্কা, ফুঙ্গি সঙ্গে থাকিলে কালা বা বর্ম্মারা সকলেই সম্মান করে।

আমি এখন ইহার গূঢ়মর্ম্ম বুঝিলাম, ইহারা কেন আমাকে উপরে স্থান দেয় নাই। কারণ তিনজন যুবতী স্ত্রী সঙ্গে, তাহার মধ্যে অপরিচিত পুরুষকে স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে। এই রমণীদ্বয়ের খড়্গ লইয়া পাঠানদিগের আক্রমণের চেষ্টা পাওয়ার কথা মনে করিয়া ইহাদের সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, হা হরি! এই মত সাহস আমাদের পোড়া বঙ্গদেশী রমণীগণের কবে হইবে? স্ত্রী কেন, পুরুষের মধ্যে এই রূপ কয়জন, তুইজন ভামকায় পাঠানের সম্মুখে দা হস্তে সাহস করিয়া দাঁড়াইতে পারে? যাহাদের সম্মুখ হইতে মা, ভগ্নী, স্ত্রীদিগকে দুর্বৃত্তগণ ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারা কি এইরূপ দা হস্তে আত্মরক্ষা ও রমণার সম্মান করিতে পারিতেছে? তাহা কখনই নয়।

অতঃপর ধর্ম্মদেবী আমার এই বদ হালের কথা, এবং সঙ্গীহীন কুলীবেশে পথ চালার কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম যে, "যদি এখন পেট ভরে চারটী খেতে দেও, তাহা হইলে সকল কথা বলিব, তাহা না পাইলে আমি আর কথা বলিতে পারিব না। আমি কহিলাম, উপবাস করিয়া আছি"। তাহাতে সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ী আমার আহারের আয়োজন করিল। ধর্ম্মদেবী আলুর তরকারি ও ভাত রাঁধিল। আমি মউলুর যুদ্ধের পরে আর এমন মিষ্ট ভাত তরকারি খাইতে পাই নাই, তাই প্রাণ ভরিয়া আহার করিলাম।

আহার সমাপ্ত হইলে শরীরে বল হইল, মনে স্ফূর্ত্তি হইল। পুরাতন বন্ধুগণের সঙ্গে যে এই ভাবে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইবে, তাহা চিন্তার অগোচর ছিল।

আমি ক্রমে স্যাগাইনের লড়াই, শোয়েবোর লড়াই, শোয়েবোর জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীগণকে খালাস করার বিবরণ, আমার সাধনানন্দ স্বামীর কথায় ইউ

জেলে বন্দী হওয়া, ও জেল ভাঙ্গিয়া পলায়নের কথা, পাতালপুরীর বিবরণ, মউলুর মংজী ও যুদ্ধের বিবরণ, ধৃত ও আহত হইয়া জেলে বন্দী হওয়া এবং কি প্রকারে শবাধারে শবাকারে থাকিয়া পলায়ন করিয়াছি, এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। ধর্ম্মদেবী ও মায়াদেবী আমার কথা শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। ধর্ম্মদেবী ব্যস্ত হইয়া আমার ক্ষত স্থান সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আবার আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিল। সকলেই আমার কাণ্ডগুলি উপন্যাসের ন্যায় মনে করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

বলা বাহুল্য যে, আমাকে পাইয়া ইহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। ধর্ম্মদেবীর প্রাণে আর আশঙ্কা ছিল না যে আমি যুদ্ধে জীবিত থাকিব এবং পুনরায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আমারও অনেকটা উদ্বেগ দূর হইল, কারণ ইহারা উন্মু না পৌঁছিলে বর্ম্মা হইতে স্থানান্তরে যাওয়া বিশ্বম্ভরের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আমার আত্মকাহিনী কহিতে কহিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। শেষে তাঁহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা এযাবৎ কোথায় ছিলেন। মায়াদেবী কহিলেন "আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে, আজ সকলে নিদ্রা যাও, কাল শুনিও।" আমরা তাহাতে রাজি হইয়া শয়নের বন্দোবস্ত করিলাম, কানাইরাম ও আমি একত্র শয়ন করিলাম। কারণ আমার বিছানাপত্র নাই। গত রাত্রি শুধু তক্তার উপর শয়ন করিয়াছিলাম।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলে আহারের বন্দোবস্ত হইল। পরে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমার ভারটী এবার একটু ভাল করিয়া বাঁধিলাম, কারণ কানাইরামদিগের সঙ্গের কাপড় চোপড় লইয়া একটী বোচকা বাঁধিলাম, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে কতকগুলি শাক সবজী বাঁধিয়া মনের সুখে, সগর্ব্বে কাঁধে ঝুলাইয়া চলিলাম। ধর্ম্মদেবীদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার সমস্ত ক্লেশ দূর হইল।

রাস্তায় গাড়ীখানা আগে আগে চলিল, ধর্ম্মদেবী গরু চালাইতে লাগিল, এবার হরিরামের স্ত্রী, পুরুষ বেশী কমলা দেবী গাড়োয়ানের অভিনয় করিয়া চলিল। আমি ও কানাইরাম ফুঙ্গি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। রাস্তায় কানাই রাম আমাদিগের অনুপস্থিতকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতে লাগিল।

"আপনি ও মেজে দাদা (হরিরাম) যুদ্ধার্থে স্যাগাইন গেলে, আমরা

কিছুদিন নিরাপদে ছিলাম। কিন্তু তথায় কোন কোন বর্ম্মা কালাদিগের পক্ষের ঘুষ খাইয়া, গুপ্তচরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমাদের সমস্ত মন্ত্রণার কথা গোপনে প্রকাশ করিয়া দেয়। তাহাতে ফুঙ্গি উনাওাকে ও আমার পিতা ঠাকুরকে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী মনে করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য গোপনে আয়োজন করিতে থাকে। সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের পক্ষের কোন ব্যক্তি তাহার সন্ধান পাইয়া কর্ত্তাকে বলিয়া দিলে, ফুঙ্গি ও কর্ত্তা দুইজনে পলায়ন করিয়া নানাস্থানে থাকিয়া অবশেষে স্যাগাইনের পাহাড়ে গমন করেন। তথায় কালারা তাঁহাদের সন্ধান পাইয়া ধরিয়া লইয়া শোয়েবো জেলে রাখে। তাহার পর শুনিলাম যে, আপনি নাকি সৈন্য লইয়া গিয়া জেল ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরে এ সংবাদও পাইলাম যে, ফুঙ্গি উ-নাওা পাগানে এবং পিতাঠাকুর উন্মুতে গোপনে বাস করিতেছিলেন। এবং আপনি বো-শোয়ে প্রভৃতিকে লইয়া তথায় কালাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার পর আর আপনার কোন সঠিক সংবাদ আমরা পাই নাই, তবে গুজব শুনিয়াছিলাম যে, মংকালাকে ধরিয়া ইউন জেলে রাখিয়াছে, এবং তথাকার জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীগণ পলাইয়াছে, সে সংবাদ মাণ্ডালে রাষ্ট্র হইয়াছিল, কিন্তু আপনি যে তাহার গোড়া, তাহা আমরা ঠিক জানিতে পারি নাই।”

“কালারা যখন আমার পিতা ও ফুঙ্গিকে গ্রেপ্তার করিতে আসিল, তখন ফুঙ্গিকে না পাইয়া আমাদের বাটী ঘেরিয়া ফেলিল। বাটীতে বাবাকে না পাইয়া আমাদের পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে মাণ্ডালে লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাকে তাহারা ধরিল না। তাহার কারণ বোধ করি, আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই বলিয়া। তবে পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাইবার কারণ এই যে, পরিবারবর্গ আবদ্ধ থাকিলে বৃদ্ধকে একদিন ধরিতে পারিবেই।”

“ইহাদিগকে মাণ্ডালে লইয়া গেলে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে মাণ্ডালে গেলাম। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে কেল্লার মধ্যে কিন্‌উন্ মিঞ্জির বাটীর নিকটে এক বাড়ীতে রাখিল, আমাকে তথায় বাস করিতে দিল না। সুতরাং আমি সহরের মধ্যে আমাদের রাজভক্ত কোন স্বদেশীয় বাটীতে থাকিতে লাগিলাম।”

“আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রাজভক্ত একজন সম্ভ্রান্ত বর্ম্মা কর্ম্মচারির উপর ভার পড়িল। এই বিপদে মামোয়ে নামক একটী স্ত্রীলোক আমাদিগকে বড় সাহায্য করিয়াছিল। মা-মোয়ে রাজা থীবুর পিতা

রাজা মিণ্ডনের রাজপুরীতে আপীয়ও বা পরিচারিকা ছিল। সে জাতিতে বর্ম্মা নহে, সে একজন চীনার কন্যা। চীনদেশে চীনার সঙ্গে চীনা মুসলমানগণের যখন লড়াই হয়, সেই সময়ে কতকগুলি মুসলমান চীনা রাজ্য ছাড়িয়া ব্রহ্মদেশে আসবার কালীন পথিমধ্য হইতে কোন গ্রামের এই বালিকাকে অপহরণ করিয়া আনয়ন করতঃ বিক্রয় করে। সেই হইতে এ রাজপুরীতে বাস করে। ইহার পরণ পরিচ্ছদ ও ভাষা ব্রহ্মদেশী হইয়া গিয়াছে, এখন ইহাকে চিনিয়া বাহির করা কঠিন।"

"মা-মোয়ের সাহায্যে বহু কৌশলে ও কষ্টে আমাদের পরিবার রাজপুরী হইতে ছদ্মবেশে বাহির হইয়া তবে চাউমিউতে পৌঁছে। তথা হইতে এই আমরা চলিতে চলিতে পথিমধ্যে সৌভাগ্য ক্রমে আপনার সঙ্গে সক্ষাৎ হইল। আপনাকে চিনিতে না পারিয়া যে অপমান করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই লজ্জিত হই—আশা করি, আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।" আমি বলিলাম যে, সেজন্য কোন ক্ষমার প্রয়োজন নাই। এখন আমরা যাহাতে নিরাপদে উন্মু পৌঁছিয়া ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে ধরা না পড়ি।

পথিমধ্যে সন্ধ্যাকালে কোন স্থানে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া পুনরায় গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করা হইল। এবং বহু কষ্টে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় উন্মুতে পৌঁছিয়া স্ত্রীলোকদিগকে এক নিরাপদ স্থানে কানাইরাম শর্ম্মার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া,আমি বৃদ্ধ বিশ্বম্ভর যেখানে থাকেন,তথায় গিয়া আস্তে আস্তে তাঁহাদিগকে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু ভয়ে কেহ শব্দ করিলেন না। শেষে নানা প্রকার সঙ্কেত দ্বারা এবং ধর্ম্মদেবাদিগের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যয় জন্মাইলাম যে আমি শত্রুপক্ষ নহে—আমি মংকালা। তখন তাঁহারা দরজা খুলিল, সকলে সবিস্ময়ে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ধর্ম্মদেবীদিগকে দেখিবার জন্য হরিরাম ও বিশ্বম্ভর ব্যস্ত হইলেন। তথায় তাহাদিগকে লইয়া গিয়া সাক্ষাৎ করাইলে, পরস্পর পরস্পরের স্নেহ ও ভালবাসা-সূচক ভাব প্রকাশ করিয়া আনন্দ-অশ্রু বর্ষণ করিলেন এবং করিলাম। স্ত্রীলোকদিগকে ইঁহাদের বাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইল এবং সাধনানন্দ স্বামীর সঙ্গে কানাই-রাম ও ধর্ম্মদেবীদিগের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলাম।

উন্মুতে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, মৌলুর যুদ্ধে বর্ম্মারা সমস্তই প্রায় মারা গিয়াছে এবং অবশিষ্ট লোকের মধ্যে অল্প দুই চারিজন বাদে আর সকলেই ধৃত হইয়া

জেলে গিয়াছে। সাধনানন্দ স্বামীর ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হইবে বলিয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন।

বিশ্বম্ভর শর্ম্মা। আমরা সকলেই তোমার জন্য চিন্তা করিয়া বড় অশান্তিতে আছি। যে প্রকার জনরব শুনিলাম, তাহাতে তুমি যে জীবিত আছ, তাহা আমাদের কাহারো বিশ্বাস ছিল না।

স্বামিজী। সকলেই বলিতেছে, এবং কেহ কেহ প্রত্যক্ষ দেখা সংবাদ বলিয়া রাষ্ট্র করিয়াছে যে, মংকালা কাথা ধৃত হইয়া জেলখানায় মারা গিয়াছে। কিন্তু আমার মনটা চিন্তাকুল হইলেও আমি তোমার সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হই নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তোমার জীবনের হানি হইবে না এবং বিপদ কাটিয়া যাইবে। আমরা হরিরামের মুখে ইউর জেল ভাঙ্গিয়া পলায়নের বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তখনই মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই। এখন বল, কি উপায়ে কাথা জেল হইতে বাহির হইলে?

আমি। আমি প্রথমতঃ আমার অঙ্গের ক্ষতগুলি তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। পরে যে যে উপায়ে, ডাক্তার ঘোষ ও হাবিলদারের সাহায্যে শবাধারে পলায়ন করিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত বলিলাম। এবং সেই সঙ্গে সেই হাবিলদারের পূর্ব্ববৃত্তান্তও বর্ণনা করিলাম। আমার কৌশল ও সাহসের জন্য সকলেই ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিলেন।

স্বামিজী কহিলেন যে, আমি জানিতাম, তোমাকে জেলখানায় কেহ রাখিতে পারিবে না। যাহা হউক, আমার ভবিষ্যৎ-বাণী যে সফল হইল, এই আমার মহানন্দ। তোমার কাণ্ড কারখানাগুলি বাস্তবিকই আরব্যোপন্যাসের মত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয়, অথচ এসব সত্য কথা, আমরা যাহা চক্ষে দেখিলাম ও কর্ণে শুনিলাম, তাহা অন্যত্র কাহারো নিকট বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না।

অতঃপর ধর্ম্মদেবী আসিয়া রাস্তায় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল, কি করিয়া সে "কালা দাদা"কে জিয়াট হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, কি করিয়া "কালা দাদা" পাঠান কালাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিল, এই সকল ঘটনা বর্ণন করিলে এক অট্ট হাস্যের রোল পড়িয়া গেল। বিশ্বম্ভর শর্ম্মা তাহাকে কহিলেন যে "কালা দাদা"কে যেমন অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলে, এখন তাহার পায় ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।

আমি কহিলাম যে "তাহা কি বাকী আছে, ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষমাদান উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হইয়াছে।

অতঃপর বিশ্বম্ভর শর্ম্মা ধর্ম্মদেবীদের মাণ্ডালয়ের দুর্গে অবস্থানের ও পলায়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়া এবং সকলে যে নিরাপদে একত্র হইতে পারিয়াছেন, সেজন্য নারায়ণকে ধন্যবাদ দিলেন।

সকলে একত্র হওয়ায় আমাদিগের মহানন্দ হইল এবং বহুদিন পরে আরাম করিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হইল।

হরিরাম কহিল, শুনিতেছি যে মউলুর মংজী এখানে গোপনে বাস করিতেছেন। মংজীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড় বাসনা হইল। আমার ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি জীবিত নাই। অনুসন্ধানে তাঁহার খোঁজ পাইয়া বিশ্বম্ভর শর্ম্মা ও স্বামিজীকে লইয়া রাত্রিকালে গোপনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মংজী আমাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন কি, "আপনি কেমন করিয়া জেল হইতে বাহির হইলেন ?"

আমি। আগে আপনি বলুন আপনি কেমন করিয়া কেল্লা হইতে বাহির হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন ? আমারত ধারণা ছিল যে আপনি জীবিত নাই।

মংজী। কালারা যখন কেল্লার মধ্যে পড়িল, আমার সৈন্যের সঙ্গে তাহাদের হাতাহাতি কাটাকাটি আরম্ভ হইল। আমার অধিকাংশ সৈন্য রণক্ষেত্রে পড়িল এবং কালারা যখন আপনাকে ঘেরিয়া ফেলিল, তখন আমি শত্রু হস্তে বৃথা ধরা পড়িয়া নানা লাঞ্ছনা পাওয়া অপেক্ষা আত্মরক্ষা করাই শ্রেয় মনে করিয়া, সেই সুড়ঙ্গের পথে স্ত্রীলোকদিগের দলে মিলিয়া বাহির হইয়া দেখি, সেদিকেও গুলি চলিতেছে। তাহাতে অনেক স্ত্রীলোক বালক বালিকা আহত হইয়াছিল। তবে অধিকাংশই পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। আমার তিন স্ত্রীর মধ্যে দুই জনের গুলিতে মৃত্যু হইয়াছে, একজন পলাইতে পারিয়াছে। আমিও অনাহত অবস্থায় পলাইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। আমার আরো সঙ্গিগণ এখানে আছে।

আমি। আপনি এখন কি করিবেন ?

মংজী। শুনিতেছি যে উম্মুর সঙ্গে কালাদিগের লড়াই হইবে। যদি লড়াই হয়, তবে উম্মুর পক্ষ হইয়া আর একবার যুদ্ধ করিব। তাহাতে যদি কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলে চীনদেশে চলিয়া যাইব, তবুও আত্মসমর্পণ করিব না।

মনে মনে ভাবিলাম, ধন্য লোক, এ প্রকার জেদের লোক বাঙ্গালার সাত কোটী লোকের মধ্যে একটীও নাই। ধন্য জেদ, ধন্য তেজ, ধন্য সাহস ও বীরত্ব। যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কোন কথা নাই। এক পক্ষের জয়, অপর পক্ষের পরাজয় হইবেই, কিন্তু পরাজিত হইলেই তাহার মহত্ত্ব যায় না ?

অতঃপর আমি বিশ্বম্ভর শর্ম্মা ও স্বামিজীকে মংজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলাম। বিশ্বম্ভর শর্ম্মার কথা তিনি পূর্ব্বে আমার মুখে শুনিয়াছিলেন, এখন সাক্ষাৎ হওয়ায় সন্তুষ্ট হইলেন। স্বামিজীকে মংকালা বলিয়া কালারা দুইবার ধরিয়াছিল, সে কথা শুনিয়া তিনি হাঁসিয়া উঠিলেন। ইহার পর আমার কথা বলিলাম। আমি নিরস্ত্র ব্যক্তি, আমাকে ধরিয়া বৃথা সঙ্গিন দ্বারা ও খুকরি দ্বারা আঘাত করিয়া সেপাইরা বাহাদুরি করিয়াছিল শুনিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। জেলখানা হইতে কি ভাবে পলায়ন করিয়াছি, তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কহিলেন, আপনার জেল হইতে পলায়নের ফন্দিগুলি এত আশ্চর্য্য যে, সহসা তাহা বিশ্বাস করা যায় না। যা হউক,

ঘটনাগুলি স্মরণ রাখিলাম, যদি নিজে জেলে পড়ি, তবে এই প্রকার ফিকির করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা পাইব।

মংজী জিজ্ঞাসা করিলেন যে "আপনারা এখন কি করিবেন?"

আমি কহিলাম যে, কাথায় ডাক্তার ও হাবিলদারের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি যে, আর ব্রহ্মদেশে থাকিব না, এখানে থাকিয়া পুনরায় ধরা পড়িলে তাঁহাদের জেল হইবে। সুতরাং উপকারী বন্ধুদিগের জন্য অন্ততঃ এদেশ পরিত্যাগ করা উচিত। আর এখানে থাকিয়াও কোন ফল নাই। সৈন্য সামন্ত দল বল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। যুদ্ধ করিবার আর আশা নাই, সুতরাং আমরা সকলে মণিপুরের দিকে যাইব। তিনি কহিলেন, সে মন্দ নয়। আত্মসমর্পণ করা বা পলাইয়া থাকা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে নিরাপদ স্থানে এখন থাকাই সঙ্গত।

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়।

মণিপুরে গমন।

আমরা মংজীর নিকট শেষ বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। আহারাদি সম্পন্ন করিবার সময় পরামর্শ হইল, রাত্রিকালে গোপনে উন্মু ত্যাগ করা। কারণ এস্থানে আর অধিক দিন থাকা নিরাপদ নহে। অনেক বিদ্রোহী আসিয়া উন্মুতে আশ্রয় লইয়াছে। বিশ্বম্ভর শর্ম্মা সুভার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলেন। আমরা সকলে উন্মু হইতে মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সকলেই ছদ্মবেশে, কেহ ফুঙ্গির বেশে, কেহ কুলির বেশে, স্ত্রীলোকগণ মাতিলার বেশে, এই প্রকার নানাবেশে পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। এক মাসে আমরা মণিপুর পৌঁছিলাম। রাস্তায় কোন বড় ঘটনা ঘটে নাই। ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি লিখিয়া গ্রন্থ বাড়াইবার ইচ্ছা নাই।

পাঠক আমার জীবনের ঘটনা শুনিতে শুনিতে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার আশঙ্কা করি। তাই তাড়াতাড়ি সমস্ত ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। উপযুক্ত লোকের হাতে এই ঘটনা গুলি বর্ণনার ভার পড়িলে ইহার এক একটী ঘটনাকে তিনি নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া আরো চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন। কিন্তু আমার দুর্ব্বল লেখনীর সে সাধ্য নাই। আমার জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না, সে বিচারের ভার আপনার হাতে।

আর একটী কথা উল্লেখ না করিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রহিবে বোধে উহা এস্থলে উল্লেখ করিতে হইল।

মণিপুর পৌঁছিয়া কয়েক দিন আরামে নির্ভাবনায় রহিলাম। মণিপুরেই স্বাধীন রাজ্যে স্বাধীনভাবে বাস করিব, স্থির করিলাম। তবে একবার দেশে গিয়া পিতা মাতা ভাইদিগকে দেখিয়া আসিব মনে করিলাম।

ইতিমধ্যে একদিন নানা বিষয়ে আলাপ হইতেছিল। এমন সময় বিশ্বম্ভর শর্ম্মা আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন যে "বাবা, আমার শেষ কাল, কবে মরি স্থির নাই, আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। তাহা না করিলে আমার অকাল মৃত্যু হইবে জানিও এবং সে পাপের ভাগী তুমি হইবে।"

আমি কহিলাম, "আপনার এমন কি অনুরোধ, যাহা আমি রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ? আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনার আশ্রয়ে আমি মানুষ হইয়াছি। এও কি সম্ভব হয় যে, সাধ্যসত্বেও আপনার কথা রক্ষা করিব না? আপনি বলুন, আমার সাধ্য হইলে তাহা অবশ্য পালন করিব, তাহাতে যদি আমার মৃত্যুও হয়, সেও শ্লাঘনীয়।

আমার কথায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি কহিলেন, আমার এই অনুরোধ যে "তোমাকে আমার ধর্ম্মদেবীকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমি বড় সুখী হইব এবং চিরকাল আশীর্ব্বাদ করিব। বল স্বীকার কর কি না?" বৃদ্ধের অনুরোধে আমার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হইল। হর্ষ হইল হইল, কেন না আজ কয়েক বৎসর ধর্ম্মদেবী আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া আসিয়াছে, আমিও যে তাকে ভালবাসি নাই, সে কথা বলিলে কপটতা প্রকাশ পাইবে। বাস্তবিক আমিও তাহাকে ভালবাসিয়াছি। ইহাকে বিবাহ করাই সঙ্গত বিবাহ, আর বিবাহ করিলে এইরূপ নারীকে বিবাহ করা উচিত, যে বিপদকালে খড়্গ ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। কষ্ট হইল যে, বিবাহ করিব না বলিয়া বাটী হইতে পলাইয়া পিতা মাতাকে কষ্ট দিয়াছি, এখন সেই বিবাহ করিলেও এ বিবাহ দ্বারা তাঁহাদের কোন সুখ হইবে না। ইহা ভাবিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে উপায় নাই। বৃদ্ধের নিকট অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং স্বীকার করিলাম যে, আপনি হাত ছাড়িয়া দিন, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। উপকারীর উপকারের শোধ, প্রণয়িনীর প্রেমের প্রতিদান, অঙ্গীকার রক্ষা, এই এক কার্য্যের দ্বারা তিন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু এই স্থানেই সারা জীবনের মধ্যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিলাম। যে জেলখানায় আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, সেই আমি এখন রমণীর প্রেম-জালে জড়িত।

স্বাধানন্দ স্বামীও কহিলেন, এই বিবাহই তোমার পক্ষে প্রশস্ত। তুমি এখানে থাকিয়া লোকের উপকার করিতে পারিবে এবং স্বাধীন রাজ্যে বাস করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে।

আমি তথাস্তু বলিয়া বৃদ্ধ বিশ্বম্ভরকে ও গুরু তুল্য স্বামিজীকে প্রণাম করিলাম।
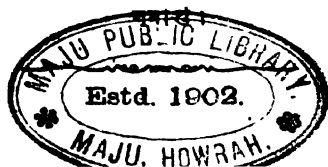
অশুদ্ধি-শোধন।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭ম পৃষ্ঠা	শীর	শির
৮ম ঐ	প্রত্যেক পড়ো	প্রত্যেক পড়োকে
১২ ঐ	কান	কাণ
ঐ	পাঠশালায়	পাঠশালার
১৩ ঐ	ভোথা	ভোতা
১৮ ঐ	বিশ্বম্বর	বিশ্বম্ভর
২৪ ঐ	স্কুলের	স্কুলে
২৫ ঐ	আমাদিপের	আমাদিগের
৪২ ঐ	পান	পাণ
৩৪ ঐ	কোমলালেবু	কমলালেবু
৬২ ঐ	যকৃতই	যকৃত
৬৮ ঐ	উঠে	উঠ
৭১ ঐ	নীচু পড় পড়	নীচু পড়
৭৪ ঐ	যশঃ লাভ করিয়া করিয়াছিল	যশঃ লাভ করিয়াছিল
৭৬ ঐ	ব্রাহ্মদের ছেলে	ব্রাহ্মণদের ছেলে
৭৭ ,,	দৃষ্টি করিবেন না।	দৃষ্টি করিবেন।
৯০ ,,	নিশ্বাস প্রবাস	নিশ্বাস প্রশ্বাস
ঐ	কারনের	কারণে
৯২ ,,	আমার ধর্ম্মমত	০
৯৩ ,,	শাপে	শাঁপে
৯৪ ,,	গায়ত্রি	গায়ত্রী
ঐ	বুবাই	বুঝাই
৯৭ ,,	গিগিনিভং	গিরীনিভং
৯৮ ,,	দিবেদন	নিবেদন

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৫ „	ধ্যানত্বং	ধ্যায়েনিত্বং
৯৯ „	আহারান্তে	আহারারন্তে
১০০ „	খাবেবে	খা—বে
১০১ „	সবুও	তবুও
ঐ „	কর্ত্তে	করতে
১০৫ „	তাছারা	তাঁহারা
১০৭ „	বসিলাম	বলিলাম
১০৯ „	প্রকাশ্য	প্রকাশ্যে
ঐ „	ধর্ম্মমত	ধর্ম্মমতে
১১০ „	ওঁতৎসৎ	ওঁ তৎসৎ
১১১ „	বুজিয়া	বুঁজিয়া
১১২ „	এককালের পক্ষে	সকলের পক্ষেই
১১৩ „	পূর্ণ পুকুর	পুণ্য পুকুর
১১৫ „	ধর্ম্মেও	ধর্ম্মের
১২৫ „	সেটা	পেটা
ঐ „	শুনকা	ওনকা
১২৯ „	উপস্থিত ছিলেন না	উপস্থিত
১৩১ „	টাঠের	টাটের
১৩৮ „	গদাই ঝাঝির	গদাই মাঝির
১৪৪ „	হুজুরের যে	হুজুরের
১৫৭ „	করিল	করিলেন
১৬০ „	ভাণ্ডারীর মালাপহরণ	ভাণ্ডারের মালাপহরণ
১৬২ „	অচ্ছা	আচ্ছা
১৬৩ „	আকিসে	আফিসে
১৬৫ „	my I ask	may I ask
১৬৬ „	take	talk
১৬৭ „	হামরা	হামারা
ঐ „	ঠাট্টা	টাণ্টা

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৭ "	একরূপ নেহি	এক ছুন্না নেহি
ঐ "	তিন জল	তিন জন
১৬৮ "	ঠাট্টায়	টাঙ্গায়
১৭১ "	bief	beef
১৭২ "	কলকার	ফলকার
ঐ "	প্রকৃতির দৃশ্য	প্রাকৃতিক দৃশ্য
ঐ "	বিশ্বাস হইলে জল	বিশ্বজননীর জলরাশির মধ্যে
১৭৩ "	তালায়	তলায়
১৭৪ "	ঝাঁপটে	সাপটে
ঐ "	জেল	ছেলে
ঐ "	ছিল	ছিলেন
১৭৬ "	আনার	আমার
ঐ "	কুঙ্গ	কুলি
ঐ "	বৰ্ম্মগণ	বৰ্ম্মাগণ
ঐ "	সুরজ	সুরতী
ঐ "	বর্ণনা	বর্ণ
ঐ "	সুদাম	সুদীর্ঘ
ঐ "	জরির	জড়ির
১৭৮ "	চোথা	চোখা
১৮১ "	যাহব	যাইব
ঐ "	বাবায়	বাসায়
১৮২ "	I shall be able to do much for you	I shall be able to do so much for you
১৮৪ "	রবং	বরং
১৮৫ "	জি গানশ	জি গনেশ
১৮৭ "	agant	against
১৮৮ "	আনার	আমার
১৯০ "	Chuckar-butty	Chucker-betty
১৯১ "	ইউরোপিয়ান	ইউরেশিয়ান
১৯১ "	মন	মনে
১৯৩ "	যুবতী	সুরতী
ঐ "	ছেন জাতা	ছেন আদা
ঐ "	দিয়া	গিয়া
১৯৪ "	কয়া	ফয়া
ঐ "	পদ	পদস্ত
১৯৬ "	সুন্দর	সুদর

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৬ "	হইল	হইয়া
ঐ "	মুখটার	মুখটা
১৯৭ "	সৈএ গাঁই	সঙ্গ্রামিনী গাঁই
১৯৯ "	ফালা	ফানা
২০০ "	তাহার সঙ্গে কথা	তাহার কথা
ঐ "	তাহার পিতা	তাহার পিতাকে
২০১ "	সঙ্গে কি কথা কহিবে	সঙ্গে কথা কহিলে
ঐ "	বিশ্বম্বর	বিশ্বম্ভর
ঐ "	মাংডিন	মংডিন
ঐ "	মা কোয়া	মা ফোয়া
ঐ "	গোলচনী	গোলোচনীতে
ঐ "	সৌন্ধর্য্যের	সৌন্দর্য্যের
২০২ "	আমেন	থামেন
ঐ "	পশমী	রেশমী
২০৩ "	কেবল	কোন
ঐ "	পদগুলির	শব্দগুলির
২০৪ "	বর্ম্ম কথা	বর্ম্মাকথা
ঐ "	আবৃত	আবৃত্তি
ঐ "	পারিত না	পারিতেন না।
ঐ "	ল্ল	ল্লে
ঐ "	লঃ	ল্লেঃ
ঐ "	গরু গাড়ী	গরুর গাড়ী
২০৪ "	মাত্র	যত
ঐ "	অক্ষরে	অক্ষর
ঐ "	বাঙ্গালা-ভাষা	বর্ম্মাভাষা
ঐ "	করিয়া	করাইয়া
ঐ "	করিতে ও	করিতে
ঐ "	সমবয়স্কদিগের	সমবয়স্কাদিগের
২০৫ "	করিয়া	করাইয়া
ঐ "	তাহাদের	তাহাদিগকে
২০৬ "	যেন দিনাজপরে	যেমন দিনাজপুরে
২০৭ "	সৈন্যদলেও	সৈন্যদলে
ঐ "	অবরোধ্য উল্লঙ্ঘন	অবরোধ্যস্থান উল্লঙ্ঘন।
ঐ "	খালাপালা	খালনালা
ঐ "	বস্তু	বস্তুও
২০৮ "	ডুবিয়া গেল	ডুলিয়া গেলাম

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৮ "	গুর্খার	গুর্খারা
ঐ "	মিণ্ডাউক	মিনডাট
ঐ "	রোজ মোলের	রেজিমেণ্টের
ঐ "	মিম্ উন	মিনউন্
ঐ "	আকাটর	আক্যাট্
ঐ "	অনেকগুলি বহর	অনেকগুলি নৌ বহর।
ঐ "	সিট্ বা ভুল	সিট্-বা ইন
২১০ "	পোষাক	পোষক
ঐ "	স্বর্য্যাবংশোদ্ভব	সূর্য্যবংশোদ্ভব
ঐ "	বালা	রাজা
ঐ "	প্রিভি কাউনসেল	প্রীভি কাউন্সেল
২১১ "	রাজ মহিলাদিগের	রাজ মহিষীদিগের
ঐ "	ফুঙ্গির	ফুঙ্গির
২১২ "	প্রতিপত্তিশালিনী	প্রতিপত্তিশালিনী রাজকুমারী
	রাজার ষড়যন্ত্র কোন	রাজার ষড়যন্ত্রকারী কোন
২১২ "	বসান হয়	বসান
২১৩ "	করিয়া	করিলেন
ঐ "	যেন কোন	যে কোন
ঐ "	তাহারা	তাঁহারা
২১৪ "	কেহ বাহির	কেহ বাছিয়া বাহির
ঐ "	মিন্ তুজির	মিন তুজির
ঐ "	রাস্তার শেষে প্রান্তে বসিয়া	রাস্তার শেষ প্রান্তে
ঐ "	মুটেদিগকে মোট নামাইয়া	মুটেদিগকে মোট নামাইতে
ঐ "	বসিয়া	বলিয়া
২১৫ "	চলিতে থাকে	চলে
ঐ "	বম্মান	বর্ম্মা
ঐ "	sladen	slaven
ঐ "	'নামনেবু'	'নামনেবু'
ঐ "	Burmon	Burman
২১৬ "	উল	উন
২১৮ "	বাসায়	বসায়
২১৯ "	ঝোক	ঝোঁক
ঐ "	কিন্তুইন	চিন্তুইন্
২২২ "	দেয়	দেন
ঐ "	আস্তর	অন্তর
ঐ "	বোষিত	ঘোষিত

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৪ ,,	পাতিত হয়	পতিত হয়
২২৯ ,,	আসেলেন	আস্লেন
২৩১ ,,	ডিউনমিঞ্জী	কিন-উন-মিঞ্জী
২৩২ ,,	তেইশ লক্ষ	তেত্রিশ লক্ষ
২৩৫ ,,	করা থাটের	কয়া থাটের
ঐ ,,	এককোণ্	একেকোণে
২৩৭ ,,	তাহার	তাহারা
ঐ ,,	র্কয়া	ফ্য়া
২৩৮ ,,	কোয়েরে	শোয়েবো
২৪০ ,,	পটীতে	পার্টিতে
২৪১ ,,	স্যাগদিন(sagadine)	স্যাগাইন(sagaine)
ঐ ,,	তথাচ দিগঞ্জল সেনাপতি	তথায় তিনজন সেনাপতি
২৪২ ,,	মিনমূল	মিন্মু
ঐ ,,	মাস্তালে	মাণ্ডালে
ঐ ,,	তাহা হইল প্রায়	তাহা হইতে প্রায়
ঐ ,,	সেদাপতি	সেনাপতি
২৪৩ ,,	ক্ষুদ্র হেটলার	ক্ষুদ্র টিলার
২৪৪ ,,	বিপদ আশঙ্কা করিয়া	ভীত হইয়া
২৪৪ ,,	ওয়ালীগুলির বিপদ	ওয়ালীগুলি হইতে বিপদ
২৪৯ ,,	আদমিসে	আদমিনে
ঐ ,,	does not understand	does understand
ঐ ,,	এস্মে	এস্নে
ঐ ,,	হামলোককে	হামলোককো
২৫০ ,,	মান্দ্রাজিগুলিকে	কয়েদীগুলিকে
ঐ ,,	উল্লাসিত হইল	উল্লাসিত হইয়া কহিল যে
ঐ ,,	set of fool	set of fools
২৫১ ,,	বাঙ্গলা বাবুটী	বাঙ্গালী বাবুটী
ঐ ,,	অর্থ	থর্প
ঐ ,,	লালাখাঁ	লালখাঁ
২৫৪ ,,	জোরবাদী	জেরবাদী
২৫৫ ,,	shew	shwe
ঐ ,,	নরহত্যা	নরহন্তা
ঐ ,,	ন্যায়বলে	ন্যায়বান
২৫৬ ,,	ক্যাম্পপাতিমুখে	ক্যাম্পাভিমুখে
২৫৬ ,,	সৈন্যদল	সৈন্যদান

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫৮ ”	কালাসৈন্যদিগকে কি করিয়া আনিয়া	কালা সৈন্যদিগকে ফাঁকি দিয়া আনিয়া
২৫৯ ”	একদলের লোক	একদলের গুলি
”	লোককে না পায়	লোককে আঘাত করিতে না পায়
২৬০ ”	বর্শার লক্ষ্যে	বর্শা লইয়া
২৬১ ”	সুভাদার দিলেন	সুভাদার ছিলেন
২৬৪ ”	নিমক হালামি	নিমক হারাম
”	যুদ্ধ করেয়াছ	যুদ্ধ করিতেছে
”	লুটতারাজে	লুটতারাজের লোভে
২৫৬ ”	সৈন্যদল	সৈন্যদলে
২৬১	ডেরামেলগিয়া	ডেরামে লেগিয়া
২৬৮ ”	মেড়প্রহরের	দেড় প্রহরের
”	যখন চারিদিক হইতে	তখন চারিদিক হইতে
”	শব্দের আওয়ালা	শব্দের আওয়াজ
২৬৯ ”	অনেক লাফাইয়া	অনেক সেপাই
”	কেল্লার কোনখানার মধ্যে	কেল্লার জেলখানার মধ্যে
২৭০ ”	সৈন্যের দল বল	সৈন্যের রসদ
”	করা হুকুম	কড়া হুকুম
”	৫০জন গোড়া	৫০ জন গোরা
২৭১ ”	অবশিষ্ট কেল্লাধিকারে	অবশেষে কেল্লাধিকারে
”	মিলিত হইবার শোয়েবো জন্য	মিলিত হইবার জন্য শোয়েবো
২৭২ ”	মিনঠুর	মিনমুব
২৭৪ ”	রাইফলধারীসৈন্যদিগকে আটক করিয়া	রাইফলধারী সৈন্যগণ কিরিয়া
২৭৫ ”	ইহাদের	ইঁহাদের
২৭৬ ”	চক্ষুদিয়া	চক্ষু হইতে
”	ফুঙ্গিচার	ফুঙ্গিচাং
”	‘যে বড় দুঃখের কথা’	সে বড় দুঃখের কথা
”	বর্ম্মা সাধু	বর্ম্মা
”	দেবতার মুখোজ্জ্বল কর	দেশের মুখোজ্জ্বল কর।
২৭৯ ”	সাধু বাতকিয়া	সাধুবান্ গিয়া
২৮০ ”	পিনাল কোর্টের	পিনাল কোডের
”	স্বামীজার	স্বামীজীর
”	চাউমিউর কেল্লা ও ফুঙ্গির	চাউমিউর লুটকরে ও ফুঙ্গির
”	তাহাতে যে ব্যক্তি	তাহাতে সে ব্যক্তি

পৃষ্ঠ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮১ ,,	বাসা খরচ	রাহা খরচ
২৮৪ ,,	তাহা কথাই	তাহা কখনই
২৮৫ ,,	যে সব বাঙ্গালী মোটা মোটা বাবুর	যে সব বাঙ্গালী মোটা মোটা বাবুদিগের
২৮৫ ,,	ভবিষ্যদ্বংশ এখন	ভবিষ্যদ্বংশ এমন
২৮৫ ,,	শত শত জাগিতেছে	শত শত জন্মিতেছে
২৮৬ ,,	প্রত্যক্ষ দেখিতেছে	প্রত্যক্ষ দেখিতেছি
২৮৭ ,,	পৌরুষের	পৌরষের
,,	কামড়াইয়া মারিয়া তাহার	কামড়াইয়া তাহার
,,	শত্রু লোকের নিকট	শত্রুর নাকের নিকট
২৮৮ ,,	তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়িত হইয়া	তিনি রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া
২৮৯ ,,	তিনি জেলখানার নিকট	তিনি জেনারেলের নিকট
,,	স্বদেশীয়	স্বদেশীর
,,	বৈঠকই বসায়	বৈঠক বসাইয়া
২৯০ ,,	বোশোয়ে প্রভৃতি	মংশোয়ে প্রভৃতি
২৯১ ,,	মারফত হইয়া	মারফতে
,,	তুই হইতে	তুইই হইবে
২৯৩ ,,	বারুদের গুলি	বন্দুকের গুলি
২৯৪ ,,	take the posion	take the position
,,	বর্ষ্মা হস্তে	বর্শা হস্তে
২৯৫ ,,	গুলি ভরিতে আদেশ করিলেন	গুলি ভরিতে আরম্ভ করিলেন
২৯৬ ,,	গোড় খোড়া	গোড় খোড়া উঠাও
২৯৮ ,,	মনে চেতন হইরে	মনে চেতনা হইবে
,,	কবর খানায় হইয়া	কবর খানার লইয়া
২৯৯ ,,	যুদ্ধে বর্ম্মদের	যুদ্ধে বর্ম্মাদের
৩০১ ,,	মংহুর	মংহ্লার
,,	বোশোয়া	বোশোয়ের
,,	গুরুম করিয়া	গুড়ুম করিয়া
৩০২ ,,	ছত্রভঙ্গ হইল	ছত্রভঙ্গ হইবে
,,	কুহ্মাটিকা	কুজ্ঝটিকা
৩০৫ ,,	পাঁচশ	পঁচিশ
৩০৬ ,,	ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলাম	হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম

পৃষ্ঠা	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৩০৬ "	কালা পাঠানের	কালা পল্টনের
৩০৭ "	কাজ সুচক্ষে	কাজ স্বচক্ষে
"	কোথা আসিয়া	কোথা হইতে আসিয়া
"	ক্ষুদ্রকেও জব্দ করা	ক্ষুদ্রকেও তুচ্ছ করা
৩০৯ "	অগ্রার্য্য স্থানে	অন্যান্য স্থানে
৩১১ "	মুক্ত করিয়া দি	মুক্ত করিয়াছি
৩১২ "	ফুলকাযুক্ত	কুল্লাযুক্ত
৩১৪ "	বেশফ	বেশর্ক
৩১৫ "	বনে জঙ্গলে	বনে জঙ্গলে
ঐ "	তাহারা ভাবে	তাহার
৩১৫ "	ফুঙ্গি কানা	মংকালা
৩১৮ "	যাহাদের বাস্থ	যাহাদের বাহি
" "	যা খাটিত	খাটিত
৩১৯ "	ডে কেটে	তে কেটে
৩২০ "	আনে লেলে	আমে-লে লে
" "	বাছুর চর্ম্মে	বাছুর চর্ম্মে প্রবেশ করান হইল
" "	কামজারীর মার মারে	কামজারির জন্য মারে
৩২২ "	ইউকেই	ইউতেই
৩২৩ "	নায়ক ধারণ করিল	নায়ক ধাক্কা মারিল
৩২৫ "	প্রকাণ্ড	প্রকাণ্ড
৩২৬ "	কয়া কয়া	ক্ষয়া ক্ষয়া
৩২৭ "	ঘামিয়া	মামিয়া
" "	মংচাউ বলে	মচাউবানে
৩৩১ "	পত্রে জবাব	পত্রের জবাব
৩৩৩ "	আসিয়াবাসী জীবগণ	আসিয়াবাসীগণ
৩৩৪ "	এখানে আসুন	এখানে থাকুন
৩৩৬ "	চাউ ও জিয়াট	চাউ ও জিয়াট্
" "	কয়া (দেব)	ক্ষয়া (দেব)
৩৩৮ "	দেখিতে করিলেন	দেখিতে কহিলেন
৩৩৯ "	Battalion command and to	Battalion commandant
" "	জোরবাদী	জেরবাদী
" "	মংজীর সাক্ষী	মংজীর কথা
৩৪০ "	তখন চাহিয়া খাইল	চাহিয়া খাইবে
৩৪১ "	স্ত্রীলোক বেশ	স্ত্রীলোকের বেশ
৩৪৭ "	মংজী সৈন্য	মংজীর সৈন্য
৩৪৭ "	আমরা	আমি

পৃষ্ঠা		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪৭	„	দুই তিন সঙ্গীনের	দুই তিনটা সঙ্গীনের
৩৪৯	„	জেলমে গিয়া	জেলমে গিয়া
ঐ	„	হাতমে গিয়াথা	হাতমে গিয়াথা
ঐ	„	ঐছা গিয়া হ্যায়	এছা গিয়া হ্যায়
ঐ	„	এ মার্গ	এমান
৩৫৩	„	ধরা না পড়ি	ধরা না পড়ে
৩৫৬	„	খুব হুঁসিয়ার মে	খুব হুঁসিয়ার সে
ঐ	„	বর্ম্মা টাপ্পুনে	বর্ম্মা টাপ্পুমে
	„	জালাইলাম	ঠারইলাম
৩৫৭	„	বঙ্গ কুড়াইয়া	বাঁশ কুড়াইয়া
৩৫৮	„	ফলিন	কলিন
৩৫৯	„	তাহারা পল্টনের	সে পল্টনের
৩৬০	„	কোন ডাকু	কোন ডাকুর
	„	এ চিঞ	এজিঞ
৩৬১	„	আমার নাম উতে	আমার নাম ওতে
„	„	মাপ চাহিল	মাপ চাহিয়া কহিল যে
৩৬৪	„	যখন হইতে	যখন উপর হইতে
„	„	দুর্ব্বৃত্ত ও গোরাগণ	দুর্ব্বৃত্ত গোরাগণ
„	„	চলিয়াছি	চলিয়াছে
৩৬৭	„	সীবুর পিতা	ধীবর পিতা
৩৬৮		আপীয়ও	আপীরও
„	„	দরজা খুলিল	খুলিলেন
৩৬৯	„	তোপখানায় মারা গিয়াছে	জেলখানায় মারা গিয়াছে

২৯শে আগষ্ট, ১৯১১। — শ্রীরামলাল সরকার।